# এসো কলম মেরামত করি

আবু তাহের মিছবাহ

# এসো কলম মেরামত করি

আবু তাহের মিছবাহ

بسم الله الرحمن الرحيم

# মাতৃভাষার গুরুত্ব আল-কোরআনে

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ، فيضل الله من يشآء ويهدى من يشآء ، وهو العزيز الحكيم ٥

*আমি প্রেরণ করিনি কোন রাসূলকে তবে তাঁর কাউমের 'ভাষাজ্ঞান' দিয়ে, যাতে তিনি বয়ান করতে পারেন তাদের উদ্দেশ্যে। অনন্তর তিনি গোমরাহ করেন যাকে ইচ্ছা করেন এবং হিদায়াত দান করেন যাকে ইচ্ছা করেন, আর তিনিই মহাপ্রতাপশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়।*

*(সূরা ইবরাহীম-৪)*

# মাতৃভাষায় নবীর শ্রেষ্ঠত্ব

عـــن أبي هـــريرة رضي الله عنه (في حديث) أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
قـــال : أعطيت جوامع الكل

(একটি হাদীছে) হযরত আবূ হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে দান করা হয়েছে **'সর্বমর্মী বচন'**। (মুসলিম)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
أنا أعرب العرب ولدتني قريش

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি আরবের শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধভাষী; কোরায়শগোত্রে আমার পয়দায়েশ।

# ভাষার নববী সংশোধন

এক ছাহাবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হলেন এবং বাইরে থেকে সালাম আরয করে বললেন, 'আ-আলিজু?' নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদেমকে বললেন, যাও, তাকে অনুমতি চাওয়ার তরীকা শিক্ষা দাও যে, বলো, আস-সালামু আলাইকুম, আ-আদখুলু? ছাহাবী শিক্ষা পেয়ে তাই বললেন, তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন। (আবূ দাউদ, হাদীছ, ৫১৭৭)

*(প্রবেশ করা অর্থে দু'টোই সমার্থক শব্দ এবং কোরআনের শব্দ। তদুপরি দ্বিতীয়টি অধিকতর উচ্চাঙ্গ শব্দ, কিন্তু প্রবেশের অনুমতি চাওয়ার ক্ষেত্রে যথাশব্দ হচ্ছে দুখূল, উলূজ নয়।)*

আল্লামা মুহম্মদ আব্দুল খালিক ওযায়মাহ (রাহ.) বলেন–

'আমার মতে, আপন বিষয়ে যিনি বিশেষজ্ঞ এবং অধ্যয়নে নিয়োজিত, তার জন্য সঙ্গত নয় যে, তার কোন লেখা পুনর্মুদ্রিত হবে, অথচ তাতে সংস্কার ও পরিমার্জনের কোন ছাপ থাকবে না। বস্তুত এটা নির্জীবতা ও স্থবিরতারই নামান্তর (আলমুগনী)

না য রা না

আমার
কল্পনার,
আমার
স্বপ্নের
সেই
দশজন
তরুণকে
যারা...

# বি ⬭ ষ ⬭ য় ⬭ সূ ⬭ চী

# ভূমিকা

আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে, আমি তখন নূরিয়া মাদরাসায়। ছাত্ররা আমাকে লেখা দেখাতো; আমি দেখতাম। কাছে বসিয়ে তাদের লেখার ভালো-মন্দ, সৌন্দর্য-অসৌন্দর্য হাতে কলমে বুঝিয়ে দিতাম। লেখাটা যখন লালে লাল হয়ে উঠতো, তাদের মুখে হতাশার ছায়া পড়তো। তখন আমি আমার আত্ম-সম্পাদনা দেখিয়ে বলতাম, নিজের লেখার এমন নির্মম কাটাচেরা যদি করতে পারো তবেই তোমার লেখার উন্নতি হবে। তারা অবাক চোখে নিজের হাতে আমার নিজের লেখার 'দুর্গতি' দেখতো এবং নিজেদের লেখার বিষয়ে সান্ত্বনা পেতো। আমি বলতাম, লাল কালি শুধু ভুল সংশোধনের জন্য নয়, সুন্দর থেকে সুন্দরতর এবং সুন্দরতমের দিকে অভিসারেরও জন্য।[১]

কারো লেখায় সুন্দর কোন শব্দ, বাক্য, উপমা, বা চিত্রকল্প দেখলে সৌন্দর্যের প্রশংসা করতাম; আবার কোন ত্রুটি থাকলে সেটাও আলোচনা করে বুঝিয়ে দিতাম যে, সমস্যাটা কোথায় এবং কীভাবে তা সমস্যামুক্ত হতে পারে! লেখার ভাষাগত দিক নিয়ে যেমন আলোচনা হতো তেমনি তার অবয়ব ও শরীর-কাঠামো নিয়েও পর্যালোচনা হতো। উদ্বোধনী অংশটি কেমন হয়েছে, কেমন হওয়া উচিত, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে গমনের যে যোগসূত্র, সেটা কেমন হলে ভালো হয়, ইত্যাদি সববিষয় তাদের খুলে খুলে বুঝাতাম। কখনো গোটা লেখাটি নতুন করে ঢেলে সাজিয়ে দেখাতাম, যাতে তারা চোখের সামনে দেখে বিষয়টি বুঝতে পারে।

দীর্ঘদিন ধরে এ কাজটি আমি করেছি। তাতে আমার নিজের তো উপকার হতোই, ওদেরও কিছু উপকার হচ্ছে, মনে হতো। ওদের পরবর্তী লেখায় কিছুটা হলেও উন্নতির ছাপ দেখে আমার ভালো লাগতো। আমি অন্যরকম আনন্দ পেতাম। আমার তখনকার কোন কোন ছাত্র এখন লেখক। তারা বলে, ঐ 'কাটাচেরা' তাদের বেশ কাজে এসেছে এবং লেখা দেখার এটা খুব কার্যকর পদ্ধতি, যা অন্য কোথাও তারা পায়নি।

বিভ্রান্ত হওয়ার মত প্রশংসা, কিন্তু আমি সতর্ক থাকি। কারণ আমি ভালো করেই জানি, পথের এটা শেষ নয়, মাত্র শুরু। এখনো দীর্ঘ পথ বাকি, মান্‌যিল এখনো অনেক দূরে।

আমি শুধু তাদের জিজ্ঞাসা করি, তাই যদি হয়, তোমরা তাহলে কেন নিজেদের লেখাকে এভাবে সময় দাও না এবং কেন তোমাদের ছাত্রদের পিছনে এভাবে মেহনত করো না? তোমাদের কাছে যেমন রয়েছে তোমাদের কলমের দাবী তেমনি রয়েছে তোমাদের ছাত্রদেরও কাঁচা কলমের পাকা দাবী। সে দাবী পূরণের জন্য কী করছো তোমরা? এসব কথা যত বলি, তারা আমার সঙ্গে তত কম দেখা করে।

তখন আমার মনে হতো, লেখা দেখার এবং লেখা সংস্কারের এ মজলিসগুলো যদি ধরে রাখা যেতো, হাতে-কলমের এ আলোচনাগুলো কাগজে-কলমে যদি সংরক্ষিত করা যেতো, পরবর্তিদের জন্য ভালো হতো। লেখার অনুশীলনের ক্ষেত্রে কচি হাতের কাঁচা কলমগুলো কিছুটা হলেও দিকনির্দেশনা লাভ করতো। কিন্তু আমি তা করিনি, আমার ছাত্ররা তো করেইনি। হয়ত সুযোগের সীমাবদ্ধতা ছিলো, আমার এবং তাদের।

তারপর দীর্ঘ সময় পার হলো, অনেক দূর পথ চলা হলো এবং একসময় ইলমের চলমান কাফেলায় মাদরাসাতুল মাদীনাহ যাত্রা শুরু করলো। আমার শিক্ষক-জীবনে পুরোনোরা যেমন বিদায় নিলো তেমনি নতুনদেরও আগমন ঘটলো। নদীর স্রোত চলতেই থাকে, পানি গড়াতে থাকে, নতুন পানি আসতে থাকে।

স্রোতের কাজ হলো সাগর-অভিমুখে চলতে থাকা। আমারও জীবন-নদীর স্রোত থেমে ছিলো না। নতুন পরিস্থিতি ও প্রতিকূলতার মধ্যেও কাজ চলছিলো। ওখানে যেমন তেমনি এখানেও আমি নিজে লিখতাম এবং ছেলেদের লেখা দেখতাম। প্রতিদিনই নিজের এবং ছেলেদের কিছু না কিছু লেখার সম্পাদনা ও কাটাচেরা চলতো।

অন্তত এই কাজটুকু যদি কেউ করতো, লাল কালির কাটাচেরায় ক্ষতবিক্ষত, অথচ সাহিত্যের প্রাণরসে সজীব সেই কাগজগুলো যদি কেউ সংরক্ষণ করতো!

একদিন আমার প্রিয় ছাত্র– তখনকার মুনীর, এখনকার নদবী ছাহেব, বললো, হযরত সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদবীর 'কাছাছুন্‌-নাবিয়্যীন লিল আতফাল' সে তরজমা করবে এবং আমাকে দেখাবে। সে দেখাতো, আমি দেখতাম, আমার মত করে, কাছে বসিয়ে, বুঝিয়ে বুঝিয়ে, লালকালিতে কেটেচুরে।

কাজটা অনেক দিন চললো। তাতেও কাগজের বড়সড় একটা দফতর হলো।

দ্বিতীয় পর্যায়ে তাকে 'দিফা'আন 'আন আবী হোরায়রাতা' নামে উচ্চ স্তরের একটি আরবী কিতাব তরজমা করতে দিলাম। প্রতিদিনের তরজমা আমি একই ভাবে দেখে দিতাম। এ কাজটাও চললো অনেক দিন। লালকালির সম্পাদনাটা থাকতো কাগজে, কিন্তু মৌখিক যে আলোচনা-পর্যালোচনা হতো, সেটা কোথাও লেখা হতো না।

তৃতীয় পর্যায়ে সে ইমাম গায্যালী (রহ)-এর একটি কিতাব উর্দু থেকে তরজমা করলো। তরজমাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাকে সামনে বসিয়ে আমি আমূল সম্পাদনা করেছি। বলতে গেলে তখন লেখা-সম্পাদনার নিয়মিত দরস হতো, এক উস্তায এক শাগিরদ-এর দুর্লভ দরস। এত দীর্ঘ আদবী ছোহবত ও সাহিত্য-পরিচর্যা আমার আর কোন ছাত্র পায়নি।

আরেকজন ছাত্র ইয়াহয়া ইউসুফ। সে যখন নদবী হয়ে দেশে এলো এবং তার মত করে 'লেখালেখি' শুরু করলো, তাকে নিয়েও বহু দিন একই রকম দরস হলো। তাকে অনুরোধ করলাম, এ দরসগুলো কাগজ-কলমে ধরে রাখার চেষ্টা করো। এ কাজটা যদি সে করতো, তার নিজের জন্যও একটি স্মরণীয় কাজ হতো, কিন্তু কিসমতে ছিলো না, হলো না। আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই রয়ে গেলাম। আসলে এসব ক্ষেত্রে ছাত্রদেরই এগিয়ে আসতে হয় এবং উস্তাযের কাজকে এগিয়ে নিতে হয়। তবে এটাই বাস্তব সত্য যে, সবার ভাগ্যে সবকিছু জোটে না।

একদিন আমার প্রিয় নদবী ছাহেব আবেগের সঙ্গে বললো, এই প্রথম আমার কোন ছাত্র এ কথা বললো, প্রিয় কারো মুখে এমন কথা শুনতে কত ভালো লাগে, তা সেদিন প্রথম অনুভব করলাম। সে বললো, 'আপনার লেখা দেখার দরসগুলো কাগজ-কলমে এসে গেলে খুব ভালো হয়।' আমি বললাম, ভালো তো হয়, কিন্তু প্রশ্ন হলো 'ঘণ্টা'!

আমার আশা ছিলো, সে কিছু করবে। করার যোগ্যতা তার ছিলো। আল্লাহ তাকে যোগ্যতা দিয়েছিলেন। আমার কিসমতে যা হয়নি, হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদবী (রহ)-এর ছোহবত লাভ করা, আমার এই প্রিয় ছাত্রটি তা পেয়েছিলো। নদওয়াতুল উলামায় সে হযরত আলী নদবীর ছাত্রত্বের গৌরব অর্জন করেছিলো।

যাই হোক, নদওয়া থেকে নদবী হয়ে সে দেশে এলো এবং শিক্ষক হলো, এমনকি কলমও হাতে নিলো, কিন্তু ঘণ্টা বাঁধার কাজটা আর হলো না।

কী করা! আমি নিজেই উদ্যোগী হলাম এবং লিখতে শুরু করলাম লেখার সম্পাদনা ও কলম-মেরামতের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে। লিখতে আমার এত শান্তি

লাগতো যে, কখনো কখনো খাতাটা বুকে জড়িয়ে চুপচাপ বসে থাকতাম। একদিনের কথা মনে আছে, খুব সুন্দর একটি ... থাক, সবকথা সবসময় বলা বোধহয় ঠিক নয়!

জীবনে একটি ঘটনা কখনো আমার সঙ্গ ছাড়ে না। সেটা আমার ভাগ্য, না দুর্ভাগ্য জানি না, কিংবা সৌভাগ্য! কারণ আমাদের ভাবনায় যা মন্দ, অনেক সময় তাতেই লুকিয়ে থাকে কল্যাণ।

ঘটনাটি হলো লেখা হারিয়ে যাওয়া। আগে হারাতো কাগজের লেখা, এখন হারায় কম্পিউটারের লেখা। এই তো দু'দিন আগে এক দুর্ঘটনায় কম্পিউটার থেকে মুছে গেলো পুষ্পের জন্য তৈরী কয়েকটি লেখা। লেখা হারানোর বেদনা সেই বুঝতে পারে, লেখার প্রতি যার আছে মমতা। আমার ছোট মেয়ে অদ্ভুত একটি সান্ত্বনার কথা বলেছিলো, লেখাগুলো নাকি গেছে আল্লাহর কাছে আরো সুন্দর লেখা আনতে! হতে পারে। তবে শত সান্ত্বনার মধ্যেও বুকের ভিতরে একটা জখম থেকেই যায়।

যাই হোক, অর্ধেক-লেখা খাতাটার ইচ্ছে হলো, হারিয়ে গেলো। নিজেও খুঁজে পেলাম না, সে নিজেও ধরা দিলো না। আমার কোন কোন নিখোঁজ খাতা পরে নিজে থেকেই ফিরে আসে। তাই মনের কোণে ক্ষীণ একটি আশা ছিলো, হয়ত সে কাগজের স্তূপ থেকে আত্মপ্রকাশ করবে, কিন্তু এ আশাটা আর সত্য হলো না; খাতাটা আর পাওয়া গেলো না। সুতরাং বহুবারের মত এবারও একটা স্বপ্নভঙ্গ হলো। স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় আমি তো আগে থেকেই অভ্যস্ত। সে বেদনার পিছনে আপনজনের ছায়া থাকলেও হাসিমুখেই আমি তা বরণ করি। কারণ প্রতিটি বেদনা আসলে একটি করে সম্ভাবনা, যদি বুকের বেদনা বুকে লালন করা যায়, শান্ত হৃদয়ে এবং সমর্পিত চিত্তে।

আমার বুকের ভিতরে লালন করা এ বেদনাই বস্তুত আমার পুষ্পের আত্মপ্রকাশকে ত্বরান্বিত করেছিলো। পুষ্পের পাতায় 'এসো কলম মেরামত করি' নামে আমি নিয়মিত লেখা শুরু করলাম। তাতে বুকের ভিতরে যে ক্ষতটা ছিলো তার উপর শীতল একটা প্রলেপ পড়তে শুরু করলো। পুষ্পের প্রতি এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। পুষ্প না হলে হয়ত কাজটা আর হতো না। কারণ এখন অবলম্বন ছাড়া কাজ করে যাওয়ার, বয়স পার না হলেও স্বাস্থ্যটা অন্তত পার হয়ে গেছে।

লেখা এগিয়ে চললো, পুষ্পের বন্ধুদের থেকে ঠিক প্রত্যাশা মত না হলেও যথেষ্ট সাড়া পেলাম; এমনকি এ লেখা যাদের জন্য নয়, তারাও অনেকে বললেন, তাদেরও কলম কিছু কিছু মেরামত হচ্ছে।

আসল কথাটা এখনো বলা হয়নি। 'কলম মেরামত' নামে যা কিছু লিখতাম তার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু ছিলো আমার নিজের কলম মেরামত করা। কারণ আমি জানি, আমি কত কম জানি। তবু ভালো লাগতো, যখন শুনতাম, আমার সঙ্গে পুষ্পের বন্ধুদেরও উপকার হচ্ছে, তাদেরও কলম অল্প-বিস্তর মেরামত হচ্ছে। আসলে বারবার যেমন বলা হয়েছে, পুষ্পের তো লক্ষ্যই ছিলো লেখক, সম্পাদক ও পাঠক সবাই মিলে কিছু শেখার চেষ্টা করা। সাহিত্যের পথে হাত ধরাধরি করে একটু একটু এগিয়ে যাওয়া। বাংলাভাষা ও সাহিত্য আমরা সবাই কম জানি, খুবই কম জানি, তবু প্রতিদিন কিছু না কিছু জানতে চাই। প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে জানার পরিমাণ একটু একটু বাড়াতে চাই। পুষ্প ছিলো সাহিত্যের পথে আমাদের সেই অভিযানের, সেই অভিসারের বিশ্বস্ত বন্ধু।

পুষ্প ছিলো, 'কলম মেরামত'-এর লেখাও চলছিলো। কিছু কলম 'মেরামত' হচ্ছিলো এবং সবার আগে আমার নিজের কলম। বাগানে গাছের ডাল থেকে ফুল ঝরে যায়, জানি; ঝরে যাওয়া ফুল শুকিয়ে যায়, তাও জানি। কারণ এ দীর্ঘ জীবনে প্রকৃতির উদ্যানে বসন্ত ও শরতের আসা-যাওয়া কম তো দেখা হলো না![২] প্রকৃতির উদ্যান এবং তার ঝরা ফুল ও শুকনো পাতার কথা জানতাম,[৩] কিন্তু জানতাম না, আমার জীবনোদ্যান থেকে পুষ্প কখনো ঝরে যাবে, কিন্তু ঝরে গেলো। বসন্ত চলে যায়, তবু বাগানের মালি চায়, ঝরে যাওয়া ফুল যেন শুকিয়ে না যায়। আমারও কামনা, ঝরে যাওয়া 'পুষ্প' যেন শুকিয়ে না যায়। যত সামান্য হোক ঝরা পুষ্প এখনো[৪] যেন সবার মাঝে সুবাস বিলিয়ে যায়, আমার জীবদ্দশায় এবং পরে।

একজন নিঃসঙ্গ মানুষের নিঃসঙ্গ পথচলায় কেউ যদি পাশে এসে দাঁড়ায়, যে কেউ যদি কিছুটাও সমবেদনা[৫] জানায়, ভালো লাগে।[৬] আমারও ভালো লাগলো একদিন যখন অপরিচিত এক তরুণ আমার কাছে এলো। হাতে 'এসো কলম মেরামত করি'-এর বাঁধাই করা খাতা। ফটোকপির এ যান্ত্রিক যুগে আগাগোড়া সবটা হাতে লেখা! এটা যদি আমার অন্তরকে স্পর্শ করে থাকে এবং আমার চিন্তাকে ... তাহলে দোষ কী! এমন তো আমি দেখিনি, খুব কাছে যারা তাদেরও মধ্যে!

সে জানালো, তার পরিচিত কোন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে এগুলোকে সে সংকলন আকারে প্রকাশ করতে চায়। আমি দ্বিধায় পড়ে গেলাম।

প্রথমত এ কারণে যে, লেখাগুলো এখন একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। বই আকারে প্রকাশ করতে হলে সব নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে, আগাগোড়া

নতুন সম্পাদনা করতে হবে; সংযোজন-বিয়োজন এবং সংস্কার-পরিমার্জনের এক দীর্ঘ 'মারহালা' পার হতে হবে, বর্তমান অবস্থায় আমার পক্ষে যা সম্ভব নয় কিছুতেই। তবে, জীবন সঙ্গ দিলে সংকল্প আছে ভবিষ্যতে এ কাজটা করার।

কিন্তু তার কথা, এ যুক্তিতে পাঠকের প্রয়োজন উপেক্ষা করা যায় না। পুষ্পের 'ছবি' থেকে যতটুকু উপকার হয়েছে তার 'প্রতিচ্ছবি' থেকে ততটুকু উপকারও যদি হয়, ক্ষতি কী!

সাদা চোখে যুক্তিটা গ্রহণযোগ্য হলেও এমন যুক্তিতে বিচলিত হওয়া আমার স্বভাব নয়। এবার হলাম। আসলে কেউ যখন মনের দুয়ার দিয়ে প্রবেশ করে তখন এমনই হয়। তাই মনের দুয়ার সবার ব্যবহার করা ঠিক নয়। আর যখন ব্যবহার করা হয় তখন তার মর্যাদা রক্ষা করা কর্তব্য হয়।

দ্বিধার দ্বিতীয় কারণ, আমি চাই, আমার কলমের সবকিছু দারুল কলম থেকে প্রকাশিত হোক। আমি চাই না আমার মযলূম নানাজানের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা আমার জীবনেও ফিরে আসুক। তাঁর বহু লেখা হারিয়ে গেছে, যেগুলোর পিছনে তাঁর বহু সাধনা ছিলো। এই সেদিনও ঘটনাক্রমে তাঁর একটি পাণ্ডুলিপি জনৈক প্রকাশকের কাছ থেকে উদ্ধার পেয়েছে।

একবার ইচ্ছে হলো বলি, দারুল কলম থেকে প্রকাশ করার কথা ভাবছো না কেন? বললাম না। শুধু ভাবলাম, সমবেদনা প্রকাশকারী একটি তরুণ হৃদয়ের ইচ্ছাকে সম্মান জানানো আমার কর্তব্য। তাই কোন্ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এবং কে প্রকাশক, কিছু না জেনেই এবং কোন আনুষ্ঠানিকতায় না গিয়েই প্রথম সংস্করণটি প্রকাশের অনুমতি দিলাম।

কোন লেখা দ্বিতীয়বার ছাপা হবে পুনঃসম্পাদনা ছাড়া, এ আমার স্বভাববিরুদ্ধ। তাই সবকাজ ফেলে, সব প্রয়োজন ভুলে কয়েকদিনের জন্য নিমগ্ন হলাম 'কলম মেরামত'-এর ভুবনে। পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংস্কার অনেক হলো, তবু মনের মত হলো না, তবে এ-ই ছিলো এখন সাধ্য। বাকি আল্লাহ তাওফীক দিলে বইটিকে পূর্ণাঙ্গ করার ইচ্ছা আছে।

কলমের জগতে যারা প্রবীণ, এ লেখা তাদের জন্য নয়, তা বলারও প্রয়োজন নেই, এমনকি তা আমাদের মত কারো জন্যও নয়; এ শুধুই তাদের জন্য, শিশুর হাঁটা শেখার মত যারা মাত্র কলম ধরা শিখছে, যাদের কলমে লেখার কলি মাত্র ফোটা শুরু করেছে। শিশু যখন হাঁটতে শেখে তখন একজন দরকার হাত ধরে রাখার; বাবা, মা, বা অন্য কেউ। এ লেখা তাদের জন্য যারা তাকিয়ে আছে আগামী দিনের দিকে এবং এ লেখা আমারও জন্য; কারণ আমি শিখতে চাই, শিশুর হাঁটতে শেখার সময় কীভাবে তার হাত ধরে রাখতে হয়।

নামকরণের একটা ব্যাখ্যা কেউ কেউ দেন; আমি দিতে চাই না; শুধু বলতে চাই, গায়বের পর্দা থেকে যিনি লিখতে সাহায্য করেন, আমার অন্তরে উদিত এ নাম তাঁরই দান। সুতরাং আমি তাঁর শোকর গোযার।৭

মেরামত শব্দের একটা স্থূল অর্থ আছে। অনেক কিছুই তো আমরা মেরামত করি; ঘড়ি, কলম, ছাতা। আমি শুধু অনুরোধ করবো, মেরামত শব্দের অন্ত র্নিহিত মর্মটুকু উপলব্ধি করার। হতে পারে তা আমার উপলব্ধিতে এলো না, কিন্তু উপলব্ধিটুকু চাইতেও কি পারবো না, তাঁর কাছে, যিনি চাইলে খুশী, না চাইলে অখুশী?! তাই চলো, আমিও চাই, তুমিও চাও, আমরা সবাই মিলে চাই–

হে আল্লাহ! আমাকে দাও, আজকের জন্য এবং 'আগামীর' জন্য। তোমার যা খুশী তাই দাও, যতটুকু খুশী ততটুকু দাও। কলম দাও, কালি দাও, কাগজ দাও এবং .. এবং হৃদয় দাও, যেখানে সঞ্চিত হয় ভাব ও মর্ম এবং শব্দ ও বর্ণ।

*আবু তাহের মিছবাহ*
শিক্ষক, আরবীভাষা ও সাহিত্য
মাদরাসাতুল মাদীনাহ, ঢাকা
২১শে রজব ১৪২৮ হিজরী

---

১। প্রথমে চিন্তায় এসেছিলো, 'অভিযানের জন্য', কিন্তু লিখবার আগেই কলমের ডগায় এসে গেলো 'অভিসারের জন্য'। এখন তুমি দু'টির মধ্যে তুলনা করে দেখো, কোনটি এখানে অধিকতর উপযোগী!)

২। বাক্যটি প্রথমে কলম থেকে এসেছিলো এভাবে, *'কারণ প্রকৃতির বাগানে এই একজীবনে বসন্ত ও শরতের গমনাগমন অনেক দেখেছি।'* প্রথমে মনে হলো, প্রকৃতির সঙ্গে 'বাগানে' না হয়ে 'উদ্যানে হলে ভালো হয়। তাতে একটা সমস্যা হলো, কঠিন শব্দটি আগে, আর সহজ শব্দটি পরে হয়ে যায়, যা আবৃত্তিগত দিক থেকে সুন্দর নয়। তাছাড়া অর্থগত দিক থেকেও 'এই একজীবনে' অংশটি আগে আসা দরকার। তাই লিখলাম, *'কারণ এই একজীবনে প্রকৃতির উদ্যানে... ।*
'গমনাগমন' শব্দটি আমার রুচির বিচারে মনে হলো, এখানে উপযুক্ত নয়, 'গমন-নির্গমন' শব্দটির কথাও মনে হলো, কিন্তু মনের সায় পাওয়া গেলো না। তার চেয়ে 'আসা-যাওয়া' অপেক্ষাকৃত ভালো মনে হলো। তাই সেটাই লিখলাম, তবে মনের ভিতরে একটা দ্বিধা এখনো রয়ে গেছে।
*'অনেক দেখেছি'* কথাটায় একটু যেন আত্মগর্ব উঁকি দিতে চায়, তাই লিখলাম, *'অনেক দেখা হয়েছে'*। তবু যেন গন্ধটা পুরোপুরি গেলো না। তাই শৈলী পরিবর্তন করে লিখলাম,

*'কম তো দেখা হলো না।'* অনেক-এর পরিবর্তে 'কম' শব্দটি আসায় মনে হলো সেই গন্ধটা দূর হয়েছে।

৩। আগে ছিলো, *ঝরা ফুল ও শুকনো ফুলের কথা জানতাম'*।

৪। বাক্যের শেষে যেহেতু আছে, 'আমার জীবদ্দশায় এবং পরে' সেহেতু মনে হচ্ছে 'এখনো' শব্দটি এখানে একেবারে অপ্রয়োজনীয়। এমন হওয়া উচিত, *'যত সামান্য হোক ঝরা পুষ্প যেন সবার মাঝে...*

৫। এখানে ছিলো 'সহানুভূতি জানায়', শব্দে কোন ত্রুটি নেই, কিন্তু কানের শ্রুতি যেন এখানে শব্দটিকে গ্রহণ করতে চায় না। তুমি শব্দ পরিবর্তন করে বারবার কানে বাজিয়ে দেখো।

৬। এখানে মনে হয়েছিলো শুধু 'ভালো লাগে' দ্বারা ভেতরের ভাবটার যেন পূর্ণ প্রকাশ ঘটে না। অনেক চিন্তার পর ভেবেছিলাম লিখবো, 'চোখের পাতা ভেজে, মন গলে এবং হৃদয় সিক্ত হয়', উপযুক্ত স্থানে এটা হতে পারতো অপূর্ব, কিন্তু এখানে অতিশয়তার দোষ আছে, তাই লোভটা সম্বরণ করলাম এবং যা ছিলো তাই রেখে দিলাম। একজন লেখককে সুন্দর শব্দ ও সুন্দর বাক্যের মোহ থেকেও বেঁচে থাকতে হয়।

৭। আগে ছিলো, 'গায়বের পর্দা থেকে যিনি আমাকে লিখতে সাহায্য করেন...' শুধু আমাকে কেন, তিনি তো সবাইকে সাহায্য করেন, সুতরাং এখানে 'আমিত্ব'-এর উল্লেখ অনভিপ্রেত।
তারপর ছিলো, 'এ নাম তিনিই আমাকে দান করেছেন, আমার অন্তরে তা উদিত করেছেন। কথাটা এখানে অনাবশ্যক দীর্ঘ হয়েছে। পক্ষান্তরে এখন উভয় বাক্যের বক্তব্য একই বাক্যে এসে গেছে এবং বাক্যের গাঁথুনি সুন্দর হয়েছে।

# দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আলহামদু লিল্লাহ! ছুম্মা আলহামদু লিল্লাহ। দারুল কলম থেকে 'এসো কলম মেরামত করি'-এর সূচনা-সংস্করণ আজ আত্মপ্রকাশ করছে, যা অন্য একটি প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো প্রায় তিনবছর আগে। তখন প্রিয় পুষ্প-এর প্রকাশনা বন্ধ ছিলো। পরে আল্লাহর রহমতে দ্বিতীয় প্রকাশনা শুরু হয়েছে এবং 'এসো কলম মেরামত করি' বিভাগেও নতুন কিছু লেখা এসেছে। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় প্রতিশ্রুতি ছিলো, আল্লাহ তাওফীক দিলে বইটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপদান করার। সে প্রতিশ্রুতিপূরণের পথে এবার কিঞ্চিৎ অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেছি।

প্রথমত বইটিকে বিষয়-ভিত্তিতে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। আগের সংস্করণে যা ছিলো একেবারেই অবিন্যস্ত।

দ্বিতীয়ত লেখাগুলো আগাগোড়া পুনঃসম্পাদনা করা হয়েছে এবং বহু ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটেছে। বিশেষত পুনঃসম্পাদনার উপর টীকা আকারে প্রচুর পর্যালোচনা এসেছে যে, আগে কী ছিলো, এখন কী হয়েছে এবং কেন। আমার মনে হয়, বিষয়বস্তুগত কারণে এ বইয়ের জন্য এই টীকা-পর্যালোচনাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম সংস্করণের সময় বেশ দ্বিধান্বিত ছিলাম যে, অপ্রস্তুত অবস্থায় বইটি প্রকাশ করা ঠিক হবে কি না? এখন মনে হচ্ছে, বইটির যা প্রকৃতি তাতে যা হয়েছে সেটাই ভালো হয়েছে। এখন পাঠক ইচ্ছা করলে প্রতিটি সংস্করণের তুলনামূলক অধ্যয়নের মাধ্যমে কিছুটা হলেও ধারণা পাবেন যে, লেখার প্রতি লেখকের কেমন যত্নশীল হওয়া উচিত, তাতে একটি লেখা কীভাবে উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করতে থাকে। পুষ্পে প্রকাশিত লেখাগুলোর সঙ্গে প্রথম সংস্করণ এবং সেটার সঙ্গে দ্বিতীয় সংস্করণের যে পার্থক্য সেটা চিন্তাশীল পাঠককে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক যোগাবে বলে আশা করি।

আমার অন্যান্য বইয়ের ক্ষেত্রে এটা ঘটেনি। সেগুলো প্রকাশের পূর্বেই পুনঃপুনঃ-সম্পাদনার মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমার্জিত হয়ে পাঠকের সামনে এসেছে। ফলে লেখার প্রতি লেখকের যত্নের বিষয়টি পাঠকের দৃষ্টির আড়ালে থেকে গেছে। অবশ্য সেখানেও প্রতিটি সংস্করণে কিছু না কিছু পরিমার্জন ঘটেছে। কিন্তু এ বইয়ে বিষয়টি অনেক বেশী পরিমাণে হয়েছে। যারা লেখার অঙ্গনে সত্যি সত্যি উন্নতি লাভ করতে চায় এ বিষয়টি তাদের কলমকে যথেষ্ট আলো দান করবে বলে আমি মনে করি।

তৃতীয়তঃ পুষ্পের দ্বিতীয় প্রকাশনায় প্রকাশিত লেখাগুলো বর্তমান সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এমন কিছু লেখাও এসেছে যা পুষ্পে প্রকাশিত হয়নি। ফলে কলেবর যেমন দ্বিগুণেরও বেশী হয়েছে তেমনি বিষয়গত দিক থেকেও যথেষ্ট সমৃদ্ধি ঘটেছে। যেমন লেখার মুহূর্ত এবং লেখার বীজ অধ্যায়দু'টি সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন। যারা লেখা শিখতে চায় তাদের জন্য এ বিষয়দু'টির গুরুত্ব অপরিসীম।

পূর্ণতা লাভের স্তর থেকে বইটি এখনো অনেক দূরে এবং আমার অনেক পরিকল্পনাই এখনো রয়েছে অঙ্কুরোদ্গমের অপেক্ষায়। তবে পাঠককে আমি এ আশ্বাস দিতে চাই যে, আল্লাহর ইচ্ছায় সময় ও স্বাস্থ্য যদি ঠিকমত সঙ্গ দান করে তাহলে আমার প্রচেষ্টা অবশ্যই অব্যাহত থাকবে। আফসোস শুধু এই যে, এ দুর্গম পথে চলার জন্য এক দ'জন সঙ্গী আমার ভাগ্যে জুটলো না; তাহলে পথ চলা অনেক সহজ হতো।

ভাষাশিক্ষা ও সাহিত্যচর্চার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। আমি বলি না যে, প্রতিটি তালিবে ইলমকে ভাষা ও সাহিত্যের সর্বোচ্চ স্তর অর্জন করতে হবে, বা সবাইকে ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক হতে হবে। আমি বলি, ভাষা ও সাহিত্য সবাইকে শিখতে হবে, তবে প্রত্যেকের স্তর হবে আলাদা। একেবারে প্রাথমিক স্তর হলো বানান ও ব্যাকরণের বিশুদ্ধতা। এটা আমাদের সবার জন্য অপরিহার্য। কোন তালিব ইলম মাতৃভাষার বানানে বা ব্যাকরণে ভুল করে মানুষের সামনে লজ্জিত হবে, এটা কল্পনাও করা যায় না।

দ্বিতীয় স্তর হলো কোন বিষয় স্বাভাবিকভাবে লিখতে ও বলতে পারা। সাহিত্যের মানে উন্নীত না হোক, বিশুদ্ধ অবশ্যই হতে হবে। যারাই কিছু লিখতে চায়, হোক তা মৌলিক বা অনুবাদ এবং হোক পত্রপত্রিকা বা বইপত্র, এ যোগ্যতা তাদের অবশ্যই অর্জন করতে হবে, যা দুঃখজনভাবে আমাদের নেই। তাই জাফর ইকবালের মত একজন লেখক বলতে সাহস পান যে, শুদ্ধ ভাষায় লেখা কোন ধর্মীয় বই তার নযরে পড়েনি। ভদ্রলোকের মন্তব্যটা সন্দেহ

নেই অতিশয়তাদোষে দুষ্ট, কিন্তু কথাটা বলার সুযোগ তিনি পেয়েছেন। ভাষার ক্ষেত্রে এরূপ দৈন্য থাকা অবস্থায় সমাজে মর্যাদার আসন লাভ করা সত্যি কঠিন।

তৃতীয় স্তর হলো মুখের ভাষা ও কলমের লেখা সাহিত্যের মানে উত্তীর্ণ হওয়া। আমার মতে অন্তত দশভাগ আলিমের এ যোগ্যতা থাকা উচিত। তাহলে ভাষা ও সাহিত্যের জগতে আলিমসমাজকে কেউ আর অবজ্ঞার চোখে দেখতে পারবে না। পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানে আলিমসমাজ বহু আগেই এ যোগ্যতা অর্জন করেছেন। তাই তাদের বক্তব্য সমাজকে গুরুত্বের সঙ্গে শুনতে হয়। কিন্তু আমরা কি এ পর্যায়ে উপনীত হতে পেরেছি? পারিনি, এর কাছাকাছিও যেতে পারিনি।

চতুর্থ স্তর হলো ভাষা ও সাহিত্যের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা। অর্থাৎ বাংলাভাষা ও সাহিত্যে আমাদেরকে এমন মৌলিক অবদান রাখতে হবে, যাতে দেশের বিদ্বান সমাজ এক্ষেত্রে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। ভাষা ও সাহিত্য- বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত যেন আমাদের মতামত ছাড়া গ্রহণ করার সাহস কারো না হয়। আমি মনে করি, বাংলাভাষায় এমন যোগ্যতার অধিকারী অন্তত দশজন আলিম থাকা উচিত। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের জন্য তারা তাদের যিন্দেগি ওয়াকফ করে দেবেন। 'কাদেসীয় ও ইয়ারমুকি' জাযবা ও প্রেরণা বুকে ধারণ করে সাহিত্যের রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হবেন।১ আমাদের দুর্ভাগ্য, এমন একজনও আলিম বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে এখনো আসেননি। আমার বারবার মনে পড়ে, এদেশের আলিমসমাজের উদ্দেশ্যে হযরত আলী নদবী (রাহ.)-এর সেই জ্বলন্ত প্রশ্নটি, 'আপনাদের' মধ্যে এখনো কেন একজন 'ট্যাগোর' পয়দা হলো না?

'এসো কলম মেরামত করি' বইটি এ পথে আমাদেরকে অনেক দূর নিয়ে যাবে, এ কথা বলার মূর্খতা আমার নেই। আমি শুধু বলতে চাই, বইটি যদি সবাইকে যার যার স্তরমত কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারে তাহলেই আমি খুশী। সর্বোপরি যদি অন্তত দশজন তরুণের হৃদয়ে ঐ স্বপ্নসাহসটা জাগিয়ে তুলতে পারে তাহলেই আমি সফল। শুধু জানতে চাই, আমার 'ইলমী বেরাদরি'র কাছে আমার চাওয়াটা কি খুব হয়ে গেছে? মাত্র দশজন! তাহলেই আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করে আমি যুদ্ধে নামার হিম্মত করি। মাত্র দশজন সাহসী ও আত্মত্যাগী তরুণকে আমি সঙ্গে চাই।

এ আশা ও প্রত্যাশা বুকে নিয়ে এই অসম্পূর্ণ বইটি, প্রিয় পাঠক, আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। আশা করি, আপনি আমার এবং আমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার দ্বীন-

দুনিয়ার কল্যাণের জন্য দু'আ করবেন। আপনাকেও আল্লাহ তা'আলা 'মালামাল'২ করুন, আমীন।

সব বইয়ের মত আমার এ বইটিরও প্রচ্ছদ এঁকেছে আমার প্রিয় ভাই বশির মিছবাহ। পাঁচটি প্রচ্ছদ আঁকার পর এ প্রচ্ছদটি তার পছন্দ হয়েছে। আর আমার পছন্দ হয়েছে তার এ মন্তব্যটি, আপনার যেমন 'শব্দের শাহযাদী' আছে, আমারও আছে 'প্রচ্ছদের শাহযাদী'! এবং তা অনেক প্রতীক্ষার পর আসে। আল্লাহ তাকে কবুল করুন, আমীন

কয়েকটি নাম বুকে আছে, বুকেই থাকুক, শুধু বলি, সময় দিয়ে, উপদেশ দিয়ে, প্রেম ও প্রার্থনা দিয়ে৩ এবং 'প্রাপ্য ত্যাগ করে' যারা আমার সাহিত্য-সাধনার পথ মসৃণ করছেন, আল্লাহ তাদের, শায়ানেশান জাযা দান করুন, আমীন।

*আবু তাহের মিছবাহ*
শিক্ষক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য
মাদরাসাতুল মাদীনাহ, ঢাকা
পয়লা জুমাদাল উলা ১৪৩১ হিজরী

---

১। আগে ছিলো, 'ভাষা ও সাহিত্যের রণাঙ্গনে', চিন্তা করে দেখলাম, আগের দু'টি 'ও'সহ তিনটি 'ও' একটু বেশী হয়ে গেছে, আবৃত্তির ক্ষেত্রে এটা শ্রুতিকটু। আর ভাষা ও সাহিত্য-এর পরিবর্তে শুধু 'সাহিত্যের রণাঙ্গনে' বললে তেমন কোন ক্ষতি নেই।

২। আগে ছিলো, 'আপনাকেও আল্লাহ তা'আলা অনুরূপ দান করুন'। হঠাৎ একজন প্রিয় মানুষের কথা মনে পড়লো, যিনি সেদিন, আমার লেখায় আরবী-ফারসী-উর্দূ প্রয়োগ তার খুব ভালো লাগে। মনের অঙ্গনে ভেসে ওঠা তার ছবি থেকেই যেন এখানে 'মালামাল' শব্দটি উপহার পেলাম।

৩। আগে ছিলো, 'সময় দিয়ে, উপদেশ দিয়ে, প্রার্থনা দিয়ে এবং 'প্রাপ্য ত্যাগ করে', হঠাৎ মনে হলো 'ভালোবাসা দিয়ে' এ কথাটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কেন আমার কলম থেকে ঝরলো না? অথচ 'নিকট ও দূর' থেকে যত দান আমি পেয়েছি তার মধ্যে ভালোবাসার দানই তো সবার বড় দান! তাহলে কি স্বভাবের দিক থেকে অসলে আমি অকৃতজ্ঞ! আল্লাহ মাফ করুন। তবু আল্লাহর শোকর, স্বতঃস্ফূর্তভাবে না হোক, চিন্তার মাধ্যমেই হোক, শেষ পর্যন্ত কথাটা এসেছে। তারপর মনে হলো, এখানে 'প্রার্থনা'-এর সঙ্গে 'ভালোবাসা'-এর পরিবর্তে 'প্রেম' হলে ভালো হয়। তুমি কানে বাজিয়ে দেখো, 'ভালোবাসা ও প্রার্থনা দিয়ে/ প্রেম ও প্রার্থনা দিয়ে'।

# প্রথম অধ্যায়ঃ কলমের কান্না ও ভাষার অশ্রু

আমার বুকে যেমন হাসি-কান্না ও আনন্দ-বেদনা আছে তেমনি আছে আমার কলমেরও বুকে। আমার চোখে যেমন আছে 'ব্যথার অশ্রুজল' তেমনি আছে আমার মায়ের ভাষারও চোখে। কলমের সেই হাসি-কান্না, সেই আনন্দ-বেদনা আমি যদি বুঝতে পারি, মায়ের ভাষার চোখের অশ্রু আমি যদি মুছে দিতে পারি তাহলে কলম আমাকে.... এবং মায়ের ভাষা আমাকে.... ।

সেই না বলা কথাগুলোই বলতে চাওয়া হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে

# কলমের প্রতি কৃতজ্ঞতা

জীবনে যখন যেখানে কারো কাছে আমি কিছু উপকার পেয়েছি, তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কিছু না কিছু লিখেছি; আমি লিখেছি মায়ের কথা, বাবার কথা, ভাই, বোন ও সন্তানের কথা এবং লিখেছি বন্ধুদের কথা, কাছের বন্ধু ও দূরের বন্ধু, সবার কথা, লেখা হয়নি শুধু আমার কলমের কথা, অথচ এমন উপকারী বন্ধু আমার জীবনে আর কে আছে![১]

জীবনে যখন যেখানে যা কিছু দেখে মুগ্ধ হয়েছি, হৃদয়ের সুরভি মেখে আমি তার কথা লিখেছি। আমি লিখেছি ফুল ও বসন্তের কথা, চাঁদ ও জোসনার কথা, আলো ও জোনাকির কথা, আমি লিখেছি ভোরের কথা, শিশিরের কথা; আরো অনেক কিছুর কথা। লিখিনি শুধু কলমের কথা, অথচ কলমই আমার প্রথম ভালোবাসা, কলমই আমার শেষ ভালোবাসা! তাই আমি আজ লিখবো শুধু আমার কলমের কথা।

কলম আমার ব্যথার মলম এবং আমার বেদনার উপশম; কলম আমার নিঃসঙ্গতার সঙ্গী এবং আমার বঞ্চিত জীবনের সান্ত্বনা।

কলম আমার কথা শোনে এং আমার কথা বলে। কলম আমার জন্য হাসে এবং আমার জন্য কাঁদে। আনন্দের শুভলগ্নে আলোকিত বর্ণে কলম আমাকে অভিনন্দন জানায় এবং বেদনার বিষণ্ন মুহূর্তে কালো কালির হরফে আমার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে। সুখের দিনে বন্ধুরা কাছে থাকে, দুঃখের দিনে চলে যায় দূরে। কিন্তু কলম সুখে, দুঃখে, আনন্দে, বেদনায় আমার সঙ্গে থাকে। জীবনের সুখ-দুঃখের ও আনন্দ-বেদনার প্রতিটি মুহূর্ত তাই কলমের কাছে ঋণী; কলমের ধনে আমি আজ ধনী। মুদ্রার ধন হারিয়ে যায়,[২] কলমের ধন থাকে আজীবন। যখন নেমে আসে মৃত্যুর যবনিকা, মুছে যায় জীবনের রেখা; থাকে শুধু কলমের লেখা, কাগজের বুকে এবং মানুষের বুকে। কাগজ হারিয়ে যায় এবং মানুষ ভুলে যায়, কিন্তু কলমের লেখা রাব্বুল কলমের কাছে থেকে যায়।

কলম আমার জন্য শব্দের মালা গাঁথে এবং কাগজের পাতায় হৃদয়ের মানচিত্র আঁকে। কলম আমার অতীতকে জীবন্ত রাখে এবং ভবিষ্যতকে সমৃদ্ধ করে। কলম আমাকে উজ্জ্বল আগামীর স্বপ্ন দেখায় এবং উদ্দীপ্ত করে নতুন চেতনায়। কলম

আমাকে দূর মানযিলের পথ দেখায় এবং জীবনসফরের পাথেয় যোগায়। কলম আমার সামনে উন্মুক্ত করে নতুন নতুন দিগন্ত এবং তুলে ধরে জীবনের অজানা অনেক রহস্য। বার্ধক্যের জীর্ণতা থেকে কলম আমাকে নিয়ে যায় যৌবনের সজীব উদ্যানে এবং শৈশবের নির্দোষ আনন্দের ভুবনে।

সুদীর্ঘ অতীতের বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার কীভাবে এসেছে আমার কাছে? ছোট্ট এই কলমের কল্যাণে। আমার সামান্য যা কিছু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, কীভাবে আমি তা পৌঁছে দেবো ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে? সামান্য এই কলমের মাধ্যমে। অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝে কলম আমার বন্ধন। হৃদয় থেকে হৃদয়ে ভাব ও ভাবনার পারাপারে কলম আমার সেতুবন্ধন।

হে কলম! হে বন্ধু! যেদিন শুনেছি, আসমান থেকে তুমি নেমে এসেছো প্রথম অহীর আলো সঙ্গে করে, সেদিন তোমাকে আমি ভালোবেসেছি; আজীবন ভালোবাসবো। আমার হৃদয়-উদ্যানের প্রতিটি ফুল তোমার জন্য নিবেদিত। কামনা করি, তোমাকে যারা ভালোবাসে, তোমার ভালোবাসা যেন তারা পায়, তোমার অকৃপণ দানে তাদের জীবন যেন ধন্য হয়। তোমাকে যারা অসম্মান করে, তোমাকে যারা কলঙ্কিত করে তাদের হাত থেকে আল্লাহ যেন তোমাকে রক্ষা করেন। তোমার কালিতে বিষ মেখে মানুষের জীবন যারা বিষিয়ে তোলে, তোমার কালিতে যারা মযলুমের রক্ত ঢেলে উল্লাস করে, মানবতার অভিশাপে তারা যেন ধ্বংস হয়।

হে কলম! হে আমার ব্যথার মলম! হে আমার বেদনার উপশম! আজ এ পবিত্র মুহূর্তে গ্রহণ করো আমার হৃদয়ের অভিনন্দন! আমার রক্তের ফোঁটা এবং আমার অশ্রুর প্রতিটি কণা যেন মিশে থাকে তোমার কালির বিন্দুতে।

হে কলম! হে বন্ধু! সারা জীবন শুধু পেয়েছি তোমার দান, কিন্তু রক্ষা করতে পারিনি তোমার সম্মান; তবু আশা করি, তোমার ক্ষমা পাবো আমি। হে কলম! হে বন্ধু! আমার শেষ মিনতি, মৃত্যুর সময় থাকবে তুমি আমার হাতে করুণাময়ের করুণার চিহ্ন হয়ে।

---

১। আগে ছিলো এরকম, *'জীবনে যখন যেখানে কারো কাছে কিছু উপকার পেয়েছি, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কিছু না কিছু লিখেছি; আমি লিখেছি মায়ের কথা, বাবার কথা, ভাই, বোন ও সন্তানের কথা, আমি লিখেছি আমার বন্ধুদের কথা, কাছের বন্ধু এবং দূরের বন্ধু, সবার কথা; লেখা হয়নি শুধু কলমের কথা। অথচ এমন উপকারী বন্ধু আমার জীবনে আর কে আছে!'*

প্রথমে মনে হলো, 'কারো কাছে' এবং 'কিছু উপকার পেয়েছি'– এর মাঝখানে 'আমি' দরকার, দিলাম; তাতে 'কৃতজ্ঞতা' নীচে নেমে গেলো এবং অঙ্গসজ্জা অসুন্দর হয়ে গেলো। নমুনাটা দেখো–

*'জীবনে যখন যেখানে কারো কাছে আমি কিছু উপকার পেয়েছি, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কিছু না কিছু লিখেছি; আমি লিখেছি মায়ের কথা, বাবার কথা, ভাই, বোন ও সন্তানের কথা, আমি লিখেছি আমার বন্ধুদের কথা, কাছের বন্ধু এবং দূরের বন্ধু, সবার কথা; লেখা হয়নি শুধু কলমের কথা। অথচ এমন উপকারী বন্ধু আমার জীবনে আর কে আছে!'*

তখন অঙ্গসজ্জার সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনার তাগিদে সম্পাদনার প্রতি মনোযোগী হলাম। হঠাৎ মনে হলো, 'তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে' এই সম্প্রসারিত কথাটি সংক্ষিপ্ত হতে পারে, যেমন 'তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে'। এখন নযরে আরো ত্রুটি ধরা পড়লো, প্রথমত 'আমার বন্ধুদের কথা', এই ইযাফত মনে অপ্রয়োজনীয়, শুধু 'বন্ধুদের কথা বলাই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে ইযাফতটি অর্থবহ হতে পারে, 'লেখা হয়নি শুধু আমার কলমের কথা'-এখানে। সেটাই করলাম। তখন দেখা গেলো, 'আমি লিখেছি বন্ধুদের কথা', এটা খাপছাড়া হয়ে গেছে। তাই লিখলাম, 'সন্তানের কথা এবং বন্ধুদের কথা। প্রথমে 'আমি' শব্দটি বাড়ানোর পর অঙ্গসজ্জার যে সৌন্দর্যহানি ঘটলো, তা থেকেই এই পুরো সম্পাদনাটি এসেছে। তুমি নুমনা দু'টি তুলনা করে দেখো, এই সম্পাদনার প্রয়োজন ছিলো কি না!

২। এ বাক্যটি চিন্তায় আসছে, 'মুদ্রার ধন হারিয়ে যেতে/ হারাতে কতক্ষণ, কিন্তু মনে হচ্ছে এই ছন্দে কৃত্রিমতার ছাপ আছে। তাই তা পরিহার করছি।

# কেন ভাবি না কলমের কথা?

আমার হাতের কলমটি দিয়ে প্রতিদিন কত কথা লিখি; সুখের কথা, দুঃখের কথা, হাসি-আনন্দের কথা, কান্না ও বেদনার কথা। কিন্তু কখনো ভেবে দেখিনি কলমের কথা। আমি চেয়েছি, কলম শুধু লিখে যাবে আমার কথা, কিন্তু কখনো বুঝতে চাইনি, কলমেরও আছে কিছু কথা, কিছু মিনতি! কলমেরও আছে হাসি-কান্না ও আনন্দ-বেদনা! কলম কখন হাসে, কখন কাঁদে? কিসে কলমের আনন্দ, কিসে তার বেদনা?

কলমেরও আছে হৃদয় ও প্রাণ! কলমের যিনি সাধক, কলম চায় তাকে ভালোবসতে এবং তার ভালোবাসা পেতে! কলমের আকুতি আর কিছু না, শুধু এই, পরম সমাদরে, পরম মমতায় মানুষ যেন কলমকে গ্রহণ করে এবং সত্যের পথে তাকে পরিচালিত করে। কলমের মিনতি আর কিছু না, শুধু এই, মানুষ যেন কলমের মূল্য বোঝে এবং কলমের মর্যাদা রক্ষা করে।

কেউ যখন হৃদয় দিয়ে কলমের আকুতি অনুভব করে এবং কলমের মিনতি রক্ষা করে, কলমের মুখে তখন হাসি ফোটে। কেউ যখন কলমের মূল্য বোঝে এবং কলমের মর্যাদা রক্ষা করে, কলমের হৃদয়ে তখন আনন্দের তরঙ্গ জাগে। কিন্তু কলম যখন কারো হাতে লাঞ্ছিত হয়, কারো অবহেলা-অবজ্ঞার শিকার হয়, কলমের তখন কান্না পায়, কলমের প্রাণে তখন বড় বেদনা জাগে।

একটি কলমের মূল্য কত? তিন টাকা, পাঁচ টাকা। আসলেও কি তাই?! কলমের প্রতিটি শব্দ তো একটি করে ফুল! কলমের প্রতিটি রেখা তো একেকটি আলোকরেখা! কলমের মাত্র একটি কথার মূল্য তো আসমান-যমীনের চেয়ে বেশী হতে পারে! কলমের নিব দিয়ে লেখা একটি কথা তো জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে, পারে জীবনের গতিধারা পরিবর্তন করে দিতে! কলমই পারে একটি জীবনকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনতে! কলমই পারে পথহারা সমাজকে সত্যের পথ দেখাতে! ন্যায় ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে! কলমের মুখ হতে পারে আলোর ফোয়ারা, কলমের কালি হতে পারে কল্যাণের ঝর্ণাধারা! কলম তো কাগজের বুকে শব্দের ফুল দিয়ে মালা গাঁথে এবং কালো কালির রেখা টেনে

জীবনের রাজপথ তৈরী করে! এমন কলমের মূল্য কি তিনটাকা, পাঁচটাকা হতে পারে! এমন কলমের মূল্য কি পৃথিবীর কোন মানুষ নির্ধারণ করতে পারে! কিন্তু আমরা ক'জন কলমের মূল্য বুঝতে পারি? আমরা ক'জন সত্য ও কল্যাণের জন্য কলমের যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করি? কেন করি না? কেন কলমের কথা ভাবি না? কেন কলমের মূল্য বুঝি না?

কলমের মত দরদী বন্ধু পৃথিবীতে কে আছে আমার? একদিন আমি থাকবো না, কিন্তু কাগজের বুকে আমার কলমের কথা থাকবে এবং যুগ যুগ ধরে মানুষের জীবনে আলো ছড়াবে। কবরে-হাশরে-মিযানে আমার কলম আমাকে নাজাতের পথ দেখাবে, আমাকে জান্নাতের দুয়ারে পৌঁছে দেবে, যদি আমি কলমের আকুতি ও মিনতি রক্ষা করি; যদি আমি কলমের মূল্য ও মর্যাদা বুঝতে পারি। কিন্তু আমি কি কলমের কষ্ট বুঝতে পারি? আমি কি কলমের কান্না অনুভব করতে পারি? কেন পারি না? কেন আমি কলমের কথা ভাবি না?

পূর্বযুগে কলমকে ভালোবেসে যারা কলমের যোগ্যতা অর্জন করেছেন, কলমের মিনতি রক্ষা করে কলমকে যারা ন্যায় ও সত্যের পথে ব্যবহার করেছেন, আজ তারা পৃথিবীতে নেই, কিন্তু তাদের কলমের কথা রয়ে গেছে কাগজের বুকে। তাঁদের কলম আমাদের আজো সত্যের পথ দেখায়, আমাদের চলার পথে পাথেয় যোগায়। কলমকে যারা ভালোবাসে, তারা কলমের ভালোবাসা পায়। কলম তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে। পৃথিবীর বুকে কলম তাদের অমর করে রাখে। কিন্তু আমরা কি পেরেছি কলমকে ভালোবাসতে? কলমের ভালোবাসা অর্জন করতে? কেন পারি না? কেন আমরা কলমের কথা ভাবি না!!

কলম কখন দামী হয়? কলমের কথা কখন মূল্যবান হয়? একটি কলমের মুখ থেকে কখন উৎসারিত হয় আলোর ফোয়ারা এবং কল্যাণের ঝর্ণাধারা? কলম যখন গ্রহণ করে কলবের বন্ধন এবং কলমের কালি যখন গ্রহণ করে চোখের পানির মিশ্রণ; হাতের স্পর্শ ছাড়িয়ে কলম যখন লাভ করে হৃদয়েরও স্পর্শ তখন কলমের মুখ হয় আলোর ফোয়ারা এবং কল্যাণের ঝর্ণাধারা। সেই কলমের একটি শব্দ হীরকখণ্ড কুহে নূরের চেয়ে মূল্যবান। আমরা কি পেরেছি কলবে কলমে বন্ধন সৃষ্টি করতে এবং কলমের কালিকে চোখের পানির উষ্ণতা দান করতে? কেন পারি না? কেন আমরা কলমের কথা ভাবি না?

কলমকে যারা ভালোবাসে এবং কলমের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করে, কলম তাদের হৃদয়ের কথা বলে এবং তাদের আত্মার আকুতি তুলে ধরে। সেই কলম থেকে শুধু রূহানিয়াত ও নূরানিয়াতের বিচ্ছুরণ ঘটে। কোথায় সেই কলম? ইমাম গায্‌যালী ও ইবনে তায়মিয়ার কলম? মুজাদ্দিদে আলফেছানী ও শাহ ওয়ালিউল্লাহর কলম? কী ছিলো তাঁদের কলমে? কী নেই আমাদের কলমে? কোথায় আলোর কলম এবং

কলমের আলো? কোথায় মুজাহিদীনের কলম এবং কলমের মুজাহিদীন? আমরা কি হতে পেরেছি মহান সালাফের জীবন্ত কলমের যোগ্য উত্তরাধিকারী! কেন পারি না? কেন আমরা কলমের কথা ভাবি না?

পৃথিবী একদিন তাঁদের কলমে শুনেছে শব্দের ঝঙ্কার, আজ আমাদের কলমে শোনে শব্দের আর্তনাদ! পৃথিবী একদিন দেখেছে তাঁদের হাতে কলমের আলো, আমাদের হাতে আজ দেখে কলমের অন্ধকার! আবার কি ফিরে আসতে পারে না অতীতের কলম, যা শুধু ন্যায় ও সত্যের জন্য কালির অশ্রু ঝরাতো! আবার কি আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি না কলমের অতীত, যা ছিলো এই উম্মাহর গর্বের ও গৌরবের? কেন পরি না? কেন আমরা কলমের কথা ভাবি না?

আজ সময় এসেছে কলমের ডাকে জেগে ওঠার, কলবের সঙ্গে কলমের নতুন বন্ধন গড়ে তোলার।

আজ সময় এসেছে কলমের হাসি-কান্না ও আনন্দ-বেদনা অনুভব করার, কলমের মূল্য ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করার।

আজ সময় এসেছে কলমকে ভালোবেসে কলমের ভালোবাসা অর্জন করার, কলমের আলোতে আলোকিত হওয়ার এবং কলমের দানে ধন্য হওয়ার।
হে অরুণ, হে তরুণ! তুমি ছাড়া বলো আর কে আছে কলমের ফরিয়াদ শোনার!

# কলমের আত্মকথা

আমি কলম। আমি মনের ভাব ও হৃদয়ের ভাবনা প্রকাশের মাধ্যম। যুগে যুগে বিশ্বের জ্ঞানী-গুণী ও আহলে ইলম তাদের জ্ঞানসাধনার যত ফসল তোমাদের জন্য রেখে গেছেন তা আমারই মাধ্যমে। আবার আজকের তোমরা আগামী দিনের জন্য যে জ্ঞান-সম্পদ রেখে যাবে তা আমারই মাধ্যমে। আমি না হলে গড়ে উঠতো না তোমাদের এই বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার এবং সংরক্ষিত হতো না ইলমের এই মহাসম্ভার। আমি না হলে পৃথিবীতে থাকতো শুধু মূর্খতার অন্ধকার। কোথায় থাকতো তখন তোমাদের শিক্ষা ও সভ্যতার অহঙ্কার। আমারই মাধ্যমে ঘটেছে ন্যায় ও সত্যের বিকাশ এবং অন্যায় ও অসত্যের বিনাশ।

আমারই মুখ থেকে তোমরা পেয়েছো যত নীতিকথা ও উপদেশ, আমিই দিয়েছি তোমাদের, উন্নত চরিত্র গঠনের পথনির্দেশ।

তোমরা যদি আমার মূল্য ও মর্যাদা না বোঝো, ক্ষতি কী! আল্লাহ যে আমাকে অনন্য মর্যাদা দান করেছেন! আমি যে নূরের প্রথম অহী, আমি যে 'আল্লামা বিল কলম'! আমি তো সেই কলম, যা দ্বারা লওহে মাহফূযে আল্লাহ তাঁর পাক কালাম লিখেছেন এবং লিখেছেন তোমাদের তাকদীর! আমি তোমাদের সেই 'জাফ্‌ফাল কালাম'!

কিন্তু হায়, এত গর্ব ও গৌরব যিনি আমাকে দান করেছেন তিনি আমার মধ্যে একটি বড় দুর্বলতাও রেখে দিয়েছেন! আমার কীর্তি ও কর্ম নির্ভর করে তোমাদের হাতে! আল্লাহ আমাকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। আমার গতি নির্ধারিত হয় তোমাদের মতি-গতির মাধ্যমে। আমি নিজে সচল হতে পারি না, আমি যা ইচ্ছা করি তা লিখতে পারি না। তোমাদের হাত যখন সচল হয় শুধু তখন আমি চলতে পারি। তোমরা যা লিখতে চাও আমি শুধু তাই লিখতে পারি। তোমরা যখন আমাকে জ্ঞান ও সত্যের সেবায় নিয়োজিত করো এবং ন্যায় ও কল্যাণের পথে ব্যবহার করো তখনই শুধু আমি জ্ঞান ও সত্য-ন্যায়ের বাহন হতে পারি। নিজেকে তখন আমি ধন্য মনে করি। আমার কালি তখন কল্যাণের ঝর্ণা প্রবাহিত করে,

আমার মুখ থেকে তখন আলোর ফোয়ারা উৎসারিত হয়। জগৎ তখন আলোকিত হয়, জগৎ তখন প্লাবিত হয়।

কিন্তু আল্লাহর দুশমন যখন আমাকে হাতে তুলে নেয়, যন্ত্রণায় আমি আর্তনাদ করি, কিন্তু প্রতিবাদে সোচ্চার হতে পারি না। আমার ভিতরে তখন আগ্নেয়গিরির লাভা টগবগ করে, কিন্তু আমি বিদ্রোহে জ্বলে উঠতে পারি না। অক্ষম অসহায়ের মত আমি তার না-পাক হাতে ব্যবহৃত হতে থাকি। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে সে করে তোলে অন্যায়-অসত্যের বাহন। মানুষের সমাজে আমারই মাধ্যমে সে ছড়িয়ে দেয় অনাচার-পাপাচার, খোদাদ্রোহিতা ও ব্যভিচার। এ লাঞ্ছনা ও অপমান আমি সইতে পারি না, তবু সইতে হয়। আমি তখন যন্ত্রণায় ছটফট করি, আর তোমাদের পথ চেয়ে থাকি; কখন আসবে বা-গায়রাত কোন তালিবে ইলম আমাকে উদ্ধার করতে আল্লাহর দুশমনের না-পাক হাত থেকে, আমকে নাজাত দিতে যুলুম-কুফুরির এই নরকযন্ত্রণা থেকে! কিন্তু আফসোস, তোমরা ঘুমিয়ে আছো গাফলাতে -র চাদর মুড়ি দিয়ে। তোমাদের ঘুম ভাঙ্গে না, তোমাদের গায়রত জাগে না, আমারও নরকযন্ত্রণা শেষ হয় না। আমাকে যারা উদ্ধার করবে, আমার আর্তনাদ তারা শুনতে পায় না।

একদিন আমি ছিলাম তোমাদের পূর্বপুরুষদের হাতে। হায়, কী সৌভাগ্যের দিন ছিলো! আনন্দ-উদ্দীপনার কী সোনালী সময় ছিলো! সত্যের আপোশহীন সৈনিকের হাতে আমি তখন লড়াই করেছি বিপুল বিক্রমে! আমার শব্দে ছিলো তলোয়ারের ঝঙ্কার, আমার কণ্ঠে ছিলো বজ্রের হুঙ্কার! আমার কালির প্রতিটি আচড়ে লেখা হতো সত্যের জয় ও বাতিলের পরাজয়।

আজ আমি বন্দী বাতিলের কারাগারে, ফেরাউনের জাদুগরদের হাতে। কবে তোমরা জেগে ওঠবে গাফলতের ঘুম থেকে? কবে আবার তুলে নেবে আমাকে তোমাদের শক্ত হাতে? কবে?

আমি আবার জ্বলে উঠতে চাই সেই বিপুল তেজে। বাতিলের ভিত্ আমি আবার কাঁপিয়ে দিতে চাই সেই বজ্রহুঙ্কারে । শুধু তুমি হে ইলমের তালিব, আমাকে তুলে নাও তোমার হাতে।

তোমাদের দেশে বাংলাভাষার অঙ্গনে, জানো, কেন তোমরা এত অবহেলিত? কারণ তোমরা আমাকে ত্যাগ করেছো, আর শত্রুরা আমাকে তুলে নিয়েছে। আর কুদরতের এটাই ফয়ছালা, কলম যার হাতে শক্তি ও প্রতিপত্তি তার দখলে। তোমরা আমাকে উদ্ধার করো, আমি তোমাদের শক্তি ও প্রতিপত্তি উপহার দেবো; সমাজে তোমাদের আমি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবো।

যথেষ্ট হয়েছে আমার দুর্গতি এবং তোমাদের যিল্লতি! এবার অন্তত রুখে দাঁড়াও শব্দের 'ধর্ষক' যারা তাদের বিরুদ্ধে এবং দেখো আমার আসমানি শক্তি।১

এখনো যদি সাবধান না হও, গাফলাতের ঘুম থেকে এখনো যদি জাগ্রত না হও তবে শুনে রাখো, রোযহাশরে তোমাদের বিরুদ্ধে আমি নালিশ জানাবো আল্লাহর দরবারে– হে আল্লাহ, তোমার দ্বীনের খাদেম যারা তাদেরই হাতে লুণ্ঠিত হয়েছে আমার আবরু। তোমার দুশমনেরা আমার টুটি চেপে ধরে যখন মত্ত উল্লাসে মেতে উঠেছে এরা তখন আমার প্রতি ছিলো নির্লিপ্ত। আমি ইনছাফ চাই হে আল্লাহ!

---

১। আগে ছিলো '.... শব্দের ধর্ষক যারা, তাদের বিরুদ্ধে এবং পরীক্ষা করে দেখো আমার আসমানি শক্তি', শক্তি শব্দটি চলে গিয়েছিলো অপর পৃষ্ঠায়। এতে অঙ্গসজ্জা অসুন্দর হয়ে পড়েছিলো। শব্দটিকে আগের পৃষ্ঠায় নেয়ার প্রয়োজনে ভাবলাম কী করা যায়? যদি লিখি, 'শব্দের ধর্ষকদের বিরুদ্ধে এবং .... তাহলে কাজ হয়, কিন্তু ভাষাসৌন্দর্য নষ্ট হয়। তারপর হঠাৎ মনে হলো, 'পরীক্ষা করে দেখো' কথাটা সুন্দর নয়। তাই 'পরীক্ষা করে' বাদ দিলাম। এখন দেখো, 'শক্তি' শব্দটি আগের পৃষ্ঠায় চলে এসেছে, আবার ভাষাগত অসৌন্দর্যও দূর হয়েছে। অঙ্গসজ্জা রক্ষা করার প্রয়োজনে সম্পাদনা করা, এটা আমার প্রচুর হয় এবং অঙ্গসৌন্দর্যের পাশাপাশি ভাষাসৌন্দর্যও অনেক বৃদ্ধি পায়। এটা সম্ভব হয়, লেখক নিজের লেখার কম্পোজ যখন নিজেই করেন। (লেখা সম্পাদনার এই সম্পূর্ণ নতুন ধারাটি সম্পর্কে সামনেও কোন টীকায় আরো কিছু কথা আছে।)

# বাংলাভাষার ফরিয়াদ!

আমি এক মযলুম ভাষা, আমি বাংলাভাষা, আমার বুকে লুকিয়ে আছে অনেক ব্যথা, অনেক যন্ত্রনা। বুকের ভিতরে আর কত দিন লুকিয়ে রাখবো বুকের বেদনা! নীরবে আর কতকাল সয়ে যাবো এ জ্বালা-যন্ত্রণা! কোন দিন কি আমি খুঁজে পাবো না একজন দরদী বন্ধু, যে শোনবে আমার ব্যথা ও যন্ত্রণার কথা, আমাকে দেবে একটু সামান্য শান্তি ও সান্ত্বনা! ১

ভাষা হলো ভালোবাসার মাধ্যম, ভাষা হলো চিন্তা ও চেতনার বাহন। আমার স্বপ্ন ছিলো, আমি হবো তোমাদের মুখের এবং কলমের ভাষা। আমার পঞ্চাশটি বর্ণ দ্বারা তোমরা লিখবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসার কথা; সেই ভালোবাসায় সিক্ত হবে তাদের হৃদয় যারা বাংলাভাষায় কথা বলে। আমার স্বপ্ন ছিলো, আমি হবো সত্যের, কল্যাণের এবং ন্যায়ের বাহন। আমার মাধ্যমে এদেশে এই সমাজে তোমরা সত্যের চিন্তা প্রচার করবে, কল্যাণের ভাবনা ছড়িয়ে দেবে এবং ন্যায়-চেতনার বিস্তার ঘটাবে। আমি হবো পৃথিবীর সুখী ও সমৃদ্ধশালী এক ভাষা, যেমন ইরানের ফারসি এবং হিন্দুস্তানের উর্দূ ভাষা।

আমার কি যোগ্যতার অভাব ছিলো? ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের কমতি ছিলো? ভূষণে, অলঙ্কারে ও ধ্বনি-মাধুর্যে আমি তো ছিলাম অনন্য! তবু আমি পেলাম না তোমাদের যত্ন-ভালোবাসা! আদর পরিচর্যা!

আমার বাগানে কি ফুল ছিলো না! আমার ফুলে কি সুবাস ছিলো না! তবু তোমরা আমার কাছে এলে না, ফুল তুলে মালা গাঁথলে না।২

আমি এক মযলূম ভাষা, আমি বাংলাভাষা! আমার বুকে এখন শুধু হতাশা! আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, পরম সমাদরে তোমরা আমাকে গ্রহণ করবে এবং ন্যায় ও সত্যের পথে আমাকে ব্যবহার করবে। তোমরা যখন বাতিলের বিরুদ্ধে লড়বে, তোমাদের কলম থেকে আমি আগুন হয়ে ঝরবো। কিন্তু তোমরা আমাকে গ্রহণ করলে না, বরং তুলে দিলে ইসলামের যারা শত্রু তাদের না-পাক হাতে। ওরা আমাকে বানালো নগ্নতা ও অশ্লীলতার বাহন এবং ভ্রান্তি ও গোমরাহির অন্ধকার ছড়ানোর মাধ্যম। মুখে ও কলমে ওরা আমার বুকে বিষ ছড়ালো। বিষে বিষে আমি হলাম জর্জরিত এবং আমার দ্বারা সমাজ হলো বিষাক্ত

আমি এক মযলূম ভাষা, আমি বাংলাভাষা! আমার সর্বাঙ্গে এখন পচন-ধরা ঘা। বিষের জ্বালায় আমি এখন শুধু ছটফট করি, আর আর্তনাদ করি। বিশ্বাস ছিলো একদিন তোমাদের কানে পৌঁছবে আমার আর্তনাদ। ফিরে আসবে তোমাদের চেতনা ও গায়রাত। বিলম্বে হলেও তোমরা এগিয়ে আসবে বাতিলের থাবা থেকে আমাকে উদ্ধার করতে। কিন্তু তোমরা এলে না, তোমরা জাগলে না। আমি লাঞ্ছিত হলাম; একদল পশুর হাতে আমি ধর্ষিত হলাম।

ফল কী হলো আমার প্রতি অবহেলা ও অবজ্ঞার! দেশ ও সমাজের কাছে তোমরাও হলে অবহেলা ও অবজ্ঞার পাত্র! এমনই হয়, মায়ের ভাষাকে যারা অবজ্ঞা করে দেশ ও সমাজের কাছে তারা নিজেরাই হয়ে পড়ে অবজ্ঞার পাত্র।

আর কতকাল থাকবে অচেতন গাফলাতের ঘুমে? একদিন তো দাঁড়াতে হবে আল্লাহর সামনে। সেদিন আমি ফরিয়াদ জানাবো আল্লাহর কাছে। সেদিন আমি নালিশ দায়ের করবো তোমাদের নামে, 'হে আল্লাহ, তুমি তো কাওমের মাঝে রাসূল পাঠিয়েছো তাঁর মুখে তাঁর কাওমের ভাষা দিয়ে, যেন তিনি তাদের সামনে প্রচার করতে পারেন হকের দাওয়াত এবং সত্যের বাণী। কিন্তু এরা আমাকে পরিত্যাগ করেছিলো হে আল্লাহ! ফলে তোমার দুশমনদের হাতে আমার ইজ্জত-আবরু হয়েছে লুণ্ঠিত! আমি হয়েছি জাহেলিয়াতের বাহন। হে আল্লাহ আমি বিচার চাই, আমি ইনছাফ চাই।

তখন কী কৈফিয়ত পেশ করবে তোমরা আল্লাহর কাছে? কী জবাব আছে তোমাদের কাছে আমার নালিশের?

এখনো সময় আছে। ওঠো, জাগো। আমার বর্ণমালাকে গ্রহণ করো, আমার শব্দমালাকে বরণ করো। অন্যায় ও বাতিলের কবল থেকে আমাকে উদ্ধার করো। ন্যায় ও সত্যের বাহনরূপে আমাকে ব্যবহার করো। তাদের হাতে আছে 'কলমের দড়ি', তোমরা হাতে নাও 'কলমের লাঠি'। দেখবে, বাতিলের সব জাদু-কারসাজি হয়ে যাবে নাস্তানাবুদ। মিথ্যার অন্ধকার বিদূরিত হবে এবং সত্যের আলোতে সমাজ আলোকিত হবে। দ্বীনের চূড়ান্ত বিজয় হবে এবং তোমাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে দেশে, সমাজে এবং মানুষের হৃদয়ে। তোমরা আমাকে উদ্ধার করো এবং প্রতিষ্ঠিত করো আমার প্রাপ্য মর্যাদায়; আমি তোমাদের সমাসীন করবো সমাজের নেতৃত্বের আসনে। যদি না করো তাহলে দুনিয়াতে পাবে শুধু যিল্লতি ও লাঞ্ছনা, আর আখেরাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে আসামীর কাঠগড়ায়।

*(এই লেখাটিতে একজনের কলমের সহযোগিতা রয়েছে, আল্লাহ তাকে 'শায়ানেশান' কবুল করুন, আমীন।)*

---

১। আগে ছিলো এরকম– 'আমি বাংলাভাষা, আমার বুকে লুকিয়ে আছে অনেক ব্যথা, অনেক যন্ত্রণা। আর কত দিন লুকিয়ে রাখবো! একজন দরদী বন্ধুও কি খুঁজে পাবো না, যে শোনবে আমার বুকের ব্যথা ও যন্ত্রণার কথা এবং আমাকে দেবে সামান্য কিছু হলেও সান্ত্বনা!'
'আর কত দিন লুকিয়ে রাখবো' কথাটা অসম্পূর্ণ মনে হলো। তাই চিন্তা করে লিখলাম, 'কিন্তু আর কত দিন লুকিয়ে রাখবো বুকের ভিতরে বুকের ব্যথা-বেদনা!' তারপর ভাবলাম,

তাকরার হলে বক্তব্যটি আরো জোরালো ও আবেদনপূর্ণ হবে; তাই লিখলাম, 'আর কতকাল নীরবে সইবো এ জ্বালা যন্ত্রণা! এখন বাহ্যত আর ভাষাগত কোন সমস্যা নেই। কিন্তু চিন্তা করলাম, সান্ত্বনা শব্দটিকে নীচে আনতে পারলে একটি প্যারা সৃষ্টি হতো, তাতে সজ্জাটি সুন্দর হতো। কিন্তু কীভাবে? দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ হলো, খুঁজে খুঁজে দেখলাম, কোথায় একটা দু'টো শব্দ বাড়ানো যায়! অনেক চিন্তার পর লিখলাম, 'আমাকে দেবে একটু সামান্য শান্তি ও সান্ত্বনা! আরো সুন্দর হলো, কিন্তু শব্দটি নামলো না। অনেক চিন্তার পরও কোন পথ হলো না। তখন ভাবলাম, আচ্ছা একেবারে শুরু থেকে চেষ্টা করে দেখি, তখন হঠাৎ করেই, একেবারে হঠাৎ করেই কলম থেকে যেন ঝরে পড়লো, 'আমি এক মযলূম ভাষা, আমি বাংলাভাষা।' এতে কাজ হলো, প্যারা সৃষ্টি হলো, কিন্তু নীচের লাইনটি অর্ধেক ভরে গেলো। তখন অনেক চিন্তা-ভাবনা করে কিছু শব্দ কমিয়ে বর্তমান রূপটি পেলাম। এখন চিন্তা করে দেখো, শুধু একটি প্যারা তৈরীর চিন্তা ও চেষ্টা থেকে কত সুন্দর সম্পাদনা হলো। প্যারা সৃষ্টির তাগাদা না হলে এ সম্পাদনাটুকু হতো না। কারণ বাহ্যত ভাষাগত কোন সমস্যা ছিলো না। আমার মনে হয়, লেখার সম্পাদনার এটি একেবারে নতুন একটি ধারা! আল্লাহ যেন কবুল করেন।)

২। আমার বাগানে ... এটা আগে ছিলো না, এখন সংযোজন করেছি। প্রথমে লিখেছিলাম, আমার বাগানে কি ফুল ছিলো না! তবু তোমরা মালা গাঁথলে না!' মনে হলো, পরপর দু'টি প্রশ্ন হলে কথাটা জোরালো হয়, চিন্তা করতে করতে এই ভাবটা এলো যে, ফুলের সুবাস নিয়ে প্রশ্ন করা যায়, তখন লিখলাম, 'আমার ফুলে কি সুবাস ছিলো না!' এরপর মনে হলো দু'টি প্রশ্নের পর 'তবু তোমরা মালা গাঁথলে না' শুধু এইটুকু কথা ভারসাম্যপূর্ণ মনে হয় না। এখানেও দু'টি কথা থাকা দরকার। কত যে চিন্তা করলাম! শেষে এইটুকু পেলাম, 'তবু তোমরা ঘর সাজালে না এবং মালা গাঁথলে না। পছন্দ হলো না, তাই লিখলাম, তবু তোমরা আমার কাছে এলে না, ফুল কুড়ালে না এবং মালা গাঁথলে না।' নাহ, এখনো আসেনি! অবশেষে লিখলাম, 'তবু তোমরা আমার কাছে এলে না এবং ফুল তুলে মালা গাঁথলে না!' এবার মনে হলো, 'শব্দের শাহযাদী' এসেছে আমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে!'

শব্দের শাহযাদী প্রথম আহ্বানেই আসে না। আগে সে পরীক্ষা করে, তুমি কি কলমের রাখাল, কৃষাণ, না শাহযাদা! তাই প্রথমে পাঠায় পরিচারিকা। রাখাল তাতেই মজে যায়, আর শাহযাদী দূর থেকে হাসে অবজ্ঞার হাসি! কৃষাণ হলে পরিচারিকার ছলনায় ভোলে না। শাহযাদী তখন পাঠায় সহচরীকে। কৃষাণ তাতে মজে যায়, আর দূর থেকে শাহযাদী হাসে করুণার হাসি! কিন্তু তুমি যদি হও শাহযাদা তাহলে এসব ছলনায় তুমি ভোলবে না, বরং সাধনায় নিমগ্ন থাকবে, তখন স্বয়ং শাহযাদী হাযির হবে এবং মধুর হেসে বলবে, আমি এসেছি হে কলমের শাহযাদা!

সাহিত্য-সাধনার জীবনে এ আমার এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা! এখানেই দেখো, প্রথমে এসেছে, 'তুব তুমি ঘর সাজালে না এবং মালা গাঁথলে না!' সুন্দর, কিন্তু শাহযাদী নয়! তারপর এলো, 'তবু তুমি ফুল কুড়ালে না এবং মালা গাঁথলে না! আরো সুন্দর, তবু শাহযাদী নয়! অনেক সাধনার পর এলো, 'তবু তুমি আমার কাছে এলে না, ফুল তুলে মালা গাঁথলে না।' হাঁ, তুমি সেই শাহযাদী, যার প্রতীক্ষায় ছিলাম আমি! কী অপূর্ব তোমার সৌন্দর্য! 'তবু তুমি/ আমার কাছে এলে না/ ফুল তুলে মালা গাঁথলে না!'

এখন কলমের রাখাল ও কৃষাণ অনেক, কিন্তু শব্দের শাহযাদী তো চায় কলমের শাহযাদাকে! তুমি কলমের শাহযাদা হও, শব্দের শাহযাদী সানন্দে তোমাকে বরণ করে নেবে।

# দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ কিছু চিন্তা, কিছু চেতনা

চিন্তা ও চেতনা এবং প্রেরণা ও উদ্দীপনা ছাড়া কখনো জীবনে কোন কাজ হয় না এবং কোন কাজে সফলতা আসে না। এ অধ্যায়ে পুষ্প থেকে নির্বাচন করে এরকম কিছু লেখা সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা পাঠকের অন্তরে লেখার প্রতি মমতা জাগ্রত করতে পারে, যা তার হৃদয়-জগতকে সাহিত্যের সাধনার জন্য উন্মুক্ত করতে পারে। বাকি আল্লাহর ইচ্ছা।

# আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পৃথিবীতে মানবজাতির যাত্রালগ্ন থেকেই শুরু হয়েছে হক ও বাতিলের লড়াই, সত্য ও মিথ্যার সংঘাত।[১] এটা অতীতে ছিলো, বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। এ সংঘাত কখনো বন্ধ হয়নি, তবে রূপ বদলেছে, ক্ষেত্র পরিবর্তিত হয়েছে এবং অস্ত্র ও উপায়-উপকরণে ভিন্নতা এসেছে। সব যুগে, সব দেশে বাতিলের পক্ষে ছিলো একটা দল। আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন, ওরা হলো হিযবুশ-শায়তান বা শয়তানের দল। হকের পক্ষেও ছিলো একটি দল। আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন, ওরা হলো হিযবুল্লাহ, বা আল্লাহর দল।[২]

আল্লাহ তা'আলার 'সুন্নত' ও শাশ্বত বিধান[৩] এই যে, আহলে বাতিল ও শয়তানের দল সংখ্যায়, শক্তিতে এবং উপায়-উপকরণে সবসময় ভারী হবে, পক্ষান্তরে আহলে হক সংখ্যায় কম হবে, শক্তিতে দুর্বল হবে এবং উপায়-উপকরণে হবে নিঃসম্বল।[৪]

হক-বাতিলের এই যে লাগাতার লড়াই, সত্য ও মিথ্যার[৫] এই যে অব্যাহত সংঘাত, এর পরিণতি ও ফলাফল কী?

আল্লাহ নিজেই তা ঘোষণা করেছেন পবিত্র কোরআনে—

أولئك حزب الشيطن ط ألا إن حزب الشيطن هم الخسرون

'ওরাই হলো শয়তানের দল, আর শোনো, (সংখ্যায়, শক্তিতে এবং উপায়-উপকরণে সবল হলেও) শয়তানের দলই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।'

পক্ষান্তরে অন্য দলটি সম্পর্কে বলেছেন—

أولئك حزب الله ط ألا إن حزب الله هم المفلحون

ওরাই হলো আল্লাহর দল, আর শোনো, (সংখ্যায়, শক্তিতে এবং উপায়-উপকরণে দুর্বল হলেও শেষ পর্যন্ত) আল্লাহর দলই হবে সফলকাম।

অর্থাৎ চূড়ান্ত পরিণতিতে 'শক্তি ও গুণতি' নির্ধারক বিষয় নয়: নির্ধারক বিষয় হলো

সম্পর্ক। যাদের সম্পর্ক আল্লাহর সঙ্গে তারাই হবে সফলকাম, আর যাদের সম্পর্ক শয়তানের সাথে তারাই হবে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত।[৬]

কিন্তু আহলে হকের বৈশিষ্ট্য এই যে, বাতিলের মকর-ফেরেব, ছল ও ছলা এবং কল ও কৌশল সম্পর্কে তারা পূর্ণ হুঁশিয়ার থাকবে।[৭]

বাতিল কখন কোন্ ক্ষেত্রে লড়াই শুরু করছে এবং কী কী অস্ত্র নিয়ে মাঠে নামছে তা আহলে হকের জানা থাকবে এবং সাধ্যপরিমাণ শক্তি ও উপায়-উপকরণ অর্জনে তারা সচেষ্ট হবে। তারপর আল্লাহর উপর ভরসা করে বাতিলের মোকাবেলায় ময়দানে হাযির হবে। অবশ্য তাদের আসল শক্তি এই যে, তারা শুধু আল্লাহকে রাযী-খুশী করতে চায়; তাদের আসল অস্ত্র এই যে, তারা শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করে এবং গায়বের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস রাখে।

যুগে যুগে আমাদের মহান পূর্বসূরিগণ এ নীতি অনুসরণ করেই বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং ইবলীসী শক্তির সাথে পাঞ্জা ধরেছেন।

যুগের দাবী ও সময়ের গতিধারার প্রতি তাদের তীক্ষ্ণ নযর ছিলো।[৮] তাই আহলে বাতিল যখন যে অস্ত্র হাতে নিয়েছে এবং যখন যে কৌশল অবলম্ব করেছে, তাদের বিরুদ্ধে তাঁরা সে অস্ত্রই তুলে নিয়েছেন এবং কৌশলের জবাব কৌশল দ্বারাই দিয়েছেন। তবে তাঁরা লড়াই করেছেন একমাত্র আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের ভরসায়। এ কথা আম্বিয়া কেরামের ক্ষেত্রে যেমন সত্য তেমনি সত্য যুগে যুগে ওয়ারিছীনে আম্বিয়া-এর ক্ষেত্রে। (বিশদ উদাহরণের এখানে অবকাশ নেই।)[৯]

স্বভাব ও প্রকৃতির ধারা অনুযায়ী হক ও বাতিলের লড়াই আমাদের দেশে এবং আমাদের সমাজেও ছিলো, আছে, থাকবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, (আমাদের দেশে) আমরা বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্র, অস্ত্র ও কৌশল চিহ্নিত করতে পারিনি। বাতিল ও আহলে বাতিলের গতি-প্রকৃতি বুঝতে বরাবর আমরা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছি। তাই বাতিল বিনা বাধায় প্রবল বেগে এগিয়ে চলেছে এবং পদে পদে আমরা আহলে বাতিলের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে চলেছি।[১০]

এ যুগে বাতিলের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ের প্রথম ও প্রধান ক্ষেত্র হলো শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিম থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ এবং তার পর আজকের 'প্রমুখ' সাহিত্যের অঙ্গনে আমাদের প্রতিপক্ষ।[১১] কিন্তু আমরা বাংলাভাষার আলিমসমাজ কি তাদের সাথে লড়াই করার মত ভাষাজ্ঞান, সাহিত্যবোধ ও সাংস্কৃতিক যোগ্যতা অর্জন করেছি? কখনো কি সে চিন্তাও করেছি? হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদবী (রহ) আমদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন আপনাদের মধ্যে একজন 'ট্যাগোর' পয়দা হলো না? বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ইমাম না হয়ে কেন আপনারা মুক্তাদী হবেন? এর কী জবাব আছে আমাদের কাছে?

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আজ আলিমসমাজের অবস্থান কোথায়? আর শিক্ষা? সে সম্পর্কে যত কম বলা যায় তত ভালো। শিক্ষা অবশ্য আমরা অর্জন করছি এবং সেটাকে বলছি দ্বীনী শিক্ষা; যদিও আমাদের দ্বীনী শিক্ষার গভীরতা সম্পর্কেও প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে। কিন্তু সময় ও সমাজকে 'বশীভূত' করার জন্য আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে শিক্ষা অপরিহার্য তা থেকে 'অতি যত্নের' সঙ্গে নিজেদের আমরা সরিয়ে রেখেছি। ফলে শিক্ষার অঙ্গনেও আহলে বাতিলের মোকাবেলায় আমাদের অসহায়ত্ব প্রকট হয়ে উঠেছে।

এককথায় যদি বলতে যাই, তাহলে সমকালের প্রতিটি বিষয়ে আমরা অজ্ঞ, আর বিগতকালের প্রতিটি বিষয়ে আমরা অবিজ্ঞ। সুতরাং সমকালের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা দূর করতে হবে এবং কোরআন-সুন্নাহ ও শরী'আতের জ্ঞানে আমাদের সুবিজ্ঞ হতে হবে।

নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই এখন আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হলো শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ময়দানে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তোলা, আর তা একদিনের কাজ নয়, পঞ্চাশ বছরের কাজ, যা শুরু হওয়া দরকার ছিলো আরো পঞ্চাশ বছর আগে।

সাহিত্যের অঙ্গনে বাতিলের বিরুদ্ধে আমাদের জয়ী হতে হবে কলমের যুদ্ধে। এযুগের কলম জাদুগরদের মোকাবেলায় আমাদের কলমকে হতে হবে এমন 'আছা', যার সামনে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে 'কলমজাদুগর'দের সব তেলেসমাতি। এ মহান চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে যারা সাহিত্যের সাধনায় আত্মনিয়োগ করবে, কোন সন্দেহ নেই, তাদের সাহিত্য-সাধনা হবে বিনিদ্র রাতের ইবাদতের সমতুল্য। সুতরাং কবি নজরুল, যার সাহিত্য-প্রতিভা শেষ করে দিয়েছিলো, 'ওদের' কূট চক্রান্ত, তার কবিতা থেকে ধার করে বলতে চাই, 'কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যত!'

---

১। দেখো, এখানে লড়াই ও সংঘাত শব্দদু'টি ব্যবহার করা হয়েছে শব্দের সমশ্রেণিতা রক্ষা করে। তাছাড়া প্রথম অংশের শব্দগুলো দেখো, 'হক, বাতিল, লড়াই' প্রতিটি শব্দ উচ্চারণে কোমল, পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অংশে 'সত্য, মিথ্যা, সংঘাত প্রতিটি শব্দ উচ্চারণে কঠিন। কোন লেখা পড়ার সময় এভাবে লেখার বিভিন্ন সৌন্দর্য অনুধাবন করে করে পড়া উচিত। তাহলেই তোমার মধ্যে সৃষ্টি হবে সুন্দর সাহিত্যরুচি।

২। একটা ও একটি-এর ব্যবহারক্ষেত্র লক্ষ্য করো। টি ও টা-এর ব্যবহারসম্পর্কিত আলোচনা সামনে আসছে।

৩। আরবীতে সুন্নত শব্দটির অর্থ বিধান, সুন্নাতুল্লাহ মানে আল্লাহর নির্ধারিত বিধান, বাংলাপাঠকের কাছে সুন্নতের সুপরিচিত অর্থ হলো নবীর সুন্নত এবং নামাযের ফরয-সুন্নত। তাই কোট করে বোঝানো হয়েছে যে, সুন্নত শব্দটি এখানে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত

হয়েছে। তারপর ব্যাখ্যামূলক আতফ আনা হয়েছে। অপরিচিত শব্দকে পরিচিত ও প্রচলনভুক্ত করার জন্য আতফে তাফসীরের কৌশলটি বেশ কার্যকর, তবে এর সীমিত ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

৪। দুর্বল-এর পর নিঃসম্বল শব্দটি ছন্দগত দিক থেকে সুন্দর হয়েছে। যদি বলা হতো সম্বলহীন তাহলে ছন্দপতন ঘটতো।

৫। হক ও বাতিল শব্দদু'টিকে সমাসবদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু সত্য ও মিথ্যা-কে করা হয়নি, প্রথমত এ কারণে যে, এটাই হচ্ছে শ্রুতিমসৃণতার দাবী। দ্বিতীয়ত 'সত্য-মিথ্যা'-এর স্বাভাবিক অর্থ হচ্ছে, 'সত্য নাকি মিথ্যা', যেমন, 'সত্য-মিথ্যা জানি না, যা শুনলাম তাই বললাম। লড়াই ও সংঘাত-এর ছিফাত ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমশ্রেণিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

৬। সাথে ও সঙ্গে-এর ব্যবহার লক্ষ্য করো।

৭। ছল ও ছলা-এর সঙ্গে সুরছন্দ রক্ষা করে 'কল ও কলা বলা যায় কি না, ভেবেছিলাম। কিন্তু কৃত্রিমতার গন্ধ থাকাতে মনটা সায় দিলো না, তাছাড়া 'কল ও কৌশল শব্দদু'টিরও রয়েছে নিজস্ব সুরছন্দ।

৮। আসলে হওয়া দরকার, 'কড়া নযর' এবং 'তীক্ষ্ণ দৃষ্টি'। এখানে পূর্ববর্তী শব্দাবলীর প্রেক্ষিতে 'তীক্ষ্ণ দৃষ্টি' হলেই ভালো হতো।

৯। এ বিষয়ে মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদবী (রাহ.) রচিত 'তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত' (বাংলা অনুবাদ– ইসলামী রেনেসার অগ্রপথিক) বইটি পড়া খুব উপকারী হবে।

১০। আগে ছিলো এরকম, 'তাই পদে পদে বাতিলের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে চলেছি, আর বাতিল বিনা বাধায় প্রবল বেগে এগিয়ে চলেছে।' এখন মনে হলো, একটি বাক্য হওয়া উচিত বাতিল সম্পর্কে, একটি বাক্য হওয়া উচিত আহলে বাতিল সম্পর্কে, সে হিসাবে প্রথমে লিখলাম, 'তাই পদে পদে বাতিলের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে চলেছি, আর আহলে বাতিল বিনা...।' তারপর মনে হলো, মানুষ বাতিলের হাতে পর্যুদস্ত হয় না, আহলে বাতিলের হাতে হয়। তাই অগ্র-পশ্চাত করে লিখলাম, 'তাই বাতিল বিনা বাধায় প্রবল বেগে এগিয়ে চলেছে এবং পদে পদে আমরা আহলে বাতিলের হাতে...। লেখাটি অনেক বার দেখার পরও এই ত্রুটিটা মাত্র এখন ধরা পড়লো। তুমিও এই পরিবর্তনটুকুর যৌক্তিকতা চিন্তা করো। নিজের লেখাকে যদি এভাবে বারবার সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখো, তাহলেই তোমার লেখা ধীরে ধীরে নিখুঁত ও সুন্দর হবে।

১১। আগে ছিলো 'জগতে'। তুমি চিন্তা করে দেখো, ময়দানে, জগতে ও অঙ্গনে, এগুলোর মধ্যে কোন শব্দটি এখানে অধিকতর উপযুক্ত।

# লেখার প্রতি আমার মমতা[১]

কাগজের পাতায় কালো হরফের 'পর্দায়' আমরা কত কিছু লিখি; কত ভাব ও ভাবনা প্রকাশ করি, কিন্তু কখনো কি চিন্তা করেছি, কাগজের কালো হরফের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কত গভীর! লেখার সঙ্গে লেখকের আত্মীয়তা কত নিবিড়! লেখা তো লেখকের চিন্তার ফল! তার ভাব ও ভাবনার ফসল![২] লেখা তো লেখকের মানস-সন্তান! তার 'অস্তি' ও অস্তিত্বের প্রমাণ![৩]

আমি যে একদিন পৃথিবীর আলো-বাতাস গ্রহণ করেছিলাম; সবুজ ঘাসের নরম গালিচার উপর বিচরণ করেছিলাম!

আমি যে বাগানে বসন্তের আগমনে প্রফুল্ল হয়েছিলাম, বৃক্ষ-শাখায় ফলের সমাহারে ও ফুলের সমারোহে[৪] পুলকিত হয়েছিলাম, উড়ন্ত প্রজাপতি ও প্রস্ফুটিত গোলাবের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলাম!

আমি যে নীল আকাশে মেঘের খেলা দেখেছিলাম, সূর্যের আলো ও চাঁদের জোসনা উপভোগ করেছিলাম এবং তারার মেলায় ফুলের মালার স্বপ্ন দেখেছিলাম!

আমার লেখা তো পৃথিবীর সেই আলো-বাতাসেরই কথা! সবুজ ঘাসের, সোনালী ফসলের এবং পুষ্পিত বসন্তেরই ছন্দগাঁথা! আমার লেখা তো নীল আকাশের শুভ্র মেঘেরই ছায়া! চাঁদ-সুরুজ ও সেতারার আলোরই ইশারা!

একদিন আমি থাকবো না, কিন্তু আমার লেখা বেঁচে থাকবে আমার সেই জীবনের স্মৃতি হয়ে। আমি থাকবো না, কিন্তু আমার লেখা থাকবে কাগজের পাতায় এবং আমলের খাতায়।[৫]

এই দেশ, এই সমাজ এবং আমি একদিন অভিন্ন ছিলাম। আমাদের হাসি-কান্না ও আনন্দ-বেদনা অভিন্ন ছিলো। আমাদের দিন-রাত ও সকাল-সন্ধ্যা এক ছিলো, আমাদের ভাব ও ভাবনা এবং আশা ও প্রত্যাশা একাকার ছিলো।

আমি ছিলাম, আমার চারপাশে অনেক মানুষ ছিলো। আপন ছিলো, পর ছিলো, বন্ধু ছিলো, শত্রু ছিলো; তবু সবাই মানুষ ছিলো এবং মানুষের প্রতি আমার ভালোবাসা ছিলো।

আমি ছিলাম, আমার চারপাশে জীবনের কোলাহল ছিলো, যৌবনের উচ্ছলতা ছিলো, আনন্দের কলরব ছিলো এবং বেদনার নীরবতা ছিলো। একদিন আমি থাকবো না, কিন্তু দেশ ও সমাজ থাকবে; মানুষ এবং মানুষের আনন্দ-বেদনা থাকবে। কোলাহল থাকবে, নীরবতা থাকবে, আর থাকবে আমার কলমের লেখা। আমি থাকবো না, কিন্তু মানুষের প্রতি ভালোবাসার স্মৃতি হয়ে আমার লেখা বেঁচে থাকবে কাগজের বুকে এবং হয়ত মানুষের বুকে।

একদিন আমার সম্ভাবনাময় একটি জীবন ছিলো; সেই জীবনের প্রভাতে অনেক স্বপ্ন ছিলো, অনেক কল্পনা ও পরিকল্পনা ছিলো, অনেক আশা ও প্রত্যাশা ছিলো। আবার জীবনের অপরাহ্নে অনেক কষ্ট ছিলো, কান্না ছিলো, হতাশা ও দীর্ঘশ্বাস ছিলো এবং স্বপ্নভঙ্গের পুঞ্জীভূত বেদনা ছিলো। সব ছিলো, সব থাকবে; শুধু আমি থাকবো না। আমি থাকবো না, তবে আমার স্বপ্নের এবং স্বপ্নভঙ্গের স্মৃতি হয়ে আমার লেখা বেঁচে থাকবে কালো হরফের পর্দায় এবং হয়ত মানুষের হৃদয়ের আঙ্গিনায়।

হয়ত একদিন থেমে যাবে কলমের গতি; হয়ত হারিয়ে যাবে লেখা ও লেখকের স্মৃতি; হয়ত কালো কালির হরফগুলো মুছে যাবে কাগজের পাতা থেকে; হয়ত মানুষ ভুলে যাবে, মাটির নীচে শুয়ে থাকা একজন মানুষের হাসি-কান্না ও আনন্দ বেদনার কথা, তার আশা ও নিরাশার কথা এবং তার স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কথা। যদি মুছে যায় যাক! যদি ভুলে যায় যাক! কলম এবং কলমের লেখা যার দান, আমি তো শুধু তাঁরই কাছে চাই প্রতিদান![৬]

লেখা আমার হৃদয়ের স্পন্দন, লেখা আমার আত্মার নিবেদন। লেখা আমার প্রাণের ছবি, লেখা আমার জীবনের প্রতিচ্ছবি। আমার লেখাকে তাই আমি ভালোবাসি এবং লেখার সৌন্দর্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করি। আমার লেখাকে তাই আমি দোয়াতের কালি দিয়ে লিখি না, বিগলিত হৃদয়ের অশ্রু দিয়ে লিখি। এবং তাই আমি চাই, সকল প্রাপ্তির মোহ ত্যাগ করে একদল তরুণ যেন এগিয়ে আসে সাহিত্যের সাধনায়, বাতিলের কলম-জাদু গুঁড়িয়ে দেয়ার দৃপ্ত প্রতিজ্ঞায়। ওদের কলম যদি হয় ধারালো ছুরি, এদের কলম হবে শাণিত তরবারি। ওদের কলম যদি ছড়ায় ফুলঝুরি, এদের কলম ছড়াবে সূর্যের দীপ্তি। ওদের সাহিত্য যদি হয় কাগুজে ফুলের সমাহার, এদের সাহিত্য হবে বসন্তের পুষ্পসম্ভার। [৭]

অদেখা হে বন্ধু! কলমের সাধনার এ দুর্গম পথে তুমি কি আমার সঙ্গী হবে, না একা একাই সাঙ্গ হবে আমার জীবনসফর?! [৮]

---

১। লেখার প্রতি লেখকের যে মমতা ও আত্মিক সম্পর্কের কথা এখানে বলা হয়েছে, কারো হৃদয়ে যদি এটা সৃষ্টি না হয় তাহলে সে 'জীবিকার প্রয়োজনে' লিখতে পারে এবং লেখকও হয়ত হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যিক হতে পারে না, আর সাহিত্যের সাধক তো

হতেই পারে না। তুমি যদি সাহিত্যের সাধক হতে চাও, আগে লেখার প্রতি মমতা অর্জন করো। লেখার প্রতি যদি তোমার মমতা থাকে, তাহলে মৃত্যুর পরও তোমার লেখা অনন্ত জীবনের সুবাস ধারণ করবে। লেখার জন্য তুমি কতটা ত্যাগ স্বীকার করছো, সেটাই নির্ধারণ করবে, লেখার প্রতি তোমার কী পরিমাণ মমতা রয়েছে। মুখে তোমাকে বলতে হবে না, লেখার প্রতি মমতার কথা।

২। আগে ছিলো, 'তার ভাবনার ফসল'। তার চেয়ে 'ভাব ও ভাবনা' আরো ভালো হয়েছে কি না চিন্তা করো।

৩। আগে ছিলো, 'তার অস্তিত্বের প্রমাণ'। এখানে সমান্তরালে দু'টি বাক্য রয়েছে, মিলিয়ে দেখো–

০ লেখা তো লেখকের চিন্তার ফল

০০ লেখা তো লেখকের মানস-সন্তান [এখানে যদি লেখা যেতো, 'হৃদয়ের সন্তান/ আত্মার সন্তান' তাহলে চিন্তার ফলের সঙ্গে ইয়াফতেরও অভিন্নতা অর্জিত হতো, কিন্তু মানস-সন্তান এতই সুপরিচিত শব্দ যে, সেটাকে এড়িয়ে যাওয়া ঠিক বলে মনে হয়নি।]

০ তার ভাব ও ভাবনার ফসল

০০ তার অস্তিত্বের প্রমাণ। [আশা করি, বুঝতে পেরেছো যে, এখানে উভয় অংশের ভারসামান্য ক্ষুণ্ন হয়েছে, সে জন্যই এখন লিখেছি, তার অস্তি ও অস্তিত্বের প্রমাণ। অস্তি ও অস্তিত্ব প্রায় সমার্থক। প্রসঙ্গত, শব্দটির মূল হচ্ছে ফার্সি 'আস্ত' বা আছে শব্দটি, অথচ হিন্দু অভিধানপ্রণেতাগণ গায়ের জোরে শব্দটির মূল সংস্কৃত বলে সাব্যস্ত করতে চান।]

৪। যত দূর মনে পড়ে, এখানে আমি লিখেছিলাম, 'ফুলের সমাবেশে', 'সমারোহে' শব্দটি স্নেহাস্পদ ছাত্র মাওলানা ইউশা আমার কলমে যুগিয়ে দিয়েছিলো। আমার কলমের পক্ষ হতে তাকে ধন্যবাদ এবং তার কলমের জন্য শুভকামনা।

৫। দেখো, মূল শব্দটি হচ্ছে 'আমলনামায়', কিন্তু এখানে যদি লেখা হতো 'কিন্তু আমার লেখা থাকবে কাগজের পাতায় এবং আমলনামায়' তাহলে দু'দিকের শব্দগত ভারসাম্য নষ্ট হতো এবং গদ্যের যে একটা ছন্দ আছে তা ক্ষুণ্ন হতো। অনিবার্য প্রয়োজনে শব্দ নিয়ে এ ধরনের নাড়াচাড়া করতে হয়, তবে খুব সাবধানে এবং নিপুণভাবে। এ জন্য প্রয়োজন নিয়মিত অধ্যয়ন, অব্যাহত অনুশীলন এবং আরো বেশী প্রয়োজন কারো সান্নিধ্য গ্রহণ।

৬। হয়ত থেকে প্রতিদান পর্যন্ত এ অংশটুকু আগে ছিলো না। হঠাৎ মনে হলো এখানে কিছু একটা কথা রয়ে গেছে। 'আমার লেখা বেঁচে থাকবে' এই আকুতির উর্ধ্বে উঠে আমাকে কিছু বলতে হবে। ভিতরটা খুব ছটফট করছিলো, কী হতে পারে কথাটা! যন্ত্রণাটা খুব তীব্র হওয়ার পর হৃদয়ের গভীর থেকে এ কথাগুলো বের হয়ে এলো এবং মনে হলো, এখন যেন লেখাটি পূর্ণতা লাভ করেছে। দেখো, কত দিন পরে হলো এটা! মূল লেখাটা তৈরী হয়েছে প্রায় আট বছর আগে। পড়েছি অন্তত একশবার! কিন্তু এই অংশটুকু, যা এই লেখার বলা যায় মূল প্রাণ, তা এলো, আট বছর পর এবং অন্তত একশবার পড়ার পর। এমনই হয়, এটা মানতেই হবে, এটাকে রক্ষা করতেই হবে।

৭। প্রথমে বাক্যটি ছিলো এমন, *'ওদের সাহিত্য যদি হয় কাগজের ফুল, এদের সাহিত্য হবে বসন্তের ফুল।'* সুন্দরই তো ছিলো! কিন্তু মনে হচ্ছিলো, যার আসার কথা সে

আসেনি, সে এখনো লুকোচুরি খেলছে। অনেক চিন্তা-ভাবনা ও কাটাচেরার পর বর্তমান বাক্যটি এসেছে; তুমি উভয়ের মধ্যে তুলনা করে পড়ো তাহলেই সৌন্দর্যের ব্যবধানটুকু বুঝতে পারবে। একজন লেখক হবেন, শব্দসৌন্দর্য ও মর্মসমৃদ্ধির পূজারী। তার কাম্য হবে সুন্দরতম শব্দ এবং সমৃদ্ধতম মর্ম। সে জন্য তাকে পরম ধৈর্যের সঙ্গে প্রতীক্ষা করতে হবে শেষ সময় পর্যন্ত।

৮। আগে ছিলো, 'তুমি কি আমার সঙ্গী হবে, নাকি একা একাই সাঙ্গ হবে আমার জীবনসফর?' এটা ভুল। 'কি' ও 'নাকি' একসঙ্গে আসে না। 'কি'-এর সঙ্গে শুধু 'না' আসবে, আর 'কি' না থাকলে পরে 'নাকি' হবে। উদাহরণ–

০ তুমি যাবে, না আমি যাবো?

০০ তুমি কি যাবে, না আমি যাবো?

০০০ তুমি যাবে, নাকি আমি যাবো?

# সাহিত্যের উৎস হৃদয়, অন্যকিছু নয়

অনেকে আমাকে প্রশ্ন করে, লেখা শেখা যায় কীভাবে? লেখক হওয়া যায় কোন্ পথে? আমি তাদের কখনো বলি ভাষার নিয়ম ও ব্যাকরণের কথা, কখনো শব্দবৈচিত্র ও বাক্যসৌন্দর্যের কথা; কখনো সাহিত্যের অলঙ্কার ও কবিতার ছন্দ-মাধুর্যের কথা! অনেক কথাই বলি, কিন্তু আসল রহস্য প্রকাশ করি না এবং হৃদয়ের 'বদ্ধ দুয়ার' উন্মুক্ত করি না।[১] কেননা চারপাশে আমার যদিও অনেক কোলাহল এবং উপচে পড়া কৌতূহল; যদিও সবার হাতে কাগজ-কলম এবং লেখালেখির উৎসাহে কমতি নেই কোনরকম,[২] কিন্তু মর্মজ্বালা যদি প্রকাশ করতে দাও তাহলে বলবো, আমি অপেক্ষা করেছি, প্রতীক্ষার প্রহর গুণেছি এবং 'আকাশের' কাছে প্রার্থনা করেছি, কিন্তু একটি উন্মুক্ত বক্ষের এবং একটি প্রস্ফুটিত হৃদয়ের সন্ধান আজো পাইনি।

মেঘ না হলে তো বৃষ্টি হয় না, বাগান না হলে তো বসন্ত আসে না এবং প্রস্ফুটিত হৃদয় না হলে তো হৃদয় থেকে রহস্য উন্মোচিত হয় না। হৃদয়ের ভাব হৃদয়ে তখই প্রবেশ করে এবং হৃদয়ের মিনতি হৃদয়কে তখনই স্পর্শ করে যখন হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মিলন ঘটে। কিন্তু সেই শুভলগ্ন এখনো আসেনি আমার জীবনে।

নিঃসঙ্গ জীবনের এ বিষণ্ন সন্ধ্যায় আজ আমি ভাবছি, আমার দৃষ্টি-সীমার বাইরে দূর দিগন্তে– যেখানে আকাশ নেমে এসেছে পৃথিবীর কোলে– সেখানে নিশ্চয় আছে এমন কোন তরুণ, যার আত্মার আকুতি এবং হৃদয়ের মিনতি আমি শুনতে পাই না, কিন্তু সাহিত্যের সাধনায় সে উৎসর্গিত হতে চায় এবং আগামী দিনের কলম-জিহাদের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে চায়। হে তরুণ! হে নবারুণ! তোমারই উদ্দেশ্যে আমার আজকের এ নিবেদন।

তুমি সাহিত্যের সাধক হতে চাও! সাহিত্যের অনন্ত জগতে প্রবেশ করতে চাও! তাহলে দুয়ার খোলো, হৃদয়ের বদ্ধ দুয়ার। শব্দের রাজ্য জয় করে হৃদয়ের পথে প্রবেশ করো ভাবের জগতে। কেননা শব্দের রাজ্যে তুমি পাবে শুধু লেখার উপাদান, আর ভাবের জগতে পাবে সাহিত্যের সন্ধান। চিন্তার সংকীর্ণতা বর্জন

করো এবং হৃদয়ের উদারতা অর্জন করো। কেননা উদার হৃদয়েই শুধু ভাবের আবির্ভাব হয়, সংকীর্ণ হৃদয়ে নয়।

তোমাকে যারা কষ্ট দেয় তাদের তুমি ক্ষমা করো; তোমার চোখ থেকে যারা অশ্রু ঝরায় তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। আঘাতকে হাসিমুখে বরণ করো এবং ছুঁড়ে দেয়া পাথরকে ফুলরূপে গ্রহণ করো। তখন তোমার চোখের অশ্রু কলমের কালি হয়ে ঝরবে; তোমার কলমের 'অশ্রুবিন্দু' শব্দের মুক্তা হয়ে বর্ষিত হবে।

তোমার চিন্তায় যেন ঈর্ষা ও বিদ্বেষ না থাকে; তোমার হৃদয়ে যেন সবার প্রতি ভালোবাসা থাকে, যে ভালোবাসা হবে জাগতিক সকল চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে; যে ভালোবাসা শুধু দান করে এবং দানের আনন্দেই তৃপ্ত থাকে, কখনো প্রতিদান কামনা করে না; যে ভালোবাসা শুধু বিলিয়ে দেয়, কিছু কুড়িয়ে নেয় না; বিলিয়ে দেয়ার উচ্চতা থেকে কুড়িয়ে নেয়ার নীচতায় নেমে আসে না।

শত্রুকে যেন তুমি ক্ষমাসুন্দর হাসি উপহার দিতে পারো; সকল ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে তুমি যেন উঠতে পারো। তখন প্রকৃতির কাছ থেকে তুমি একটি তন্ময়তা লাভ করবে। তোমার উপর 'পরম সত্তা'র অনুগ্রহ বর্ষিত হবে। তোমার হৃদয় থেকে ভাবের অনিঃশেষ ঝর্ণাধারা উৎসারিত হবে। স্রষ্টার আদেশে সৃষ্টিজগৎ তাদের অকৃপণ দানে তোমাকে ধন্য করবে। তখন পাতার সবুজ থেকে, ফুলের সুবাস থেকে, পাখীর গান থেকে, নদীর কল্লোল থেকে এবং বৃষ্টির রিমঝিম থেকে তুমি লেখার প্রেরণা পাবে।

ভোরের আলো থেকে, সন্ধ্যার আঁধার থেকে, দিগন্তের লালিমা থেকে, আকাশের নীলিমা থেকে,[৩] মেঘের আল্পনা থেকে, চাঁদের জোসনা থেকে, তারকার ঝিলিমিলি থেকে এবং জোনাকির আলোকসজ্জা থেকে তুমি চিন্তার স্নিগ্ধতা লাভ করবে।

যখন আঘাত আসে, যখন ব্যথা জাগে তখন প্রত্যাঘাত না করে, কোন অভিযোগ না তুলে[৪] তুমি শান্ত হও, সংযত হও এবং তোমার কলমের আশ্রয় গ্রহণ করো। কলম তোমাকে শব্দের ফুল দিয়ে লেখার মালা গেঁথে পরম সান্ত্বনা দান করবে। আর কলমের যা কিছু দান তা রাব্বুল কলমের ইহসান। কারণ মানুষকে তিনি শিক্ষা দান করেছেন কলমের মাধ্যমে। সুতরাং কলমের দান পেতে হলে তোমাকে যেতে হবে রাব্বুল কলমের দুয়ারে, চাইতে হবে দু'হাত পেতে।

শোনো বন্ধু! তুমি যদি শুধু কলম চালনা করো, তাহলে কলম তোমাকে পরিচালনা করবে, কখনো এদিকে, কখনো সেদিকে; কখনো ঠিক পথে, কখনো ভুল পথে। কলমের অনুশীলনে তুমি শুধু লেখক হতে পারো, সাহিত্যের সাধক হতে পারো না। এ জন্য প্রয়োজন কলমের সঙ্গে কলবের বন্ধন। কলম ও কলব, এদু'য়ের শুভমিলনেরই নাম সাহিত্যের সাধনা। তুমি যদি হতে পারো এদু'য়ের মিলনক্ষেত্র

তাহলে তুমি পেয়ে গেলে মহাসত্যের আলোকরেখা। তোমাকে করতে হবে না আর পথের সন্ধান। পথ নিজে ডাকবে তোমাকে। তুমি শুধু চলবে সামনে, আরো সামনে এবং পৌঁছে যাবে আলোর ঝর্ণাধারার নিকটে। তোমার কলম থেকে ঝরবে আলোর শব্দ, আলোর মর্ম। ৫

কারণ লেখা তো কিছু নয়, শুধু রেখা। তাতে তুমি পাবে না সত্যের দেখা। জীবনসফরে কলমের পথে সত্যের দেখা যদি পেতে চাও তাহলে আগে, সবার আগে কলমের স্রষ্টার নৈকট্য অর্জন করো ৬

হৃদয় যদি স্রষ্টার ডাকে সাড়া দিতে পারে এবং হৃদয় যদি সৃষ্টির সৌন্দর্যের বাণী শ্রবণ করতে পারে তাহলে তোমার সামনে পরম সত্যের প্রকাশ এবং সুপ্ত রহস্যের উদ্ভাস ঘটবে। তোমার কলম জীবন্ত হবে, সৃজনশীল হবে। সাহিত্যের সাধনায় তুমি সফল হবে। তোমার সাহিত্য সত্য ও সুন্দরের এবং শুভ ও কল্যাণের ধারক হবে।

---

১। পুষ্পে এবং সংকলনের প্রথম সংস্করণে ছিলো এরকম, *'অনেকে প্রশ্ন করে, লেখা শেখা যায় কীভাবে? লেখক হওয়া যায় কোন্ পথে? আমি একথা, সেকথা অনেক কথা বলি, শব্দের বৈচিত্র শেখাই, বাক্যের সৌন্দর্য দেখাই এবং ভাষার কারুকাজ বোঝাই, কিন্তু আসল রহস্য প্রকাশ করি না এবং হৃদয়ের 'বদ্ধ দ্বার' উন্মুক্ত করি না।'* এবার মনে হলো, *'শেখাই, দেখাই, বোঝাই-* এই ছন্দটা ঠিক স্বতঃস্ফূর্ত হচ্ছে না। তাছাড়া আলাদা তিনটি শব্দের ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাও নেই। তাতে শব্দের অপচয় ঘটে। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে লিখলাম, *'আমি তাদের কখনো বলি ভাষার নিয়ম ও ব্যাকরণচর্চার কথা, কখনো লেখার অনুশীলন ও যত্ন-পরিচর্যার কথা; কখনো শব্দের প্রয়োগ ও ব্যবহার-বৈচিত্র এবং বাক্যের গঠন ও বিন্যাস-সৌন্দর্যের কথা। কখনো সাহিত্যের অলঙ্কার ও কারুকার্যের কথা, কখনো কবিতার ছন্দ-মাধুর্যের কথা! আমি তাদের একথা সেকথা অনেক কথা বলি, কিন্তু আসল রহস্য প্রকাশ করি না এবং হৃদয়ের 'বদ্ধ দ্বার' উন্মুক্ত করি না।'* এখন আবার মনে হলো, শব্দস্ফীতি ঘটেছে, শব্দ কমানো দরকার। প্রথমে ব্যাকরণচর্চা থেকে *'চর্চা'* বাদ দিলাম। তারপর *'যত্ন'* বাদ দিয়ে শুধু *'পরিচর্যা'* রাখলাম, তারপর মনে হলো, *'লেখার অনুশীলন ও পরিচর্যা'* পুরোটাই বাদ যেতে পারে। তারপর *'শব্দের প্রয়োগ ও ব্যবহার-বৈচিত্র* এবং *বাক্যের গঠন ও বিন্যাসসৌন্দর্য*'কে সংক্ষেপ করে বানালাম, *'শব্দবৈচিত্র ও বাক্যসৌন্দর্য'* এখন মোটামুটি একটি গ্রহণযোগ্য রূপ দাঁড়িয়েছে বলে মনে হয়। বদ্ধ দ্বার-এর চেয়ে বদ্ধ দুয়ার এখানে ভালো মনে হচ্ছে।

২। প্রথমে ছিলো এরকম, *'এবং সাহিত্যের পথে চলতে চায় জোরকদম'*, পরিবর্তন করা হলো কেন? কারণ কাগজ-কলম নিয়ে মানুষ টেবিলের সামনে বসে, জোরকদম বা ধীর কদম চলে না। তা তো চলে না, কিন্তু আমি যে দিব্বি চালিয়ে দিয়েছিলাম! বলো তো, এই লেখা নিয়ে বাতিলের সাথে কলমযুদ্ধে কীভাবে নামবো?

৩। আগে ছিলো, *'ভোরের আলো থেকে, সন্ধ্যার লালিমা থেকে, আকাশের নীলিমা*

*থেকে...।* অনেক চিন্তা করেই পর্বগুলো সাজানো হয়েছিলো। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, *'লালিমা'*-এর সঙ্গে তো *নীলিমা*-এর মিল, *আলোর* সঙ্গে তাহলে কিসের মিল? তারপর *ভোরের* সঙ্গে *সন্ধ্যার* মিল, কিন্তু *আকাশের* সঙ্গে কিসের মিল? এখন দেখো, *ভোর ও সন্ধ্যা, আলো ও আঁধার, দিগন্ত ও আকাশ এবং লালিমা ও নীলিমা,* কীভাবে খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে! এখন আমি তোমাকে যে প্রশ্নটা করতে চাই তা হলো, ভুলটা ধরা পড়লো কীভাবে এবং সংশোধনটা সম্ভব হলো কীভাবে? শুধু চর্চা-অনুশীলন দ্বারা কি এটা সম্ভব? না, এজন্য প্রয়োজন আড়াল থেকে কারো সাহায্যের।

৪। আগে *'কোন'* ছিলো না, তাতে *'প্রত্যাঘাত না করে'*-এর তুলনায় *'অভিযোগ না তুলে'* একটু ছোট হয়েছিলো এবং জোরালোতা কম ছিলো

৫। পরিবর্তন করে লেখা যায়, *'তোমার কলম থেকে ঝরবে আলোর শব্দ এবং শব্দের আলো'*। কোনটা ভালো হবে, স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারায় পরিবর্তনটা করা হলো না।

৬। লিখতে চেয়েছিলাম, 'তাহলে রাব্বুল কলমের নৈকট্য অর্জন করো', কিন্তু পরবর্তী বক্তব্যের সঙ্গে অর্থাৎ 'হৃদয় যদি স্রষ্টার ডাকে'-এর সঙ্গে শব্দগত মিল রক্ষার জন্য তা করা হয়নি।

# তৃতীয় অধ্যায়ঃ বানানের 'ভূল' অমার্জনীয় ভুল

বাংলাভাষায় বানানের ভুল আমাদের মাদরাসা-মহলের একটা লজ্জাজনক দুর্বলতা। আরবীতে, এমনকি উর্দুতে সামান্য একটি বানান ভুল হলে আমরা ছাত্রদের কত তিরস্কার করি, কিন্তু বাংলায় ছাত্র-শিক্ষক সবাই মিলে যেন বানানভুলের উৎসব পালন করি। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার এ এক অদ্ভুত অবস্থা! যেদিন আমরা বানানভুল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবো সেদিন বোঝবো, ভাষাশিক্ষার প্রথম স্তর আমরা পার হলাম।

আমাদের বানানভুলের যে শোচনীয় অবস্থা, তার সর্বোত্তম উদাহরণ এই যে, ভুল শব্দটাও আমরা অনেকে 'ভূল' বানানে লিখি। তো আমাদের মধ্যে বানানসচেতনা সৃষ্টি করাই হলো বর্তমান অধ্যায়টির উদ্দেশ্য।

# বানানে নির্ভুল হবো আমরা

প্রিয় বন্ধুরা!

আশা করি সবাই ভালো আছো। আমি ভালো থাকার চেষ্টা করি, পারি না, তোমাদের কারণে। কথাটা মিথ্যে নয়। তোমাদের লেখায় যখন বানানের আশ্চর্য রকম অশুদ্ধতা দেখি তখন সত্যি সত্যি আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। 'ভুল' শব্দটি লিখতে একটি ছোট্ট শিশুরও ভুল করা উচিত নয়, অথচ আমার কাছে যত লেখা আসে তার অধিকাংশেই থাকে 'ভূল'। তখন মনে হয় কী, আমাদের জীবনটাই বুঝি ভুল!

বানানে আমরা কত দুর্বল, তা বুঝতে আর বাকি থাকে না, যখন তোমরা লেখো, 'বানানে আমরা খুব দূর্বল'। এ দুর্বলতা আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে, উঠতেই হবে এবং যে কোন মূল্যে। ঐ যা, মনে পড়ে গেলো, তোমাদের একজন তার চিঠিতে আমার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছে, আমি নাকি তার লেখাকে 'মুল্য' দেই না! আচ্ছা বলো তো, আমি কীভাবে 'মুল্য' দেবো! মজার ব্যাপার দেখো, মূল্য-এর দীর্ঘ-ঊকার চলে আসে, ভুল-এর কাছে, আর ভুল-এর হ্রস্ব-উকার চলে যায় মূল্য-এর কাছে!

যাই হোক, কলম মেরামত-এর আজকের মজলিসে আমরা বানান সম্পর্কে কিছু কথা বলবো। যে কোন ভাষায় বিশুদ্ধ বানানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন শিক্ষিত মানুষ বানানে ভুল করবে, এটা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা যারা মাদরাসায় পড়ি, মাতৃভাষায় আমাদের বানানভুল লজ্জাজনক পর্যায়ে বেশী। অবশ্য এটাও ঠিক যে, ইংরেজী বর্ষপঞ্জীর ফেব্রুয়ারী মাসের একুশ তারিখে যারা শহীদ মিনারে ফুল দেয় এবং শহীদানের আত্মার শান্তি কামনায় নাচ-গান ও নাটক মঞ্চস্থ করে তাদের বাংলাবানানের অবস্থাও যথেষ্ট কাহিল। কিন্তু আমার কথা হলো, আমরা আত্মসমালোচনা করতে চাই। অন্যদের অবস্থা আমাদের আলোচ্যবিষয় নয়। বাংলাভাষার প্রতি অন্যদের কোন দায় নেই; বাংলাভাষারও অন্যদের কাছে কোন দাবী নেই। পক্ষান্তরে আমরা দ্বীনী দিক থেকে বাংলাভাষার কাছে দায়বদ্ধ এবং বাংলাভাষারও আমাদের কাছে রয়েছে আত্মিক

দাবী। আমরা বাংলা শিখতে চাই এ জন্য যে, এ ভাষার মাধ্যমে আমরা দ্বীনের খিদমত করবো। বাংলাভাষাকে আমরা আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখবো, যাতে শয়তানের অনুচরেরা হকের বিরুদ্ধে বাতিলের বাহনরূপে একে ব্যবহার করতে না পারে; অন্তত ফাঁকা মাঠে একাই যেন বাঁশী বাজাতে না পারে। ১

আমাদের বাংলাভাষার চর্চা-অনুশীলন হলো ইবাদত। আমরা চাই বাংলাভাষার নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হতে এবং বাংলাভাষাকে দ্বীন প্রচারের শক্তিশালী বাহনরূপে ব্যবহার করতে। সেভাবেই আমাদের বাংলাভাষা শিখতে হবে। তাই এখন থেকে আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক–

ভাষা আমরা যে যে পরিমাণই শিখি না কেন এবং সাহিত্য যে যে পরিমাণই চর্চা করি না কেন, অন্তত বাংলা বানানে আমরা নির্ভুল হবো, কখনো 'ভূল' লিখবো না। পরে কোন এক অবকাশে তোমাদের লেখায় ও চিঠিপত্রে বানানশুদ্ধির বড়সড় একটা অভিযান চালানোর ইচ্ছে আছে, যাকে বলে 'চিরুনিঅভিযান'; আল্লাহ যদি তাওফীক দান করেন।

ভালো কথা, চিরুনি ও চিরনি, দু'রকমই লেখা যায়, তবে মূর্ধন্য-ণ নয় এবং দীর্ঘ-ঈকারও নয়। আর শব্দদু'টো লিখতে হবে সংলগ্নরূপে।

যাই হোক, এ মজলিসে আমরা বানান সম্পর্কে শুধু দু'একটি সাধারণ নিয়ম আলোচনা করবো, যা মেনে চললে খুব সহজেই আমরা প্রচুর পরিমাণে বানানভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকতে পারি। ২

মূর্ধন্য শব্দটি এসেছে মূর্ধা থেকে। এর আভিধানিক অর্থ মস্তক বা অগ্রভাগ। ব্যাকরণের পরিভাষায় মূর্ধন্য অর্থ জিহ্বার অগ্রভাগকে তালুতে স্পৃষ্ট করে ৩ উচ্চার্য বর্ণ। ঋ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, র ও ষ– এই আটটি বর্ণ হলো 'মূর্ধন্যপরিবারভুক্ত বর্ণ'। তবে 'ণ ও ষ' এদু'টি বর্ণের সঙ্গেই শুধু মূর্ধন্য শব্দটি প্রযুক্ত হয়। আমরা বলি, মূর্ধন্য-ণ ও মূর্ধন্য-ষ, যাতে 'স ও ন' থেকে এদু'টিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়। নইলে প্রকৃতপক্ষে মূর্ধন্য বর্ণ হচ্ছে মোট আটটি।

মূর্ধন্যবর্ণ ক'টি? এ প্রশ্ন করে অনেকের কাছ থেকেই উত্তর পাওয়া যায়, মূর্ধন্যবর্ণ হচ্ছে দু'টি, মূর্ধন্য-ণ ও মূর্ধন্য–ষ। আশা করি, তোমরা বিষয়টি মনে রাখবে।

যাই হোক, মূর্ধন্য–ণ ও মূর্ধন্য–ষ নিয়ে সবাইকে বেশ হিমশিম খেতে দেখা যায়, অথচ কয়েকটি নিয়ম জেনে নিলে এবং তা মেনে চললে অন্তত আশিভাগ ক্ষেত্রে 'মূর্ধন্য-সমস্যা' থেকে আমরা রেহাই পেতে পারি। এ সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাকরণগ্রন্থে যে সকল বানাননিয়ম দেয়া হয়েছে সেগুলোকে এখানে আমরা সহজ ভাষায় তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

*প্রথম নিয়ম*

'র-গুচ্ছ' (অর্থাৎ র, ঋ, রেফ ও র-ফলা) এবং 'ষ'-এর পরে ণ হয়। তবে যদি মাঝখানে স্বরবর্ণ, প-বর্গ (প-ফ-ব-ভ-ম) এবং 'য়' ও 'হ' ছাড়া অন্য কোন বর্ণ হয়

তাহলে 'ন' হবে। এবার কিছু নমুনা দেখো–

**(ক)** চরণ, বরণ, মরণ, হরণ, করণ, কারণ, কিরণ, রোপণ, রাবণ, রমণী, ন্যায়পরায়ন, ইত্যাদি।

**(খ)** ঋণ, ঘৃণা, তৃণ, মসৃণ, কৃপণ, ইত্যাদি।

**(গ)** বর্ণ, কর্ণ, চূর্ণ, পূর্ণ, জীর্ণ, অর্পণ, নির্মাণ, অনির্বাণ, ইত্যাদি।

**(ঘ)** প্রাণ, ত্রাণ, ঘ্রাণ, গ্রহণ, ভ্রমণ, প্রমাণ, প্রবীণ, গ্রামীণ, ম্রিয়মাণ, ইত্যাদি।

এবার পুষ্পের বন্ধুদের লেখা ও চিঠিপত্র থেকে কিছু নমুনা তুলে ধরছি, যেখানে উপরের এই সহজ নিয়মটি না জানার কারণে ণ-এর পরিবর্তে 'ন' লেখা হয়েছে। দেখো–

এক ছোট্ট বন্ধু লিখেছে– 'মাতৃচরনে স্বর্গ, এটা হাদীছের কথা।' হাদীছের কথা তো ঠিক আছে, কিন্তু কথা হলো, আমার মা, তোমার মা, সবার মায়ের চরণেই মূর্ধন্য-ণ হয়, দন্ত্য-ন হয় না। বিশ্বাস না হয়, এবার বিরতিতে বাড়ী গিয়ে মায়ের পা ছুঁয়ে এবং চরণ স্পর্শ করে দেখে নিয়ো।

দ্বিতীয় কথা হলো, হিন্দুরা বলে স্বর্গ, আমরা বলি জান্নাত, কেউ কেউ বলে বেহেশত। আর মাতৃচরণ হলো কঠিন শব্দ। তুমি সহজ করে বলতে পারো, মায়ের পায়ের/কদমের নীচে জান্নাত/বেহেশত।

আরেকজন লিখেছে– 'কখনো ঋন করো না। ঋন করা ভালো না।' তো আমি বলি কী! তুমি 'ঋন' চাইলে কেউ তোমাকে ঋণ দেবেও না!

রাজশাহী থেকে এক ছোট্ট খুকী আমাকে সুসংবাদ দিয়েছে, সে নাকি একটি আমের চারা 'রোপন' করেছে। যখন চারাটি বড় হবে, আর আম ধরবে তখন আমাকে দাওয়াত করে আম খাওয়াবে। কিন্তু আমার যে আশঙ্কা হয় 'রোপন' করা চারা হয়ত বেশী দিন বাঁচবে না, যতই গাছের গোড়ায় পানি দাও!

এক তরুণ বন্ধু, তার দিলে খুব জিহাদি জযবা, সে লিখেছে, 'দুশমনের উপর এমন আক্রমন চালাবো যে, ...।'

দুশমনের গর্দান থেকে কল্লাটা উড়ে যাবে, কিংবা দুশমন লেজ তুলে দৌড় দেবে, এই তো! কিন্তু ভাই, তোমার আক্রমনে যে ধার নেই! 'ন'-এর কারণে ধার নষ্ট হয়ে গেছে।

তাছাড়া তোমাকে দুশমনের উপর হামলা চালাতে হবে, আর শত্রুর উপর আক্রমণ চালাতে হবে, যাতে শব্দে শব্দে সমশ্রেণিতা রক্ষিত হয়।

(ঙ) ভাষণ, ভীষণ, তোষণ, দোষণ, চোষণ, ইত্যাদি।

মনে রেখো, তুমি যদি মঞ্চে দাঁড়িয়ে 'ভাষন' দিলে কেউ তোমার ভাষন শোনবে না, সবাই উঠে চলে যাবে। কারণ তারা তো এসেছিলো তোমার ভাষণ শুনতে!

আমরা যখন ছোট্ট ছিলাম, পাকা আমের নীচের অংশে ছিদ্র করে চোষণ দিতাম, মুখ ভরে যেতো রসে। এখনো মনে পড়লে মন যেন কেমন করে ওঠে! তোমরাও

পরীক্ষা করে দেখো একটা পাকা আম নিয়ে। কেটে খাওয়ার চেয়ে ওভাবে চুষে খাওয়ার স্বাদ কত আলাদা, তবে আগেই বলে রাখি, তুমি যদি 'চোষন' দাও, তাহলে সারাদিন চুষলেও সামান্য রসও বের হবে না।

এখন একটি প্রশ্ন। বলো তো, ভক্ষণ, লক্ষণ, বিচক্ষণ, সর্বক্ষণ, দক্ষিণ, প্রদক্ষিণ ইত্যাদি শব্দগুলোতে মূর্ধন্য-ণ হলো কেন?

কারণ 'ক্ষ' বর্ণটি হচ্ছে যুক্ত বর্ণ। যথা, ক+ষ= ক্ষ। সুতরাং ষ-এর পরে স্বাভাবিক নিয়মেই 'ণ' হয়েছে। একটা কথা কি জানো, হিন্দিভাষায় মূল উচ্চারণটি প্রকাশ পায়। লক্ষণ-কে ওরা বলে, 'লক্‌ষণ', পরীক্ষা-কে বলে, 'পরীক্‌ষা'। পদ্মা-কে বলে পদ্‌মা, আত্মা-কে বলে আত্‌মা, ইত্যাদি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ক্ষ-এর পরে দন্ত্য-ন হওয়ার সুযোগ নেই কেয়ামতের আগ পর্যন্ত। কেয়ামতের সময় তো উলটো কাজ শুরু হবে; পূর্বদিক থেকে সূর্য ওঠবে, তাই তখন ক্ষ-এর পরে 'দন্ত্য-ন' হলে কিছু করার থাকবে না। কিন্তু এখন যারা ক্ষ-এর পর দিব্বি দন্ত্য-ন চালিয়ে দেয় তাদের নিয়ে কী করা! বহুবছর থেকে দেখছি, সলিমুল্লাহ 'মুসলিম' হলের পশ্চিম পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি গিয়েছে, কিছু দূর এগুলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভবনের ফটকে লেখা রয়েছে, 'দক্ষিণ'। আশা করি, এখনো তা বহাল রয়েছে। তোমরা গিয়ে দেখে আসতে পারো। বেচারা বিশ্ববিদ্যালয়!

রচনা, রসনা, রত্ন, রুগ্ন ইত্যাদি শব্দগুলোতে 'র'-এর পরে দন্ত্য-ন হয়েছে। কারণ মাঝখানে স্বরবর্ণ, প-বর্গ এবং য় ও হ ছাড়া অন্য বর্ণ এসেছে। যথা, চ, স, ত, গ। (কারো কারো মতে রুগ্ন-তে মূর্ধন্য-ণ এবং তা লিখতে হবে, এভাবে, রুগ্‌ণ।)

অর্জন, নির্বাচন, দর্শন, প্রবর্তন ইত্যাদি শব্দে রেফ-এর পরে একই কারণে দন্ত্য-ন হয়েছে। আসল শব্দটাই তো রয়ে গেলো! মূর্ধন্য-ণ, এখানে কেন দন্ত্য-ন?! বলতে পারলে বোঝবো, নাহ্, বানান শেখা হচ্ছে বটে!

প্রবচন, প্রাচীন, প্রয়োজন, প্রধান ইত্যাদি শব্দগুলোতে একই কারণে র-ফলা-এর পরে দন্ত্য-ন হয়েছে।

মনে রাখতে হবে, এ নিয়ম মুফরাদ শব্দের বেলায় শুধু খাটবে; মুরাক্কাব বা যুক্তশব্দের ক্ষেত্রে খাটবে না। তাই দুর্ণাম নয়, দুর্নাম এবং ত্রিণয়ন নয়, ত্রিনয়ন। কারণ 'দুঃ' এই উপসর্গ যুক্ত হয়ে দুর্নাম হয়েছে, আর নয়নের সাথে যুক্ত হয়েছে 'ত্রি'; সুতরাং এরা হচ্ছে যুক্তশব্দ।

প্রবীণ ও নবীন শব্দদু'টি লিখতে অনেকেই ভুল করে। আশা করি, উপরের নিয়মটি জেনে নেয়ার পর তোমাদের আর ভুল হবে না।

পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ– এ তিনটি হলো দিবসের তিনটি সময়ভাগের নাম। প্রথম ও তৃতীয়টিতে মূর্ধন্য-ণ, আর মাঝেরটিতে দন্ত্য-ন; কারণটি আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছো।

আমরা অনেকে হারুণ, ইমরাণ, কামরাণ, কোরবানি এবং গভর্ণর, কর্ণার, হর্ণ ইত্যাদি লিখে থাকি। কিন্তু এগুলো অন্য ভাষার শব্দ, যা বাংলায় ব্যবহৃত হচ্ছে। তো বিদেশী কোন শব্দে কখনো মূর্ধন্য-ণ হবে না এবং মূর্ধন্য-ষও হবে না। এদুটি বর্ণ বাংলাভাষার একান্ত নিজস্ব বর্ণ।

সুতরাং যদি উপরের শব্দগুলো সঠিক বানানে লিখতে চাও তাহলে তোমাকে লিখতে হবে, হারুন, ইমরান, কামরান, কোরবানি এবং গভর্নর, কর্নার, হর্ন ইত্যাদি।

কোন বিদেশী শব্দে 'ণ' হতে পারে না, অথচ আমাদের পুরোনো টাকার গায়ে 'গভর্ণর' ছিলো। আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর তা সংশোধন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি মজার ঘটনা আছে, এখানে তা আর উল্লেখ করলাম না।

কিছু শব্দ আছে, যেগুলোতে কোন নিয়ম ছাড়া এমনিতেই মূর্ধন্য-ণ হয়, সেগুলো মুখস্থ করে নিলে ঝামেলা চুকে যায়। কয়েকটি শব্দ এখানে দেয়া হলো–

অণু, কণা, কণিকা, কোণ, কঙ্কণ, কল্যাণ, গণ, গুণ, গৌণ, ঘুণ, চিক্কণ (চিকন), তূণ, তূণীর, নিক্বণ (মিষ্টি আওয়াজ), নিপুণ, পণ, পণ্য, ফণা, বণিক, বাণিজ্য, বাণ (তীর), বাণী, বীণা, বেণী, ভণিতা, মণিমুক্তা, মাণিক, লবণ, লাবণ্য, শোণিত (রক্ত) ইত্যাদি।

নিক্বণ হচ্ছে ক+ব-ফলা, পক্ষান্তরে চিক্কণ হচ্ছে ক+ক।

***দ্বিতীয় নিয়ম***

ট, ঠ, ড–এগুলো কোন্ পরিবারের বর্ণ? মূর্ধন্যপরিবারের। সুতরাং এগুলোর সাথে যুক্ত অবস্থায় মূর্ধন্য-ণ এবং মূর্ধন্য-ষ হবে। যেমন–

(ক) অবগুণ্ঠন, কণ্ঠ, কুণ্ঠা, ঘণ্টা, ডাণ্ডা, পণ্ড, পাণ্ডা, প্রচণ্ড, বণ্টন, ভণ্ড, লণ্ঠন, লুণ্ঠন, হণ্টন।

(গ্রামের সাধারণ কৃষক জামা-জুতা পাবে কোথায়! তারা উদোম গায়ে, খালি পায়ে ক্ষেতের আইলের উপর দিয়ে হেঁটে যায়। [চন্দ্রবিন্দুটাও অনেক সময় হ-এর মাথায় থাকে না। থাকবে কীভাবে, খোদ কৃষকের মাথায়ই তো টুপি থাকে না!] তবে শহরের সাহেব বাবুরা স্যুট-বুট-হ্যাট-এ একেবারে সুসজ্জিত হয়ে রাজধানীর রাজপথে রীতিমত হণ্টন করে থাকেন।)

(খ) কনিষ্ঠ, ঘনিষ্ঠ, নষ্ট, বলিষ্ঠ, বৃষ্টি, মিষ্টি, যথেষ্ট, স্পষ্ট ইত্যাদি। এখন এ প্রশ্নের উত্তর তুমিই দাও যে, মাস্টার, পোস্টার, স্টেশন, ইস্ট-ওয়েস্ট ইত্যাদি শব্দে মূর্ধন্য-ষ না হয়ে দন্ত্য-স কেন হলো?

রাজধানী ঢাকার একটি বড় ও প্রসিদ্ধ মাদরাসায় নাম ফলকে বড় বড় করে লেখা রয়েছে 'নূরানী ওয়াকফ ষ্টেট'; অথচ স্টেট শব্দটি বিদেশী। এটি দেখে আমি লজ্জিত হয়েছিলাম, কারণ আমি তো এই মাদরাসা-পরিবারেরই একজন। একের লজ্জা তো দশেরই লজ্জা!

দেশের বড় বড় ও নামী-দামী প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ডেও এ ভুল দেখা যায়। তোমরা শহরের সাইনবোর্ডগুলো একটু অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখলে অনেক 'সুস্বাদু' অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে।

একটি কলেজের খৃস্টান অধ্যক্ষকে খৃষ্টান লিখতে দেখে যখন বললাম, 'আপনি খাঁটি খৃস্টান নন, ভুল খৃষ্টান।' তখন তিনি হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। পরে বিষয়টি বুঝিয়ে বললে তিনি মৃদু হেসে আমাকে 'থ্যাঙ্ক' বলেছিলেন। 'তাদের' এই একটি গুণ; ভুল ধরিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ হয়। এ গুণটি যদি আমরা অর্জন করতে পারি, ভালো হয়।

### *তৃতীয় নিয়ম*

তৎসম শব্দে সাধারণত অ, আ এবং অ-কার ছাড়া অন্যান্য স্বরবর্ণের পরে মূর্ধণ্য-ষ হয়। যেমন, ঈষৎ (সামান্য), উষ্ণ, উষ্মা (ক্রোধ, অসন্তুষ্টি), ঔষধ, বিষ, বিষয় (ব+ই= বি), ভীষণ (মূর্ধন্য-ষ-এর পর অনিবার্যভাবেই মূর্ধন্য-ণ হবে, আর মূর্ধন্য-ষ হয়েছে এই তৃতীয় নিয়মটির কারণে। ভ+ঈ= ভী), দূষণ, দ্বেষ (দ+উ= দূ, দ+এ= দে), নিষেধ, পরিষদ, পেষণ, পোষণ, শোষণ, তোষণ, চোষণ, ঘুষ, ঘোষণা, রোষ, মোষ, মেষ, মুষলধারে বৃষ্টি, হতাশায় মুষড়ে পড়া ইত্যাদি। তবে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও কম নয়।

### *চতুর্থ নিয়ম*

তৎসম শব্দে ঋ ও ঋ-কারের পরে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন, ঋষি, কৃষক, কর্ষণ, ঘর্ষণ, বর্ষণ, বর্ষ, বর্ষা, বিমর্ষ, মুমূর্ষু, হর্ষ ইত্যাদি। (দর্শন শব্দটি ব্যতিক্রম)

নীচে নিয়মের বাইরে মূর্ধন্য-ষযুক্ত কিছু শব্দ দেখো–

অনুষঙ্গ, অভিলাষ, অভিষেক (কর্মে নিয়োগ), আভাষ (অলাপ অর্থে, আর ইঙ্গিত অর্থে আভাস), আষাঢ়, চাষ, পাষাণ, ভাষা, (মুখের ভাষা, জলের ভাসা নয়) ভাষণ, সুষম, নিষ্ (নিষ্ফ, নিষ্কাশন, কিন্তু নিশ্চেষ্ট, নিশ্ছিদ্র), দুষ্ (দুষ্কর্ম, দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু দুশ্চরিত্র), চতুষ্পদ, ষষ্ঠ ইত্যাদি

### *পঞ্চম নিয়ম*

বাংলায় –কারী হচ্ছে ইসমুল ফাইল-এর আলামত। যথা, সাহায্যকারী, বিক্রয়কারী, ক্রয়কারী ইত্যাদি। এটা দীর্ঘ-ঈকার হবে। তবে মুআন্নাছ হবে -কারিণী। যেমন–

সাহায্যকারী, সাহায্যকারিণী।

তদ্রূপ সঙ্গী ও সঙ্গিনী, মেধাবী ও মেধাবিনী, সোহাগী ও সোহাগিনী, অহঙ্কারী ও অহঙ্কারিণী

ইসমুল ফাইলজাতীয় সমস্ত শব্দের শেষে দীর্ঘ-ঈকার হবে। যেমন– বিরোধী, প্রতিদ্বন্দ্বী, উপকারী, পরিবাহী, -কামী (কল্যাণকামী), উপযোগী, প্রতিযোগী। তবে 'ওয়াছফ'-এর ক্ষেত্রে হবে হ্রস্ব-ইকার। যেমন– বিরোধিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, উপকারিতা, পরিবাহিতা, কল্যাণকামিতা, উপযোগিতা, প্রতিযোগিতা। তদ্রূপ সাথী ও সাথিত্ব।

***ষষ্ঠ নিয়মঃ ং ও ঙ***

০ কিছু শব্দে শুধু ং হয়, ঙ হয় না। যেমন–
অংশ, কিংবা, জিঘাংসা, দংশন, নৃশংস, পাংশু, বংশ, মাংস, মীমাংসা, সংবাদ, সংবিধান, সংবেদন, সংযম, সংযুক্ত, সংযোগ, সংরক্ষণ, সংলগ্ন, সংলাপ, সংশয়, সংশোধন, সংশ্লিষ্ট, সংসদ, সংসর্গ, সংসার, সংস্করণ, সংস্কার, সংস্থা, সংস্পর্শ, সংহত, (লোভ সংবরণ/সম্বরণ), সিংহ, স্বয়ং, হিংসা, হিংস্র ইত্যাদি।
০০ ঙ হচ্ছে ক-বর্গের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং ক-বর্গের পরে অবশ্যই ঙ হবে, ং হবে না। যেমন–
অঙ্ক, অঙ্কন, অঙ্কুর, অঙ্গ, অঙ্গন, অঙ্গীকার, অপাঙক্তেয়, আকাঙ্ক্ষা, আঙুল/আঙ্গুল, আতঙ্ক, আশঙ্কা, ইঙ্গিত, উলঙ্গ, কঙ্কর, কঙ্কাল, গঙ্গা, ঠোঙ্গা, দাঙ্গা, নাঙ্গা, পঙক্তি, পতঙ্গ, পুঙ্খানুপুঙ্খ, প্রাঙ্গন, বঙ্গ, ব্যঙ্গ, ভঙ্গ, মঙ্গল, রঙিন/রঙ্গিন, রাঙা/রাঙ্গা, লঙ্ঘন, শৃঙ্খল, হুঙ্কার ইত্যাদি।
০০০ কিছু শব্দের শেষে ঙ ও ং দু'টোই হয়,। যেমন–
অলংকার/অলঙ্কার, অহংকার/অহঙ্কার, ঝংকার/ঝঙ্কার, নিংড়ান/নিঙড়ান, রং/রঙ, শিং/শিঙ, সংকট/সঙ্কট, সংকল্প/সঙ্কল্প, সংকেত/সঙ্কেত সংখ্যা/সঙ্খ্যা, সংগীত/সঙ্গীত, সংগোপন/ সঙ্গোপন, সংঘ/সঙ্ঘ, সংঘর্ষ/সঙ্ঘর্ষ, সংঘাত/সঙ্ঘাত, ইত্যাদি।

***সপ্তম নিয়ম***

এটিকে অবশ্য নিয়ম না বলে উপদেশ বলতে পারো। তবে যদি তা মেনে চলতে পারো, যথেষ্ট উপকার পাবে। আমদের লেখায় উকার ও ইকার-এর ব্যবহার হচ্ছে শতকরা নব্বই বা আরো বেশী। পক্ষান্তরে ঊকার ও ঈকার-এর ব্যবহার হচ্ছে শতকরা দশ বা তার চেয়ে কম। সুতরাং সাধারণভাবে তোমরা উকার ও ইকারই ব্যবহার করবে; পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে ঊকার ও ঈকার ব্যবহার করবে না।

পাখী, গাড়ী, বাড়ী ইত্যাদি শব্দের শেষে আগে দীর্ঘ-ঈকার দেয়া হতো, এখন হ্রস্ব-ইকার দেয়া হয়। বানানের সহজীকরণের নামে নতুন নতুন নিয়ম চালু করায় আমার মনে হয় বানানের অনাচার আরো বাড়ছে, কমছে না।

অদ্ভুত শব্দটিতে অনেকেই ভুল করে দীর্ঘ-ঊকার দেন, আসলে হবে হ্রস্ব-উকার। কৌতূহল শব্দটির ক্ষেত্রে হয় উল্টো। অর্থাৎ আমরা ভুল করে হ্রস্ব-উকার দেই, আসলে হবে দীর্ঘ-ঊকার। গৃহীত মানে যা গ্রহণ মঞ্জুর করা হয়েছে। দীর্ঘ-ঈকার

হবে, হ্রস্ব-ইকার দেয়ার অভ্যাস আছে কারো কারো। নিহিত মানে লুকায়িত (জানি না এতে কী রহস্য নিহিত রয়েছে।) এখানে হবে হ্রস্ব-ইকার, দিয়ে বসি দীর্ঘ-ঈকার। আখের গুড়, খেজুরে গুড় হচ্ছে হ্রস্ব-উকার, আর গূঢ় রহস্য হচ্ছে দীর্ঘ-উকার।

এরকম আরো বহু উদাহরণ আছে, তবে আজ এ পর্যন্ত থাক্।

---

১। বাঁশীটা কীভাবে বাজালাম দয়া করে দেখে নাও, আর শোনো, ফাঁক, ফাঁকা ও ফাঁকি- এগুলোতে চন্দ্রবিন্দুটা যেন তোমাকে ফাঁকি না দেয়।

২। বানানশুদ্ধি, বাননবিভ্রাট, বানানত্রুটি, বানানভ্রান্তি, বানানভুল, এগুলো একসঙ্গে লিখতে হবে, আলাদা লেখা ভুল।

৩। পণ্ডিতি বাংলা ছেড়ে সহজ বাংলায় বলো তালুতে লাগিয়ে

# বানানের রম্যরচনা

*(পুষ্প অনেক দিন পর্দার আড়ালে থাকার পর যখন দ্বিতীয় প্রকাশনায় যাত্রা শুরু করে এ লেখাটি তখন পুষ্পের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিলো। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের পর এটিকে এখানে সন্নিবেশিত করা হলো)*

পুষ্পের প্রিয় বন্ধুরা!

মাঝখানে কয়েক বছর পার হয়ে গেছে। তোমরা যারা শিশু ছিলে তারা এখন কিশোর, আর কিশোররা যুবক। এমনই হয়, এভাবেই জীবন গড়িয়ে যায়, অনেকটা আমাদের অজান্তেই। হারিয়ে যাওয়া সময় তো আর ফিরিয়ে আনা যায় না! তাই সে দুঃখ করে লাভ নেই। আমরা শুধু চেষ্টা করতে পারি সামনের সময়টুকু যেন হারিয়ে না যায়।

আচ্ছা, একটা কথা জানতে বড় ইচ্ছে করে। এ ক'বছরে তোমাদের বয়সে যেমন পরিবর্তন এসেছে, শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে তারুণ্য ও যৌবন, তেমনি তোমাদের কলমেও কি কিছু পরিবর্তন এসেছে? তোমাদের কলমেরও কি শৈশব পার হয়েছে? তোমাদের কলমও কি তারুণ্য ও যৌবনের ছোঁয়া পেয়েছে? যদি বলো, হাঁ, তাহলে বলবো, এ সময়গুলো বৃথা যায় নি। আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা করো, ১ বলবো, শীত ও শরতের প্রতিকূলতায় আমার পুষ্প হারিয়ে গেলেও চেষ্টা করেছি, আমি যেন হারিয়ে না যাই। প্রতিদিন কিছু না কিছু লিখেছি, যাতে পুষ্প যখন ফিরে আসবে তখন যেন আমার কলম সচল থাকে এবং নতুন উদ্যমে আমি পুষ্পের সেবা করতে পারি। ২

তোমরা যারা পুষ্পের উপদেশ মনে রেখেছো, মনে রেখে প্রতিদিন পিছনের পুষ্প পড়েছো এবং নিয়মিত রোযনামচা লিখেছো, আমি চোখ বন্ধ করে বলতে পারি, বয়সের মত তোমাদের কলমেও পরিবর্তন এসেছে। আশা করি, এখন তোমরা আরো বেশী করে পুষ্পের কাছ থেকে নিতে পারবে এবং পুষ্পকে দিতে পারবে। আরো আশা করি যে, তোমাদের কলমের এখন আর তত মেরামতের প্রয়োজন নেই।

# বানানের রম্যরচনা

*(পুষ্প অনেক দিন পর্দার আড়ালে থাকার পর যখন দ্বিতীয় প্রকাশনায় যাত্রা শুরু করে এ লেখাটি তখন পুষ্পের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিলো। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের পর এটিকে এখানে সন্নিবেশিত করা হলো)*

পুষ্পের প্রিয় বন্ধুরা!

মাঝখানে কয়েক বছর পার হয়ে গেছে। তোমরা যারা শিশু ছিলে তারা এখন কিশোর, আর কিশোররা যুবক। এমনই হয়, এভাবেই জীবন গড়িয়ে যায়, অনেকটা আমাদের অজান্তেই। হারিয়ে যাওয়া সময় তো আর ফিরিয়ে আনা যায় না! তাই সে দুঃখ করে লাভ নেই। আমরা শুধু চেষ্টা করতে পারি সামনের সময়টুকু যেন হারিয়ে না যায়।

আচ্ছা, একটা কথা জানতে বড় ইচ্ছে করে। এ ক'বছরে তোমাদের বয়সে যেমন পরিবর্তন এসেছে, শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে তারুণ্য ও যৌবন, তেমনি তোমাদের কলমেও কি কিছু পরিবর্তন এসেছে? তোমাদের কলমেরও কি শৈশব পার হয়েছে? তোমাদের কলমও কি তারুণ্য ও যৌবনের ছোঁয়া পেয়েছে? যদি বলো, হাঁ, তাহলে বলবো, এ সময়গুলো বৃথা যায় নি। আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা করো, ১ বলবো, শীত ও শরতের প্রতিকূলতায় আমার পুষ্প হারিয়ে গেলেও চেষ্টা করেছি, আমি যেন হারিয়ে না যাই। প্রতিদিন কিছু না কিছু লিখেছি, যাতে পুষ্প যখন ফিরে আসবে তখন যেন আমার কলম সচল থাকে এবং নতুন উদ্যমে আমি পুষ্পের সেবা করতে পারি। ২

তোমরা যারা পুষ্পের উপদেশ মনে রেখেছো, মনে রেখে প্রতিদিন পিছনের পুষ্প পড়েছো এবং নিয়মিত রোযনামচা লিখেছো, আমি চোখ বন্ধ করে বলতে পারি, বয়সের মত তোমাদের কলমেও পরিবর্তন এসেছে। আশা করি, এখন তোমরা আরো বেশী করে পুষ্পের কাছ থেকে নিতে পারবে এবং পুষ্পকে দিতে পারবে। আরো আশা করি যে, তোমাদের কলমের এখন আর তত মেরামতের প্রয়োজন নেই।

তবে নতুন বন্ধুদের জন্য আজকের মজলিসে ৩ বানান সম্পর্কে দু'একটি কথা বলি। কারণ বানানের দুর্বলতা থেকে আমাদের কলম যেন মুক্ত হতেই চায় না। আমার মেয়ে বলে দারুণ কথা, বানানের ভুল নাকি আমাদের কলমের সঙ্গে আঠার মত লেগে আছে, আসলেও তাই। তবে আঠাটা ছাড়াতে হবে; যেভাবেই হোক ছাড়াতেই হবে, নইলে যে লজ্জাটাও আমাদের সঙ্গে আঠার মত লেগে থাকবে! কাঁঠালের মৌসুম কিছু দিন হলো শেষ হয়েছে। কিন্তু পুরো মৌসুম আমার মাদরাসার ছেলেরা কাঁঠাল খেয়েছে চন্দ্রবিন্দু ছাড়া, আমার ছেলেটিও। জানি না, তোমরা কে কীভাবে খেয়েছো। একদিন দেখি, পাঁচজন মিলে বড়সড় এক কাঁঠাল নিয়ে বসেছে এবং যথারীতি তাদের কাঁঠালেও চন্দ্রবিন্দু নেই! ভিতরের কোষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় বললো, দন্ত্য-স। আমি বললাম, আগে লোগাত দেখো, তারপর কোষ মুখে দাও, কিন্তু তারা লোগাত না দেখে আন্দাযে ধরে নিলো তালব্য-শ। এসব দেখে আমার বড় কষ্ট হয়। বানানের বিশুদ্ধতা হলো ভাষার একেবারে প্রাথমিক স্তর। সেটাই এখনো আমরা পার হতে পারলাম না।

'শুদ্ধ' অনেকে অশুদ্ধ করে লেখে, তুমি দেখে নাও, ভুল করো না।

যখন দেখি তোমরা 'অক্ষুন্ন' লেখো আমি তখন ভীষণ মনঃক্ষুণ্ন হই। একটি মেয়ে লিখেছে, আমরা মেয়েরা যদি ইলম অর্জন না করি তাহলে বিশ্বের বুকে ইসলামের মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকবে কীভাবে? শোনো মেয়ে, তুমি যদি 'অক্ষুণ্ন' লেখো তাহলেই আমাদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকবে।

আমার এক ছাত্র লেখা শেখার 'ভিশন' চেষ্টা করছে; আমার তাতে কখনো ভীষণ হাসি পায়, কখনো পায় ভীষণ কান্না। টেলিভিশনের ভিশন, আর চেষ্টার ভীষণ তো এক নয়। আচ্ছা আরেকটা কথা, ভীষণ ও ভূষণ দু'টোতেই কিন্তু মূর্ধন্য-ষ। কথাটা কেন বললাম জানো, সেদিন এক মেয়ে 'ভুশন' লেখে ভীষণ লজ্জা পেয়েছে। লজ্জা অবশ্য মেয়েদের ভূষণ, তবে তা বানান ভুলের লজ্জা নয়। শুধু 'ষ' ভুল হলেও কথা ছিলো, দীর্ঘ-ঊকারেও ছিলো ভুল।

আরেকজন লিখেছে, জীবনপথের পাথেয় বইটি তার খুব 'মনপুত'। এমন বানান-ভুল আমার কিন্তু মনঃপূত নয়। আরেকজন তো 'সমশ্যা' লিখে আমাকে রীতিমত সমস্যায় ফেলে দিয়েছে। তার চিঠিতে ঠিকানা ছিলো না, থাকলে তাকে জানাতে পারতাম যে, সমস্যা যদি 'শ' দিয়ে লেখো তাহলে ভবিষ্যতে অনেক সমস্যা হবে। 'স' দিয়ে লিখলে সমস্যা তো হবেই না, বরং পিছনের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তোমাদেরকে আর বকেঝকে লাভ কী, আমি নিজেই তো এই সেদিন পর্যন্ত 'নিরব' লিখেছি, এখন অবশ্য একেবারে 'নীরব' হয়ে গেছি। এমনকি আমার 'শ্বাস-নিঃশ্বাসে'ও অসুবিধা ছিলো। তালব্য শয়ে ব ছিলো না, এক বানান-ডাক্তার চিকিৎসা করেছিলেন।

**তুমি** যদি 'হিংশা' লেখো, তোমার বাড়ীর ষাঁড়গরুটাও তোমাকে হিংসা করে শিং **দিয়ে** গুঁতো দেবে এবং সেই গুঁতোয় অবশ্যই চন্দ্রবিন্দু থাকবে। তখন যদি বলো, **এই** বলদ, 'সিং' দিয়ে গুঁতো দিস কেন? ষাঁড়টা কী বলবে জানো! বলবে, তোমার **'সিং'** ঠিক করার জন্য।

**অনেকে** ঈর্ষা করে। বানানটা অবশ্য ঠিক আছে, তবে ঈর্ষা করা কোন অবস্থাতেই **ভালো** না। বিদ্বেষ সম্পর্কেও একই কথা, বানান ঠিক থাকলেও কাজটা ভালো না। **তুমি** তো লক্ষ্মী ছেলে, তাই না! লক্ষ্মী ছেলে কিন্তু কখনো 'লক্ষি' লেখে না। আমি **কামনা** করি, তোমার কলম যেন 'পরিপক্ক' না হয়ে দিন দিন পরিপক্ব হয়ে ওঠে। **আচ্ছা**, তুমি কি ভূতের গল্প পড়ে ভয় পাও! আমি অবশ্য ভয় পেতাম না। যখন **ছোট** ছিলাম, গভীর রাতে একলা ঘরে ভূতের গল্প পড়েছি, তারপর আরাম সে ঘুমিয়ে পড়েছি; একটুও ভয় করেনি। কী বললে, ভূত আছে বলে বিশ্বাসই করো না! আরে ভাই, একবার শুধু হ্রস্ব-উকার দিয়ে 'ভুত' লিখে দেখো না! ভূতেরা এমন-ভাবে তেড়ে আসবে! তখন টের পাবে, ভূত আছে কি নেই!

তোমরা অনেকে 'হতাসা' লিখে আমাকে হতাশ করছো। একটি ছেলে লিখেছে, **যখন** পুষ্প ছিলো তখন লিখতে খুব উৎসাহ বোধ করতাম। পুষ্প বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আমার মনে 'হতাসা বাসা বেধেছে।' তো এই ছেলেটির মনে হতাসা বাসা বেধেছে দেখে আমার মনে হতাশা বাসা বাঁধতে শুরু করেছে। এককাজ **করো** মনের সব হতাশা দূর করো এবং আশায় বুক বাঁধতে চেষ্টা করো, আর **তাতে** চন্দ্রবিন্দু দিয়ো।

**আরেকটা** কথা, দূরকে যদি 'দুর' লেখো তাহলে তোমার 'হতাসা' বেশী দুরে যাবে **না**, কিছু দূর গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকবে, সুযোগ পেলেই আবার এসে তোমার **মনে** চন্দ্রবিন্দু ছাড়াই বাসা বাঁধতে শুরু করবে। কাজেই সাবধান! ঘাপটি মেরে বসে থাকা, আর ওত পেতে বসে থাকা, অর্থ কিন্তু একই। অর্থাৎ কারো উপর হামলা করার জন্য গোপন স্থানে লুকিয়ে অপেক্ষা করা।

**ঘাস**, ঘষা, ঘুষ ঘুষি। বাব্বা! কী কঠিন কঠিন শব্দ! ঘাস খায় গরুতে ঘোড়াতে। **তবে** সে যুগে ঘাসের বানানে ভুল হলে পাঠশালার পণ্ডিৎ মশাই রেগে গিয়ে **বলতেন**, যা গরুর সঙ্গে মাঠে গিয়ে ঘাস খা, তবু যদি বানানটা ঠিক হয়! এবার **বোঝো**, বানান ঠিক করার জন্য গরুর সঙ্গে মাঠে গিয়ে ঘাস খাওয়া! তবু কি বানান **ঠিক** হয়! এক ছেলে লিখেছে সবুজ ঘা.. থাকগে, ছেলেটাকে লজ্জা দিয়ে কাজ **নেই**। তার চেয়ে এক কাজ করো, ছেলেটাকে বলো, মাথাটাকে দেয়ালের সঙ্গে **মূর্ধন্য-ষ** দিয়ে ঘষা দিতে, তাতে ঘাসের বানানটা যদি মনে পড়ে! আর ঘুষ! সে **বড়** খারাপ জিনিস, হাদীছের কথা, ঘুষখোরের ঠিকানা হলো জাহান্নাম! তবে

লিখতে হবে মূর্ধন্য-ষ দিয়ে, নইলে দেবো কিন্তু নাক বরাবর মূর্ধন্য-ষওয়ালা একটা ঘুষি! না, থাক, ঘোষাঘুষি ভালো কাজ না। ভদ্র ছেলেরা ওটা করে না। আচ্ছা, শোনো, দুষ্ট ছেলেদের কাছেও ঘেঁষবে না কখনো, তাতে তোমাকেও লোকেরা মন্দ বলবে। শোনোনি, সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ! সর্বনাশে তালব্য-শ না দিলে সর্বনাশ! আর স্বর্গের 'ব-ফলায়' যদি হয় ভুল, স্বর্গবাস তো দূরে, স্বর্গের দুয়ারই খোলা হবে কি না সন্দেহ। বিসর্গে কিন্তু ব-ফলা নেই, তবে বিসর্গটা শব্দের বানানে জ্বালায় বড় বেশী! আরেকটা সর্গ আছে বাংলায়, সেটা হলো উপসর্গ, তাতেও ব-ফলা নেই। উপসর্গ মানে হলো, মূল রোগ থেকে সৃষ্ট অন্য রোগ। যেমন যক্ষ্মা হলো মূল রোগ, আর জ্বর ও কাশি হলো তার উপসর্গ। এই সুযোগে যক্ষ্মা ও কাশির বানানটা শিখে ফেলতে দোষ কী! দু'আ করি, আল্লাহ যেন তোমাকে সমস্ত রোগ-শোক থেকে রক্ষা করেন।

উপসর্গের আরেকটা মানে হলো উৎপাত বা উপদ্রব। যেমন শহরে একলোকের বাসায় তিন তিনটি শ্যালক একসঙ্গে গ্রাম থেকে এসে উঠেছে চাকুরির খোঁজে। তাই ভদ্রলোক বললেন, 'এত দিন ছিলাম শান্তিতে। সম্প্রতি এসে জুটেছে কয়েকটি উপসর্গ। বসে বসে শুধু অন্ন ধ্বংস করছে।'

উপসর্গের আরেকটা অর্থ আছে ব্যাকরণে, সেটা না হয় পরে জেনে নিয়ো! কাকে ছোঁ মেরে গোশতা নিয়ে গেছে? নেবেই তো! বাইরে হেঁটে হেঁটে খেতে গেছো কেন। ভালো ছেলেরা তো ঘরে বসে খায়। আচ্ছা, ছোঁ-এর মাথায় চন্দ্রবিন্দুটা আছে কি না দেখো তো! তুমি হাত দিয়ে কিছু ছুঁতে গেলে তাতেও চন্দ্রবিন্দু লাগবে। জানো তো, হিন্দু বড় ছোঁয়াছুঁয়ি মানে। শূদ্রের ছোঁয়া লাগলে ব্রাহ্মণের নাকি জাত যায়। জাত আবার থাকে কীভাবে, যায়ই বা কীভাবে, আল্লাহ মালুম। আমরা ওসব জাতপাত মানি না, তবে শূদ্র আর ব্রাহ্মণের বানানটা মনে রাখার চেষ্টা করি। শূদ্র তো দেখতেই পাচ্ছো, দীর্ঘ-উকার, কিন্তু ব্রাহ্মণ! বড় বিদঘুটে বানান, হ+ম = হ্ম।

'ছ'-এর মাথায় চন্দ্রবিন্দু, এমন শব্দ বাংলাভাষায় কম নয়। বলি কয়েকটা! এই যে শোনো– 'ছাঁকনা বা ছাঁকনি দিয়ে দুধ ছেঁকে নেয়া ভালো।'মা বলে তার ছেলেকে, তুই আমার নাড়ি-ছেঁড়া ধন!' মুজাহিদ শত্রুকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ছেন।' 'গাছের ডালগুলো ছেঁটে দিলে ভালো ফল ধরে।'

ভালো কথা, গাছ বাইতে পারো! কী গাছ? আমগাছ, জামগাছ, পেয়ারাগাছ? সে তো সবাই পারে। ডাবগাছ, তালগাছ, সুপারিগাছের মাথায় যদি গিয়ে বসতে পারো তবেই বোঝবো, তুমি একটা ছেলে! থাক বাবা, অত বাহাদুরিতে কাজ নেই। শেষে পা না, ভেঙ্গে, দোষ দেবে আমার! গাছে চড়তে হবে না, শুধু জেনে রাখো,

গাছের যত নাম আছে সব একসঙ্গে হবে। দেখোই না, উপরে যতগুলো গাছের নাম আছে কীভাবে লেখা হয়েছে। যারা গাছ বাইতে জানে না ওরাই শুধু আলাদা লেখে। এখন বলো দেখি, চারা গাছ কীভাবে লিখবে? কী বললে, একসাথে! নাহ, ঠকে গেলে! চারা গাছ তো নাম নয়। চারা গাছ মানে কচি গাছ, ছোট গাছ। তো একসঙ্গে হবে কেন?

আচ্ছা, আজ পয়লা মজলিসে এ পর্যন্ত থাক, আগামীবার অনেক কথা হবে, ইনশাআল্লাহ।

---

১। এখানে একটা 'তাহলে' ছিলো, কিন্তু সেটার খুব একটা প্রয়োজন নেই। তাই সেটা বাদ দিয়ে শুধু একটি কমা [,] বসিয়ে দিয়েছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'যদি'-এর পর 'তাহলে' বাদ দিয়ে কমা দেয়াই ভালো।

২। আগে ছিলো, পুষ্প যদি কখনো ফিরে আসে, তখন যেন ...। যারা আরবী বালাগাত পড়েছো, তারা তো জানোই 'ইন' ও 'ইযা' অব্যয়দু'টির ব্যবহারগত পার্থক্য! বিষয়টি তোমার কাঙ্ক্ষিত, এটা বোঝাতে হলে 'ইন'-এর পরিবর্তে 'ইযা' ব্যবহার করতে হবে। তো পুষ্পের পুনরাগমন যেহেতু আমার কাম্য ও কাঙ্ক্ষিত সেহেতু 'যদি'-এর পরিবর্তে 'যখন' ব্যবহার করাই সঙ্গত ছিলো। আশ্চর্য, এত বড় একটি অলঙ্কারগত ত্রুটি আগে নযরে পড়েনি। এখান থেকে এটাও বোঝা গেলো যে, আরবী বালাগাতের জ্ঞানটুকু বাংলা সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রেও আমরা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারি।

৩। 'তবে নতুন বন্ধুদের জন্য আজকের মজলিসে বানান সম্পর্কে ...।' এ অংশটুকু আগে ছিলো না। আগে কথাটা শুরু হয়েছিলো এভাবে, 'এখন শুধু বানান সম্পর্কে দু'একটি কথা বলি ...।' আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, যাদের কলমের আর ততটা মেরামতের প্রয়োজ নেই বলে আশা প্রকাশ করা হলো, তাদের ধরেই কেন বানান শেখানো শুরু করলাম? আমার কাছে এর জবাব নেই। অর্থাৎ এখানে লেখার শরীরকাঠামোগত ত্রুটি ছিলো। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার যোগসূত্রটা সুন্দর হয়নি। পরিমার্জনের পর এখন আর ত্রুটি নেই। কিন্তু এত বড় একটা ত্রুটিসহই লেখাট পুষ্পের পাঠকদের সামনে গিয়েছিলো ভাবতেই লজ্জা লাগছে।

# ফ-এ চন্দ্রবিন্দু

আর বলো না কাণ্ড! একেই বোধহয় বলে.কাকতালীয়!১ এক ফাঁকে লোগাত খুলেছিলাম ফাঁকি-তে চন্দ্রবিন্দু আছে কি না দেখতে। তো পড়ে গেলাম চন্দ্রবিন্দুর ফাঁদে। লেগে গেলাম ফয়ে চন্দুবিন্দুওয়ালা শব্দগুলো খুঁজে বের করতে। তাতেই হয়ে গেলো বানানের উপর সুন্দর একটা লেখা! সময় অবশ্য লেগেছে প্রচুর, তার উপর আমার এখন সময়ের বড্ড আকাল, যাক তবু লেখাটা তো হলো! তুমিও পড়ে দেখো।

বলছিলাম ফাঁক ও ফাঁকির কথা। দু'টোতেই চন্দুবিন্দু আছে। পুষ্পের এক বন্ধু আমাকে 'ফাকি' দিতে চেয়েছিলো। তাতে আমার দেখো না, কত বড় লাভ হলো! আমি তো জানি ফাঁকিতে চন্দ্রবিন্দু আছে, তবু লোগাত খুলে নিশ্চিত হতে গেলাম, আর তাতে এই লেখাটির জন্ম! কত লাভ বলো দেখি! অবশ্য আমার লাভ মানে তোমাদেরও লাভ।

ফাঁক মানে দু'টো বস্তুর মাঝখানে শূন্যস্থান। তবে আমরা যে বলি, 'সে খুব ফাঁক তালাশ করে', 'এই ফাঁকে কাজটা করে ফেলো' ইত্যাদি, তো এই ফাঁক অর্থ সুযোগ। ফাঁক-ফোকর, এখানে চন্দ্রবিন্দু আছে, তবে অতি উৎসাহে দু'টো দিয়ে বসো না যেন!

সুযোগ যখন পেয়েছো, ফ-চন্দ্রবিন্দু দিয়ে আরো কিছু শব্দ শোনো। ফাঁড়া কেটে গেছে, মানে বিপদ কেটে গেছে, কিন্তু চন্দ্রবিন্দু না দিলে বিপদ আরো বাড়তে পারে। ফাড়া কাপড় মানে ছেঁড়া কাপড়, তাই না। তো কী দাঁড়ালো, বিপদের ফাঁড়ায় চন্দ্রবিন্দু আছে, কাপড়ের ফাড়ায় নেই. ছেঁড়া কাপড়ে আবার আছে। থানা-ফাঁড়ির ঝামেলায় একবার যে পড়েছে সেই জানে, ভোগান্তি কাকে বলে। তুমি ফাঁড়িতে চন্দ্রবিন্দু অবশ্যই দেবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ তোমাকে থানা-ফাঁড়িতে যেতে হবে না. এমনকি পুলিশের ছায়াও পড়বে না কখনো তোমার উপর

... ফাঁদ পেতে রেখেছে সর্বত্র। শিকারী যেমন ফাঁদ পেতে

**শিকার** ধরে তেমনি বাংলাভাষাটা যেন বানানের ফাঁদে ফেলে আমাদের শিকার করতে চায়। সাবধান, তুমি কিন্তু সেই ফাঁদে কখনো পা-দিয়ো না।

**ফুলে** ফেঁপে কলাগাছ হতে দেখেছো কাউকে! আমি দেখেছি অনেক। হঠাৎ করে (এবং বিশেষভাবে অবৈধ উপায়ে) প্রচুর পয়সার মালিক হলে বলা হয়, লোকটা দেখো, কেমন ফুলে ফেঁপে কলাগাছ হয়েছে! তা হোক, যার যার হিসাব সে দেবে, আমার চিন্তা শুধু ঐ চন্দ্রবিন্দুটা!

**ফাঁপরে** পড়ে যাওয়া মানে মহাদুশ্চিন্তায় বা অস্বস্তিতে পড়ে যাওয়া, ফাঁস ও ফাঁসিতে চন্দ্রবিন্দু দিতেই হবে, নইলে ফেঁসে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা। ফাঁস-এর অর্থ শোনো, 'একসময় পাট ছিলো সোনালী আঁশ, সেই পাট এখন কৃষকের গলার ফাঁস।' বিশ্বাস করে তোমাকে আমার গোপন কথাটা বলেছিলাম, আর তুমি কিনা তা ফাঁস করে দিলে!'

**ফুঁ** মানে ফুৎকার, একফুঁয়ে উড়িয়ে দেয়া মানে সহজে বা অনায়াসে প্রতিপক্ষকে কাবু করা বা তার প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দেয়া, সেটা তুমি পারবে ফুঁয়ে যদি চন্দ্রবিন্দু দাও। ফুঁক মানেও ফুঁ, তবে অনেকে তাতে চন্দ্রবিন্দু না দেয়ার পক্ষে, আমি বলি, চন্দ্রবিন্দু দিয়ো, মাথার উপর চাঁদ-তারা, দেখতে বেশ লাগে। ফোঁকা মানে ফুঁ দেয়া। যেমন, আগুন ফোঁকা, সিগারেট ফোঁকা, বাঁশী ফোঁকা ইত্যাদি। একজন লিখেছেন, 'চুলোয় আগুন ফুঁকে ফুঁকেই আমার আম্মার জীবন শেষ হয়েছে। যখন আমার কিছু সামর্থ্য হলো আম্মার সেবা করার তখনই আল্লাহ আমার মাকে তুলে নিলেন!'

ফেঁকড়া, কেউ লেখে একার দিয়ে, কেউ য-ফলা দিয়ে, যেভাবেই লেখো, মাথার উপর চন্দ্রবিন্দুটা কিন্তু চাই! নইলে বানানভুলের ফ্যাঁকড়ায় পড়ে যাবে। ফ্যাঁকড়া মানে উটকো ঝামেলা, অনাবশ্যক ঝঞ্ঝাট।

হাঁ, এবার এসেছে একটা মজার বানান। এই বানানটাতে কাউকে ভুল করতে দেখলে আমি বেশ মজা পাই। সেটা হলো গাছের পাতা থেকে বৃষ্টির ফোঁটা পড়া, আর গাছের ডাল থেকে, ফোটা ফুল ঝরে পড়া । চন্দ্রবিন্দুর বিষয়টা এখনই বুঝে নাও, নইলে তুমি ভুল করবে, আর আমি মজা পাবো।

ফোঁটা-এর একটি অর্থ হলো 'অতিসামান্য', 'একফোঁটা মেয়ে, কেমন পাকা পাকা কথা!' 'ওর কথা আমি একফোঁটা বিশ্বাস করি না।'

হিন্দু মেয়েরা যে কপালে ফোঁটা দেয় তা তো জানো, আফসোস, আজকাল মুসলিম মেয়েরাও তা অনুকরণ করছে।

**ফোঁড়** মানে যে ছিদ্র, জানো! জানবে কেন, একটা অভিধান তো নেই তোমার ত্রিসীমানায়! সুঁইয়ের ফোঁড়, ছুরির আঘাতে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে ফেলেছে। তোমার চারবছরের বোনটা যে! ওর কান ফোঁড়া হয়েছে, নাক ফোঁড়া হয়েছে?

এখন অবশ্য নাক-ফোঁড়া লাগে না, কারণ নাকফুলই উঠে গেছে, শহর-নগর থেকে তো বটেই, এমনকি পল্লী-গ্রাম থেকেও।

আরেকটা মজার শব্দ হলো ভুঁইফোঁড়, অর্থ যে জানো না, তা আর বলতে হবে না! তুমি শুধু বানানটা বুঝে রাখো, অর্থ আমি বলে দিচ্ছি। শাব্দিক অর্থ হলো, যা ভূমি ফুঁড়ে বের হয়ে এসেছে। যেমন বীজ থেকে অঙ্কুর ভূমি ফুঁড়ে বের হয়ে আসে। রূপক অর্থে এমন কিছুকে বা এমন কাউকে ভুঁইফোঁড় বলে যা হঠাৎ দেখা দিয়েছে, যা বনেদি নয়, ভুঁইফোঁড় সভ্যতা, ভুঁইফোঁড় ধনী। ভুঁই মানে ভূমি, তবে প্রথমটায় হ্রস্ব-উকার, দ্বিতীয়টিতে দীর্ঘ-ঊকার।

মেয়েটার স্বভাব বড় মন্দ, কথায় কথায় ফোড়ন কাটে। ফোড়ন কাটা মানেটা তাহলে কী? টিপ্পনি কাটা, বাঁকা মন্তব্য করা। আরেকটা ফোড়ন আছে, সেটা হলো তরকারী সুস্বাদু করার জন্য ব্যবহৃত মশলা, পাঁচফোড়ন শুনেছো তো! প্রশ্ন হলো, ফোড়নে তো চন্দ্রবিন্দু নেই, তাহলে শব্দটা এখানে কেন? কারণ আর কিছু না, আমি অনেক দিন ভুল করে তাতে চন্দ্রবিন্দু দিতাম, একবার একবন্ধু ফোড়ন কেটে বললো, বড় যে বানান, বানান করো! তোমার অবস্থা দেখি চালনি, আর সুঁইয়ের মত। খোঁচাটা বড় লেগেছিলো, কিন্তু সুযোগটা তো আমিই দিয়েছি! তোমরা মনে হয় খোঁচাটা বুঝতে পারোনি! মানে চালনির তো ছিদ্রের অভাব নেই, সে কিনা সুঁইয়ের দোষ ধরে বলে, কিরে সুঁই, তোর গোড়ায় ছিদ্র কেন! যাক, তোমাদের যেন কেউ এভাবে ফোড়ন কাটতে না পারে।

অনেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, অথচ ক-য়ে চন্দ্রবিন্দু দিলেও ফ-য়ে দেয় না। সেই ফোঁপানো কান্না শুনতে কী যে বিশ্রী!

'আমি ঠাট্টা করে কথাটা বললাম, আর তুমি কিনা ফোঁস করে রেগে গেলে! তোমার এত ফোঁসফোঁসানি আমার ভালো লাগে না, আমিও ফুঁসতে জানি, আমি যদি ফুঁসে উঠি, তুমি পালাবার পথ পাবে না।' এত লম্বা কথা যে, একশ্বাসে পড়া দায়। তো ফোঁস মানে কি? তোমার চিন্তা অর্থ নিয়ে, আমার চিন্তা চন্দ্রবিন্দু! যাক, ফোঁস মানে সাপের গর্জন। যেমন, সাপটা ফোঁস করে ফণা তুললো। সেখান থেকেই কোন মানুষ ক্রুদ্ধ বা ক্ষিপ্ত হলে বলা হয়, লোকটা ফুঁসে উঠেছে। দুঃখ বা ক্ষোভ চাপা দিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলার ক্ষেত্রেও বলা হয়, ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেললো।)

---

১। কাকতালীয় শব্দটাতে বেশ মজা আছে! রূপক অর্থে কাকতালীয় মানে কার্যকারণহীন হঠাৎ সঙ্ঘটিত কোন ঘটনা, বা দু'টো ঘটনার কোন কারণ ছাড়া এমনিতেই মিল হয়ে যাওয়া। শব্দটির জন্ম হয়েছে এভাবে– তালগাছে কাক বসেছে, আর অমনি একটা তাল পড়েছে, যাচ্ছিলো একব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ খেতে। তাল পড়লো তার মাথায়। মাথা গেলো ফেটে, নিমন্ত্রণ খাওয়া উঠলো শিকেয়। তখন থেকে নাকি কাক হলো ব্রাহ্মণের দু'চোখের বিষ। সবদোষ নাকি কাকের! আসলে তো তালটা এমনিতেই পড়তো। কাকের বসা এবং তালপড়াটা হঠাৎ মিলে গেছে এই যা! তখন থেকে আকস্মিক মিলে যাওয়া বোঝাতে বলা হয় কাকতালীয়।

# টি ও টা এবং কি ও কী

আমরা যেখানে সেখানে 'টি' ও 'টা' অব্যয় ব্যবহার করি, আবার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করতে ভুলে যাই। অনেক বড় বড় লেখকেরও এ দুর্বলতা রয়েছে। বাংলায় 'টি'-এর ব্যবহার খুব গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কোথায় 'টি' ব্যবহার করবো, আর কোথায় 'টা'। এ বিষয়ে আমরা মোটেও সচেতন নই। সুতরাং বিষয়টির বিশদ আলোচনা হওয়া দরকার। দুঃখের বিষয়, অনেক কিছুর মত এক্ষেত্রেও আমার নিজেরই জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তাই বলে থেমে থাকা কি ভালো?! তার চেয়ে আমার জানার পরিধিতে যদ্দুর সম্ভব কিছু আলোচনা করাই কি ভালো নয়?! সেই ভালো কাজটাই এখানে করার চেষ্টা করছি।

নীচের বাক্যটা দেখো–

'গোসল সেরে কলসিটি ভরে বধু ঘরে ফিরছিলো।'

'সেরে-ভরে-ঘরে', পরপর এই তিনটি শব্দের বিন্যাস একটি সুন্দর সুরছন্দ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু লেখক 'টি' অব্যয় যোগ করে বাক্যের সৌন্দর্য নষ্ট করেছেন। তিনি যদি 'গোসল সেরে কলসি ভরে বধু ঘরে ফিরছিলো' লিখতেন তাহলে সুন্দর হতো। কেননা 'টি' অব্যয়টি হলো কোন কিছুর প্রতি আলাদাভাবে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। এটি বিশিষ্টতা-নির্দেশক অব্যয়। অথচ এখানে কলসিকে আলাদাভাবে এবং বিশেষভাবে চিহ্নিত করার কোন অর্থবহতা নেই। সুতরাং বিশিষ্টতা-নির্দেশক অব্যয়েরও প্রয়োজন নেই।

পক্ষান্তরে 'জলপূর্ণ কলসিটি কাঁখে করে বয়ে নিতে বধুর কষ্ট হচ্ছিলো।'– এ বাক্যে 'টি' অব্যয়ের প্রয়োজন রয়েছে। কেননা এখানে বিশেষভাবে জলপূর্ণ কলসিটি নির্দেশ করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ লেখক এখানে বধুর কষ্টের কারণটির দিকে পাঠকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে চাচ্ছেন।

ইংরেজীতে 'দি' এবং আরবীতে 'আল'-এর বহুল ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু বাংলায় 'টি' অব্যয় প্রয়োগে সংযম শ্রেয়। তাই সাধারণ ক্ষেত্রে 'ঘরটিতে কোন লোক নেই'

না বলে 'ঘরে কোন লোক নেই' বলা সঙ্গত। তদ্রূপ 'সাথে সাথে কলমটা নিয়ে লিখতে বসে গেলাম' না বলে 'সাথে সাথে কলম নিয়ে লিখতে বসে গেলাম' বলা ভালো। কারণ এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে লিখতে বসা, কলমের কথা এসেছে প্রসঙ্গত। 'সাথে সাথে লিখতে বসে গেলাম' বললেও বক্তব্যে বিঘ্ন ঘটতো না।

'বলটি রাশেদের দিকে এগিয়ে দিলাম, সে বলটি নিয়ে গোলপোস্টের দিকে ছুটে গেলো।'– এখানে দ্বিতীয় 'টি' বাদ দেয়া ভালো। কারণ 'টি' না বললেও বোঝা যাবে যে, রাশেদ ছুঁড়ে দেয়া বলটি নিয়েই ছুটে যাচ্ছে, অন্য কোন বল নিয়ে নয়। সুতরাং এখানে বিশিষ্টতা-নির্দেশক অব্যয়ের ব্যবহার বাহুল্য হবে।

'আমার কলম হারিয়ে গেছে' এবং 'আমার কলমটি হারিয়ে গেছে' এ বাক্যদু'টির ব্যবহারক্ষেত্র পৃথক। প্রথম বাক্যের উদ্দেশ্য হলো৷ সাধারণভাবে 'কলম হারিয়ে যাওয়া'র খবর দেয়া। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বাক্যের উদ্দেশ্য হলো আমার কলমই যে হারিয়েছে সেটা বিশেষভাবে বলা। কিংবা হারিয়ে যাওয়া কলমটির কোন বিশেষত্ব ছিলো, তা বোঝানো। অথবা এজন্যও হতে পারে যে, কলমটি শ্রোতার কাছে পরিচিত।

উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার হলো যে, নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক 'টি' অব্যয় প্রয়োগের আগে ভেবে নিতে হবে যে, আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য কী? তাতে 'টি' অব্যয়ের অনিবার্যতা বা প্রসঙ্গতা রয়েছে কি না?

***

টি ও টা-এর মধ্যে ব্যবহারগত পার্থক্যও রয়েছে। একটির স্থানে অন্যটি ব্যবহার করলে অনেক সময় কথার মূল উদ্দেশ্যই বিঘ্নিত হতে পারে। সুতরাং আমাদের সবার ভালোভাবে জানা থাকা দরকার, কোথায় ব্যবহার করবো 'টি', আর কোথায় করবো 'টা'।

বিষয়টি আমি নিজেও এখনো ভালোভাবে আত্মস্থ করে উঠতে পারিনি। তাই প্রায়ই আমার এমন হয় যে, কোন একটি স্থানে একবার একরকম ভেবে 'টি' বসাই, তারপর আবার অন্যরকম ভেবে 'টা' যোগ করি। বাংলাভাষার দুর্ভাগ্য এই যে, এ ভাষার 'সুপুত্র'রা সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দী হৈচৈ ও শোরগোল করেছেন এবং বাগানের ফুল ছিঁড়েছেন প্রচুর এবং ভাষাবিষয়ক বিভিন্ন 'প্রকল্প'-এর স্বাদ ভোগ করেছেন আরো প্রচুর, কিন্তু ভাষাজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করার জন্য 'সাধনা' বলতে যা বোঝায় তা কিছুই করেননি।

যাক, মোটামুটি বলা যায়, ক্ষুদ্রতা বা অন্তরঙ্গতা বা স্নেহ বোঝাতে 'টি' ব্যবহার করা হয়। পক্ষান্তরে বড় বা অনাদৃত বস্তু বোঝাতে 'টা' ব্যবহৃত হয়। তাই কলসিটি এবং কলসটা বলা হয়; কলসিটা এবং কলসটি বলা হয় না। কারণ কলসি

হচ্ছে ছোট, আর কলস হচ্ছে বড়। সুতরাং প্রথমটির সঙ্গে হবে 'টি', আর দ্বিতীয়টার সঙ্গে 'টা'।

আদৃত ও অনাদৃত-এর উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'বইটি তো বেশ চমৎকার!' এবং 'বইটা একদম বাজে'! কেউ যদি উল্টো করে বলে, 'বইটা তো বেশ চমৎকার' এবং 'বইটি একদম বাজে' তাহলে বেশ চমৎকার ভুল হবে এবং কথাটা একদম বাজে হবে! একই কারণে তোমাকে বলতে হবে, 'এই ছেলেটি লেখা-পড়ায় বেশ ভালো, ঐ ছেলেটাও ভালো ছিলো, কিন্তু অসৎ সঙ্গে মিশে একদম বখে গেছে'।

বড়-ছোট, প্রিয়তা-অপ্রিয়তা কিছুই যদি বোঝানো উদ্দেশ্য না হয়, বরং সাধারণ-ভাবে বস্তুটা নির্দেশ করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে সেক্ষেত্রে 'টা' ব্যবহার করতে হবে। যেমন– 'টুপিটা মাথায় দাও' বললে টুপিটির প্রতি বক্তার বিশেষ ঝোঁক বোঝা যাবে। পক্ষান্তরে বিশেষ কিছু বোঝানো উদ্দেশ্য না হলে 'টুপিটি মাথায় দাও' বলতে হবে। তদ্রূপ নীচের বাক্যদু'টি সম্পর্কেও একই কথা–

(ক) এখানেই তো রেখেছিলাম, কলমটা গেলো কোথায়?! (খ) হারিয়ে যাওয়া কলমটি পেয়েছি।

'আরিফ ছেলেটা ভালো/মন্দ'। এখানে আরিফের প্রতি প্রিয়তা ও আদর, বা অপ্রিয়তা ও অনাদর কিছুই বোঝানো উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু তার অবস্থা বোঝানো। তাই এখানে 'টা' ব্যবহার করা হয়েছে।

'বসন্ত ঋতুটা বড় আরামের' বাক্যে শুধু বসন্ত ঋতুর অবস্থা বোঝানো উদ্দেশ্য। প্রিয়তা বোঝানো উদ্দেশ্য হলে অবশ্যই বলতে হবে, 'বসন্ত ঋতুটি'।

'হিংসা জিনিসটা ক্ষতিকর' বাক্যটি সম্পর্কে দু'রকম ব্যাখ্যাই হতে পারে। অর্থাৎ বলা যায় যে, এখানে শুধু হিংসার ক্ষতিকরতা সম্পর্কে বলাই উদ্দেশ্য, হিংসার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য নয়। আবার দ্বিতীয়টিও উদ্দেশ্য হতে পারে। এক্ষেত্রে বক্তার উদ্দেশ্য বুঝতে হবে পূর্বাপর থেকে। 'ঢাকা শহরটা দিন দিন বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে' বাক্যটি সম্পর্কেও একই কথা।

নামের সঙ্গে টি ও টা যুক্ত হয় না, তবে বক্তার মনের বিশেষ কোন ভাব বোঝানোর জন্য যুক্ত হতে পারে। যেমন, 'বশিরটা গেলো কোথায়?!' এ বাক্যে বোঝা যায় যে, বশিরের অনুপস্থিতির প্রতি বক্তার বিরক্তি রয়েছে। পক্ষান্তরে 'বশিরটি বেশ কর্মঠ' বাক্যে বোঝা যায় যে, বশিরের প্রতি বক্তার বিশেষ প্রীতি রয়েছে।

অবশ্য এই সব ভাব প্রকাশের জন্য সম্মানিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে 'টি' বা 'টা'-এর ব্যবহার চলবে না।

নীচের বাক্যটা দেখো–

'শত্রুরা ত্রিশটি লাশ রেখে পালিয়ে গেলো।'

এখানে 'টি'-এর পরিবর্তে 'টা' হওয়াই সঙ্গত ছিলো। তাছাড়া 'রেখে' শব্দটার ব্যবহার স্থান-কাল-উপযোগী হয়নি। কেননা তাড়াহুড়া ও ভয়-ভীতির সময় মানুষ

রেখে যায় না, ফেলে যায়।
একজন ভালো লেখক একটি জাতীয় দৈনিকে তার নিয়মিত কলামে লিখেছেন, 'প্রতিষ্ঠানটি রসাতলে গিয়েছে'। স্বাভাবিক নিয়মে এখানে 'টা' ব্যবহার করার কথা। অবশ্য যদি প্রতিষ্ঠনটির প্রতি অন্তরের টান বোঝানো উদ্দেশ্য হয় তাহলে ভিন্ন কথা। 'সরকারের বেপরোয়া কর্মকাণ্ডে দেশটি শেষ পর্যন্ত গোল্লায় যাবে' যদি কেউ লেখে তাহলে বলতে হবে, তার লেখাটাই গোল্লায় যাচ্ছে।

***

তুমি কি এখন পড়বে? তুমি কি এখন খাবে? মানে পড়বে কি না এবং খাবে কি না জানতে চাওয়া হচ্ছে। উত্তর হাঁ, কিংবা না। এক্ষেত্রে হবে 'কি'। সে কি বাজারে গিয়েছে? উত্তর হাঁ, অথবা না।
তুমি এখন কী পড়বে? তুমি এখন কী খাবে? মানে পাঠ্যবিষয়টি কী হবে এবং কোন্ বস্তুটি খাবে, তা জানতে চাওয়া হচ্ছে। উত্তরে বলতে হবে, বই পড়বো, পত্রিকা পড়বো, বা ভাত খাবো, রুটি খাবো, ইত্যাদি। আরো উদাহরণ, কী চাও তুমি আমার কাছে? কী ভাবছো এ বিষয়ে। এখানে 'কী' হবে।
বাহ, কি সুন্দর! 'কি'-এর উপর জোর দেয়া উদ্দেশ্য নয়, তাই 'কি' হবে। কী সুন্দর আজকের সূর্যাস্তের দৃশ্য! 'কী'-এর জোর দেয়া উদ্দেশ্য। তাই 'কী' হবে। অর্থাৎ জোর দেয়া উদ্দেশ্য হলে 'কী', অন্যথায় 'কি'।
আমার আব্বা অসুস্থ। বলিস কী! কী অসুখ? দীর্ঘ-ঈকার হবে। বিস্ময় প্রকাশের জন্য বলি, 'সেকি মজার কাণ্ড!' আবার, 'সে কী ভয়াবহ দৃশ্য!' দু'খানে দু'রকম।
০ মত মানে কোন বিষয়ে ধারণা বা অভিমত। (উচ্চারণে হসন্ত আছে, তবে লেখায় থাকে না)
মত মানে অনুযায়ী। (উচ্চারণে হসন্ত নেই, যেমন, আমার সুবিধামত সময়ে যাবো। একসঙ্গে হবে) এদু'টি স্থানে ও-কার নেই। পক্ষান্তরে সিংহের মতো গর্জন করে উঠলো। এখানে মত মানে সদৃশ বা ন্যায়। ও-কার থাকা ভালো।

---

১। এখানে 'প্রথম বাক্যটির উদ্দেশ্য হলো' বলার তেমন প্রয়োজন নেই। কারণ আগেই একবার নির্দিষ্টতা-নির্দেশক অব্যয় 'টি' ব্যবহৃত হয়েছে। তবে 'প্রথমটির উদ্দেশ্য হলো'- এরূপ হতে পারে।

# পৃথক শব্দ ও যুগ্মশব্দ

কোন এক বইয়ে পড়েছিলাম, 'এখন আমরা যেমন প্রতিটি শব্দ আলাদা করে লিখি, তখন এমন করে লেখা হতো না, বরং মাঝখানে[1] ফাঁক না রেখে হরফগুলো একের পর এক লিখে যাওয়া হতো। যেমন, 'আমার নাম খালেদ' না লিখে লেখা হতো 'আমারনামখালেদ'। স্বভাবতই এরকম লেখা পড়তে অনভিজ্ঞ ও সাধারণ পড়ুয়া লোকদের বিস্তর পাঠবিভ্রাট ঘটতো[2]। তাই পরবর্তী কালে দুই শব্দের মধ্যে ফাঁক দিয়ে লেখার নিয়ম প্রচলিত হয়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুই শব্দকে এখনো একত্রে লেখা হয় শব্দদ্বয়ের অর্থগত বন্ধন ও একাত্মতার বিষয়টি লক্ষ্য রেখে। এসম্পর্কিত নিয়ম না জানার কারণে আমরা অনেকেই নির্ধারিত ক্ষেত্রেও ফাঁক দিয়ে লিখি। যেমন আমরা লিখি– 'হত্যা কারী', 'বিপদ গ্রস্ত', 'অভিজ্ঞতা সম্পন্ন', 'বিপদ সমূহ' ইত্যাদি। অথচ বিশুদ্ধ লেখা হলো, হত্যাকারী, বিপদগ্রস্ত, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও বিপদসমূহ।

প্রথমেই সসংকোচে স্বীকার করে নিচ্ছি যে, এ বিষয়ে আমি নিজেও এখনো পূর্ণরূপে অবগত নই, বরং এ ক্ষেত্রে এখনো আমার বিস্তর ভুল হয়, তবে আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি এ সম্পর্কে অধিক থেকে অধিকতর অবগতি অর্জনের জন্য। তো এ পর্যন্ত আমি যদ্দুর জেনেছি তা এখানে তোমাদের সামনে তুলে ধরতে চাই।

(ক) যে শব্দ স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হয় না, বরং পূর্ববর্তী শব্দকে আশ্রয় করে ব্যবহৃত হয় সেটাকে পূর্ববর্তী শব্দের সঙ্গে যুক্তরূপেই লেখার নিয়ম। কারী ও গ্রস্ত শব্দ দু'টি স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হয় না, বরং পূর্ববর্তী কোন শব্দকে আশ্রয় করে ব্যবহৃত হয়, তাই তা যুক্তরূপে লিখিত হয়। কল্যাণকামী, শান্তিকামী, ঢাকাগামী যান, উন্নয়নগামী দেশ ইত্যাদি সম্পর্কে একই কথা।

সাপেক্ষ শব্দটির অর্থ, কোনকিছুর উপর নির্ভরশীল। -কারী, -কামী, -গামী, -গ্রস্ত ইত্যাদির মত এ শব্দটিও স্বতন্ত অর্থে ব্যবহৃত হয় না, বরং পূর্ববর্তী কোন শব্দকে আশ্রয় করে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং একই কারণে তা একসঙ্গে লেখা হবে। যেমন, সময়সাপেক্ষ (অর্থাৎ সময়ের উপর নির্ভরশীল)। তদ্রূপ ব্যয়সাপেক্ষ, পরিশ্রম-সাপেক্ষ, ব্যাখ্যাসাপেক্ষ ইত্যাদি।

গুলো, রাজি, দল, সমূহ– এগুলো হচ্ছে বহুবচনের চিহ্ন। আরো সোজা কথায় এগুলো পূর্ণ শব্দ নয়, শব্দাংশ। সুতরাং এগুলো পূর্ববর্তী শব্দের সাথে যুক্তরূপে লিখিত হবে। যেমন, বইগুলো বেশ সুন্দর। আকাশে তারকারাজি ঝলমল করছে। যাত্রীদল এগিয়ে চলেছে।

আবার দেখো, 'আমার সামনে সমূহ বিপদ' এবং 'দল ছেড়ে একা চলো না' বাক্যদু'টিতে সমূহ ও দল হচ্ছে পূর্ণ শব্দ এবং স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত; তাই এখানে শব্দদু'টি আলাদা লেখা হয়েছে।

অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চিকিৎসক, মানসম্পন্ন লেখা– এখানে -সম্পন্ন শব্দটি পূর্ণ শব্দ নয় এবং স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত নয়, বরং অন্য শব্দকে আশ্রয় করে ব্যবহৃত শব্দাংশ; তাই তা যুক্তরূপে লিখিত হবে। পক্ষান্তরে 'তিনি এক সম্পন্ন পরিবারের সন্তান' এবং এ কাজটি খুব অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়েছে' বাক্যদু'টিতে সম্পন্ন শব্দটি যথাক্রমে সচ্ছল ও সমাপ্ত বা পূর্ণতাপ্রাপ্ত অর্থে ব্যবহৃত একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণ শব্দ; তাই শব্দটি আলাদা লেখা হবে।

(খ) স্বতন্ত্র দু'টি শব্দ যখন একত্র হয়ে নতুন অর্থ প্রকাশ করে তখন তা একসঙ্গে লিখিত হয়। উদাহরণ দেখো–

বহু মানে অনেক এবং বচন মানে মুখের কথা। যেমন, 'আমি তাঁহার পবিত্রমুখ হইতে অমূল্য বহু বচন (বা বহু অমূল্য বচন) শ্রবণ করিয়াছি' এ বাক্যে বহু ও বচন শব্দদু'টি আলাদা আলাদা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; তাই আলাদা লেখা হয়েছে। পক্ষান্তরে 'বাংলায় বহুবচন বোঝানোর জন্য বেশ ক'টি শব্দাংশ রয়েছে।' এ বাক্যে বহু ও বচন শব্দদু'টি একত্র হয়ে একশব্দের রূপ ধারণ করেছে এবং একটি নতুন অর্থ প্রকাশ করেছে। তাই শব্দদু'টি একত্রে লেখা হয়েছে।

মোটকথা, আলাদা আলাদা দু'টি শব্দ একত্রে নতুন অর্থ প্রদান করলে যুক্তরূপে লিখিত হবে। যেমন রাষ্ট্র ও দূত মিলে রাষ্ট্রদূত, (নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত পরিচয়পত্র পেশ করেছেন।) যম ও দূত মিলে যমদূত, (যমদূত যখন আসে, কাউকে না কাউকে সঙ্গে নিয়ে যায়।) খেলা ও ধূলা মিলে খেলাধূলা, (তার সারাটা দিন কেটে যায় খেলাধূলায়।) প্রেম ও পূর্ণ মিলে প্রেমপূর্ণ, (সে তার দিকে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো।) অর্থ ও পূর্ণ মিলে অর্থপূর্ণ, (সে তার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো।) রহস্যপূর্ণ হাসি সম্পর্কে একই কথা। বেশ ও ভূষা মিলে বেশভূষা, জন ও সাধারণ মিলে জনসাধারণ।

-জীবী শব্দটি সর্বদা যুক্তরূপেই লিখিত হবে। যেমন, দীর্ঘজীবী, পেশাজীবী, চাকুরীজীবী ও বুদ্ধিজীবী। জীবী ও জীবিকা-এর বানানপার্থক্য মনে রাখতে হবে, আর 'বানানপার্থক্য' একত্রে লিখতে হবে। মতপার্থক্য সম্পর্কে একই কথা, তবে 'দুটি বিষয়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্য রয়েছে', আলাদা হবে।

'আত্ম' ও তার পরবর্তী শব্দ যুক্তরূপে লিখিত হবে। যেমন, আত্মতুষ্টি, আত্মরক্ষা,

আত্মকেন্দ্রিক ইত্যাদি। শত্রুর হামলার মুখে 'আত্ম রক্ষা' করতে গেলে নির্ঘাত মারা পড়তে হবে। কারণ মাঝখানে যে রয়ে গেছে বিরাট ফাঁক!

আত্মপক্ষ সমর্থন করা, আত্মস্বার্থ রক্ষা করা, আত্মঘাতী হামলা করা– এধরনের আরো উদাহরণ দেয়া যায়।

(গ) না, নি, নে– এগুলো কেউ আলাদা লেখেন, কেউ একসঙ্গে। আবার কেউ 'না' আলাদা লিখলেও 'নি' ও 'নে' একত্রে লেখেন। যেমন, আমি এ কাজ করি না। আমি যাই নি/ যাইনি। আর পারছি নে ভাই! আমি কিছুতেই সেখানে যাচ্ছিনে। ইত্যাদি। ওখানে যাস নে ভাই! এই 'নে' অবশ্য আলাদা হবে। কারণ এটি মূলত না-এর ভিন্ন রূপ।

আসলে যে কারণে করি না (আলাদা) লেখা হয়, সে কারণেই করি নি এবং করি নে (আলাদা) লেখা উচিত। তবে আমি নিজে 'করি না' (আলাদা) এবং 'করিনি' (একত্রে) লিখে আসছি, বলা যায়, অনেকটা যুক্তির বাইরেই। আসল কথা হলো, এগুলো সাহিত্যের মূল বিষয় নয়। যেভাবেই লেখা হোক, সর্বক্ষেত্রে একরকম লিখলেই হলো। সাহিত্যের আসল বিষয় হলো উপস্থাপন সুন্দর হওয়া এবং ভাষা হৃদয়গ্রাহী হওয়া। সুতরাং আমাদের সমস্ত মনোযোগ সেদিকেই নিবদ্ধ থাকা উচিত।

(ঘ) 'বসেছিলো' এবং 'বসে ছিলো', এক নয়। বসেছিল মানে বসার কাজটা করেছিলো। যেমন, 'সে আমার পাশে বসতে কিছুতেই রাজী হচ্ছিলো না, অনেক অনুরোধ করার পর অবশ্য বসেছিলো, তবে খুব অস্বস্তিবোধ করছিলো।' দ্বিতীয় উদাহরণ, 'একদিন সে দেশের ক্ষমতায় বসেছিলো। (এখানে অবশ্য বসা শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত, অর্থাৎ লাভ করেছিলো।)

পক্ষান্তরে 'বসে ছিলো' মানে বসা অবস্থায় ছিলো। যেমন, তোমার অপেক্ষায় সে অনেক্ষণ সেখানে বসে ছিলো, কিন্তু তুমি কথা দিয়েও সময়মত আসোনি। বসে থাকতে থাকতে তার বিরক্তি ধরে গিয়েছিলো।

'আমি শুয়েছিলাম', আর 'আমি শুয়ে ছিলাম' এক নয়। শুয়েছিলাম মানে শোয়ার কাজটি করেছিলাম। যেমন, 'তখন অভাব-অনটনে আমি এমনই জর্জরিত ছিলাম যে, ঢাকা শহরে না থাকার জায়গা ছিলো, না খাওয়ার ব্যবস্থা। তখন বহু দিন আমি ফুটপাতে খোলা আকাশের নীচে শুয়েছিলাম।'

পক্ষান্তরে শুয়ে ছিলাম মানে শোয়া অবস্থায় ছিলাম। যেমন, গভীর রাত। ঘরে একা শুয়ে ছিলাম। ঘুম আসছিলো না; এমন সময় সে অস্ত্র হাতে আচমকা আমার ঘরে ঢুকে পড়লো।'

'এ চাকুরীতে তুমি কত দিন লেগে ছিলে?' 'আর বলো না, প্রায় বিশবছর লেগে ছিলাম, কিন্তু কোন উন্নতি হলো না।'

'এ কাজে একটানা এত দিন লেগে ছিলাম বলে আজ এতটা দক্ষতা অর্জন করতে

পেরেছি।' (এদু'টি উদাহরণে আলাদা লেখা হয়েছে।)
পক্ষান্তরে, 'কেন তুমি খামোখা আমার সাথে লেগেছিলো?' 'সত্যি করে বলো তো, আমি তোমার সাথে লেগেছিলাম, না তুমি আমার সাথে লেগেছিলে?' (এখানে একত্রে লিখতে হবে।)
একটি দেয়াল আরেকটির সঙ্গে লেগে ছিলো। এখানে লেগে ছিলো মানে সংলগ্ন অবস্থায় ছিলো।
পক্ষান্তরে 'বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে গিয়ে লেগেছিলো'– এখানে লেগেছিলো মানে খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিলো।
'খেয়েছিলো' এবং 'খেয়ে ছিলো', এক নয়। যেমন 'সেদিন দুপুরের খাবার সে আমার সঙ্গে খেয়েছিলো।' (অর্থাৎ আহারকর্মটি সম্পন্ন করেছিলো।) তদ্রূপ 'বিজ্ঞাপনের চটকদার ভাষায় আমি ধোকা খেয়েছিলাম।' (এখানে খেয়েছি শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ ধোকার শিকার হয়েছিলাম।) পক্ষান্তরে 'আমি তিন দিন শুধু কলের পানি খেয়ে ছিলাম।' আলাদা হবে, কারণ অর্থ হলো, খাওয়া অবস্থায়।
এক ভিখারিণী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো। রাস্তায় একটি টাকা পড়ে ছিলো। ভিখারিণী 'টাকাটা তুলে নিলো। (অর্থাৎ পড়া অবস্থায় ছিলো।) ঐ টাকাটা নিশ্চয় কোন একজন পথচারীর পকেট থেকে পড়েছিলো।' (অর্থাৎ পতিত হয়েছিলো) 'কঠিন রোগে অনেক দিন হাসপাতালে/বিছানায় পড়ে ছিলাম।' 'বিভিন্ন সমস্যার কারণে আমি প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম।' এজাতীয় শব্দগুলো সম্পর্কে একই কথা। অর্থাৎ যদি বিশেষ অবস্থা বোঝায়, আলাদা হবে, আর শুধু ক্রিয়া বুঝালে একত্রে হবে।
আরো দেখো, 'আল্লাহর রহমতে তিনি অনেক দিন বেঁচে ছিলেন।' 'চিকিৎসকের এমন অমার্জনীয় অবহেলা ও গাফলতির পরো সেবার রোগিটি বেঁচেছিলো আল্লাহর খাছ রহমতে।' 'রোগীটি বেঁচেছিলো আল্লাহর রহমতে, তারপর বিজ্ঞ চিকিৎসকের আন্তরিক প্রচেষ্টায়।' 'অনেক টাকা নিয়ে গিয়েছিলাম, বাজার শেষে মাত্র একশটি টাকা বেঁচেছিলো। (অর্থাৎ অবশিষ্ট ছিলো।), 'খেয়ে না খেয়ে ছিলাম, তাই এতদিন এই টাকাগুলো বেঁচে ছিলো, কিন্তু অসুখে পড়ে সবটাকা শেষ হয়ে গেছে।' (অর্থাৎ অবশিষ্ট অবস্থায় ছিলো)
'আমি তোমার অপেক্ষায় পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম।' 'হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম, অনেক কষ্ট করেও দাঁড়াতে পারছিলাম না; শেষে লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়েছিলাম।
(ঙ) 'যথা যোগ্য বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করছি।' আসলে লিখতে হবে যুক্ত অবস্থায়, অর্থাৎ 'যথাযোগ্য'। তদ্রূপ 'যথা সাধ্য' ও 'যথা পূর্ব' লেখা ঠিক নয়, বরং 'যথাসাধ্য' ও 'যথাপূর্ব' লিখতে হবে। যথাক্রমে, যথাসময়ে, যথারীতি, যথাসম্ভব,

যথাসর্বস্ব ইত্যাদি সম্পর্কে একই কথা। এটাই হচ্ছে এ বিষয়ে যথাশব্দ (একত্রে)। পুষ্পের এক বন্ধু লিখেছিলো, 'এভাবে আমার যথা সর্বস্ব খোয়া গেলো।'ছেলেটিকে কাছে বসিয়ে সম্পাদনা করছিলাম, মৃদু হেসে বললাম, 'খোয়া যাবেই তো, যথা ও সর্বস্ব শব্দদু'টি একসঙ্গে ছিলো না যে!'

'এই ভাব ও মর্ম প্রকাশ করার জন্য এটাই হচ্ছে যথাশব্দ,' (এখানে 'যথা' শব্দটি সঠিক বা উপযুক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।) পক্ষান্তরে 'যথা' শব্দটি যেমন বা যেখানে, এ অর্থে ব্যবহৃত হলে পৃথক লেখা হবে। যেমন, আমি তার এই বদ অভ্যাসটি সংশোধন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। ঐ যে বলে, 'যথা পূর্বং তথা পরম'! দ্বিতীয়টির উদাহরণ হলো, 'যথা নারী তথা হানাহানি।'

(চ) যে দু'টি শব্দের মধ্যে মূলত ইযাফতের সম্পর্ক ছিলো সে শব্দদু'টি একত্রে লিখতে হবে, যেমন– 'যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা চরম কাপুরুষতার প্রমাণ। মুসলমান কখনো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে পারে না।' (অর্থাৎ যুদ্ধের ক্ষেত্র থেকে।)

অঙ্কশাস্ত্র (অর্থাৎ অঙ্কের শাস্ত্র), জীবনকাহিনী, (অর্থাৎ জীবনের কাহিনী) কলমযুদ্ধ (অর্থাৎ কলমের যুদ্ধ, বা কলম দ্বারা পরিচালিত যুদ্ধ), কলমসৈনিক, (অর্থাৎ কলমের সৈনিক, বা যে সৈনিক তরবারি দ্বারা নয়, বরং কলম দ্বারা বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।)। একজন লেখক লিখেছেন, 'যে কোন মূল্যে আমাকে হতে হবে জীবন সংগ্রামের বিজয়ী সৈনিক।' বইটি পড়ার সময় আমি মন্তব্য করেছিলাম, তুমি যদি বিজয়ী সৈনিক হতে চাও তাহলে জীবন ও সংগ্রাম, একত্রে লিখতে হবে। আলাদা লিখে কখনো জীবনসংগ্রামে জয়ী হতে পারবে না।

'নির্মাণব্যয়' একসঙ্গে হবে; কারণ মূল রূপটি হলো, নির্মাণের ব্যয়। নির্মাণে মূর্ধন্য-ণ কেন হবে, আশা করি, তুমি তা বুঝতে পারছো! অনেকেই কিন্তু 'নির্মান' লিখে বসে থাকে। আবার ব্যয় শব্দটিতে আকার দেয়ার লোকও একেবারে কম নয়। এভাবে 'নির্মান ব্যায়' কত বেড়ে যায়, চিন্তা করে দেখো!

(চ) মাতৃ ও পিতৃ শব্দদু'টি অন্যশব্দকে আশ্রয় করে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং যুক্তরূপে লিখিত হবে। তাছাড়া এখানে মূল রূপটি হলো ইযাফতের। যেমন, মাতৃভাষা, (অর্থাৎ মায়ের ভাষা।) পিতৃঋণ, (অর্থাৎ পিতার ঋণ) মাতৃমমতা, পিতৃস্নেহ, মাতৃগর্ভ, পিতৃঔরস এবং মাতৃভূমি ও পিতৃভূমি সম্পর্কে একই কথা।

আমাদের দেশে একজন 'অগ্নিকন্যা' আছেন, অর্থাৎ আগুনের কন্যা। আমাদের মত তিনিও মাটির মানুষ হয়ে অগ্নিকন্যা হলেন কিভাবে, আল্লাহ মালুম। আগুনের তৈরী তো হলো 'জনাব' ইবলিস!

হিন্দুমতে সীতাকে নিজের সতিত্ব প্রমাণ করার জন্য অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিলো,

তুমি কখনো কোন বিষয়ে অগ্নিপরীক্ষা দিতে যেয়ো না, তবে যখন লিখবে, একসঙ্গেই লিখবে।

আশা করি, উপরের আলোচনা থেকে বিষয়টি তোমার সামনে মোটামুটি স্পষ্ট হয়েছে। আবারো বলছি, আমি নিজেই এ বিষয়ে খুব বেশী জানি না, তো তোমাদের জানাবো কীভাবে! তবে যদি তোমরা মানসম্পন্ন মুদ্রণের বই পড়ার সময় এদিকে লক্ষ্য রেখে পড়ো যে, দু'টি শব্দকে কোথায় আলাদা লেখা হচ্ছে, আর কোথায় যুক্তরূপে লেখা হচ্ছে, তাহলে যথেষ্ট উপকার পাবে বলে আশা করি। তবে বিদায়ের আগে বলে যাই; মুদ্রণ শব্দটি পরবর্তী শব্দের সঙ্গে যুক্তরূপে লিখতে হবে। যেমন, মুদ্রণপ্রমাদ। ('প্রমাদ' মানে ভুল, অর্থাৎ লেখকের ভুল নয়, ছাপাখানায় মুদ্রণের ভুল।) মুদ্রণব্যয়, মুদ্রণশিল্প ইত্যাদি সম্পর্কে একই কথা। আর মানসম্পন্ন যে একত্রে লিখতে হবে তা তো আগেই বলা হয়েছে

তোমরা ভালো থেকো, আমিও যেন ভালো থাকি, দু'আ করো

---

১। মাঝখানে, মধ্যখানে, মাঝবরাবর, মধ্যপথে ইত্যাদি একসঙ্গে হবে।

২। পাঠবিভ্রাট, মুদ্রণবিভ্রাট, বিদ্যুৎবিভ্রাট ইত্যাদি একসঙ্গে হবে।

৩। পূর্ণতাপ্রাপ্ত, অনুমতিপ্রাপ্ত, সনদপ্রাপ্ত, আদেশপ্রাপ্ত ইত্যাদি একত্রে লিখতে হয়।

# শব্দকে যুক্ত করে লেখার নিয়ম

গত সংখ্যায় যুক্তশব্দ এবং এসম্পর্কিত কিছু নিয়ম ও উদাহরণ আলোচনা করেছি। আমার ধারণা এ বিষয়ে আরো কিছু আলোচনা করা যায়। একটি মজার ঘটনা দিয়ে শুরু করি। টাকা নাকি হাতের ময়লা। কিন্তু আসলে হাতের ময়লা টাকায় লাগে, না টাকার ময়লা হাতে লাগে, সেটা একটা বড় প্রশ্ন। সত্য যেটাই হোক দেশের সরকার যখন টাকশালে টাকা ছাপে তখন সেটা নির্ভুল হতে হয়। টাকায় ভুল থাকা মানে জাতীয় মর্যাদা ও ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়া[1]। তো আমাদের দেশের পুরোনো পাঁচশত টাকার নোটগুলোতে লেখা ছিলো 'বাংলাদেশ ব্যাংক পাঁচ শত টাকা চাহিবা মাত্র ইহার বাহককে দিতে বাধ্য থাকিবে।'

আমার বিবেচনায় 'পাঁচশত' এবং 'চাহিবামাত্র' কথাটি একসঙ্গে লেখা উচিত। কিছুদিন আগে আলোচনা প্রসঙ্গে[2] আমার পরিচিত এক লেখক ভদ্রলোককে বললাম, যিনি জন্মসূত্রে[2] বিশ্বাস করেন যে, 'হুজুর-মাওলানারা' আর যা হোক বাংলা জানেন না। তিনি আমার মন্তব্য 'পত্রপাঠ' প্রত্যাখ্যান করে বললেন, টাকার গায়ে যেভাবে লেখা আছে সেটাই ঠিক। তারা না বুঝে লিখেছেন, এটা ভাবা নিছক মূর্খতা। আমি মৃদু হেসে বললাম, মূর্খতা তো অবশ্যই, যে কোন একপক্ষের। সম্প্রতি সেই ভদ্রলোক মাদরাসাতুল মাদীনায় এসে হাযির। তিনি নতুন ছাপানো পাঁচশত টাকার একটি নোট আমার হাতে দিয়ে বললেন, আপনার কথাই দেখা যাচ্ছে ঠিক। এই দেখুন, নতুন নোটে সংশোধন করে 'পাঁচশত' এবং 'চাহিবামাত্র' যুক্তরূপে লিখেছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে বে-তাকাল্লুফির সম্পর্ক ছিলো; তাই হাসতে হাসতে বললাম, আমি কিন্তু 'চাহিবামাত্র ফেরত দিতে বাধ্য নই।' হুযুর-মাওলানা হয়ে ভুল ধরেছি, সুতরাং এটা আমার পুরস্কার।

এর আগে আরেকটি ঘটনা আছে। ইসলামী ফাউন্ডেশনের এক মজলিসে বাংলাদেশ ব্যাংকের জনৈক কর্মকর্তার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে এ বিষয়ে আমার আলাপ হয়েছিলো। উপরোক্ত ভুলটির প্রতি আমি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। ভদ্রলোক অবশ্য আমার কথা গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে বলেছিলেন। বিষয়টি তিনি যথাস্থানে

পৌঁছে দেবেন। এবং সম্ভবত পৌঁছে দিয়েছিলেন। এরপরই টাকার গায়ের লেখায় এই পরিবর্তন।

তোমরাও পুরোনো ও নতুন পাঁচশত টাকার নোট মিলিয়ে বিষয়টি দেখতে পারো। আমার কথার উদ্দেশ্য হলো, যুক্তশব্দ লেখার বিষয়টি ভালো ভালো লোকেরাও সবসময় রক্ষা করতে পারেন না। তোমরা যদি এখন থেকে মনোযোগী হও তাহলে ভালো ফল পাবে ইনশাআল্লাহ। 'হুযুর-মাওলানা'রা বাংলা জানেন না, এমন 'সত্য' কথাটা অন্তত তোমাদের সম্পর্কে কেউ বলতে পারবে না। তবে সবার কাছ থেকে ওভাবে পুরস্কার আদায় করতে গেলে সমস্যা হতে পারে। হুযুর-মাওলানাদের তো আবার ঐ বদনামটাও আছে!

নীচের বাক্যটি দেখো, 'অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।' ভক্তি জিনিসটা ভালো, কিন্তু অতিভক্তি দেখালে বুঝতে হবে, মনে কোন কুমতলব আছে। তাহলে বোঝা গেলো, অতি শব্দটি এখানে স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, বরং ভক্তি শব্দটিতে নতুন অর্থ ও মাত্রা সৃষ্টি করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং শব্দদু'টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে যুক্তরূপে লিখিত হবে।

পক্ষান্তরে আমি আপনাকে অতি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ... ' এ বাক্যে অতি শব্দটি আনন্দ শব্দটিকে অর্থের নতুনত্ব দান করেনি, শুধু আনন্দের পরিমাণ জানিয়েছে। সুতরাং শব্দদু'টি অর্থগত স্বাতন্ত্র্যের কারণে আলাদাভাবে লিখিত হবে।

'ভোজন দোষের নয়, কিন্তু অতিভোজন দোষের। সুতরাং ভোজন করো, কিন্তু অতিভোজন করো না। অতিভোজনে ভুঁড়ি স্ফীত হয়।' দেখো, অতি শব্দটি এখানে ভোজন শব্দের অর্থে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সুতরাং তা যুক্তরূপে লেখা হবে। পক্ষান্তরে 'এই গাছের আম অতি সুস্বাদু' বাক্যে অতি শব্দটি স্বাদের পরিমাণ বুঝিয়েছে। অর্থাৎ উভয় শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বুঝিয়েছে; তাই তা আলাদা লেখা হয়েছে।

'একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে মা অতি শোকে পাথর হয়ে গেছেন।' আবার কৃত্রিম শোকের দৃষ্টিকটু মাত্রাতিরিক্ততা বোঝানোর জন্য বলা হয়, 'অতিশোকে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ'।

উপরে একই শব্দের সঙ্গে অতি শব্দটি একবার বিযুক্তরূপে, একবার যুক্তরূপে লেখা হয়েছে। কারণটি আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছো।

এভাবেও বলা যায় যে, অতি শব্দটি যখন অনুচিত আধিক্য বোঝায় তখন একত্রে লেখা হয় এবং যখন সীমাবহির্ভূত বোঝায় তখনো একত্রে লেখা হয়, কিন্তু প্রচুর পরিমাণ অর্থে আলাদা লেখা হয়৪। উদাহরণ দেখো–

(ক) অতিকথা, অতিবুদ্ধি ডেকে আনে মহাক্ষতি। অতিচালাকের গলায় দড়ি। অতিদর্পে পতন অনিবার্য। অতিবৃষ্টিতে ব্যাপক ফসলহানি ঘটেছে।

(খ) মানুষের যাবতীয় শক্তি অতিপ্রাকৃতিক শক্তির কাছে অসহায়। আল্লাহর নবী

মহামানব ছিলেন, কিন্তু অতিমানব ছিলেন না। অতিমাত্রা প্রয়োগের কারণে রোগীর মরণাপন্ন অবস্থা।

(গ) এটি অতি অন্যায় কাজ হয়েছে। সে অতি দুঃখী মানুষ। অতি শীঘ্র তুমি বুঝতে পারবে।

নীচের বাক্যদু'টি দেখো–

(ক) এটি অতি পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজ। (খ) অতিপরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়।

'অতি বাড় বেড়ো না' বাক্যে অতি শব্দটি কেউ আলাদা লিখেছেন, কেউ একত্রে।

দাতা শব্দটি দানকারী অর্থে আলাদা লেখা হয়। যেমন, তিনি তো দাতা হাতিমতাঈ। তদ্রূপ বড় দাতা, অকৃপণ দাতা, দাতা দেশ, (দাতা দেশ যা কিছু শর্ত আরোপ করে তা নির্বিবাদে মেনে নিতে হয়।) অকৃপণ দাতা।

পক্ষান্তরে প্রদানকারী অর্থে একত্রে লেখা হয়। যেমন, পরামর্শদাতা, উপদেশদাতা, ঋণদাতা, সাহায্যদাতা, সংবাদদাতা, ইত্যাদি।

দুই শব্দের মাঝে কোন কিছু উহ্য থাকলে একসঙ্গে লেখা হবে। যেমন– সংবাদস্বাধীনতা, (সংবাদের স্বাধীনতা) সমরপ্রস্তুতি, সমরসজ্জা, যুদ্ধপরিস্থিতি, দাঙ্গাপরিস্থিতি, গৃহযুদ্ধ, বিশ্বযুদ্ধ, বিশ্বসংস্থা ইত্যাদি।

(খ) তিনি দেহত্যাগ করেছেন। (অর্থাৎ দেহের ভিতরে যিনি বাস করতেন, তিনি দেহকে ত্যাগ করে স্বর্গে গমন করেছেন।) স্বার্থত্যাগ, গৃহত্যাগ, পক্ষত্যাগ, মর্মস্পর্শী, অতলস্পর্শী, মর্মভেদী, গগনভেদী, ইত্যাদি সম্পর্কে একই কথা।

(গ) কন্যাদান, বিনা মূল্যে ঔষধদান, ধর্মীয় কাজে ভূমিদান ইত্যাদি।

(ঘ) সাহিত্যবিষয়ক লেখা (সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত লেখা)।

অগ্নিবৃষ্টি ও গুলিবৃষ্টি কেন একত্রে হবে বুঝতে পেরেছো? পুলিশের গুলিবৃষ্টির ভিতর দিয়েই মিছিলটি এগিয়ে গেলো। অনলবর্ষী একসঙ্গে হবে। অনলবর্ষী কলম, অনলবর্ষী বক্তা। অনল ও অগ্নি সমার্থক হলেও অগ্নিবর্ষী কলম বা বক্তা-এর ব্যবহার নেই।

## *অন্য প্রসঙ্গ*

বহুবচন-নির্দেশক শব্দ ও প্রত্যয় যোগ করার ক্ষেত্রে আমরা প্রায় ভুল করি। যেমন, স্কুলের সকল ছাত্ররা ক্লাস বর্জন করেছে। এখানে 'সকল' হচ্ছে বহুবচন-নির্দেশক শব্দ। সুতরাং 'রা' প্রত্যয়ের ব্যবহার অর্থহীন। বলা দরকার 'সকল ছাত্র' বা ছাত্ররা সকলে।

আমরা অনেক সময় বলি, 'শুধুমাত্র' একবার তাকে দেখেছি। শুধু ও মাত্র-এর একত্রব্যবহার ঠিক নয়, কিন্তু বেশ চালু হয়ে গেছে। হয় বলবে, শুধু একবার দেখেছি, কিংবা মাত্র একবার দেখেছি।

'অতিথিবৃন্দরা' লিখতে দেখা যায় অনেককে; অথচ 'বৃন্দ' ও 'রা' দু'টোই বহুবচনের প্রত্যয়। লিখতে হবে, 'অতিথিবৃন্দ' বা 'অতিথিরা'। বৃন্দ যেহেতু

বহুবচন-নির্দেশক, সেহেতু তা একসঙ্গেই লিখতে হবে। যেমন, ছাত্রবৃন্দ, নেতৃবৃন্দ, সুধীবৃন্দ ইত্যাদি। 'মণ্ডলী' একই কারণে একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন সুধীমণ্ডলী, শ্রোতামণ্ডলী, নক্ষত্রমণ্ডল।

মণ্ডল শব্দটি গোলক বা গোলাকার স্থান অর্থেও আসে এবং যুক্তরূপে লিখিত হয়। যেমন, ভূমণ্ডল, মুখমণ্ডল, সৌরমণ্ডল। 'নির্দিষ্ট মণ্ডলে/মণ্ডলীতে নিজেকে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করো।' এটি আলাদা হবে।

যদিও মনে হয়, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনেক বলা হয়েছে, তবু অনেক কিছু রয়ে গেছে। আমার যদি আর বলার সুযোগ না হয়, তোমরা কেউ এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ কিছু বলার চেষ্টা করবে, আশা করি।

---

১। ভাবমূর্তি ও ভাবমর্যাদা নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। মূর্তি দেখে ভাবমূর্তির প্রতি অনেকের অনাগ্রহ, কিন্তু আমাদের বোঝা উচিত যে, সব মূর্তিই মূর্তি নয়। সুতরাং যারা 'ভাবমূর্তি' তাদের প্রতি রুদ্রমূর্তি ধারণ করা ঠিক নয়। তবে মূর্তি বা মর্যাদা, যাই লেখো, একসঙ্গে লিখতে হবে।

২। আলোচনাপ্রসঙ্গে সম্ভবত একসঙ্গে লেখা সঙ্গত। কথাপ্রসঙ্গে সম্পর্কেও একই কথা। বিষয়টি সম্পর্কে আমার কিছুটা দ্বিধা রয়েছে। 'বিভিন্ন প্রসঙ্গে' অবশ্য আলাদা হবে। আগেও বলা হয়েছে, কিছু ক্ষেত্রে একত্রে লেখা অপরিহার্য এবং তাতে কারো দ্বিমত নেই। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্র এমন যে, দু'দিকেরই সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে দেখা যায় একেক লেখক একেক রকম লিখছেন, এমনকি একেক অভিধানে একেকরকম লেখা হচ্ছে। তো ঐসব ক্ষেত্রে যে কোন একটি অনুসরণ করা যেতে পারে।

৩। একত্রে হবে। বংশসূত্রে, খরিদাসূত্রে, আত্মীয়তাসূত্রে, ইত্যাদি সম্পর্কে একই কথা। বিভিন্ন সূত্রে, কোন্ সূত্রে, এই সূত্রে, এগুলো অবশ্য আলাদা।

৪। সীমাবহির্ভূত, অধিকার বহির্ভূত, চুক্তিবহির্ভূত ইত্যাদি একত্রে হবে।

# বানানের অন্যান্য প্রসঙ্গ

যাওয়া শব্দটির বিভিন্ন রূপান্তরে আমাদের ভুল হয়। যেমন, 'খেলতে গিয়ে পা ভেঙ্গেছে' কথাটি শুদ্ধ, কিন্তু ভালো ভালো মানুষ এখন লিখছেন, 'খেলতে যেয়ে পা ভেঙ্গেছে'। এভাবে লিখতে 'যেয়ে' অজ্ঞাতসারে আসলে তিনি কলম ভাঙ্গছেন। এতে লাভ কী! 'গ'-কে একেবারে বাদ তো তারা দিতে পারছেন না। তাদেরও তো 'গিয়েছে' লিখতে হয়। তারা কি 'যেয়েছে বা যিয়েছে' লিখবেন? কে জানে, হয়ত কিছুদিন পর এটাও শুরু হয়ে যাবে!

'নারী' বানান ঠিক আছে, কিন্তু 'নারীত্ব' ঠিক নয়। লিখতে হবে 'নারিত্ব'। যেমন, নারী এখন তার নারিত্ব বিসর্জন দিয়ে নিজেকে পণ্যসামগ্রীতে পরিণত করেছে।১ মাদার তেরেসা দেবীতুল্য ছিলেন কি না, তা প্রশ্নসাপেক্ষ, কিন্তু অনেকেই তার উপর 'দেবীত্ব' আরোপ করছেন, যা ঠিক নয়। 'দেবিত্ব' আরোপ করলে অন্তত ভাষাগত দিক থেকে আপত্তি ওঠবে না।

তিনি আমার দীর্ঘ দিনের সাথী; তার সাথিত্ব আমার জন্য গর্বের বিষয়। (কিন্তু সাথীত্ব! গর্ব করার মত বিষয় কিছুতেই নয়।) সবসময় সববিষয়ে তিনি আমার বিরোধী; তার যুক্তিহীন বিরোধিতা সহ্য করা আমার জন্য কষ্টকর। (কিন্তু 'বিরোধীতা সহ্য করা আরো কষ্টকর।)

সহজে বোঝানোর জন্য আরবী ব্যাকরণের পরিভাষা ব্যবহার করে এভাবে বলা যায়–

'যাত মা'আল ওয়াছফ' (গুণসহ ব্যক্তি বা বস্তু)-এর ক্ষেত্রে সবসময় দীর্ঘ-ঈকার হবে। পক্ষান্তরে যখন সেটাকে 'ওয়াছফফে মহয' (শুধু গুণ)-এ রূপান্তরিত করা হবে তখন হ্রস্ব-ইকার হবে। উদাহরণ–

-মুখী (অতীতমুখী), -মুখিতা। -কামী (উন্নয়নকামী), -কামিতা। -ভাষী (মৃদুভাষী), -ভাষিতা। প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, প্রতিবাদিতা। -বাদী (বিপ্লববাদী), –বাদিতা। মন্ত্রী হলেও মন্ত্রিত্বের বড়াই তার মধ্যে একেবারে নেই।

তদ্রূপ সঙ্গী, কিন্তু সঙ্গিনী। অহঙ্কারী, কিন্তু অহঙ্কারিণী। অধিকারী, কিন্তু

অধিকারিণী। বনবাসী, কিন্তু বনবাসিনী। (সীতাকে বনবাসে পাঠানো হলেও তিনি বনবাসীনী ছিলেন না।) অনেক ডিগ্রীধারী লোক লিখছেন, 'আমার গর্ভধারীণী মা'। নারী শব্দটিতে দীর্ঘ ঈকার, কিন্তু শেষে 'গণ' যুক্ত হলে লেখা হয়, 'নারিগণ'; একই ভাবে 'নারিদের'।

মন্ত্রী, কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ/মন্ত্রিসভা। নারী, কিন্তু নারিসংঘ, নারিসভা। (এটা সম্ভবত সংস্কৃত সমাসের সমস্যা, বাংলাভাষার ব্যাকরণে অনেকে এটাকে টেনে আনতে চান না। তারা বলেন, নারীসভা, মন্ত্রীসভা লেখা যায়। আসলেই তো, ঝামেলা বাড়িয়ে কী লাভ!

## *অন্য প্রসঙ্গ।*

'খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠা ভালো। তাই আমি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠি। তুমি কখন ঘুম থেকে ওঠো? আজ কখন উঠেছো? কেন সে না বলে উঠে গেলো? একঘণ্টার আগে এখান থেকে কারো ওঠাউঠি নেই।'

ওঠা, নাকি উঠা? উঠেছে, নাকি ওঠেছে? ওঠে, নাকি উঠে? উঠি, নাকি ওঠি? এসব নিয়ে অনেকেই বেশ সমস্যায় (ভোগে), আমিও এত দিন (ভুগেছি), এখনো (ভুগছি), আমি চাই, তোমরা যেন না (ভোগো)। উপরের বাক্যগুলো ভালোভাবে দেখলে (ভোগান্তি) একটু হলেও কমবে। নইলে আরো দীর্ঘ দিন (ভোগবে), (ভুগতেই) থাকবে। এই (ভোগাভুগির) শেষ হবে না।

আরো দেখো–

কুয়া থেকে পানি তোলা কঠিন কাজ, তবু আমি প্রতিদিন অনেক পানি তুলি। কয় বালতি পানি তোলো? আজ কয় বালতি তুলেছো? কেন এত কষ্ট করে পানি তুলতে গেলে! তাছাড়া এত বড় বালতি দিয়ে পানি তুলছো কেন? কুয়া থেকে পানি তোলাতুলি নিয়ে ঝগড়া লেগেই থাকে।

আরো দেখো–

ফুল ফোটা, ফুল ফোটে, ফুল ফোটবে। ফুল ফুটেছে, ফুল ফুটছে। ফুল ফুটতে অনেক দিন লাগে। ফুল ফোটে, আর ফুটেই ঝরে যায়।

বড়দের কথা শোনা দরকার। কথা শোনে, কথা শোনবে, কথা শোনো। কথা শুনেছি, কথা শুনছি। কথা শুনতে গিয়ে বিপদে পড়েছি। দু'পক্ষের কথা শোনাশুনি করে লাভ নেই; এতে মীমাংসা হবে না।

আরো দেখো–

অনেক ছোটাছুটি করেও কাজ যোগাড় করতে পারিনি, ঘোরাঘুরি করেই সারাটা দিন পার হলো, কাজের কাজ কিছুই হলো না। ভুল বোঝাবুঝির অবসান হওয়া দরকার। দু'পক্ষের মধ্যে খুব ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি হলো। হিন্দুদের সমাজে ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটা খুব জটিল। পরস্পর জুতা ছোঁড়াকে এখন জোতাজুতি লেখা হচ্ছে।

শব্দপ্রয়োগটা ভালোই। তবে ঘটনা ঘটেছিলো জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকাররমে, এই যা দুঃখ।

আকাশে উড়াল দিয়েছে। উড়ছে। উড়ে যাচ্ছে। উড়তে দেখেছি। মানুষ ডানা মেলে দূর আকাশে উড়ে বেড়ানোর স্বপ্ন দেখতো। উড়ে উড়ে দূর আকাশে চলে যায়। এত উঁচুতে ওড়া সম্ভব নয়। বিমান এখনই আকাশে ওড়বে। পাখীরা বাগানে ওড়াউড়ি করছে। উড়ি উড়ি করছে, কিন্তু এখনো উড়েনি।

গরীবের কপালে এর চেয়ে বেশী কিছু জোটে না। কিছু একটা কাজ জুটিয়ে নাও। চেষ্টা করতে থাকো, কিছু না কিছু জুটে যাবে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সামান্য একটি চাকুরি জুটেছে। মানুষ তো এখন ক্ষুধার অন্ন জোটাতেই দিশেহারা।

এই জিনিসটা বাজারে অনেক খুঁজেছি, পাইনি; আবার খুঁজতে বের হয়েছি। খুঁজে বের করতেই হবে, নইলে ঘরে আর রক্ষা নেই। তুমি নাকি আমাকে খুঁজছো? হাঁ, সেই সকাল থেকে তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। তুমি আমাকে খোঁজবে কেন, আমি কি নিখোঁজ হয়ে গেছি!

---

১। খাদ্যসামগ্রী, বিলাসসামগ্রী, ক্রীড়াসামগ্রী ইত্যাদি একসঙ্গে হবে, তবে 'বিভিন্ন সামগ্রী', আলাদা

# বিসর্গসমাচার

বিসর্গ আসলে বাংলাভাষার বিষয় নয়, সংস্কৃত থেকে আগত বিষয়। আগে শব্দের শেষেও বিসর্গ ব্যবহার করা হতো, এখন বাদ দেয়া হয়েছে। ক্রমশঃ/ক্রমশ। তো কেন আগে লেখা হতো, এখন কেন বাদ দেয়া হলো, পণ্ডিতরাই ভালো বলতে পারবেন। তবে তারা যদি দয়া করে শব্দের মাঝখান থেকেও সেটাকে বিদায় করতেন, খুশির কারণ হতো। পুনঃপুন, এখানে শেষে বিসর্গ নেই, কিন্তু মাঝখানে আছে। 'প্রাতে এসো', বিসর্গ নেই। প্রাতঃস্মরণীয়, প্রাতঃকালীন, প্রাতঃস্নান, এসব স্থানে দু'টি শব্দ একত্র হওয়ায় বিসর্গ মাঝখানে আটকা পড়ে গেছে। কিন্তু প্রাতরাশ (সকালের নাস্তা) থেকে কিভাবে বিসর্গ ছাড়া পেলো বোঝা গেলো না।

অধঃ মানে নীচে, নিম্নে। অধঃপতন, কিন্তু অধোগতি অর্থাৎ প্রথমটির বিসর্গ বহাল থাকবে, দ্বিতীয়টিতে বিসর্গ ও-কারে রূপান্তরিত হবে। দু'রকম কেন? অধোপতন, কিংবা অধঃগতি নয় কেন, পণ্ডিতদের কাছে জবাব নেই, তবে আমাদের তো মান্য করে চলতেই হবে।

মনঃ মানে মন। মনঃকষ্ট, মনঃক্ষুণ্ন, মনঃসংযোগ, মনঃপুত ইত্যাদি, কিন্তু মনোযোগ, মনোনিবেশ, মনোদুঃখ ইত্যাদি। একরকম হলে ক্ষতি কী ছিলো? মনঃপ্রাণ সঁপে দেয়া, আর মনে প্রাণে কাজ করা।

দুঃসময় (উচ্চারণ, দুস্‌সময়), দুঃশাসন (উচ্চারণ, দুশ্‌শাসন) দুঃসাধ্য, দুঃসাহস, দুঃস্বপ্ন। এসব স্থানে বিসর্গ বহাল থাকবে এবং উচ্চারণে পরবর্তী বর্ণের রূপ লাভ করবে। যেমন, দুঃসাহস (দুস্‌সাহস)

নিঃ+শব্দ= নিঃশব্দ, নিঃশঙ্ক, নিঃশেষিত, নিঃশ্বাস, নিঃসন্দেহ, নিঃসঙ্গ, নিঃসন্তান, নিঃসম্বল, নিঃস্পন্দন, নিঃস্পৃহ, নিঃস্ব। এসব ক্ষেত্রে বিসর্গ বহাল থাকে এবং উচ্চারণে পরবর্তী বর্ণের রূপ লাভ করে। যেমন নিঃশেষ (নিশ্‌শেষ)।

'নিঃ' যেমন একটি উপসর্গ তেমনি একটি উপসর্গ হলো 'নি' এটি অতিশয্য, অভাব, সাদৃশ্য ইত্যাদি ভাবপ্রকাশক। তাতে বিসর্গ নেই। যেমন, নি+খিল= নিখিল (নিখিল বিশ্ব), নিখুঁত, নিখোঁজ। নিঘুম ও নির্ঘুম দু'রকম আছে। একটি

**হলো** নি+ঘুম, অন্যটি নিঃ+ঘুম।

**নিঃ**+ঠুর= নিষ্ঠুর, ধনুঃ+টঙ্কার= ধনুষ্টঙ্কার, নিঃ+ক্রিয়= নিষ্ক্রিয়, নিঃ+ফল= নিষ্ফল, **নিষ্কাম**, নিষ্কম্প, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্কলুষ, নিষ্কণ্টক, আবিষ্কার (আবিঃ+কার), চতুষ্কোণ (**চতুঃ**+কোণ) (বিসর্গটি মূর্ধন্য-ষয়ে রূপান্তরিত) চতুঃ+পদ= চতুষ্পদ, দিকচতুষ্টয় (**চারোটি** দিক, চতুঃ+তয়= চতুষ্টয়), আমরা বলে থাকি, 'চতুর্পার্শ্বে', এটা ভুল, প-**এর** ক্ষেত্রে বিসর্গ কখনো রেফ হবে না। সঠিক সন্ধি হলো চতুঃ+পার্শ্ব= চতুশ্‌পার্শ্বে

**নিঃ**+ তরঙ্গ= নিস্তরঙ্গ, নিঃ+তেজ= নিস্তেজ, মনঃ+তত্ত্ব= মনস্তত্ত্ব

**নিঃ**+অক্ষর= নিরক্ষর, নিঃ+অপরাধ= নিরপরাধ। নিরহঙ্কার, নিরলঙ্কার, নিরলস।

**নিঃ**+আকার= নিরাকার, নিঃ+আনন্দ= নিরানন্দ, নিরাপদ, নিরামিষ, নিরাশ্রয়।

**অন্তঃ**+ আত্মা= অন্তরাত্মা, দুঃ+আশা= দুরাশা, দুরারোগ্য।

**নিঃ**+উৎসাহ= নিরুৎসাহ, নিঃ+উত্তর= নিরুত্তর, নিরুপায়, নিরুপদ্রব, নিরুদ্বেগ।

**পুনঃ**+উত্থান= পুনরুত্থান, পুনঃ+আবৃত্তি= পুনরাবৃত্তি, পুনরুক্তি, পুনরুজ্জীবিত।

**নিঃ**+গুণ= নির্গুণ, নিঃ+জন= নির্জন, নির্জীব, নির্ঝঞ্ঝাট, নির্দয়, নির্বংশ, নির্বিঘ্ন, **নির্বাক**, নির্বিচার, নির্বুদ্ধিতা, নির্ভয়, নির্লোভ।

**চতুঃ**+গুণ= চতুর্গুণ, চতুঃ+থ= চতুর্থ, চতুর্দশ, চতুর্দিক ঠিক আছে, কিন্তু চতুর্পার্শ্বে **ঠিক** নেই। কারণ প-এর সঙ্গে বিসর্গের সন্ধি হবে শ-দ্বারা, অর্থাৎ চতুশ্‌পার্শ্বে

**দুঃ**+নাম= দুর্নাম, দুর্গম, দুর্লভ। দুর্ভাবনা।

**অন্তঃ**+যামী= অন্তর্যামী। অন্তঃ+কলহ= অন্তর্কলহ।

**পুনঃ**+মিলন= পুনর্মিলন। পুনঃ+জন্ম= পুনর্জন্ম। পুনর্জীবন, পুনর্মিলন।

**মনঃ**+রম (আনন্দদায়ক)= মনোরম (মনে আনন্দ আনয়নকারী), মনোরাজ্য, **মনোজগৎ**, মনোনিবেশ, মনোবিজ্ঞান।

**ততঃ**+অধিক= ততোধিক (তার চেয়ে অধিক বা বেশী), ইতঃ+মধ্যে= ইতোমধ্যে (**'ইতিমধ্যে'** সংস্কৃতের নিয়মে ভুল হলেও বাংলায় বহুল প্রচলিত এবং গ্রহণযোগ্য।)

**ইতঃ**+পূর্বে ( বিসর্গ বহাল থাকবে। 'ইতিপূর্বে' সংস্কৃতির ব্যাকরণে ভুল হলেও **বাংলায়** গ্রহণযোগ্য)

**অধঃ**+বদন= অধোবদন (লজ্জায় বা সংকোচে মাথা নীচু করে আছে এমন।) **অধোমুখ** (একই অর্থে।)

**বয়ঃ**+বৃদ্ধ= বয়োবৃদ্ধ।

**সদ্য** মানে এই মাত্র, নতুন। মূলে বিসর্গ আছে, তাই সদ্যমুক্ত যেমন বলা হয় **তেমনি** সদ্যঃ+মুক্ত= সদ্যোমুক্ত বলা হয়। সদ্যোজাত (এই মাত্র জন্মলাভকারী), **সদ্যোজাগ্রত**।

**দুঃ**+চরিত্র= দুশ্চরিত্র, নিঃ+চেষ্টা= নিশ্চেষ্টা (নিশ্চেষ্ট বসে থেকো না), পুনশ্চ।

**নিঃ**+ছিদ্র= নিশ্‌ছিদ্র, নিঃ+চিন্তা= নিশ্চিন্তা, নিশ্চিন্ত, নিশ্চল।

**নিঃ**+রোগ= নীরোগ, নিঃ+রস= নীরস, নিঃ+রক্ত= নীরক্ত, নিঃ+রত= নীরত

(মানে বিরত, আমরা অনেকে অতিশয় রত অর্থে এটাকে ব্যবহার করে থাকি; যেমন আমি দিন-রাতে জ্ঞানসাধনায় নিরত আছি। এটা ভুল। সঠিক ব্যবহার, তাকে একাজ থেকে যে কোন মূল্যে নিরত করতে হবে।) নিঃ+রব= নীরব (লজ্জার কথা কী বলবো, এই বিঃসর্গের কুহেলিকায় পড়ে কিছুদিন আগেও আমি 'নিরব' লিখতাম।), নি+অতিশয়= নিরতিশয় (এটা নীরতিশয় নয়।)

নভ মানে আকাশ, তবে নভোমণ্ডল কেন? বিসর্গের কারিশমা! নভ-তে বিসর্গ আছে। সুতরাং নভঃ+মণ্ডল= নভোমণ্ডল, নভোযান, নভোচারী-এর শুদ্ধরূপ হলো নভশ্চারী, তবে অশুদ্ধরূপটি বহুল প্রচলতি বলে গ্রহণযোগ্য।

বহিঃ+আগত= বহিরাগত, বহিরাবরণ, বহিঃ+গমন= বহির্গমন, বহির্জগৎ, বহির্ভাগ, বহির্বিভাগ, বহির্বাণিজ্য, বহিঃ+চর= বহিশ্চর (যে বাইরে বিচরণ করে বেড়ায়), বহিঃ+কৃত= বহিস্কৃত।

আশা করি, আমাদের এ আলোচনার ফলে বিসর্গের হাতে নাজেহাল হওয়া থেকে কিছুটা হলেও তোমরা রক্ষা পাবে। অন্তত আমরা যেমনটা নাজেহাল হয়েছি তোমরা তেমন হবে না।

# সেই ভুল, সেই গাফলত!

'দুঃখ' দিয়েই আজকের লেখাটি শুরু করি। সামান্য কিছু সুখের বিষয় ছাড়া আমার শিক্ষাজীবন ও শিক্ষক-জীবন, সেখানে অবশ্য দুঃখেরই ছড়াছড়ি। তবে আল্লাহর শোকর, এই দুঃখেরা আমার কলমকে অনেক ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ করেছে। বলতে গেলে আমার কলমের যা কিছু 'সুর ও গান' তা দুঃখেরই দান, সুখের অবদান সামান্য। কিন্তু স্বভাব থেকে উর্ধ্বে তো আর উঠতে পারি না! এটাই মানুষের স্বভাব ও ফিতরত। মানুষ কামনা করে শুধু সুখ; দুঃখকে সে এড়িয়ে যেতে চায়।

তো আমার দুঃখের কথাটা হলো, মাদরাসাতুল মাদীনাহর চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষের ছেলেরা একটি দেয়ালিকা বের করে। দেয়ালিকাটির শিরোনামের নীচে লেখা রয়েছে, 'বিশ্বাস দীপ্ত সাহিত্যের প্রতিশ্রুতি।' তোমরা কী বলো, বিশ্বাস ও দীপ্ত শব্দদু'টিকে সংযুক্তরূপে 'বিশ্বাসদীপ্ত' লেখা উচিত নয়?! হলে কী হবে; উচিত কাজটাই মানুষ ভুলে যায়!

দরসে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, দু'টি শব্দকে পৃথক ও সংযুক্তরূপে লেখার নিয়ম কোথাও তোমরা পড়েছো কি না। প্রায় চল্লিশজন তালিবে ইলমের মধ্যে দু'জন, হাঁ, মাত্র দু'জন বললো, পুষ্পে 'এসো কলম মেরামত করি' বিভাগে বিষয়টি তারা পড়েছে। ঐ দু'জনকে বললাম, 'বিশ্বাসদীপ্ত, একসঙ্গে হবে না কি আলাদা, যুক্তিসহ বলো। ওরা দু'জন বা অন্য কেউ বলতে পারলো না।

দুঃখিত হওয়ার মত ঘটনা, কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, দুঃখিত হবো না। কারণ শুরু থেকেই আমি স্থির করে নিয়েছি, 'আমিই হবো আমার ছাত্র এবং আমিই হবো আমার পাঠক।' সুতরাং কেউ যদি আমার লেখা না পড়ে এবং তা থেকে কিছু না শেখে তাতে আমার দুঃখ কিসের! আমি আমার কাজ করে যাবো। আমি লিখবো এবং সেই লেখা আমি নিজেই পড়বো; পড়বো এবং নিজেই নিজের কাছ থেকে শিখবো!

কিন্তু শোনো বন্ধু! 'বিশ্বাসদীপ্ত সাহিত্যের প্রতিশ্রুতি' রক্ষা করার জন্য শুধু কিছু কথা ও কিছু বাক্য যথেষ্ট নয়। এ দেশে, এই সমাজে যদি তোমরা ইসলামী

**শিক্ষার ভবিষ্যত নিরাপদ করতে চাও এবং বাতিল ও আহলে বাতিলের মোকাবেলায় নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চাও তাহলে** (মাওলানা সৈয়দ **আবুল হাসান আলী নদবী [রহ.]-এর ভাষায় বলতে চাই–)** বাংলাভাষা ও **সাহিত্যের ইমামত ও নেতৃত্ব অবশ্যই তোমাদের দখল** করতে হবে এবং সেজন্য **অক্লান্ত সাধনা ও মোজাহাদায় আত্মনিয়োগ কর**তে হবে।

**দু'চারজন আলিম কিছু লিখছেন বলেই বাংলাসাহিত্যে**র কেল্লা ফতে হয়ে গেছে **ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করার সুযোগ নেই। কেননা** তিক্ত সত্য এই যে, সাহিত্যের **প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া তো দূরের কথা; আমাদের** লেখা তো এখনো **ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য পর্যায়ও অতিক্রম করতে পা**রেনি। অথচ হযরত আলী নদবী (র.) আমাদের প্রশ্ন করেছেন, কেন বাংলাদেশের আলিমদের মাঝে 'ট্যাগোর'-এর সমকক্ষ কোন সাহিত্যিকের আবির্ভাব হলো না?!'

তিনি বলেছেন, 'আপনাদের তো এমন সাহিত্য অর্জন করতে হবে যাতে শিক্ষিত-সমাজ অন্যদের ছেড়ে শুধু আপনাদের সাহিত্য নিয়েই বিভোর থাকে।'

কিন্তু কোন দেশে, কোন সমাজে এত বড় বিপ্লব তো শুধু কথা দিয়ে হয় না। এ জন্য চাই দিন-রাতের এবং যুগযুগের সাধনা ও মোজাহাদা! হে বন্ধু, এ সাহিত্য-সাধনায় পুষ্প হতে পারে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সুতরাং অন্তরঙ্গভাবেই পুষ্পকে গ্রহণ করো।

সে যাক, পিছনের কথায় ফিরে আসি। দু'টি শব্দকে পৃথকভাবে এবং যুক্তরূপে লেখার ক্ষেত্রে আমরা অনেকেই ভুল করি এবং বেশি পরিমাণেই করি। 'বিশ্বাস ও দীপ্ত'-কে যুক্তরূপে বিশ্বাসদীপ্ত লিখতে হবে। কেননা এর মূল রূপ হলো বিশ্বাস দ্বারা দীপ্ত। দু'টি শব্দের মাঝখানে যদি কোন শব্দ উহ্য থাকে তাহলে শব্দদু'টি একসঙ্গে লেখা হয়। (ব্যাকরণের ভাষায়, 'সমাসবদ্ধ শব্দ একত্রে হয়।) যেমন, বাতিলের বিরুদ্ধে আমরা কলমের যুদ্ধে বা কলম দ্বারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি। তাই আমরা যুক্তরূপে এভাবে লিখে থাকি–

'বাতিলের বিরুদ্ধে আজকের কলমযুদ্ধে আমাদের জয়ী হতেই হবে।'

আরো উদাহরণ, ধানক্ষেত, (ধানের ক্ষেত)। 'কৃষকের ঘাম ঝরে ধানক্ষেতে, গোলা তার পড়ে থাকে শূন্য! মুখের হাসি তার কেড়ে নেয়, কখনো প্রকৃতি, কখনো মধ্যস্বত্বভোগিদের দুষ্কৃতি।

মুক্তিযুদ্ধ মানে মুক্তি লাভ করার যুদ্ধ। সুতরাং তা একত্রে হবে। (যদিও সব বাহিনী যেমন শান্তিবাহিনী নয়, তেমনি সব যুদ্ধ নয় মুক্তিযুদ্ধ।)

বৃষ্টিবিন্দু (বৃষ্টির বিন্দু) রক্তবিন্দু, (রক্তের বিন্দু), খাদ্যকণা, (খাদ্যের কণা) যৌবনকাল, (যৌবনের কাল) সৃষ্টিরহস্য, (সৃষ্টির রহস্য)। জ্ঞানসাগর, বিদ্যাসাগর, জ্ঞানপ্রদীপ, আলোকপ্রদীপ, বিদ্যাধন। আলোকচিত্র, আলোকসজ্জা, আলোকসংকেত ইত্যাদি একসঙ্গে হবে।

বহুল শব্দের ক্ষেত্রে মাঝখানে হাইফেন লাগে না। যেমন, জীবনকাহিনী, কিন্তু স্বল্পব্যবহৃত ক্ষেত্রে হাইফেন দেয়া হয়। যেমন, শৈশব-কাহিনী। মরহুম সৈয়দ আলী আহসান একটি লেখায় একই বাক্যে 'জীবনকাহিনী ও শৈশব-কাহিনী' লিখেছিলেন যথাক্রমে হাইফেন ছাড়া এবং হাইফেনসহ। বাক্যটি এখন মনে নেই, আর খুঁজেও পাচ্ছি না, নচেৎ এখানে তুলে দেয়া যেতো।

'সহ' মানে সঙ্গে। তাই এটি সবসময় একসঙ্গে থাকবে; একটু আগে যেমন দেখতে পেলে। আরো উদাহরণ– যাত্রীসহ, চালকসহ (গাড়ীটি ... ... খাদে পড়ে গেছে।) সহসভাপতি, সহশিক্ষা, সহযাত্রী, সহমর্মী (সহমর্মিতা)। সহধর্মী, সহধর্মিণী।

ভাবে শব্দটি পূর্বের সঙ্গে যুক্তরূপে লিখিত হয়। কেন? ভালো করে জানি না। 'বিভিন্নভাবে' এবং 'ধারাবাহিকভাবে' জানার চেষ্টা অবশ্য করছি। 'কতভাবেই' তো মানুষ চেষ্টা করে, কিন্তু সবাই কি সফলতা লাভ করতে পারে!

সপ্তাহের বিভিন্ন দিনকে বলা হয় 'বার' এবং তা একসঙ্গে। (রবিবার, রোববার, শনিবার) নির্দিষ্ট দিন অর্থেও একসঙ্গে। (আজকে আমাদের হাটবার।) একবার ব্যর্থ হয়েছো বলে হতাশ হয়ো না। এবিষয়ে বারবার চেষ্টা করো, (তবে একসঙ্গে, আলাদা নয়)

রূপে শব্দটি পূর্বের সঙ্গে যুক্তরূপে লিখিত হয়। আশা করি, উদাহরণ তুমি পেয়ে গেছো। তবে নীচের বাক্যটি দেখো, তাতে 'রূপে' একবার যুক্তরূপে, একবার বিযুক্তরূপে এসেছে–

তোমার রূপে সে উন্মাদ হয়ে গেছে। উন্মাদরূপেই হয়ত কাটবে তার বাকি জীবন। নীচের বাক্যটি দেখো–

সে লোকটির গণ্ডদেশে সশব্দে চপেটাঘাত করলো। (অর্থাৎ তার গালে কষে চড় বসালো।) এখানে 'দেশ' মানে অঙ্গ বা স্থান। যেমন, বক্ষদেশ, নাভিদেশ, গ্রীবাদেশ, গলদেশ, স্কন্ধদেশ, কটিদেশ। এগুলো একসঙ্গে হবে। তবে গণ্ডদেশ হলেও গালদেশ কিন্তু হাস্যকর। তদ্রূপ গলদেশ হলেও গলাদেশ অচল। কটিদেশ চলবে, কিন্তু কোমরদেশ লিখলে লোকে হাসবে। বক্ষদেশ ও বুকদেশ সম্পর্কেও একই কথা। দেশ মানে ভৌগলিক অঞ্চল হলে কখনো আলাদা লেখা হয়, কখনো একসঙ্গে। যেমন, নতুন দেশ, অচিন দেশ, বঙ্গদেশ, ব্রহ্মদেশ, দেশভক্তি, দেশপ্রেম, দেশসেবায় আত্মনিয়োগ ইত্যাদি।

পূর্ব শব্দটি একসঙ্গে লিখিত হয়। যেমন, পূর্বপুরুষ, পূর্বদিক, পূর্বকাল (প্রাচীন কাল)। পূর্ববর্ণিত (পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে এমন।) পূর্বলক্ষণ (কোন ঘটনার পূর্বে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন, জ্বরের/অসুখের পূর্বলক্ষণ।) পূর্বদেশ, পূর্বপাকিস্তান, পূর্ববঙ্গ, (এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়, 'অবিভক্ত বঙ্গদেশের পূর্ব অংশ' তখন পূর্ব আলাদা লেখা হয়।

অনুগ্রহপূর্বক ক্ষমা করুন। সালাম নিবেদনপূর্বক আরয এই যে, ...। -পূর্বক শব্দটি

একসঙ্গে হবে। কারণ এটি স্বতন্ত্র শব্দ নয়, আশ্রিত শব্দ। 'প্রতিম', এটিও আশ্রিত শব্দ। অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং একসঙ্গে হবে। যেমন, ভ্রাতৃপ্রতিম, (ভাইয়ের মত)। বন্ধুপ্রতিম, (শব্দটি সম্পর্কে আপত্তি আছে।) অগ্রজপ্রতিম, প্রাণপ্রতিম ইত্যাদি। মোটকথা, আশ্রিত শব্দ এবং শব্দাংশ আলাদা লেখা হবে না, যুক্তরূপে লেখা হবে।

বহুল শব্দটি সম্পর্কে আমি যা বুঝতে পেরেছি তা এই যে, এটি পূর্ববর্তী শব্দের সঙ্গে একত্রে লেখা হবে। যেমন, ব্যয়বহুল, বিলাসবহুল, বৃক্ষবহুল ইত্যাদি। কিন্তু পরবর্তী শব্দ থেকে পৃথক হবে। যেমন, বহুল আলোচিত বিষয়। বহুল প্রয়োগের কারণে শব্দটি তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে। বহুল পরিমাণে।

বহু শব্দটি কখনো আলাদা লেখা হয়, কখনো একসঙ্গে। পরবর্তীতে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার ইচ্ছে আছে। এখন শুধু কিছু উদাহরণ দিচ্ছি– সে বহু দূর থেকে এসেছে (আলাদা)। বহুদূর দেশ থেকে এসেছে (একত্রে)। তাকে বহুদূর পথ পাড়ি দিতে হয়েছে (একত্রে)। তিনি বহু ভাষা জানেন (আলাদা)। তিনি বহুভাষাবিদ (একত্রে)। একে একে তিনি বহু বিবাহ করেছেন (আলাদা)। সমাজ এখনো বহুবিবাহ মেনে নিতে পারে না (একত্রে)। দলের সভাপতিকে বহু দলীয় সমস্যা মেনে নিয়েই দল পরিচালনা করতে হয় (আলাদা)। তিনি বহুদলীয় রাজনীতি চালু করেছেন (একত্রে)। বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত।

এতে বহু অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। দূরদূরান্ত থেকে বহু লোক এসেছে। বহুমূল্য অলংকার (একত্রে)। এজন্য তোমাকে বহু মূল্য দিতে হবে (আলাদা)। বহুরূপী। (বহু রূপে সাজে, বা নানা রূপ ধারণ করে এমন লোক)।

মহা শব্দটি অনেকে আলাদা লিখে থাকেন, কিন্তু তা একত্রে লিখতে হবে। যেমন, মহামানব, মহাসম্মেলন, মহাসাগর, মহাসমারোহে (বিবাহ সম্পন্ন হলো।) তুমি তো আমাকে মহালজ্জায় ফেলে দিলে হে! আমেরিকা এখন মহাশক্তির অধিকারী একটি দেশ। লোকটি তো মহা পাজি/দুষ্ট (আলাদা লেখাই উচিত)।

# 'এক' সম্পর্কে অনেক কথা

'এক' শব্দটি কখন যে একসঙ্গে, আর কখন আলাদা হবে, এখনো সঠিকভাবে বুঝতে পারিনি। বাংলা অভিধানগ্রন্থগুলোও এ বিষয়ে তেমন কোন সাহায্য করে না। একেক অভিধানে একেক রকম, আবার কখনো একই অভিধানে দু'রকম। কোন্‌টা অনুসরণযোগ্য, বোঝা দায়। যেমন, 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'-এ রয়েছে 'এক প্রস্থ' বস্ত্র (বিযুক্ত), একদৌড় (যুক্ত) কিন্তু বাংলা একাডেমি অভিধানে রয়েছে– একপ্রস্থ (যুক্তরূপে)। সংসদ অভিধানে রয়েছে 'এক দৌড়'।

এ বিষয়ে অনেক চিন্তাভাবনার পর আমার যা ধারণা হয়েছে সে অনুসারে নীচে কিছু আলোচনা করছি।

'এক' শব্দটি যদি বিশেষভাবে একটি বোঝায় তাহলে আলাদা লেখা হবে, অন্যথায় একত্রে। যেমন–

(ক) এক হাতে তালি বাজে না। (কিন্তু এই ক্ষুদ্র জীবনে কতবার যে এক হাতে তালি বাজতে দেখলাম।) এক হাত কাপড়ে আবরুরক্ষা হয় না। তাকে একহাত দেখে নেবো। (এটি একত্রে হবে। কারণ এখানে একহাত মানে একটি হাত নয়, বরং উদ্দেশ্য হলো, 'যথেষ্ট পরিমাণ'।)

বুড়োর এক পা বাইরে, এক পা কবরে, তবু চোখের দৃষ্টিটা 'স্বচ্ছ' হলো না! এক কলসি দুধে এক ফোঁটা চনা। এক কানে শোনা, আর এক কানে বের করে দেয়া। (এখানে এক মানে একটি, দু'টি নয়)

গ্রামে এক ঘর মুসলমান, আর সব হিন্দু। তাই সবে মিলে তাদের 'একঘরে' করে রেখেছে। (এক ঘর মানে একটি ঘর, একটি মাত্র পরিবার, পক্ষান্তরে একঘরে মানে 'সমাজচ্যুত')। আরেকটি উদাহরণ, এক ঘর লোকের সামনে আমাকে এভাবে অপমান করা হলো। ( এখানে এক ঘর লোক মানে ঘরভর্তি লোক, সুতরাং একত্রে হওয়ার কথা, তবে ঘর যেহেতু একটি, হোক না তা মানুষে ভর্তি, সেহেতু আলাদা লেখা হয়েছে। –বাংলাভাষার অভিধান, জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস। তবে সংসদ ও বাংলা একাডেমির ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে প্রথম দিকটি বিবেচনা করে

যুক্তরূপে লেখা হয়েছে, একবাড়ি লোক এবং একঘাট লোক– একঘাট লোকের সামনে লজ্জা পাওয়া।)

এক আল্লাহ আমাদের সাতজনকে একমায়ের পেটে (অভিন্ন মা অর্থে) জন্মদান করেছেন, আমরা হলাম সহোদর, তবু আমরা কেউ কাউকে চিনি না।

দেশে এখন দু'টি জোট। এক জোট বলছে, আমরা বাঙ্গালী, অন্যটি বলছে, আমরা বাংলাদেশী, বাংলাদেশের লোকেরা এখন যাবে কোনদিকে?! আর ঐ বাংলার লোকেরা?! আসলে সবার একজোট হয়ে/একজোটে দেশের জন্য কাজ করা দরকার। (এক জোট মানে একটি জোট, আর একজোট মানে ঐক্যবদ্ধ বা সঙ্ঘবদ্ধ।)

এ কজটা শেষ করতে পুরো এক দিন লাগবে। একদিন সে তার ভুল বুঝতে পারবে। (প্রথমটির অর্থ হলো, বিশেষভাবে একটি দিন, আর দ্বিতীয়টির অর্থ হলো, কোন একদিন বা কোন একসময়।) আজ তোর একদিন কি আমারই একদিন। (চূড়ান্ত ফায়ছালার সময় অর্থে)

একদিন এক বন্ধু আমাকে বললো। (যথাক্রমে যুক্ত ও বিযুক্ত)

এক দেশে ছিলো এক রাজা। আমরা একদেশে বাস করি, (অভিন্ন দেশ অর্থে)। আমরা একবয়সী।

(খ) একগাল হাসি, একগাল খাবার, একপেট (গালভরা এবং পেটভরা অর্থে), একগাদা, এককাঁড়ি (প্রচুর অর্থে) এক-আধ, এক-আধটা/টু (এক-আধটু ভুলত্রুটি, সামান্য অর্থে), একগলা/বুক/কোমর (-জল/পানি, পরিমাণ অর্থে), একচুল/তিল এদিক-ওদিক হতে পারবে না (অতি সামান্য পরিমাণ অর্থে)। একছুটে/দৌড়ে (অতি দ্রুত অর্থে)। একটানা (-সুর, লাগাতার অর্থে)। আমি এককথার মানুষ, ভদ্রলোকের এককথা, (অপরিবর্তনীয়তার অর্থে)। এককথায়, এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, (চূড়ান্ততা অর্থে)। আসলে তোমরা সব একগোয়ালের গরু, (অভিন্ন চরিত্রের অর্থে)। একতরফা খেলা (প্রাধান্যপূর্ণ অর্থে)। একতরফা বিচার (ন্যায়ভিত্তিক নয় অর্থে)। একরত্তি ছেলে (অতি ক্ষুদ্র অর্থে)। একবাক্যে (সবাই একবাক্যে স্বীকার করে নিলো, সমস্বরে, বা মতভেদ ছাড়া, এই অর্থে)। একমুষ্টি চাল (এক মুষ্টিতে যতটা ধরে ততটা, অর্থাৎ মুষ্টিপরিমাণ)। তাকে দিলাম এক মুষ্টি চাল, তোমাকে দিলাম দুই মুষ্টি। (আলাদা, কারণ এখানে সংখ্যা উদ্দেশ্য।)

একদৃষ্টে (অপলক চোখে, অর্থে)

একরকম ভালোই আছি। কাজটা একরকম হচ্ছে। (মোটামুটি অর্থে) তাকে একনজর দেখার জন্য সবাই উন্মুখ হলো। (অতি অল্প সময় অর্থে)

এরা সবাই একশ্রেণী (অভিন্নতার অর্থে)। এক শ্রেণীর লোক মনে করে (বিশেষ একটি শ্রেণী অর্থে)।

একজন, একপাশ, একজাতীয়, মানুষ আসলে একজাতি। (অভিন্ন জাতি অর্থে)।

এক জাতি উন্নতি লাভ করে তো আরেক জাতি পিছিয়ে পড়ে।
এই যে এতগুলো উদাহরণ লিখলাম, তারপরো কিন্তু বিষয়টি আমার কাছে পরিষ্কার নয়। তবে আশা করি, তোমাদের কাছে বিষয়টি আগের চেয়ে কিছুটা স্পষ্ট হয়েছে।
এই মাত্র একটি উদাহরণ পেলাম, সেটাও লিখে রাখি, 'এক গাড়ি আসে, আরেক গাড়ি যায়।' 'মেয়ের বাবার বাড়ি থেকে একগাড়ি ফল এসেছে। সবাই হুড়াহুড়ি করে খেলো, মেয়ের ভাগ্যে জুটলো না একটিও, এই হলো আমাদের গ্রামবাংলার চিত্র।' (শহরের চিত্রও কি খুব একটা ভিন্ন?)
এমন এক সমাজে আমরা বাস করি, যেখানে আদর্শরূপে অনুরসরণ করার মত কোন ব্যক্তি এখন চোখে পড়ে না, (আলাদা)। একসমাজে একসঙ্গে বাস করা এখন অসম্ভব, (একত্রে)।

# বানানের তর্কযুদ্ধ

একটি বিষয় প্রায় অনস্বীকার্য সত্যের পর্যায়ে এসে পড়েছে। সেটা হলো বাংলা বানানের ক্ষেত্রে স্বৈরাচার। এ যেন এক লাওয়ারিছ সম্পত্তি। যে সুযোগ পায় সেই তাতে ভাগ বসায়। যার অধিকার আছে সেও কথা বলে, যার অধিকার নেই সে আরো বেশী বলে। (বেশী, না বেশি, এ নিয়েও বিবাদ কম নয়।)

একদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে আমাদের বাংলা একাডেমি প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে যেমন বিভিন্ন সময় বানান সংস্কারের বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আমাদের ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পর্যন্ত অনেকেই ব্যক্তিগত কিছু মতামতও তুলে ধরেছেন। কিন্তু সেই যে একটা কথা আছে, 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট', এই বচন ব্যবহার করা আমাদের জন্য সঙ্গত কি না সেটা ভিন্ন প্রশ্ন, তবে বোধকরি বাংলা বানানের ক্ষেত্রে আমাদের স্বেচ্ছাচারই হচ্ছে উপরোক্ত বচনের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ।

শব্দের বিশেষত শেষে ইকার হবে না ঈকার, এ নিয়ে বিবাদ দীর্ঘ দিনের। আগে ঈকারের একচ্ছত্র প্রতাপ ছিলো, এখন দিনবদলের গুণে ইকারের প্রতাপ চলছে, তবে অতীতে যেমন ইকারের কিছুটা হলেও উপস্থিতি ছিলো, তেমনি এখন ঈকারের উপস্থিতিও পরিলক্ষিত হয়। এসব নিয়ে আমাদের মত গরীব লেখক বা পাঠক যারা তাদের প্রায় দিশেহারা হওয়ার যোগাড়। যেমন– বাড়ী না বাড়ি? আগে মানুষ বাড়ী ভাড়া নিতে গেলে বাড়ীওয়ালা মাথায় বাড়ি দিতো। এখন ভাড়ার বাড়ি, আর লাঠির বাড়ি সমান। পাখী ও পাখি, গাড়ী ও গাড়ি, বেশী ও বেশি ইত্যাদি বহু উদাহরণ দেয়া যায়।

দ্বিতীয় বিবাদের ক্ষেত্র হলো, হলো না হল? অর্থাৎ ক্রিয়াগুলোর শেষে ওকার হবে, না হবে না? ব্যাকরণে ওকার নেই, আছে অ-কার, কিন্তু আমদের উচ্চারণ হলো ওকার। কেউ ব্যাকরণ অনুসরণ করতে চান, কেউ মুখের উচ্চারণ অনুসরণ করতে চান। সবাই নিজ নিজ মতের উপর যুক্তি-প্রমাণের ঢাল-তলোয়ারসহ অবিচল। সুতরাং লড়াই চলছে অবিরাম।

আরো আছে, ইতিমধে, না ইতোমধ্যে, উপরোক্ত, না উপর্যুক্ত, উল্লেখিত, না উল্লিখিত, সাথে, না সঙ্গে, মাঝে, না মধ্যে, পরবর্তীতে না পরবর্তী কালে, আগামীতে, না আগামী দিনে ইত্যাদি ।[২] সে এক মহাফ্যাসাদ!

আমরা যারা মাদরাসা-পড়ুয়া তাদের জন্য বিতর্কের উর্বর ক্ষেত্র হলো আরবী-ফারসী শব্দের বানান। ইহুদি, এহুদি, ইয়াহুদি; শারী'আত, শরীয়ত, শারীয়াত, ফরয, ফরজ, আযান, আজান, কত কিসিমের যে বানান! এক্ষেত্রে মূল বিতর্ক হলো আমরা কি বাংলা প্রচলিত বানান অনুসরণ করবো, না মূল আবরী উচ্চারণ? এ তর্কের ইতি কবে হবে কে জানে?

বাংলাভাষায় আমার যা যোগ্যতা, তাতে আমি এতটুকুতেই নিজেকে ধন্য মনে করি যে, আমার লেখা পড়া হচ্ছে এবং কিছুটা হলেও গ্রহণ করা হচ্ছে। কোন বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করার জন্য যে জ্ঞান-অধিকার প্রয়োজন তার ছিটে-ফোঁটাও আমার নেই। সুতরাং কোনভাবেই আমি আমার সীমা অতিক্রম করতে চাই না। আমি শুধু আমার পুষ্পের বন্ধুদের বলবো, এসব তর্ক-বিতর্ক পণ্ডিতদের জন্য ছেড়ে দাও; নিজেরা তাতে মোটেও জড়িও না (অথবা জড়িয়ো না)। কারণ ভাষা ও সাহিত্যচর্চা এসবের নাম নয়। তুমি চেষ্টা করে যাও, যাতে তোমার লেখা সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হয়। বাকি বানান ও শব্দব্যবহারের ক্ষেত্রে যে কোন একটি রীতি সর্বত্র অনুসরণ করে যাও, অন্যকেও যার যার পছন্দ অনুসরণ করতে দাও।[৩] পণ্ডিতগণ যেদিন তর্কযুদ্ধ শেষ করে সর্বসম্মত সমঝোতায় উপনীত হবেন সেদিন আমরা তাদের সিদ্ধান্তকে শিরোধার্য করে নেবো।[৪]

আরবী-ফারসি শব্দের ক্ষেত্রে নবীনদের জন্য আমার পরামর্শ হলো, বাংলায় যে বানানটি সর্বাধিক প্রচলিত সেটি অনুসরণ করো। এক ভাষা[৫] থেকে অন্য ভাষায় যখন কোন শব্দ আসে তখন মূল উচ্চারণ কিছু না কিছু অবশ্যই পরিবর্তিত হয়। এতে নতুন নতুন শব্দের আগমনের পথ সুগম হয় এবং ভাষার গতি ও প্রবাহ অব্যাহত থাকে। উচ্চারণ নিয়ে অযথা জটিলতা সৃষ্টি করলে বাংলায় আরবী-ফারসি শব্দের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ ব্যাহত হওয়ার আশংকা রয়েছে। অথচ আমরা চাই, বাংলাভাষায় আরবী-ফারসি শব্দের আগমন-প্রবাহ আরো বেগবান হোক এবং এটা হতে পারে তোমাদের হাতে। কারণ তোমরাই আগামীর আলো। (আগামী দিনের)

---

১। তৃতীয় একটি দলও আছেন। তাদের মার্কা হলো বিসর্গ, অর্থাৎ ইতঃমধ্যে এবং ইতঃপূর্বে। এ যেন কাজ নেই তো খৈ ভাজ অবস্থা।

২। এগুলো অবশ্য ঠিক বানানের বিষয় নয়, বরং ব্যাকরণের বিষয়, তবু কাছাকাছি বলে এখানে উল্লেখ করা হলো।

৩। আমার নিজের একটা বড় দুর্বলতা এই যে, অভিন্ন বানানরীতি রক্ষা করতে পারি না। একবার একটি লিখি তো পরবর্তীতেই লিখে ফেলি অন্যটি, চেষ্টা করেও পারি না। তাই আমার লেখায় একটা বিশৃঙ্খলা থেকেই যায়। এমনকি আমার নামের মিছবাহ বানানও

তিনচাররকম হয়ে যায়। আমার কোন সঙ্গী যদি আমার লেখার এ দুর্বলতা লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতেন আমি কৃতজ্ঞ থাকতাম।

৪। (শির মানে মাথা, তবে মূলে বিসর্গ ছিলো, যা ওকারে রূপান্তরিত হয়ে 'শিরোধার্য' হয়েছে। শিরঃ+ধার্য= শিরোধার্য, মানে মস্তকে ধারণীয়। শিরোদেশ মানে মস্তক, শীর্ষ, শিখর, অগ্রভাগ। শিরঃ+দেশ= শিরোদেশ। শিরঃপীড়া মানে মাথাধরা, মাথাব্যথা, রূপক অর্থে পেরেশানি। শিরশ্ছেদ, মানে মস্তকচ্ছেদন, এখানে বিসর্গটি শ-এ রূপান্তরিত হয়েছে। শিরোচ্ছেদ বানান ঠিক নয়। শিরস্ত্রাণ, মানে যা মাথাকে আঘাত থেকে ত্রাণ বা রক্ষা করে। শিরঃ+ত্রাণ=শিরস্ত্রাণ, এখানে বিসর্গটি স-এর রূপান্তরিত হয়েছে। সুতরাং র-ওকার দিয়ে লেখার কোন সুযোগ নেই। শিরোমণি, মানে মস্তকে ধারণযোগ্য মণি বা রত্ন। শিরঃ+মণি। শিরোভূষণ।

৫। আলাদা হবে, কারণ বিশেষভাবে একটি ভাষা বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে 'আমরা একভাষার মানুষ', একত্রে হবে কারণ এর অর্থ 'অভিন্ন ভাষার মানুষ।

# কিছু শব্দের বানান

কিছু কিছু শব্দের বানানে আমাদের অনেকেরই ভুল হয়। ইচ্ছে আছে পরবর্তী সুযোগে ঐধরনের শব্দগুলোর একটি আভিধানিক তালিকা প্রকাশ করার, আল্লাহ যদি তাওফীক দান করেন। এখন শুধু অল্প ক'টি শব্দের উপর একটি 'উড়ন্ত দৃষ্টি' বুলিয়ে যেতে চাই। প্রথমে আসুক কৌতূহল শব্দটি। কেন, বিশেষভাবে এ শব্দটি দিয়েই কেন আলোচনার শুরু?

কারণ এই সেদিনও আমি নিজেই শব্দটির ভুল বানান 'কৌতুহল লিখেছি। তোমরা তো আমার আপন, তোমাদের কাছে নিজের অজ্ঞতার লজ্জা প্রকাশ করতে দোষ নেই। মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন শব্দে আমার ভুল বানান ধরা পড়ে। তবে সান্ত্বনার কথা হলো, ভুলগুলো ধরা পড়ছে এবং ক্রমেই আমার বানান নির্ভুলতার দিকে এগিয়ে চলেছে। তোমাদের সামনে তো রয়েছে বয়সের বিরাট সুযোগ। তোমরা এখন থেকে চেষ্টা করলে ইনশাল্লাহ আমাদের ছাড়িয়ে অনেক দূর যেতে পারবে। আল্লাহ তাওফীক দান করুন, আমীন।

সান্ত্বনা শব্দটি অনেকে ভুল বানানে 'সান্তনা' লেখে। এ তালিকার উপরের দিকে রয়েছে শাশ্বত শব্দটি। পুষ্পের বন্ধুরা ভুল করে 'ব'টাকে প্রথম 'শ'-এ নিয়ে আসে এবং শ্বাশত লেখে। অনেকে আরো সহজ করে বলে, 'শাশত'।

সত্তা মানে অস্তিত্ব, স্থিতি, বিদ্যমানতা ইত্যাদি। (রাষ্ট্রীয় সত্তা, পরম সত্তায় বিশ্বাস স্থাপন। ব্যক্তিসত্তা) বানানটা হলো ত+ত= ত্ত। অনেকে 'ব' যোগ করে লেখে সত্ত্বা, এটা ভুল।

যারা কৃপণ, অনেক ধন থাকা সত্ত্বেও তারা হয় অভাবগ্রস্ত। এখানে ত+ত+ব = ত্ত্ব; অথচ পুষ্পের অনেক বন্ধুর কলমে শব্দটি আসে এভাবে, 'ধন থাকা সত্তেও সে গরীব।' অর্থাৎ যেখানে 'ব' থাকার কথা সেখানে নেই, আর যেখানে থাকার কথা নয় সেখানে সগৌরবে বিদ্যমান!

ভালো কথা, আমসত্ত্ব তো খেয়ে আসছো সেই ছোটকাল থেকে। বানানটা বলাই বাহুল্য, জানা নেই! তো বানানটা এখানে দেখে নাও ভালো করে।

অন্তঃসত্ত্বা মানে গর্ভধারিণী নারী। ভালো ভালো মানুষ এর বানানে ভুল করে।

প্রথম কথা হলো 'অন্তঃ'-এর বিসর্গ ভুলে যেয়ো না। দ্বিতীয় কথা হলো ত+ত সংযুক্ত ও ব-ফলা।

স্বত্ব মানে অধিকার ও মালিকানা। যেমন, এই গ্রন্থের স্বত্ব লেখকের, প্রকাশকের নয়। এখানে স ও ত– উভয়ের নীচে 'ব' রয়েছে। আর 'ত' একটি 'ত্ত' নয়।

স্বতঃস্ফূর্ত মানে যা (বাইরের কোন চেষ্টা ছাড়া নিজে নিজেই প্রকাশিত বা উৎসারিত হয়। যেমন, স্বতঃস্ফূর্ত লেখা, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয়া, ইত্যাদি। শব্দটিতে পুষ্পের বন্ধুরা এখানে তিনটি ভুল করে। একজন 'স্ব'-এর 'ব' ছেড়ে দেয় তো অন্যজন বিসর্গ ভুলে যায়, আর তৃতীয়জন কী করবে! বেচারা দীর্ঘ উকারের বদলে হ্রস্ব-উকার দেয়। তোমরা কী করবে?

এই সুযোগে স্বতঃসিদ্ধ বানানটিও দেখে নাও। স্বতঃসিদ্ধ মানে এমন স্পষ্ট বিষয়, যার সত্যতা উপলব্ধি করার জন্য দলীল-প্রমাণ ও যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন নেই। (একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে কীভাবে তোমরা অস্বীকার করছো?) এ স্বীকারোক্তি আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করেছি। (অর্থাৎ স্বেচ্ছায়, কারো চাপে পড়ে নয়)

স্বচ্ছ ও সচ্ছল শব্দদুটিতে মাঝে মধ্যেই 'ব'-এর স্থানবদল হয়ে যায়। পুষ্পের এক বন্ধু লিখেছে, 'আপনার লেখায় আমাদের দুরবস্থার সচ্ছ চিত্র ফুটে ওঠে।' এমন অকৃপণ প্রশংসায় খুশী হওয়ার কথা, কিন্তু ঐ যে বানানভুল!

আরেকজন লিখেছিলো, সে নাকি খুব 'স্বচ্ছল' পরিবারের ছেলে। উত্তরে আমি লিখেছিলাম, তাহলে তোমার বাবাকে বলো, ভালো দেখে একটি বাংলা অভিধান 'কিনে' দিতে।

একটু আগে 'উপলব্ধি' গিয়েছে, তাই না! অনেকের মত আমিও ভুল করে লিখতাম, উপলদ্ধি। অর্থাৎ দ+ধ= দ্ধ, আসলে হবে ব+ধ= ব্ধ। আর পরিপক্ব শব্দটি লিখতে গিয়ে তো বানানে আমাদের অপরিপক্বতা খুব নগ্ন হয়েই ধরা পড়ে। আমিও লিখতাম, অনেকে এখনো লেখে, পরিপক্কতা। আচ্ছা বলো তো, এভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে বানানের গণ্ডি অতিক্রম করে কবে আমরা প্রবেশ করবো ভাষার অন্যান্য অঙ্গনে?! সময় তো বসে নেই! সময় তো বসে থাকে না!

আচ্ছা শোনো মিয়াঁরা! গাধা ও গর্দভ বানানে ভুল করো না। হঠাৎ করে তোমাদের মজলিসে গাধা ও গর্দভকে দাওয়াত দিলাম বলে কিছু মনে করো না। আসলে এক বন্ধু 'গর্ধব' লিখেছিলো। তাই সতর্কবাণীটা উচ্চারণ করতে হলো।

ফুর্তি ও স্ফূর্তি-এর বানান অনেকেই গুলিয়ে ফেলে। সংস্কৃত শব্দটি হলো স্ফূর্তি। তাতে রয়েছে দীর্ঘ-উকার। তা থেকে এসেছে ফুর্তি। তাতে হলো হ্রস্ব-উকার। ফুর্তি শব্দটির একই অর্থ, আনন্দ, হর্ষ (সাধারণত নিন্দার্থে ব্যবহৃত। যেমন, খুব ফুর্তিতে আছো, না! লোকটা ফুর্তি করেই জীবনটা কাটিয়ে দিলো)। স্ফূর্তি-এর একটি অর্থ হলো আনন্দ ও হর্ষ, অন্য অর্থ হলো, স্ফুরণ, কম্পন, বিকাশ। (প্রতিভার স্ফূর্তি, বাক্যস্ফূর্তি) স্ফূর্তি-এর কারণে অনেকে স্ফুরণ-এ দীর্ঘ-উকার দিয়ে

থাকে, যা ভুল। স্ফুরণ মানে উদ্রেক, বিকাশ, প্রকাশ (বুদ্ধির/প্রতিভার/আলোর স্ফুরণ)

কূল যদি দীর্ঘ-উকার হয় তাহলে সেটা হবে নদীর কূল। (আর তোমরা তো জানোই, একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে এই তো নদীর খেলা।) আমরা যে বলি, সমস্যার কোন কূল-কিনারা পাচ্ছি না, সেটা আসলে নদীর কূল থেকেই নেয়া। আচ্ছা বলো তো, 'কূলবতী' মানে কী? মানে হলো কূলওয়ালী অর্থাৎ নদী। আর 'কুল' যদি হয় হ্রস্ব-উকার তাহলে সেটা হবে বংশ, অভিজাত বংশ, তখন 'কুলবতী' অর্থ হবে অভিজাত বংশীয়া ও বহুগুণসম্পন্না কন্যা। এবার বুঝে দেখো, বানানের বিভ্রাট ঘটলে ঘরের 'কুলবতী' নির্ঘাত নদীতে ডুবে মরবে। বাংলায় বলে, একুল ওকুল দু'কুল যাওয়া, অর্থাৎ সবদিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, উভয় দিক থেকে বঞ্চিত হওয়া। (এটা কিন্তু নদীর কূল নয়, বংশের কুল। তবে একূল ও কূল দু'কূল হারানোও বলা হয়।)

কুলীন মানে উচ্চ বংশীয়, তবে দীর্ঘ উকার দিলে তোমার কলমের বংশমর্যাদা অবশ্যই আহত হবে। অন্তত তোমার কলমের কুল রক্ষা করার চেষ্টা করো।

কুল যদি দু'বার লিখি তাহলে তা নদীর কূল দিয়ে নেমে সোজা চলে যাবে নদীর পানিতে এবং তা একসঙ্গে লিখতে হবে। (হৃদয়-নদীর জলধারা কুলকুল বয়ে যায়।)

গাছে ধরে যে কুল সেটাও হ্রস্ব-উকার। মূল সংস্কৃত শব্দটি হচ্ছে কুবল। অন্যমতে কোলি থেকে কোল, কোল থেকে কুল) দেশী বাংলায় বলি, বরই। সত্য কথাটা বলি! কুল খেতে পারো, কিন্তু বরই-এর স্বাদ কখনো তুমি কুলে পাবে না। দেশী শব্দের স্বাদই আলাদা। তাতে যে দেশের মাটির সোঁদা গন্ধ থাকে!

সোঁদা বানানটা দেখে নাও, তারপর অর্থটা জেনে রাখো– বৃষ্টিভেজা মাটির ঘ্রাণ। এরপর থাকলো আরবী 'কুল', যার অর্থ সমগ্র। (কুলমাখলুক জপে তাঁর নাম।)

অনেক আগে, পুষ্পের প্রথম প্রকাশনার সময়। একটি ছেলে একটা লেখা পাঠিয়েছিলো। দিলে তার বড়ই জযবা, সে কলমসৈনিক হবে। সে লিখেছিলো, 'আমাদের কলমের খোচায় শত্রুদের কলম কোনঠাশা হয়ে যাবে।' একটি বাক্যে তিনটি বানানভুল! তবু উৎসাহ দিয়েছিলাম। কিন্তু সেটাই ছিলো পুষ্পের জন্য তার প্রথম ও শেষ লেখা! বলো তো, কেন এমন হয়? কোথায় আমার দোষ? কেন আমি ধরে রাখতে পারি না!

যাক, ভুলগুলো দেখো– তুমি যদি চন্দ্রবিন্দু ছাড়া 'খোচা' দাও তাহলে তোমার কলমের খোঁচা তেমন তীক্ষ্ণ হবে না, আর তাতে শত্রুরও কিছু হবে না। 'কোণঠাসা' লিখতে হবে মূর্ধন্য-ণ এবং দন্ত্য-স দিয়ে। কোণ মানে দুই সরলরেখার মিলনস্থান (ত্রিভুজের কোণ) দুই পার্শ্বের মিলনস্থল। (ঘরের কোণ) অভ্যন্তর (গৃহকোণ) তো 'কোণঠাসা' মানে ঘরের কোণে যাকে ঠেসে ধরা হয়েছে, ফলে

নড়াচড়াও করতে পারছে না। রূপক অর্থে, পরিস্থিতির চাপে অসহায় অবস্থা। কোণাকুণি তবে কোনাকুনি বানানটিও শুদ্ধ।
শব্দটির সংস্কৃত রূপ হলো কুণ তা থেকে কোণ, তা থেকে বাংলা হচ্ছে কোনা।
কণা (অতি সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র অংশ, জলকণা, তার প্রতি আমার কণামাত্র মায়া নেই।) টুকরো (তুমি হলে চাঁদের কণা) আর কণিকা হচ্ছে কণার চেয়েও ক্ষুদ্র।
তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম-এর বানানে 'ন' ও 'ম'-এর জায়গাবদল হয়ে যায় অনেকের কলমে; তাছাড়া সূক্ষ্ম-এর দীর্ঘ-ঊকারও মনে রাখার বিষয়।
কুয়াশা-এর বানান অভিধানে তালব্য-শ ও দন্ত্য-স দু'টোই আছে, তবে তুমি লিখবে তালব্য-শ। কোথায় যেন পড়েছিলাম, যদি দন্ত্য-স দাও, সকালে বের হয়ে কুয়াশায় কিচ্ছু দেখতে পাবে না, না পথ, না পথের মানুষ; এমনকি চিনতে পারবে না নিজেকেও। সত্য কি মিথ্যা জানি না। তোমরা একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারো দন্ত্য-স দিয়ে। তবে এবার যে এত কুয়াশা পড়লো তা কি পুষ্পের ঐ বন্ধুটির কারণে, যে কুয়াশায় দন্ত্য-স দিয়েছিলো?! কে জানে!
এখন যারা কলম ধরে, লিখতে তো পারেই না, লেখক হওয়ার আকাঙ্ক্ষাও করতে পারে না। কথাটা কেন বললাম জানো? পুষ্পের বন্ধুদেরকে লেখক হওয়ার 'আকাংখা' এবং আকাঙ্খা করতে দেখে।
আলসে, আর কুঁড়ে কাকে বলে জানো? গপাগপ খায়, আর পড়ে পড়ে ঘোমায়, তাকে? আরে না! গপাগপ করে খাওয়া সেও তো একটা কষ্টের কাজ হলো! তাকে বড় জোর বলা যেতে পারে অলস। যে বলে, কে আছো, আমার খাবারটা খেয়ে দাও তো! সে হলো আলসে, আর কুঁড়ে! যাক, সে পরিচয় দিয়ে কাজ নেই; তুমি শুধু কাজে-কর্মে কুঁড়েমি করো না, আর চন্দ্রবিন্দু দিতে আলসেমি করো না।
বাঞ্ছা- বানানটা হলো ঞ+ছ। মানে ইচ্ছা, অভিলাষ। বাঞ্ছনীয় মানে কাম্য (এমন অশালীন আচরণ বাঞ্ছনীয় নয়।) বাঞ্চনীয়, অর্থাৎ ঞ+চ নয়। সেটা তুমি করবে বঞ্চিত-এর ক্ষেত্রে।
বাণ যদি হয় তীর ও শরজাতীয় অস্ত্রবিশেষ, তাহলে মূর্ধন্য-ন, আর যদি হয় বন্যা তাহলে দন্ত-স। (আমরা এ দেশে বানের পানিতে ভেসে আসিনি। আজ মনে আমার খুশির বান ডেকেছে। কেন যেন ওকে (মন্ত্র দ্বারা) বাণ মেরেছে।
একটা কথা বলবো কি না ভাবছি! বলেই ফেলি; কারণ একটি ছেলে যা একটা ভুল করেছে না! শোনো, তোমার আম্মু হলেন তোমার আব্বুর স্ত্রী। (স+ত+্র = স্ত্র), আর তোমার আম্মু যে যন্ত্রটা দিয়ে ধোয়া কাপড় 'মসৃণ' করেন (মানে 'আয়রন' করেন) সেটা হলো ইস্তিরি, বা ইস্ত্রি। (আজকাল স্ত্রীলোকেরা ঘরেই কাপড় ইস্ত্রি করে, ধোপাখানায় বড় একটা পাঠায় না।)
মসৃণ মানে উঁচু-নীচু নয়, খসখসে নয়, বরং সমান ও 'প্লেন'। (মসৃণ পথ। আয়নার মত মসৃণ।) স্নিগ্ধ, কোমল (মসৃণ জীবন)। বানানটা দেখে নাও। দন্ত্য-ন দেয়ার

ইচ্ছে হলে ইচ্ছেটা দমন করো, তাহলে কিন্তু আর মসৃণতা থাকবে না।

মরু মানে তো জানাই আছে তোমাদের! জল-উদ্ভিদ-প্রাণীশূন্য বালুকাময় বিস্তীর্ণ স্থলভাগ। মরুভূমির বাহন হলো উট, তাই উটকে বলে মরুজাহাজ। মরুঝড় মানে শুধু বালুর ঝড়। সে বড় ভয়াবহ জিনিস! অনেক সময় উট-মানুষ সব চাপা পড়ে যায় বালুর নীচে। যে কথাটা বলতে চাচ্ছি তা হলো, 'মরু' লিখবে হ্রস্ব-উকার দিয়ে, কিন্তু মরূদ্যান লিখতে হবে দীর্ঘ-ঊকার দিয়ে। মরুতে এক উকার, আর উদ্যানে আরেক উকার। দু'টো মিলে দীর্ঘ-ঊকার তো হতেই পারে! মরূদ্যান মানে কী? মানে মরুভূমিতে বিদ্যমান জল ও বৃক্ষপূর্ণ স্থান। এটাকে মরুদ্বীপও বলে; তখন কিন্তু হ্রস্ব-উকার। আচ্ছা, আগুনঝরা রোদ থেকে বাঁচার জন্য মরূদ্যানে যখন বসেছো, এক কাজ করো, দূরে তাকাও। কী দেখতে পাচ্ছো? পানির মত কিছু? আসলে ওখানে পানি নেই। সূর্যের প্রখর আলোতে এমন মনে হচ্ছে। এটাকে বলে মরীচিকা। মরূদ্যানে বসেই মরীচিকা-এর বানানটা ভালো করে দেখে নাও।

(আশার মরীচিকার পিছনে মানুষ ছুটছে নিরন্তর।)

মশক তোমার রক্ত হরণ করুক, কিংবা তুমি মশকে পানি ভরো। তালব্য-শ ছাড়া গতি নেই। (প্রথমটি হচ্ছে সংস্কৃত। মূলরূপ- মশ্+অক। বাংলায় বলি মশা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ফার্সি।)

'মশা মারতে কামান দাগা' কথাটা শুনেছো তো! মানে হলো, সামান্য কাজের জন্য বিপুল আয়োজন করা।

নাহ, মশারা বড্ড জ্বালাতন করছে। আজ এপর্যন্ত থাক।

# চতুর্থ অধ্যায়ঃ শব্দের অলঙ্কার

একটি বক্তব্য তৈরী হয় কতগুলো বাক্য দ্বারা, আর একটি বাক্য গঠিত হয় কয়েকটি শব্দ দ্বারা। তাই বাক্যগঠনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যা দরকার তা হলো সঠিক-সুন্দর ও যথোপযুক্ত শব্দ চয়ন করা এবং বাক্যের মধ্যে সর্বোত্তমরূপে তা প্রয়োগ করা। এ অধ্যায়ে আমরা বাক্যে শব্দের ব্যবহারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবো।

# শব্দের সঙ্গে শব্দের সমশ্রেণিতা

'শব্দের সমশ্রেণিতা' সঠিকভাবে বুঝতে হলে আগে নীচের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো।

বাংলাভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলো প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথমত তৎসম শব্দ। যদিও বিষয়টি প্রশ্নাতীত নয়, সংস্কৃতভাষাকে মনে করা হয় বাংলাভাষার জননী। অর্থাৎ সংস্কৃতভাষার গর্ভ থেকে নাকি বাংলাভাষার জন্ম হয়েছে। তো যে সমস্ত শব্দ সংস্কৃত থেকে সরাসরি বাংলাভাষায় আগমন করেছে সেগুলোকে বলা হয় তৎসম শব্দ।১ তৎ মানে তাহার, সম মানে মত; সুতরাং তৎসম মানে তাহার মত। এখানে 'তাহার' দ্বারা সংস্কৃতভাষাকে বোঝানো হয়েছে। বাংলাভাষার অর্ধেকেরও বেশী শব্দ সংস্কৃত থেকে সরাসরি আগত শব্দ। যেমন, অঙ্গ, অগ্নি, আকাশ, অশ্ব, ঔষধ, অগ্র, অদ্য, মদ্য, পাপ, পুণ্য ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত তদভব শব্দ। যে সমস্ত শব্দ সংস্কৃত থেকে পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় এসেছে সেগুলোকে তদভব শব্দ বলে, অর্থাৎ তাহা হইতে উদ্ভূত শব্দ। যেমন, অগ্নি থেকে পরিবর্তিত হয়ে আগুন, ঔষধ থেকে অষুধ, অদ্য থেকে আজ, কার্য থেকে কাজ, মদ্য থেকে মদ ইত্যাদি।

তৃতীয়ত বিদেশী শব্দ। অর্থাৎ আরবী, ফারসী, ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষা থেকে আগত শব্দ।

## মূল আলোচনা

উপরে বাংলাভাষার শব্দগুলোর যে শ্রেণী-বিভাগের কথা বলা হলো সেটা মনে রাখা জরুরি। কারণ কোন বাক্যে শব্দের পাশে শব্দ ব্যবহার করার সময় সাধারণত শব্দগুলোর মধ্যে সমশ্রেণিতা রক্ষা করা আবশ্যক। অর্থাৎ তৎসম শব্দের পাশে তৎসম শব্দ এবং অতৎসম শব্দের পাশে অতৎসম শব্দ।

এখানে 'সাধারণত' শব্দটি আবার দেখো। অর্থাৎ সমশ্রেণিতা রক্ষা করাই হলো সাধারণ নিয়ম, তবে ক্ষেত্রবিশেষে এর ব্যতিক্রমও হয়। নীচের বাক্যটি দেখো–

'তিনি তরবারি খাপমুক্ত করে বাহাদুরের মত শত্রুর উপর আক্রমণ করলেন।'

সবাই চেনে, এমন একজন লেখক তার বইয়ে কথাটা এভাবেই লিখেছেন। সাহিত্যের বিচারে এটা মোটেই মানোত্তীর্ণ নয়। কেননা শব্দচয়নের ক্ষেত্রে এখানে শ্রেণীসাদৃশ্য রক্ষিত হয়নি। এ দুর্বলতা অনেক লেখকের লেখায় দেখা যায়। উপরের বাক্যটি এমন হলে ভালো হতো–

'তলোয়ার খাপমুক্ত করে তিনি বাহাদুরের মত দুশমনের উপর হামলা করলেন।'

শব্দের সঙ্গে শব্দের এই শ্রেণীসাদৃশ্য বা সমশ্রেণিতা রক্ষা করা কখনো হয় বাঞ্ছনীয়, কখনো হয় অপরিহার্য। এটা নির্ধারণ করা সাধারণত লেখকের সাহিত্যরুচির উপর নির্ভর করে। যেমন, সমুদ্রের ঢেউ এবং সাগরের তলদেশ কথাটা চলতে পারে, তবে সাগরের ঢেউ এবং সমুদ্রের তলদেশ ব্যবহার করাই ভালো। পক্ষান্তরে আকাশের সঙ্গে পৃথিবী এবং আসমানের সাথে যমীন ব্যবহার করা অপরিহার্য। সুতরাং তুমি যদি 'এই আসমান, এই পৃথিবী আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন' লেখো তাহলে তোমার কাগজ-কলম, কে তোমাকে বাধা দেবে! কিন্তু তাতে সাহিত্যের আসরে তোমার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে যেতে পারে।

সাহিত্য ও মজলিস শব্দদু'টো সমশ্রেণীর নয়, তবু তা ব্যবহার করা যায়। তবে আদবী মজলিস, বা আদবের মজলিস। আদবী সভা, বা আদবের সভা কিছুতেই নয়। আদবের জলসা যেমন হবে তেমনি সাহিত্যের জলসা অবশ্যই চলবে, ইলমী মজলিস/জলসা/সভা হতে পারে। ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি, সুন্দর। তবে ফুলের সভায়/আসরে নয়। পুষ্পের সভায়/আসরে হবে।

লাল রক্ত যেমন হয় তেমনি লাল খুনও হতে পারে; তবে বিশুদ্ধ রক্ত শুদ্ধ হলেও বিশুদ্ধ খুন গ্রহণযোগ্য হবে না। তুমি 'খুনের দরিয়া' লিখতে পারো, রক্তের নদী লিখতে হবে। 'খুনের নদী' পার হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করা যাবে না। তদ্রূপ রক্তের হোলিখেলা হলেও খুনের হোলিখেলা হয় না। অর্থাৎ ভারতে হিন্দুরা মুসলিমরক্তের হোলিখেলায় মেতে উঠলেও এখানে আমরা 'হিন্দু-খুনের' হোলিখেলায় মাতি না। মাঝদরিয়া ও মাঝনদী দু'টোই ঠিক আছে। পক্ষান্তরে মধ্যনদী ঠিক হলেও মধ্যদরিয়া ঠিক নয়।

রাতের আকাশে চাঁদ ওঠে, কিন্তু চন্দ্র উদিত হয়। অবশ্য চাঁদও উদিত হতে পারে; তবে সহজ ব্যবহার হলো 'চাঁদ উঠেছে'; 'উদিত হয়েছে', নয়। চাঁদ-তারা এবং চন্দ্র-তারকা লিখতে পারো, কিন্তু এর বিপরীত নয়। বাগানে ফুল ফোটে, আর উদ্যানে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। তবে ক্ষেত্রবিশেষে 'উদ্যানে ফুল ফুটেছে' চলতে পারে। তুমি খুশিতে বাগবাগ হতে পারো, তবে আনন্দে বাগবাগ হওয়া খুব সুবিধাজনক নয়। আনন্দে আত্মহারা হতে পারো; খুশিতে আত্মহারা হলেও আমি বাধা দেবো না। নজরুল যখন খুশিতে আটখানা হন, আমি বুঝতে পারি, কেন তিনি আটখানা হলেন। কিন্তু এ যুগের হুমায়ুন যখন আনন্দে আটখানা হন তখন সত্যি আমি বুঝতে পারি না, কী এর কারণ!

তুমি রাস্তার পাশে গাছ লাগাতে পারো, এটা ভালো কাজ; কিন্তু কখনো বৃক্ষ লাগাতে যেয়ো না। কারণ গোড়ায় যতই পানি দাও, তোমার লাগানো বৃক্ষ বাঁচবে না। যদি বৃক্ষ রোপণ করো, পানি না দিলেও বাঁচতে পারে। গাছের ডাল হলেও বৃক্ষের হয় শাখা। গাছের শাখা তেমন সুন্দর নয়। গাছের লাইন/কাতার/সারি হতে পারে, তবে বৃক্ষের হবে শুধু সারি। গাছনিধন কাজটা যেমন খারাপ, শব্দপ্রয়োগটাও তেমনি অসুন্দর। পক্ষান্তরে বৃক্ষনিধন একই রকম খারাপ কাজ হলেও শব্দপ্রয়োগটি সুন্দর। আর এজন্যই প্রথমটাতে 'টা' এবং দ্বিতীয়টিতে 'টি' যোগ করা হয়েছে। গাছের এবং বৃক্ষের দু'টোরই প্রাণ আছে, যদিও গাছ ও প্রাণ সমশ্রেণীর শব্দ নয়। বৃক্ষের/গাছের প্রাণ আছে। গাছের জান আছে বললে ঠিক হবে না। গাছের সবুজ পাতা এবং বৃক্ষের সবুজ পত্র খুব সুন্দর। অবশ্য বৃক্ষের সবুজ পাতাও অসুন্দর নয়।

শত্রুর দিকে পাথর ছুঁড়ে মারলে এবং চন্দ্রবিন্দু দিতে ভুলে না গেলে শত্রুর মাথা ফাটার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু প্রস্তর ছুঁড়ে মারলে তা বেশি দূর যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, এমনকি চন্দ্রবিন্দু দিলেও। প্রস্তর তোমাকে নিক্ষেপ করতে হবে। দূর অতীতের একটি যুগকে বলা হয় প্রস্তরযুগ। সেটাকে তুমি পাথরযুগ বললে মোটামুটি চলবে। কেউ যদি খুব নির্দয় আচরণ করে তাহলে তাকে তুমি পাষাণহৃদয় বলতে পারো, তবে পাষাণদিল নয়। তার হৃদয় পাষাণ হতে পারে, তবে দিলটা হবে পাথর। অন্তরটা তার পাষাণ হতে পারে, প্রস্তর নয়, পাথর তো নয়ই।

তুমি বাড়ী তৈরী করতে পারো, তবে গৃহ তোমাকে নির্মাণ করতে হবে। আর ভবন! নির্মাণ করাই ভালো, তবে তৈরী করলেও কেউ বাধা দেবে না, কিন্তু প্রাসাদ নির্মাণ করতে হবে, তবে নিন্দার্থে তৈরী করা বলা যায়। বাড়ীর দরজা ও দুয়ার হতে পারে, তবে গৃহের হবে শুধু দ্বার। তাই আমরা 'গৃহদ্বার' বলি, গৃহদুয়ার নয়।

তুমি জল বলবে, না পানি, সেটা আলাদা প্রশ্ন; কিন্তু গ্লাসে যদি জল নাও তাহলে তোমাকে তা পান করতে হবে, জল খাওয়া ঠিক নয়। পানি তুমি পান করতে পারো, খেতেও পারো। তবে পানীয় শুধু পান করা চলে।

গ্রন্থ ও পুস্তক তুমি পাঠ বা অধ্যয়ন করবে, আর বই শুধু পড়বে। গ্রন্থাগার যেমন সুন্দর তেমনি সুন্দর পুস্তকালয় এবং বইঘর। গ্রন্থালয় চলনসই হলেও পুস্তকাগার ভালো নয়। নাওয়া-খাওয়া ভুলে দিন-রাত তুমি বই নিয়ে পড়ে থাকো, তাহলে তোমাকে বইয়ের পোকা বলা যাবে এবং বলা যাবে গ্রন্থকীট, কিন্তু গ্রন্থপোকা নয় এবং নয় বইয়ের কীট। বইপ্রেমিক ও গ্রন্থপ্রেমিক দু'টোই চলে। বই লেখা হয়, আর গ্রন্থ রচনা করা হয়, আর পুস্তক প্রণয়ন করা হয়। গ্রন্থপ্রণয়নও হতে পারে, যেমন হতে পারে পুস্তক রচনা করা, কিন্তু গ্রন্থ বা পুস্তক লেখা ঠিক নয়।

কেশ মানে চুল। তুমি চুলের যত্ন নিতে পারো, তবে কেশপরিচর্যা করতে হবে। কেশগুচ্ছ এবং চুলের গোছা ঠিক আছে, কিন্তু বিপরীতটি নয়। চুলের তেল এবং

কেশতৈল। কেশতেল ও চুলের তৈল ঠিক নয়।
স্বার্থ উদ্ধার করা এবং মতলব হাছিল করা বললে ঠিক আছে। মতলব উদ্ধার করা কিছুটা চলতে পারে, তবে স্বার্থ হাছিল করা মোটেই নয়। গাড়ীতে তুমি চড়তে পারো, উঠতে পারো এবং আরোহণও করতে পারো, কিন্তু যানবাহনে তোমাকে আরোহণ করতে হবে। তদ্রূপ সিঁড়িতে আরোহণ করা যায়, ওঠা যায় এবং চড়া যায়, কিন্তু সোপানে শুধু আরোহণ করা হয়।
রাত ভোর হয়, নিশি ভোর হয়, কিন্তু রজনীর ক্ষেত্রে হবে প্রভাত। খুশিমনে, আনন্দিত মনে, প্রফুল্ল মনে। খোশমনে নয়, বরং খোশদিলে। চিত্তের সঙ্গে হবে প্রফুল্ল চিত্তে, আনন্দিত চিত্তেও হয়, তবে খুশিচিত্তে নয়।
রাতের পাহারাদার এবং নৈশপ্রহরী। রাতের প্রহরী সুন্দর নয়। রাতের সফর এবং নৈশযাত্রা। নিশিযাত্রাও ঠিক আছে, কিন্তু নৈশসফর নয়।
আশা করি, উপরের আলোচনা থেকে তুমি কিছুটা হলেও ধারণা পেয়েছো যে, শব্দের সঙ্গে শব্দের সমশ্রেণিতা রক্ষার বিষয় কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

---

১। আগে ছিলো 'সংস্কৃতভাষা থেকে বাংলাভাষায় এসেছে', এখন প্রথম অংশ থেকে ভাষা শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছে। কারণ একই বাক্যে 'ভাষা' দু'বার ব্যবহার করা শ্রুতিমসৃণ মনে হয় না। দ্বিতীয়ত 'সংস্কৃত'-এর সঙ্গে সমশ্রেণিতা রক্ষা করার জন্য 'এসেছে'-এর পরিবর্তে 'আগমন করেছে' বলা অধিকতর সঙ্গত মনে হয়।

# শব্দের শুদ্ধি-অশুদ্ধি

অনেক সময় আমরা বেমালুম ভুল ও অশুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করি। বহুল ব্যবহারের কারণে বুঝতেও পারি না যে, শব্দটি অশুদ্ধ। অশুদ্ধ শব্দের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আমাদের করণীয় হলো অভিধান ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তোলা। মাদানী নেছাবের ছাত্রদের মধ্যে এ অভ্যাস আলহামদু লিল্লাহ কিছুটা হলেও গড়ে উঠেছে। আমি চাই, সারাদেশের সমস্ত তালিবানে ইলম যেন অভিধানমনস্ক হয়ে ওঠে। তাহলে বানানভুল এবং অশুদ্ধ শব্দ ব্যবহারের বিড়ম্বনা থেকে সহজেই তারা মুক্ত হতে পারবে। নির্ভরযোগ্য অভিধান ব্যবহার করতে হবে এবং অভিধান দেখে শব্দের শুদ্ধাশুদ্ধি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তারপর কোন শব্দ ব্যবহার করতে হবে। দ্বিতীয়ত বাংলাভাষায় যারা বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ তাদের ছোহবত ও সংস্পর্শ গ্রহণ করতে হবে, হয় সরাসরি, না হয় কলমের মাধ্যমে।

তবে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, কোন কিছুতেই বাড়াবাড়ি ঠিক নয়। অনেকের মধ্যে যেমন এ বিষয়ে শিথিলতা ও অসচেতনতা দেখা যায় তেমনি কারো কারো মধ্যে দেখা যায় যথেষ্ট বাড়াবাড়ি। নীচে আমরা দু'টি বিষয় নিয়েই আলোচনা করবো, যদিও আলোচনা করার মত পর্যাপ্ত জানাশোনা এখনো আমি অর্জন করতে পারিনি।১

অনেকে দেশ থেকে দারিদ্রতা দূর করতে চান, কিন্তু তাতে দারিদ্র্য দূর তো হবেই না, বরং দেশের মাটিতে তা আরো গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসবে। তদ্রূপ তুমি যদি 'দৈন্যতা' লেখো তাতে তোমার লেখার দৈন্যই শুধু প্রকটভাবে ধরা পড়বে। 'দরিদ্র' একটি বিশেষণবাচক শব্দ। এর সাথে 'তা' প্রত্যয় যোগ করে একে বিশেষ্যে রূপান্তরিত করা হয়। তুমি স্বচ্ছন্দে বলতে পারো, 'দেশ ও দেশের জনগণকে দরিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে।' কিন্তু দারিদ্র্য নিজেই একটি বিশেষ্যবাচক শব্দ। সতরাং এর শেষে 'তা' প্রত্যয় যোগ করার কোন অবকাশ নেই। আবার দেখো, 'এক'-এর শেষে 'ত্ব'প্রত্যয় যোগ করে তুমি বিশেষ্যে পরিণত করেছো; এখন তাতে 'তা' প্রত্যয় যোগ করে 'একত্বতা' বললে তা হবে অর্থহীন। তদ্রূপ ঐক্য নিজেই বিশেষ্য। সুতরাং ঐক্যতা হলো মূর্খতা।

এ বিষয়ে মূল কথা এই যে, 'তা' বা 'ত্ব' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় বিশেষণকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত করার জন্য। সুতরাং যে শব্দ নিজেই বিশেষ্য, তার শেষে 'বিশেষ্যপ্রত্যয়' যুক্ত করার অবকাশ নেই। এই নিয়মের আলোকে সামনের কথাগুলো পড়ো

তুমি যদি বলো, 'অমুকের আচরণে সৌজন্যতাবোধ নেই' তাহলে তোমার 'ভাষাবোধ' বা ভাষাজ্ঞান সম্পর্কেই প্রশ্ন ওঠবে। তুমি বলবে, 'সৌজন্যবোধ'।

অনেকে লেখে, 'লেখার উৎকর্ষতা সাধনের জন্য নিয়মিত চর্চা করা আবশ্যকীয় একটি বিষয়।' আমি বলি, তা তো অবশ্যই। তবে শুদ্ধ লেখার জন্য ব্যাকরণচর্চা এবং অভিধানমনস্কতা কিছু পরিমাণে হলেও 'আবশ্যক'। ব্যাকরণের নিয়মে উৎকর্ষতা নয়, উৎকর্ষ, এবং আবশ্যকীয় নয়, আবশ্যক। যে কোন অভিধান খুলে দেখলেই এ ভ্রান্তি দূর হতে পারে।

'ঈয়' প্রত্যয়টি যোগ করা হয় বিশেষ্যকে বিশেষণে রূপান্তরিত করার জন্য। যেমন, জাতি–জাতীয়, দল–দলীয়, গোত্র–গোত্রীয়, আরব–আরবীয় (আরবীয় আভিজাত্য)। তদ্রূপ বরণ–বরণীয়, স্মরণ–স্মরণীয়, পালন–পালনীয়।

আবশ্যক শব্দটি নিজেই যেহেতু বিশেষণ সেহেতু আবশ্যকীয় বলা একেবারেই অনাবশ্যক।

সংসদ অভিধান আবশ্যকীয় শব্দটিকে ভুক্ত করে লিখেছে, 'অশুদ্ধ হইলেও বাংলায় প্রয়োগ দেখা যায়।') কিন্তু এক্ষেত্রে একটি মূলনীতি থাকা দরকার, আর তা এই যে, অশুদ্ধ হলেও যার গ্রহণযোগ্যতা আছে সেটাকেই শুধু গ্রহণ করা যায়। নচেৎ অশুদ্ধতার কারণে বহুল ব্যবহার সত্ত্বেও তা অবশ্যবর্জনীয় হবে। আবশ্যকীয়-এর গ্রহণযোগ্যতা নেই। কারণ এর উচ্চারণ কঠিন। তুলনা করে দেখো, আবশ্যক, আবশ্যকতা এবং আবশ্যকীয়, আবশ্যকীয়তা।

এক ভদ্রলোক লিখেছেন, জাহেলি যুগে মানুষ অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলো।' এখানে 'অজ্ঞানতা'কে তিনি অজ্ঞতা ও মূর্খতা অর্থে ব্যবহার করেছেন। এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার ভুল। অজ্ঞানতা শব্দটির মূল অর্থ 'অজ্ঞান অবস্থা বা বেহুঁশ অবস্থা। অবশ্য শব্দটি নতুন অর্থে অভিধানে স্থান পেয়ে গেছে। তাদের যুক্তি হলো, জ্ঞানহীন শব্দটি যদি সংজ্ঞাহীন এবং জ্ঞান থেকে বঞ্চিত উভয় অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে তাহলে অজ্ঞান কেন উভয় অর্থে ব্যবহৃত হবে না। এখন আমার মনে হচ্ছে, এই যুক্তিতে শব্দটির গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।

প্রয়োজন থেকে প্রয়োজনীয়, আবার প্রয়োজনীয় থেকে প্রয়োজনীয়তা, এটা ঠিক আছে। কিন্তু প্রয়োজনতা লেখা অর্থহীন।

এখানে বিশেষণ থেকে বিশেষ্যে রূপান্তরের কিছু উদাহরণ দেয়া হলো– সফল থেকে সফলতা ও সাফল্য; দরিদ্র থেকে দরিদ্রতা ও দারিদ্র্য; উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতা ও উৎকর্ষ; মধুর থেকে মধুরতা ও মাধুর্য; কৃপণ থেকে কৃপণতা ও

কার্পণ্য; বিশিষ্ট থেকে বিশিষ্টতা ও বৈশিষ্ট্য; দীন থেকে দীনতা ও দৈন্য; প্রবল থেকে প্রবলতা ও প্রাবল্য। সুতরাং সাফল্য, দারিদ্র্য, উৎকর্ষ, মাধুর্য, কার্পণ্য, বৈশিষ্ট্য, প্রাবল্য ইত্যাদির পরে 'তা' প্রত্যয় যোগ করা কিছুতেই ঠিক নয়। (প্রাবাল্য লিখতে দেখা যায় কাউকে কাউকে, এটা কিন্তু ঠিক নয়।)

একতা ও একত্ব, চপলতা ও চপলত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে উভয় প্রত্যয় গ্রহণযোগ্য, কিন্তু সবক্ষেত্রে নয়, যেমন মধুরতা, মধুরত্ব নয়; দীনতা, দীনত্ব নয় এবং প্রবলতা, তবে প্রবলত্ব নয়। তদ্রূপ কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষণ থেকে বিশেষ্যে রূপান্তরের জন্য 'তা' ও 'ত্ব' কোন প্রত্যয়ই গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন, লাবণ্য (কান্তি ও সৌন্দর্য অর্থে), কিন্তু লবণতা বা লবণত্ব নয়। তবে নুন অর্থে লবণ থেকে লবণত্ব হবে, লাবণ্য হবে না। তদ্রূপ ললিত থেকে লালিত্য, কিন্তু 'তা' ও 'ত্ব' প্রত্যয়যোগে কিছুতেই নয়।

'তিনি খুব সংযমী লোক, এই সংযমতার কারণেই তিনি সবার প্রিয়পাত্র হতে পেরেছেন।'[২] ভাবতে অবাক লাগে, যিনি বেশকিছু বই লিখেছেন, এটা তার কলমের লেখা! যার মধ্যে সংযম আছে তাকে আমরা বলি সংযমী। সংযম নিজেই একটি গুণ; সুতরাং 'তা' যোগ করে 'সংযমতা' বলা কেন? সহজ উত্তর, ভুল করার জন্য।

কঠোর থেকে কঠোরতা ঠিক আছে; কঠিন থেকে কঠিনতাও ঠিক আছে, কাঠিন্যও হতে পারে, কিন্তু কাঠিন্যতা কেন? একই উত্তর।

'তাদের দু'জনের মধ্যে ইদানিং বেশ সখ্য গড়ে উঠেছে।' উঠতেই পারে, কিন্তু সখ্যতা গড়ে ওঠে কীভাবে? সখ্যতার অপমৃত্যু তো অনিবার্য। তবু সখ্যতা লিখতে কেউ কেউ বেশ আনন্দ পায়।

'ইদানিং' সম্পর্কেও কিছু কথা আছে। অনেকে বলে 'ইদানিংকালে শহরে চুরি-ছিনতাই খুব বেড়ে গেছে।' এটা ঠিক নয়। ইদানিং মানে বর্তমানে; সুতরাং এর সঙ্গে 'কালে' যোগ করার সুযোগ নেই। 'বর্তমানে'-এর স্থলে অবশ্য 'বর্তমানকালে' লেখা যায়। সম্প্রতি শব্দটিও ইদানিং-এর সমার্থক; সুতরাং 'সম্প্রতিকালে' ঠিক নয়; সাম্প্রতিককালে অবশ্য ঠিক আছে।

আমার এক প্রিয় ছাত্র আমাকে বলে, হুযূর দো'আ করবেন, আমার বোনের বিবাহের 'সমালোচনা' চলছে। আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে বললাম, কেন কী হয়েছে? পরে বুঝলাম, সমালোচনা নয়, আলোচনা চলছে। সমালোচনা ও আলোচনা এক নয়। সমালোচনা মানে মন্দ আলোচনা। অবশ্য সাহিত্য-সমালোচনা মানে সাহিত্যের ভালো ও মন্দ উভয় দিক সম্পর্কে আলোচনা।

সম্ভাবনা ও আশঙ্কা শব্দদু'টির ব্যবহারেও ভুল দেখা যায়। ভবিষ্যতে ঘটতে পারে, এমন বিষয়ে আশঙ্কা ও সম্ভাবনা শব্দদু'টি ব্যবহৃত হয়। তবে সম্ভাবনা হবে প্রত্যাশিত ও কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে, আর আশঙ্কা হবে অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়ে। যেমন,

শান্তির সম্ভাবনা এবং যুদ্ধের আশঙ্কা। অবশ্য যেসব দেশ অস্ত্রব্যবসায়ী, তারা বলবে, শান্তির আশঙ্কা এবং যুদ্ধের সম্ভাবনা। কারণ দু'টি দেশের মধ্যে যুদ্ধ হওয়াই তাদের কাম্য, শান্তি তাদের কাম্য নয়। অর্থাৎ একই বিষয় তোমার কাম্য হলে তুমি সম্ভাবনা ব্যবহার করবে, পক্ষান্তরে বিষয়টি যার কাম্য নয় সে ব্যবহার করবে 'আশঙ্কা'। যেমন তোমার বৃষ্টিতে ভেজার খুব ইচ্ছে, তুমি আফসোস করে বলছো, নাহ, বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। পক্ষান্তরে ক্রিকেট খেলা যার ভালোবাসা সে বলবে, বৃষ্টির আশঙ্কা নেই। অর্থাৎ ব্যক্তি ও পরিস্থিতির ভিন্নতায় সম্ভাবনা ও আশঙ্কার বদল হতে পারে।

'অত্র এলাকায় তিনদিন বিদ্যুৎ থাকবে না' কথাটার মানে কি 'এই' এলাকায়? কিন্তু অত্র মানে তো 'এই' নয়, অত্র মানে তো এখানে! এর সমগোত্রীয় শব্দগুচ্ছ হলো– যত্র, মানে যেখানে এবং তত্র, মানে সেখানে এবং সর্বত্র, মানে সবখানে এবং অন্যত্র, মানে অন্যখানে। আমরা বলি, জিনিসগুলো যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে; মানে যেখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে। আশা করি, তুমি বুঝতে পারছো যে, উপরের বাক্যে অত্র শব্দটির অপপ্রয়োগ হয়েছে। সহজ করে 'এ এলাকায়' বললেই হয়ে যায়! এটি বহুল প্রচলিত হলেও ব্যবহার করা যাবে না, কারণ তার নিজস্ব গ্রহণযোগ্যতা নেই।

বিখ্যাত ব্যক্তি সম্পর্কে পত্রিকায় খবর ছাপা হয়, 'ক্রমেই তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে।' অর্থাৎ তার স্বাস্থ্যটা ক্রমেই দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যখন শহরে রোগ ছড়িয়ে পড়ে তখন কেন লেখা হয়, 'ক্রমেই মহামারির অবনতি ঘটছে' কিংবা 'বন্যার অবনতি ঘটছে'? মহামারি বা বন্যার অবনতি ঘটা মানে তো তা দুর্বল হয়ে যাওয়া এবং তার ব্যাপকতা হ্রাস পাওয়া। সুতরাং আমরা তো বন্যা ও মহামারির উন্নতি চাই না, অবনতিই চাই। যদি লেখা হয় বন্যা বা মহামারি-পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে তাহলে আর ভুল থাকে না। তখন অর্থ হবে, বন্য বা মহামারির কারণে যে গুরুতর ও দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তার আরো অবনতি ঘটেছে, অর্থাৎ বন্যা ও মহামারি আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

'তিনি বাংলাদেশের অন্যতম লেখক।' এখানে 'অন্যতম'কে আসলে বিশিষ্ট ও প্রধান অর্থে লেখা হয়েছে; যেমন একজন লিখেছেন, 'কাঁঠাল বাংলাদেশের একটি অন্যতম ফল।' (অর্থাৎ একটি প্রধান ও সুপরিচিত ফল)। কিন্তু 'অন্যতম'-এর প্রকৃত অর্থ হলো, বহুর মধ্যে একজন, বা একটি। সুতরাং 'তিনি বাংলাদেশের অন্যতম লেখক' মানে বাংলাদেশের বহু লেখকের মধ্যে একজন। তদ্রূপ 'কাঁঠাল বাংলাদেশের অন্যতম ফল' মানে অনেক ফলের মধ্যে একটি ফল। তাহলে 'অন্যতম'-এর সঙ্গে একজন, একটা একটি ব্যবহার করা অর্থহীন।

এখানে আমি আমার একটি ভুল সসংকোচে স্বীকার করছি। 'বন্ধুপ্রতিম দেশ' কথাটা পত্রপত্রিকায় এবং সুধিজনদের লেখায় বহুবার দেখেছি এবং ভালো লেগেছে

বলে সম্ভবত নিজেও ব্যবহার করেছি, কিন্তু তলিয়ে দেখিনি। 'ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা' বইটি হাতে আসার পর আমার হুঁশ হলো এবং বুঝতে পারলাম, এটা কত বড় ভুল!

প্রতিম মত বা সদৃশ। তো বন্ধুপ্রতিম মানে পুরোপুরি বন্ধু নয়, বন্ধুর মত, বা বন্ধুস্থানীয়। যদি 'বন্ধুদেশ' না বলে বলি, 'ভারত আমাদের বন্ধুপ্রতিম দেশ' তাহলে অর্থ দাঁড়াবে, ভারত আমাদের বন্ধু নয়, বন্ধুর মত। তবেই ভেবে দেখো, দাদারা কেমন রুষ্ট হবেন! এমনিতেই তো পানি দিচ্ছেন না; প্রতিদিন সীমান্তে 'পাখী' শিকার করছেন; তখন! তাই খুব বুঝে শুনে কথা বলা দরকার।

'বন্ধুপ্রতিম দেশ' সঠিক না হলেও ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ হতে পারে। কারণ যে আমার ভাই নয় তাকে ভাই না বলে ভাইয়ের মত বলাই সঙ্গত। তদ্রূপ 'তিনি আমার পিতৃপ্রতিম'-এর মানে হলো, তিনি আমার পিতা নন, তবে স্নেহ ও মহত্ত্ব দিয়ে তিনি পিতার স্থান অধিকার করে নিয়েছেন।

শিক্ষক সম্পর্কে অবশ্য পিতৃপ্রতিম যেমন বলা যায় তেমনি বন্ধুপ্রতিমও বলা যায়। যেমন, তিনি আমার শিক্ষক, অথচ আমাদের প্রতি তার আচরণ হলো বন্ধুপ্রতিম। যে বইটির মাধ্যমে আমার এ ভুলের সংশোধন হলো তার লেখকের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

শ্বাস ও নিঃশ্বাস একজিনিস নয়। বাইরে থেকে বিশুদ্ধ বাতাস আমরা ফুসফুসে গ্রহণ করি সেটা হলো শ্বাস। আর ভিতর থেকে যে দূষিত বাতাস ত্যাগ করি সেটা হলো নিঃশ্বাস। সুতরাং আমরা শ্বাস গ্রহণ করি এবং নিঃশ্বাস ত্যাগ করি। আরো সহজ ভাষায়, আমরা শ্বাস নেই এবং নিঃশ্বাস ফেলি। দুঃখের বিষয়, শব্দদু'টির পার্থক্য আমরা অনেকেই খেয়াল করি না।

আমরা কেন বলি, 'নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নেই'? শুধু কি শব্দগত সাযুজ্যের কারণে? না, বরং এ কারণে যে, মৃত্যুর সঙ্গে বের হয়ে যাওয়ার সম্পর্ক রয়েছে। কারণ মৃত্যু মানে রূহ বের হয়ে যাওয়া। অথচ প্রকৃতপক্ষে নিঃশ্বাসের যেমন বিশ্বাস নেই তেমনি শ্বাসেরও বিশ্বাস নেই; অর্থাৎ পরবর্তী শ্বাসটি গ্রহণ করতে পারবো কি না তার বিশ্বাস নেই।

একই কারণে আমরা বলি, তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। শ্বাস বললে বলতে হবে, তিনি শেষ শ্বাস গ্রহণ করেছেন, যার আদৌ প্রচলন নেই।

'সব ছাত্ররা' কথাটি ঠিক নয়। কারণ 'সব' হচ্ছে বহুবচন-নির্দেশক শব্দ। সুতরাং শেষে বহুবচনের চিহ্ন 'রা' যোগ করা বাহুল্য ছাড়া কিছু নয়। এটা অবশ্যই বর্জনীয়। হয় বলো, সকল ছাত্র কিংবা ছাত্ররা সকলে।

***

এখন আমি এমন কিছু শব্দ সম্পর্কে আলোচনা করবো যেগুলো অশুদ্ধ হলেও সেগুলোর নিজস্ব গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে; সুতরাং সেগুলো গ্রহণ করে নেয়াই কর্তব্য,

যাতে ভাষার গতি ও সাবলীলতা ব্যাহত না হয়।

সহসা মানে শীঘ্র নয়, অথচ এ অর্থেই সামনের বাক্যদু'টিতে শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। দেখো- 'পরিস্থিতি কোন্ দিকে যাবে, সহসা বোঝা যাবে না।' (অর্থাৎ এখনই বা শীঘ্র বোঝা যাবে না। কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে।) তদ্রূপ 'আমরা আশা করছি, সহসাই দেশ উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে।' ( অর্থাৎ দ্রুত, বা অবিলম্বে উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে।)

অভিধানমতে সহসা মানে আচমকা, অকস্মাৎ ও হঠাৎ। যেমন, 'জনগণের অন্তরে যেভাবে ক্ষোভ ও অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছে তাতে একদিন সহসা বড় ধরনের বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে।' তদ্রূপ- নির্জন পথে পথচারী আপন মনে হেঁটে যাচ্ছিলো, আক্রমণটা এলো সহসা পিছন থেকে।

'উদ্দেশ্যে ও উদ্দেশে' নিয়ে যথেষ্ট লেখা হচ্ছে। উদ্দেশ্য মানে ইচ্ছা, অভিপ্রেত। অর্থাৎ যা আমাদের ইচ্ছা ও কাম্য এবং যা আমরা অর্জন করতে চাই সেটাই উদ্দেশ্য। যেমন 'আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো দ্বীনের ইলম হাছিল করা; এ উদ্দেশ্যেই আমরা মাদরাসায় এসেছি; অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।

উদ্দেশ্য-এর সাথে 'এ' বিভক্তি যুক্ত হয়ে 'উদ্দেশ্যে' হয়েছে। পক্ষান্তরে উদ্দেশে মানে কারো বা কোন কিছুর প্রতি বা দিকে। যেমন 'তিনি দেশের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন।' 'কথাগুলো বলা হয়েছে অমুকের উদ্দেশে।' 'বন্ধুর উদ্দেশে বের হয়েছি, তার খোঁজ না জেনে আর ফিরছি না।'

নীতিগতভাবে এ বক্তব্য অবশ্যই সঠিক। আবার এটাও ঠিক যে, উভয় অর্থেই 'উদ্দেশ্যে'-এর ব্যবহার চলে আসছে এবং শব্দটিতে দ্বিতীয় অর্থের অবকাশও রয়েছে। তাছাড়া' উদ্দেশে'-এর চেয়ে 'উদ্দেশ্যে'-এর শ্রুতিসৌন্দর্য অধিক। সুতরাং উভয় অর্থে শব্দটির ব্যবহারে আপত্তি না করাই উত্তম।

একত্র মানে সমবেত, মিলিত। এটি বিশেষণবাচক শব্দ। সুতরাং এর শেষে 'ইত' প্রত্যয় যুক্ত করার কোন অবকাশ নেই। 'ইত' প্রত্যয় যুক্ত হয় বিশেষ্যকে বিশেষায়নের জন্য। যেমন, পুষ্প+ইত= পুষ্পিত, মুকুল+ইত= মুকুলিত। যেহেতু 'একত্র' নিজেই একটি বিশেষণ সেহেতু 'ইত' প্রত্যয়যোগে এর বিশেষায়নের প্রয়োজন নেই। আমরা বলি, 'ছাত্রদের মসজিদে একত্র হতে বলা হয়েছে।' তবে একত্রিত শব্দটি অনেক পুরোনো এবং অভিধানে যথেষ্ট পুক্তোভাবেই আসন গেড়ে বসেছে। তাছাড়া শ্রুতিগত দিক থেকে কোন কটুতা নেই। সুতরাং কেউ যদি একত্র-এর স্থলে 'একত্রিত' বলে, বলতে দেয়া যায় বলেই মনে হয়।

একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার। সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ বাংলাভাষার উপর জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়ে দেয়া কিছুতেই ঠিক নয়। ভাষার সাবলীলতার প্রয়োজনে ব্যাকরণকে কিছুটা শিথিল অবশ্যই করতে হবে। এটা আমাদের কথা নয়, ভাষাবিদদেরই কথা। 'পরবর্তীতে' শুনে পণ্ডিত মহাশয় হাসতেই পারেন।

কারণ তাতে তিনি বিভক্তিজনিত সমস্যা দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু আমাদের সাধারণ চোখে পরবর্তীতে এবং পরবর্তী কালে, তদ্রূপ আগামীতে ও আগামী দিনে-এর মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য দেখতে পাই না। সুতরাং পণ্ডিত মহাশয়ের হাসি উপেক্ষা করে আমরা এর ব্যবহার অব্যাহত রাখতে চাই।

কলকাতার লেখকবাবুরা সঙ্গে ব্যবহার করেন, আমরা সাথে বেশী ব্যবহার করি। এতে দোষের কী হলো! বলা হয় 'সাথে' শব্দটি কবিতার শব্দ। কিছু শব্দ অবশ্য আছে যা শুধুই কবিতায় ব্যবহৃত হয়। এগুলোকে বলা হয় 'পদ্যীয় শব্দ' যেমন, মোর, মোরা, মোদের। কিন্তু পদ্যের ও গদ্যের 'এজমালি' কিছু শব্দ কি নেই, যা পদ্যে যেমন চলে তেমনি চলে গদ্যেও?

সনে শব্দটি পদ্যীয় হলেও সাথে শব্দটি পদ্যে ও গদ্যে উভয় ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে বলেই মনে হয়।

মাঝে ও মাঝারে-এর মধ্যে মাঝারে শব্দটি পদ্যীয় হলেও মাঝে শব্দটি উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য। মাঝেমধ্যে এবং মাঝেমাঝে যদি চলতে পারে তাহলে 'মাঝে' একলাভাবে কেন চলবে না? কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে 'মধ্যে' বা 'ভিতরে'-এর পরিবর্তে 'মাঝে' ব্যবহার করা অনিবার্য হয়ে পড়ে; বিশেষত আবেগঘন স্থানে। 'বিহনে' কবিতার শব্দ, ঠিক আছে, কিন্তু 'বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ' চলবে না কেন? অনুমতি ছাড়া/ব্যতীত প্রবেশ নিষিদ্ধ বলতেই হবে?

কেউ কেউ বলছেন, 'করে থাকি' লেখা চলবে না, শুধু 'করি' লিখতে হবে। যেমন একটি কথা আমি বলে থাকি, 'ব্যাকরণ নিয়ে বাড়াবাড়ি ঠিক নয়।' আসলে 'বলি'-এর চেয়ে 'বলে থাকি'তে আধিক্য ও জোর রয়েছে, যা শুধু 'বলি'তে নেই। সুতরাং এখানে বাহুল্যদোষ ঘটেছে বলা যায় না। ফেলো-এর স্থানে ফেলে দাও, বলি কেন! ফেলে আবার দেয় কীভাবে! যেভাবে আমি 'ফেলে দেই' সেভাবেই 'দিয়ে থাকি'। মজার বিষয় হলো যিনি 'করে থাকি'-এর প্রতিবাদে সবচে' সোচ্চার তিনি নিজেও একস্থানে 'লিখে থাকি' লিখে ফেলেছেন!

পদক্ষেপ শব্দটিতেও কারো কারো আপত্তি, কিন্তু যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে যেমন বলা যায় তেমনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলতে সমস্যা কোথায় বুঝতে পারি না।

কারো কারো যুক্তি, পদক্ষেপ মানে পা ফেলা। সেটা আবার নেয়া হয় বা গ্রহণ করা হয় কীভাবে? এর দৃশ্যকল্পটি রীতিমত হাস্যকর। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার। অনেক সময় শব্দের মূল অর্থটি চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ আপসৃত হয়ে ব্যবহৃত অর্থটিই শুধু বর্তমান থাকে। তাই হাসবার খুব একটা সুযোগ ঘটে না। তিনি আমাকে পত্রপাঠ বিদায় করে দিয়েছেন। এখানে কেউ কোন পত্র পাঠ করছে, এরূপ দৃশ্যকল্প কি আমাদের চিন্তায় থাকে? না আমরা শুধু এর উদ্দিষ্ট অর্থটিই বুঝি (বুঝে থাকি) যে, তিনি আমাকে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করে দিলেন? উদাহরণ আরো

আছে, ভয় বা বিস্ময় প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমরা বলি, 'দেখে/শুনে আমার তো চক্ষু স্থির! এটা ঠিক আছে, কিন্তু আসলে তো চক্ষু চড়কগাছ! চক্ষু চড়কগাছ হয় কীভাবে। এখানে কি স্থূল দৃশ্যকল্পটি আমাদের চিন্তায় আসে, না শুধু ভীতি ও বিস্ময়ের ভাবটিই আমরা বুঝি? তো আসল কথা হলো চক্ষু যদি চড়কগাছ হতে পারে তাহলে পদক্ষেপ গ্রহণ করাও হতে পারে। এটা কারো 'মাথাব্যথার কারণ হওয়া উচিত নয়।

বাংলাভাষায় ক্রিয়াপদ ব্যবহারে কিছু দিন থেকে যথেচ্ছাচার চলছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। এর সাম্প্রতিকতম উদাহরণ হলো, ফোন দেয়া। জনৈক লেখক সত্যি বলেছেন, শব্দটি দেখতে দেখতে মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়েছে।'

আমার মতে এটা এমনই রুচিবিরুদ্ধ ব্যবহার যে, তা খুব বেশী সময় স্থায়ী হবে না, হতে পারে না। যেমন জোয়ারের মত এসেছে তেমনি অল্পদিনের মধ্যেই ভাটার টানের সঙ্গে চলে যাবে। যেমন একসময় বস্তি থেকে উঠে এসেছিলো হেভি সমস্যা, কোথায় এখন শব্দটা?

কিন্তু প্রশ্ন হলো ক্রিয়াপদের নতুন কোন ব্যবহার গ্রহণযোগ্যই হবে না, এটা কেমন যুক্তি? বক্তব্য পেশ করা যাবে, উপস্থাপন করা যাবে এমনকি প্রদানও করা যাবে; এত কিছু করা যাবে, কিন্তু বক্তব্য রাখা যাবে না; কেন?! ফোন করা– এখানে 'করা'-এর মত সহজ একটি ক্রিয়ার স্থলে দেওয়া আনা হয়েছে শুধু অনুকরণ-রোগের কারণে।

পক্ষান্তরে 'উপস্থাপন করা'-এর মত ভারী শব্দের পরিবর্তে 'রাখা' ব্যবহার করা হয়েছে সহজায়নের উদ্দেশ্যে। সুতরাং দু'টো এক হয় কীভাবে? একজন লিখেছেন, 'তুমি যদি বক্তব্য এবং প্রস্তাব রাখতেই থাকো আমি তাহলে অভিশাপ রাখতে শুরু করবো।' কলমচালনায় এমন অসংযম কোন অভিজাত লেখকের পক্ষে কি শোভা পায়?

আশা করা-এর স্থলে আশা রাখা অবশ্য গ্রহণযোগ্য নয়। প্রশ্ন করা যেমন ঠিক আছে তেমনি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 'প্রশ্ন রাখা'-এরও প্রয়োজন আছে। দাবী যেমন করা যায়, তোলা যায় তেমনি রাখাও যায়। একজন দাবী তুলছে, অন্যজন দাবী রাখছে, উভয় ক্ষেত্রেই দৃশ্যকল্প একই রকম। বরং আমি তো মনে করি, তোলার মধ্যে তুলে নেয়া বা প্রত্যাহার করে নেয়ার সামান্য হলেও গন্ধ আছে, যা 'রাখা'-এর মধ্যে নেই।

উৎসর্গ শব্দটি নিয়ে বামপাড়ার ভদ্রলোকদের কোন সমস্যা নেই; থাকার কথাও নয়। তারা তো মঙ্গলপ্রদীপ পর্যন্ত যেতে রাজী! সমস্যা হচ্ছে আমাদের মাওলানা মহলে। কারণ শব্দটির অর্থ হলো দেবতার উদ্দেশ্যে দান। কিন্তু কথা হলো ওরা আমাদের ছোঁয়া পানি খায় না, আমরা তো ওদের ছোঁয়া জল পান করি, যদি মুখে

কোন না-পাকি না থাকে। আমাদের জাত তো সামান্য ছোঁয়াতে যায় না। তো কোন শব্দে ওদের দেবতার কী না কী ছোঁয়া লেগেছে বলেই আমাদের জন্য তা অস্পৃশ্য হয়ে যাবে? আমরা কি উৎসর্গ শব্দটিকে শুধু দান বা নিবেদন অর্থে ব্যবহার করতে পারবো না? হিন্দুরা পূজা শেষে তাদের প্রতিমা নদীতে বিসর্জন দেয় বলে আমরা শব্দটিকে সাহিত্য থেকে বিসর্জন দেবো? আমরা কি সত্যের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে পারবো না? আসলে আমাদেরকে ভাবতে হবে আবেগ দিয়ে নয়, যুক্তি দিয়ে এবং যুক্তি দিয়ে নয়, আবেগ দিয়ে এবং যুগপৎ আবেগ ও যুক্তি দিয়ে; তাহলেই সাহিত্যের গতি হবে বেগবান।

আজ এ পর্যন্ত থাক। যদি সুযোগ হয় তাহলে এবিষয়ে আরো বিস্তৃত আলোচনা করার ইচ্ছে আছে।

---

১। জানা ও শোনা মিলে হয়েছে জানাশোনা, তাই একসঙ্গে হবে।

২। প্রিয় ভাই বা বন্ধুতে যেরূপ স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, প্রিয়পাত-তে তা নেই। কারণ ভাই বা বন্ধুর মত পাত্র শব্দটির আলাদা ব্যবহার নেই। 'ছেলেটি তার মেয়ের জন্য উত্তম পাত্র হবে বলে মনে হচ্ছে', এখানে আলাদা হবে। কারণ এ অর্থে পাত্র-এর আলাদা ব্যবহার রয়েছে। সৎ পাত্রে কন্যাদান সম্পর্কে একই কথা।

# সুন্দর শব্দব্যবহারের নমুনা

কোন লেখায় শব্দের ব্যবহার ও শব্দচয়ন যদি সুন্দর হয় তাহলে লেখার সৌন্দর্য অনেক বেড়ে যায় এবং লেখাটি সহজেই হৃদয়কে স্পর্শ করে। ভালো লেখকদের লেখায় সুন্দর শব্দচয়নের অনেক উদাহরণ তুমি দেখতে পাবে, যদি চিন্তা করে করে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাদের লেখা পড়ো। এখানে শুধু দু'একটি নমুনা পেশ করছি–

(ক) অনেক দিন পর একলোক অপ্রত্যাশিতভাবে শত্রুকে হাতের নাগালে পেয়ে উল্লাস প্রকাশ করে বলছে, 'আমি কল্পনাও করিনি, ভগবান তোমাকে আমার সামনে এভাবে 'পরিবেশন' করবেন।'

পরিবেশন শব্দটি আস্তো ভুনা মুরগীর একটি লোভনীয় দৃশ্য যেন চোখের সামনে তুলে ধরে। শত্রু যেন ভুনা মুরগীর মত তোমার দস্তরখানে হাজির; চিবিয়ে খাওয়াই শুধু বাকি।

'ভগবান' তোমাকে আমার নাগালে এনে দিয়েছেন, কিংবা অন্য যা কিছু বলা হোক, পরিবেশন শব্দটির যে সুন্দর কল্পরূপ তা কি অন্যকিছুতে আসবে?! হিন্দুর মুখের উক্তি বলে ভগবান শব্দটি এসেছে, তুমি শব্দটিকে পরিবর্তন করে নিজের লেখায় উপযুক্ত স্থানে উপযুক্তরূপে অবশ্যই ব্যবহার করতে পারো। সুন্দর শব্দ ও তার প্রয়োগ কারো একার মালিকানা নয়, তবে তাতে স্বকীয়তা ও সৃজনশীলতার ছাপ থাকতে হবে। উৎকটভাবে যেন ধরা না পড়ে যে অন্যখান থেকে বা অমুক স্থান থেকে আনা হয়েছে

(খ) আমরা সাধারণত বলি, 'বেশী কথা বলো না, মেজাজটা আমার বিগড়ে আছে।' কিন্তু একজন লেখক কথাটায় নতুনত্ব এনে এভাবে বলেছেন– 'বেশী কথা বলো না, মেজাজটা আমার তিন চার রকম হয়ে আছে।' এধরনের আকর্ষণীয় নতুন নতুন ভাবপ্রকাশ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে। উপরের শব্দপ্রয়োগটিকে অনুসরণ করে তুমি বলতে পারো, 'মেজাজটা আমার কয়েক কিসম হয়ে আছে।' তাতে কিছুটা নতুনত্ব আসবে।

(গ) কথার পুনরুক্তিকে দোষণীয় (দোষের) মনে করা হয়। অনেক লেখককেই এবিষয়ে অসচেতন দেখা যায়। বিখ্যাত লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী দেখো কী সুন্দরভাবে এই পুনরুক্তিদোষটা এড়িয়ে গেছেন! তিনি লিখেছেন–

'দিল্লীর লোকেরা রুটি-গোশ্‌ত খেতো; এখনো তারা গোশ্‌ত-রুটি খায়।'

রুটি-গোশ্‌তকে গোশ্‌ত-রুটি করে দেয়াতে পুনরুক্তিটা আর কানে বাজে না। বহু আগে পড়া মুজতবা আলীর এ বাক্যটি আমাকে অনেক আনন্দ দিয়েছিলো। এখনো বাক্যটি আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। আমি আমার লেখায় এ কৌশলটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি।

আমাদের বড় দোষ এই যে, একে তো আমরা সাহিত্যসমৃদ্ধ লেখা পড়ি না, দু'একটা যাও বা পড়ি, শুধু পড়ে যাই; বুঝে বুঝে চিন্তা করে করে এবং স্বাদ গ্রহণ করে করে পড়ি না। ফলে ভালো লেখা থেকে ভালো কিছু গ্রহণ করতে পারি না। একথা আমি বরাবর বলছি, বলতেই থাকবো, যত দিন না তোমাদের মধ্যে ভালো লেখা ভালোভাবে পড়ার অভ্যাস গড়ে ওঠে।

পুনরুক্তিদোষ পরিহার করার জন্য উপরের বাক্যটি অবশ্য এভাবেও বলা যায়– 'দিল্লীর লোকেরা রুটি-গোশ্‌ত খেতো, এখনো খায়।' কিন্তু তিনি যেভাবে বলেছেন তাতে নতুনত্ব এসেছে। 'রুটি-গোশ্‌ত ও গোশ্‌ত-রুটি' আসলে 'রুটি ও গোশতের' মতই সুস্বাদু হয়েছে। শুধু 'এখনো খায়' লিখলে সেই স্বাদ কিছুতেই আসতো না।

(ঘ) অনেক আগে মরহূম আবুল ফজল সাহেবের রোযনামচা পড়েছিলাম। তিনি যেমনই ছিলেন, তার লেখা চমৎকার। একস্থানে তিনি লিখেছেন–
'ঘুষ ও ঘুষি', যেভাবে পারো তাকে ঘায়েল করো।'

এক্ষেত্রে সাধারণত 'ভয়-ভীতি' এবং 'লোভ ও প্রলোভন' বলা হয়; 'ঘুষ ও ঘুষি' শব্দদু'টির ব্যবহার তার লেখাতেই প্রথম পেয়েছি, যা আমার মনে গেঁথে ছিলো। 'ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মু'আবিয়া' বইটিতে সুযোগমত তা ব্যবহার করেছি। অনেক পাঠক আমার এ শব্দপ্রয়োগের নতুনত্বের প্রশংসা করেছেন। আমি অবশ্য বলেছি, এটি আমার সৃজন নয়, মরহূম আবুল ফজল থেকে ঋণগ্রহণ। তাঁর মত ও বিশ্বাস যাই হোক, ঋণস্বীকার তো করতেই হবে।

তুমি যখন কোন লেখা পড়বে তখন গোগ্রাসে না গিলে ধীরে ধীরে বুঝে বুঝে পড়বে, যাতে সুন্দর শব্দ, বাক্য, উপমা, চিত্রকল্প ইত্যাদি ভালোভাবে আত্মস্থ করতে পারো।২ তবে অবশ্যই ভালো লেখকের ভালো লেখা হতে হবে। সাধারণ লেখকের নিম্নমানের লেখা পড়লে তোমার মধ্যে কখনো সাহিত্যবোধ ও সাহিত্যরুচি গড়ে ওঠবে না।৩

(ঙ) মরহূম আবুল ফজল সাহেবের লেখায় আরেকটি বাক্য আমার ভালো লেগেছিলো– 'লোকটি প্রতারণার ইন্দুরকলে আটকা পড়েছে।'
আমরা সাধারণত বলি, 'প্রতারণার ফাঁদে বা জালে আটকা পড়েছে।' বহুল পরিচিত এ উপমা যে কেউ ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু বাংলাসাহিত্যে তিনি একটি উপমা সংযোজন করেছেন। এজন্য অবশ্যই তিনি সাধুবাদ লাভের যোগ্য।

(চ) বহু আগে আমার আম্মার কাছে শোনা। নানীর দেশে আম্মার বয়সের একটি মেয়ে ছিলো। শ্বশুরবাড়ীতে তার উপর খুব নির্যাতন হতো। বাপের বাড়ী থেকে শ্বশুরবাড়ী যেতে কিছুদূর খাল পার হয়ে নৌকা নদীতে গিয়ে পড়তো। তো মেয়েটি নাকি বলতো, নৌকাটা যখন নদীতে পড়তো তখন মনে হতো, নদীর ঢেউ, আর আমার বুকের ঢেউ এক হয়ে যাচ্ছে।'
যখনই কথাটা মনে পড়ে আমার বুকের ভিতরেও কেমন একটা ঢেউ জেগে ওঠে। গ্রামের একটি সাধারণ মেয়ে, কিন্তু মনের ভিতরের কষ্টটা কত মর্মস্পর্শীভাবে প্রকাশ করেছে। নদীর ঢেউ, আর বুকের ঢেউ একাকার হয়ে যাওয়া! কোন সাহিত্যিক এর চেয়ে ভালো আর কী বলতে পারতেন! আম্মার বয়সের মেয়েটি এখন আর দুনিয়াতে নেই। কিন্তু তার ছবি আছে এখনো গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে। এখনো স্বামী ও শ্বশুরবাড়ীর ভয়ে বহু মেয়ের বুকের ঢেউ, আর নদীর ঢেউ এক হয়ে যায়! ইসলাম ছিলো তাদের জন্য রক্ষাকবচ। কিন্তু ইসলামের যারা প্রতিনিধি .... থাক!
মেয়েটি যত দিন বেঁচে ছিলো, শুধু নির্যাতনই সয়ে যেতে হয়েছে। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তার মন্তব্য ছিলো, ' মনে হয় আমার মৃত্যুর কষ্ট বেশী হবে না।' কেন? কারণ 'মৃত্যুর বেশীর ভাগ কষ্ট আমি এই জীবনে ভোগ করে ফেলেছি!' আল্লাহ তাকে জান্নাত নছীব করুন।

---

১। আগে ছিলো শুধু 'দৃশ্য', এখন লিখেছি 'লোভনীয় দৃশ্য'। দেখো, একটি মাত্র শব্দের সংযোজনে বর্ণনা কত আকর্ষণীয় হলো!
২। আগে ছিলো 'হজম করতে পারো', তাতে শব্দের সমশ্রেণিতা ছিলো না। তদুপরি হজম শব্দটি কিছুটা লঘু ও তরল, যা আলোচ্যস্থানের উপযোগী নয়। আত্মস্থ করা-এর সঙ্গে 'ভালোভাবে'-এর চেয়ে উত্তমরূপে হয়ত অধিকতর উপযোগী, তবে সেটাও 'ভালোভাবেই' চলবে।
৩। এখানে একটি কথা স্বীকার করে নিচ্ছি। মাঝে ও সাথে শব্দদু'টি আগে যেভাবে অধিকমাত্রায় ব্যবহার করতাম এখন তা পরিমাণে কমে এসেছে। এখন মনে হচ্ছে, শব্দদু'টির ব্যবহার সীমিত পরিসরে হওয়া উচিত। আগে ছিলো, 'তোমার মাঝে কখনো সাহিত্যরুচি গড়ে ওঠবে না।' এখন মাঝে-এর পরিবর্তে মধ্যে দিয়েছি। আরো কিছু জায়গায় এটা করেছি।

# শব্দপ্রয়োগের কুশলতা

যাকে বলা হয় ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি নিবেদিত সাহিত্যসেবীদের অভিভাবক পুরুষ, সৈয়দ আলী আহসান, কিছু দিন আগে তিনি ইন্‌তিকাল করেছেন। মৃত্যুর মাস দু'য়েক আগে সৌভাগ্যক্রমে মাত্র ত্রিশ মিনিটের জন্য তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিলো। তিনি আমাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং স্নেহসিক্ত আচরণ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে সেটাই ছিলো আমার জীবনে প্রথম দেখা এবং শেষ কথা। আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম, যেন তিনি আমার ছাত্রদের জন্য বাংলাভাষা ও সাহিত্যচর্চার একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠসূচী তৈরী করে দেন। তিনি সদয়সম্মতি প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমারই গাফলতি ও অবহেলার কারণে তা আর হয়ে উঠেনি। যাবো যাবো করছি, এরই মধ্যে তিনি চলে গেলেন; ঘুমের মাঝেই চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে গেলেন। অবহেলায় এমন একটি মূল্যবান সুযোগ হারানোর আফসোস আমার আজীবন থাকবে। নিভু নিভু প্রদীপ থেকে আলো গ্রহণে যারা বিলম্ব করে, এভাবেই বঞ্চনা তাদের ঘিরে ধরে।[1] তিনি বাংলা ব্যাকরণ পড়ার কথা বেশ জোর দিয়ে বলেছিলেন। 'ব্যাকরণ হলো ভাষার গাঁথুনি', তাঁর এ মন্তব্য আমার বেশ মনে পড়ে।

সৈয়দ আলী আহসানের লেখা কিছু আমি পড়েছি এবং স্বাভাবিক কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে তাঁর লেখা আমার ভালো লেগেছে। সাহিত্যজীবনে তাঁর লেখা থেকে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। এখানে আমি তাঁর আত্মজীবনী থেকে একটি উদ্ধৃতির কিছু সাহিত্যগত পর্যালোচনা তোমাদের সামনে তুলে ধরছি। একস্থানে তিনি লিখেছেন—

(ক) 'জীবন অগ্রসর হয় এবং একসময় জীবন শেষও হয়। জীবনে সংকট থাকে, অসহায়তা থাকে, কিন্তু তবু জীবন সকল কিছুকে উপেক্ষা করে সামনের দিকে চলতে বাধ্য হয়।'

জীবন সম্পর্কে এটি একটি সুন্দর দর্শন, যা প্রশান্তচিত্তে জীবনের কাছে নিজেকে অর্পণ করতে এবং জীবনের দাবী হিসাবে কর্মে প্রবৃত্ত হতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। দেখো, তিনি যদি বলতেন,'জীবন অগ্রসর হয় এবং একসময় শেষও হয়।' তাহলে বক্তব্য পূর্ণাঙ্গ হলেও এর ভাষাসৌন্দর্য ক্ষুণ্ন হতো। 'জীবন'-এর পুনরুক্তি যেমন শ্রুতিসৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে তেমনি পাঠকের সামনে জীবনকে অত্যন্ত গভীরভাবে তুলে ধরেছে। তবে পরবর্তীতে তিনি যদি বলতেন, 'জীবনে সংকট থাকে, শঙ্কা থাকে, অক্ষমতা ও অসহায়তা থাকে, তবু জীবন সকল...।' তাহলে বাক্যটি আরো সুন্দর ও সর্বাঙ্গীন হতো কি না ভেবে দেখো।

'চলতে বাধ্য হয়' কথাটার মধ্যে জীবনের সম্মুখগতির স্বতঃস্ফূর্ততা নেই। মনে হয় জীবন বুঝি সুযোগ পেলে সামনে চলা এড়িয়ে যেতো। অথচ আখেরাতের দিকে আমাদের জীবনের গতি তো স্বতঃস্ফূর্ত। তাই যদি বলা হতো, 'তবু জীবন সকল কিছুকে উপেক্ষা করে পরম পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়।' তাহলে সম্ভবত বক্তব্যে ভাবের পূর্ণ সমৃদ্ধি ঘটতো।

(খ) কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে একটি দৃশ্য অবলোকন করে তার মনে অপরিচিত একটি শিহরণ জেগেছিলো। তাই তিনি হতবাক হয়ে বলেছেন–

'এ কোন পৃথিবীতে এলাম? আমি এত দিন যে পৃথিবীকে জানতাম সেখানে মানুষের জীবন কত শান্ত ও নিশ্চিত! একটি নিরুপদ্রব শান্ত জীবনধারায় আমি অভ্যস্ত ছিলাম, কিন্তু এখানে দেখি সকল পদক্ষেপই অপ্রস্তুত পদক্ষেপ।'

মাত্র চারটি শব্দের প্রথম বাক্যে প্রশ্নকে আশ্রয় করে যে বিহ্বলতা ফুটে উঠেছে তা অন্য কোনভাবে সম্ভব হতো বলে মনে হয় না।

'আমি এত দিন...' এবং এত দিন আমি...' কথাদু'টিকে সশব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে কানে বাজিয়ে দেখো, উভয়ের কোনটিতে উচ্চারণমাধুর্য বেশী! আমার মনে হয় 'এত দিন আমি'-এর উচ্চারণ অধিক শ্রুতিমধুর। কিন্তু পূর্ববর্তী বাক্যের শেষ শব্দটি হচ্ছে 'এলাম'; সুতরাং পরবর্তী বাক্যটি 'এ' দিয়ে শুরু হলে একটু শ্রুতিকটুতা আসে বৈকি। তাই মনে হয় সচেতনভাবেই তিনি 'এত দিন আমি' না বলে 'আমি এত দিন' বলেছেন।

তবে তাঁর শব্দকুশলতার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে 'অপ্রস্তুত পদক্ষেপ' কথাটিতে। শব্দচয়নের অভিনবত্ব আলী আহসানের একক বৈশিষ্ট্য, যা আমরা শুধু অনুকরণের চেষ্টা করতে পারি।

(গ) একস্থানে তিনি লিখেছেন–

'কোনটি সুন্দর এবং কোনটি সুন্দর নয় তা বলা কঠিন। কিন্তু তবু মনে হয় প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব উপলব্ধির কাছে সুন্দর-অসুন্দরের একটি হিসাব ঠিক করা আছে।'

প্রশ্ন করা যায়, সৈয়দ আলী আহসান, 'কোনটি সুন্দর এবং কোনটি অসুন্দর' কেন

বললেন না, অথচ পরে বলেছেন, ...সুন্দর-অসুন্দরের একটি হিসাব...?
প্রথম কারণ, এখানে সুন্দরের প্রতি স্বভাব-অনুরাগের কারণে অসুন্দর শব্দটিকে তিনি এড়িয়ে গেছেন। যেমন 'মিথ্যা বলেছে'র পরিবর্তে বলা হয়, 'অসত্য বলেছে' বা 'সত্য বলেনি'। দ্বিতীয়ত সুন্দর-অসুন্দর-এর পুনরুক্তি পরিহার করাও উদ্দেশ্য। তবে একটি কথা, সৌন্দর্যের আলোচনায় নিরেট বৈষয়িক শব্দ 'হিসাব' ব্যবহার না করলেই বোধ হয় ভালো হতো। তাছাড়া এখানে শব্দের কিছুটা অপচয়ও ঘটেছে। আরো কম শব্দে কথাটা প্রকাশ করা যায় এভাবে, 'তবু মনে হয়, প্রত্যেক মানুষের সুন্দর-অসুন্দরের নিজস্ব একটি উপলব্ধি আছে।' কিংবা 'তবু মনে হয়, সুন্দর-অসুন্দর সম্পর্কে প্রত্যেকের নিজস্ব একটি পূর্ব-উপলব্ধি আছে।'

(ঘ) অন্যত্র তিনি লিখেছেন–
'আমাদের জীবনে অতীতে প্রকৃতির পৃষ্ঠপোষকতা ছিলো, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখন আর নেই। এখন নির্জনতাকে কামনা করা যায়, কিন্তু পাওয়া যায় না।'
এখানে পৃষ্ঠপোষকতা শব্দের ব্যবহারে মানুষের প্রতি প্রকৃতির যে মমতা ফুটে উঠেছে, অন্য কোন শব্দে কি তা সম্ভব হতো?
'কামনা করা যায়' এবং 'পাওয়া যায় না' এদু'টি অংশকে 'কিন্তু'সহ এবং 'কিন্তু' ছাড়া উচ্চারণ করে দেখো, কিন্তু ছাড়া দ্বিতীয় অংশটি যেন উচ্চারণে অপেক্ষাকৃত ছোট হয়ে যায়। তাছাড়া তাতে বক্তব্যের জোর থাকে না। পক্ষান্তরে প্রথম বাক্যে কিন্তু শব্দটি না থাকলেই ভালো লাগে। তদুপরি পর পর দু'টি 'কিন্তু' কিছুটা শ্রুতিকটুও বটে।
আরেকটি কথা, 'আমাদের জীবনে অতীতে'-এর পরিবর্তে 'পিছনে/অতীতে আমাদের জীবনে' বললে কেমন হয় তা ভেবে দেখা যেতে পারে।

(ঙ) অন্যত্র তিনি লিখেছেন–
'এখনকার দিনে বৃক্ষকর্তন করে আমরা প্রশস্ত এলাকা তৈরী করে নেই, কিন্তু অতীতে এটা ছিলো না। পাহাড় পাহাড়ের মতই থাকতো। নদী তার নিজস্ব গতিতেই চলতো। বনভূমিতে গাছগুলো শ্রেণীবদ্ধভাবে নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে থাকতো। এগুলোকে নিয়েই মানুষের বসবাস ছিলো। এখন আমরা সবকিছুতেই হাত লাগিয়েছি। মানুষের নিষ্ঠুর করস্পর্শে প্রকৃতি আহত হয়েছে।'
এখানে প্রকৃতির প্রতি লেখকের যে মমতা ও আকুতি ফুটে উঠেছে, পাঠকচিত্তকে তা অবশ্যই স্পর্শ করবে।
'এখন আমরা' না বলে লেখক বলেছেন, 'এখনকার দিনে আমরা' আশা করি, এর সৌন্দর্যটুকু তুমি অনুভব করতে পারছো। দ্বিতীয়টিতে আশ্চর্য সুন্দর একটি সুরছন্দ রয়েছে, যা প্রথমটিতে অনুপস্থিত।
'পাহাড় কাটা হতো না' না বলে বলা হয়েছে, 'পাহাড় পাহাড়ের মতই থাকতো।' এটি অনেক বেশী ভাবপূর্ণ।

তবে বনভূমির গাছ সম্পর্কে 'শ্রেণীবদ্ধভাবে' কথাটা না থাকলেও চলতো। কেননা শ্রেণীবদ্ধতা বনভূমির বৈশিষ্ট্য নয়। তাছাড়া গাছগুলোর নিশ্চিন্ততা নষ্ট কারার কথাটা বলাই এখানে উদ্দেশ্য, সেগুলো শ্রেণীবদ্ধ, না অশ্রেণীবদ্ধ সেটা বলা এখানে উদ্দেশ্য নয়।

'প্রকৃতি আহত হয়েছে' কথাটি মর্মস্পর্শী, তবে করস্পর্শে কোমলতা থাকে, নিষ্ঠুরতা থাকে না। সুতরাং বলা ভালো ছিলো, 'মানুষের নিষ্ঠুর হাতে প্রকৃতি বড় বেশী আহত হয়েছে।'

প্রথম বাক্যটির পরে যদি বলা হতো, 'এবং নদীশাসন করে ভূমিরক্ষার চেষ্টা করে থাকি' তাহলে মনে হয় বক্তব্যটি অধিকতর পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতো।

'প্রশস্ত এলাকা তৈরী করে নেই' ভালো, তবে এরচে' ভালো হয় যদি বলি, 'বৃক্ষকর্তন করে আমরা প্রশস্ত জনপদ গড়ে তুলি' (বা তৈরী করি)।

'হাত লাগিয়েছি' কথাটা হয়ত চলবে, তবে এর বেশী ব্যবহার হলো কাজে প্রবৃত্ত হওয়া অর্থে। 'হস্তক্ষেপ করেছি' বললে আরো ভালো হতো বলে মনে হয়।

'এগুলোকে নিয়েই মানুষের বসবাস ছিলো।' আমার মনে হয় তাঁর চিন্তায় আরো বিকল্প বাক্য ছিলো। যেমন–

০ এগুলোকে নিয়েই মানুষের বসবাস ছিলো।

০ এগুলোকে সঙ্গে করেই ...

০ এভাবেই প্রকৃতির কোলে এবং প্রকৃতির মমতার ছায়ায় মানুষের বসবাস ছিলো। আমার মনে হয় অনেক চিন্তা-ভাবনা করেই তিনি প্রথম বাক্যটি গ্রহণ করেছেন। কারণ তাতে অনিবার্যতা ও স্বাভাবিকতার একটি ছাপ ফুটে উঠে। অর্থাৎ বাক্যটির আবহ থেকে বোঝা যায়, লেখক বলতে চাচ্ছেন, সেটাই মানুষের জন্য ভালো ছিলো। তৃতীয় বাক্যটি অধিকতর ভাবপূর্ণ হলেও ঐ ভাবটি নেই যা হচ্ছে লেখকের বক্তব্যের মূল সুর।

---

১। আগে ছিলো, 'অন্ধকার তাদের গ্রাস করে', চিন্তা করে দেখো, কত মারাত্মক ভুল ছিলো এটা! [এখানে ত্রুটি শব্দটি ছিলো, আসলে এটা ছিলো ত্রুটির চেয়ে গুরুতর, তাই এখন ভুল শব্দটি ব্যবহার করলাম] অন্ধকার গ্রাস করা শুধু ভ্রষ্টতা ও গোমরাহির ক্ষেত্রেই বলা যেতে পারে। আল্লাহ হেফাযত করুন, আমীন।

# শব্দব্যবহারে উপযোগিতা রক্ষা করা

শব্দব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা মাত্রা, পরিমিতি ও বাস্তবতা রক্ষা করি না। এটা লেখার স্বাভাবিক সৌন্দর্য ক্ষুণ্ন করে। এবিষয়েও আমাদের সচেতনতা দরকার। বাংলাভাষায় লেখকরূপে যারা বরেণ্য তারা এক্ষেত্রে যেমন ছিলেন সজাগ তেমনি ছিলেন চৌকশ। কোন লেখা পড়ার সময় যদি এদিক থেকেও লেখাটিকে বিচার করি, আবার নিজেরা লেখার সময়ও বিষয়টির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখি তাহলে অবশ্যই আমাদের লেখায় মাত্রা ও পরিমিতিবোধ আসবে, ইনশাআল্লাহ।

প্রথমে কিছু নমুনা তুলে ধরছি যেখানে উপরোক্ত বিষয়গুলো রক্ষিত হয়নি। দেখো–

(ক) একজন নবীন লেখক লিখেছেন, 'খালেদের কথায় সে কষ্ট পেলো, আর তার দু'চোখ থেকে নেমে এলো অশ্রুর বান।'

প্রথম কথা, 'চোখ থেকে অশ্রু পড়া'– এর সাহিত্যিক প্রকাশ মাত্রাভেদে কয়েক রকম হতে পারে। যথা–

(ক) তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরলো বা প্রবাহিত হলো।

(খ) তার চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হলো, বা আশ্রুর ধারা নেমে এলো।

(গ) তার চোখে অশ্রুর বান ডাকলো। (অশ্রুর বান নামলো– কথাটা ঠিক নয়।)

(ঘ) তার চোখ থেকে অশ্রুর বন্যা বয়ে গেলো। ইত্যাদি।

দ্বিতীয় কথা, অল্প কষ্টে মানুষের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়, কিংবা চোখ থেকে অশ্রু ঝরে, অশ্রুর বান ডাকে না। সুতরাং বলতে হয়, লেখক এখানে শব্দব্যবহারে পরিমিতি রক্ষা করেননি, ফলে তার লেখার সৌন্দর্য ক্ষুণ্ন হয়েছে।

(খ) জনৈক ছাহাবীকে মদীনার কবরস্থান জান্নাতুল বাকীতে দাফন করার দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে এভাবে– 'মদীনার কবরস্থান। লাখো মানুষের ভীড়। সবার সামনে

একটি কবর।' অথচ তখন হয়ত সমগ্র মদীনায়ও লক্ষ লোকের বসতি ছিলো না। তাছাড়া লক্ষ মানুষের সমাবেশে কবরটি সবার সামনে হতে পারে না। পরিমিতি ও বাস্তবতা দু'টোই এখানে লঙ্ঘিত হয়েছে।

আরেকটি কথা, মদীনার কবরস্থান যেহেতু 'জান্নাতুল বাকী' এই সুন্দর নামে পরিচিত সেহেতু সেই নামটির উল্লেখ এখানে কাঙ্ক্ষিত ছিলো। লেখক যদি এভাবে বলতেন– 'মদীনার কবরস্থান জান্নাতুল বাকী। সেখানে হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ। সামনে একটি নতুন কবর।'

ভীড় শব্দটি এখানে শোভনীয় নয়, তার পরিবর্তে সমাবেশ বা জমায়েত ব্যবহার করা যায়। ভীড় শব্দটি সাধারণত অপ্রয়োজনীয়, অপ্রিয়, অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

(গ) গাযওয়াতুল বদরের প্রস্তুতিপ্রসঙ্গে একই লেখক লিখেছেন–

'ছাহাবা কেরাম মসজিদে নববীর বিশাল চত্বরে সমবেত হলেন।' অথচ নবী-যুগে মসজিদে নববীর আকার-আয়তন 'বিশাল' ছিলো না, এমনকি বিরাটও ছিলো না; সুতরাং শুধু চত্বরে বা অঙ্গনে বলাই যথেষ্ট ছিলো। বড় জোর প্রশস্ত শব্দটি ব্যবহার করা যায়। আরো ভালো হয় যদি বলা হয়, 'ছাহাবা কেরাম মসজিদে নব্বীতে একত্র/সমবেত/জমায়েত হলেন।

(ঘ) একই লেখক লিখেছেন, 'বাগানের ঐ লাল গোলাবটি নিশ্চয় দেখেছো! কত সুন্দর! তার ঘ্রাণে চারদিক মৌ মৌ করছে।'

একটি মাত্র গোলাবের ঘ্রাণে কি চারদিক মৌ মৌ করে? তাছাড়া গোলাবের ঘ্রাণ তো হাসনাহেনার মত তীব্র নয়। খুব বেশী হলে বলা যায়, 'তার ঘ্রাণে বাতাস সুরভিত হয়ে আছে।

শব্দপ্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় নিজস্ব পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হই, অর্থাৎ যে স্থান, কাল ও পাত্র সম্পর্কে লিখছি সেগুলোর উপযোগী শব্দ ব্যবহার করার পরিবর্তে আমরা নিজেদের স্থান, কাল ও পরিমণ্ডলের পরিচিত শব্দ ব্যবহার করি। বলাবাহুল্য সাহিত্যের মানদণ্ডে এটা বড় ধরনের ত্রুটি, যা লেখার সৌন্দর্যকে ক্ষুণ্ন করে। সামান্য একটু সচেতনতার পরিচয় দিলেই এ ত্রুটি থেকে আমাদের কলম মুক্ত হতে পারে। এবিষয়ে কিছু নমুনা নীচে তুলে ধরা হলো

(ক) একই লেখক লিখেছেন–

'ঐ ছাহাবী কাকডাকা ভোরে মসজিদে নববীতে হাজির হলেন।' বলাবাহুল্য, কাকডাকা ভোর হচ্ছে বাঙ্গালী লেখকের নিজস্ব পরিবেশের শব্দ, মদীনাহর নয়। এখানে 'খুব ভোরে' বলাই ঠিক ছিলো।

(খ) অন্যত্র তিনি ছাহাবী হযরত যায়দ বিন ছাবিত (রা.)-এর মৃত্যুতে তাঁর ছাত্র হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর শোকার্ততা সম্পর্কে লিখেছেন–

'মা-হারা অসহায় সন্তানের মত গুমড়ে গুমড়ে কাঁদছে তার হৃদয়।'
প্রথম কথা, ভদ্রজনের ক্ষেত্রে 'মা-হারা' বলা হয় না, বলা হয় 'মাতৃহীন' বা 'মাতৃহারা'। দ্বিতীয় কথা, বাঙ্গালীজাতি মাতৃকেন্দ্রিক, পক্ষান্তরে আরবজাতি হলো পিতৃকেন্দ্রিক। তাই আমরা বলি 'মাতৃভূমি', আর আরবরা বলে, 'পিতৃভূমি'। সুতরাং এখানে 'মাতৃহীন অসহায় সন্তানের মত' না বলে বলা দরকার, 'পিতৃহীন/পিতৃহারা এতীমের মত'। গুমড়ে গুমড়ে শব্দটির বানান হলো ব-শূন্য 'র'। সম্ভবত এটি মুদ্রণভুল নয়। তাছাড়া গুমরে গুমরে শব্দটি এখানে বক্তব্যের সাহিত্য-সৌন্দর্যকে 'দুমড়ে মুচড়ে' শেষ করে দিয়েছে। অনেক আগে একটি বাক্য পড়েছিলাম আধুনিক আরবী সাহিত্যের স্বনামধন্য লেখক মুস্তফা মানফুলূতী-এর কিতাবে। বাক্যটির ভাবানুবাদ এরকম– 'যারা মহান তাদের সবকিছু মহান, এমনকি তাদের হাসি-কান্নাও মহান।'
তো হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মত ছাহাবীর হৃদয়ের কান্না প্রকাশ করার জন্য আরো অভিজাত শব্দ দরকার। অবশ্য এখানে আমরা স্বাভাবিক শব্দেও বলতে পারি– 'তাঁর হৃদয় পিতৃহীন এতীম শিশুর মত কেঁদে উঠলো।'

(গ) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই-এর মুনাফেকি সম্পর্কে জনৈক লেখক লিখেছেন–
'সে সর্বদা শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করতো।'
এটা লেখকের নিজস্ব পরিবেশের শব্দ ও বাগ্‌ধারা, মদীনার মুনাফেক-সরদারের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার ঠিক হয়নি। বেচারা যদিও বা মাছ পায়, সেই মাছ ঢাকার জন্য শাক পাবে কোথায়?! যদিও বা শাক পায়, শাক দিয়ে মাছ ঢাকার বাঙ্গালী-বুদ্ধিটা তার মাথায় আসবে কোত্থেকে?!

(ঘ) উল্লাস হচ্ছে আনন্দের উৎকট প্রকাশ। তাই অমুক ছাহাবী আনন্দিত মনে, উল্লসিত হৃদয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন।', কিংবা 'জিহাদের কথা শুনে ছাহাবীদের মাঝে উল্লাস দেখা দিলো।'– এধরনের কথা সুন্দর নয়।
'বড় পবিত্র তার হৃদয়, অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন তার মন' কথাটা ঠিক নয়। কেননা পবিত্রতা হলো সর্বোচ্চ শব্দ, আর পরিচ্ছন্নতা হলো সাধারণ শব্দ। সুতরাং পবিত্রতা-এর পর পরিচ্ছন্নতা-এর উল্লেখ তাৎপর্যহীন।
এ ভুল অন্তত সেই লেখকের করা উচিত নয়, যিনি আরবী বালাগাত পড়েছেন, যিনি .. এর মর্ম জানেন এবং .. এর অসৌন্দর্যের বিষয় জানেন।
আরেকটি কথা, 'বড়' ও 'অত্যন্ত' এক মাপের শব্দ নয়। সুতরাং দ্বিতীয় বাক্যে 'খুব' কিংবা 'অতি' শব্দটি ব্যবহার করা সঙ্গত ছিলো। তদ্রূপ প্রথমে 'হৃদয়' ও পরে 'মন'-এর ব্যবহার ঠিক নয়। আমার মতে বাক্যটি এরকম হতে পারতো, 'খুব পরিচ্ছন্ন তার মন, অতি পবিত্র তার হৃদয়।'
আরো ভালো হয় যদি বলা হয়, 'বড় পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র তার হৃদয়।' সবচে' ভালো হয় যদি পরিচ্ছন্ন শব্দটি বাদ দিয়ে বলা হয়, 'বড় পবিত্র তার হৃদয়।' কারণ

পরিচ্ছন্ন হচ্ছে হৃদয়ের খুব স্বাভাবিক গুণ, যা যে কোন ভালো মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। একজন ছাহাবীর শানে এ শব্দের ব্যবহারে তেমন কোন অর্থবহতা নেই। তারপরো যদি ব্যবহার করতে হয় তাহলে দু'টি বাক্যের পরিবর্তে একটি বাক্য ব্যবহার করাই ভালো, অর্থাৎ 'বড় পবিত্র তার হৃদয়, অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন তার মন।' এই যুগলবাক্যের পরিবর্তে 'খুব পরিচ্ছন্ন তার মন, অতি পবিত্র তার হৃদয়' এই যুগলবাক্যটি ভালো। এর চেয়ে ভালো হলো এই এককবাক্যটি– 'বড় পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র তার হৃদয়।'

(ঘ) একই লেখকের লেখায় নীচের বাক্যটি দেখতে পেলাম, 'কোরআন ও হাদীছে যে যত বেশী নিপুণ ও দক্ষ ফেকাহশাস্ত্রে সে তত বেশী নিপুণ ও দক্ষ।'

এখানে দক্ষ শব্দের ব্যবহার মোটামুটি ঠিক আছে, কিন্তু নিপুণ শব্দটির ব্যবহার মোটেই ঠিক নয়। এটি সাধারণত কাজকর্ম ও কারিগরি দক্ষতার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত।

বিশেষণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের বেশ ত্রুটি দেখা যায়। আমার এক ছাত্র সেদিন একটি আরবী বাক্যের তরজমা করলো এভাবে– 'ফেরাউনের ক্ষিপ্ততা বিশাল আকার ধারণ করলো।'

ক্ষিপ্ততা বিরাট বা বিশাল হয় না, ভীষণ বা ভয়ঙ্কর হয় এবং তা আকার ধারণ করে না, রূপ ধারণ করে। সুতরাং বলা উচিত ছিলো– 'ফেরাউনের ক্ষিপ্ততা ভীষণ বা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করলো।'

তাছাড়া এখানে অনুবাদের ছাপ রয়ে গেছে সুন্দর বাংলা হবে এরকম– 'ফেরাউন ভীষণ ক্ষিপ্ত হলো।'

একজন লেখক ছাহাবী সম্পর্কে লিখেছেন, 'তিনি প্রচণ্ড আনন্দিত হলেন।' এখানে প্রচণ্ড শব্দটির সুপ্রয়োগ হয়নি। বলা উচিত, 'অত্যন্ত/খুব আনন্দিত হলেন। 'ভীষণ খুশী হলেন'ও চলতে পারে।

এবার সুন্দর শব্দপ্রয়োগের কিছু নমুনা পেশ করি–

(ক) নাস্তিক লেখক হুমায়ূন আযাদ 'আমার অবিশ্বাস' গ্রন্থে এ বাক্যটি লিখেছেন, 'শিশিরভেজা ঘাসের সবুজ দেখে আমি আনন্দ পাই। আমার চোখেও সেই সবুজের ছায়া পড়ে কিন্তু শহরের দালান-কোঠা দেখতে নোংরা লাগে, চোখ অসুস্থ বোধ করে।'

মানুষ যে বস্তু অবলোকন করে, তার চোখের তারায় সে বস্তুর ছায়া পড়ে। তুমি কারো চোখের খুব কাছে গিয়ে দেখো, তার চোখের তারায় তোমার ছায়া দেখতে পাবে। তাই হুমায়ূন আযাদ চোখে সবুজের ছায়া পড়ার কথা লিখেছেন। তদ্রূপ চোখের জন্য অসুস্থতা বোধ করা-এর ব্যবহারও সুন্দর হয়েছে। যদিও লোকটা নাস্তিক, কিন্তু তার লেখার সাহিত্য-সৌন্দর্য তুমি অস্বীকার করবে কীভাবে? এবং কোন সাহিত্যামোদীকে তার লেখার প্রতি মুগ্ধতা থেকে উদ্ধার করবে কীভাবে, যদি না তুমি আরো সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী সাহিত্য উপস্থিত করতে পারো![১]

আমার শুধু আফসোস, হুমায়ূন আযাদ যত দিন বেঁচে ছিলেন শিশিরভেজা ঘাসের সবুজ দেখে আনন্দ পেয়েছেন, এমন কি চোখের তারায় সেই সবুজের ছায়া অনুভব করেছেন; অনুভব করতে পারেননি শুধু সবুজের দৃশ্য ছায়ার পিছনের অদৃশ্য ছায়াটি। সবুজ ঘাসের ডগায় শিশিরবিন্দু দেখেছেন, কিন্তু বুঝতে চাননি, কী এই শিশির? কেন এই শিশির?

'আমি আনন্দ পাই'-এর পরিবর্তে হতে পারে, 'আমি আনন্দিত হই', কিংবা 'আমার ভালো লাগে'। অবশ্য 'আমার'-এর পুনরুক্তির চেয়ে 'আমি ও আমার' ভালো। 'দালান-কোঠা দেখতে নোংরা লাগে', এর চেয়ে ভালো হয় যদি বলি, 'শহরের দালান-কোঠা বড় নিষ্প্রাণ/প্রাণহীন মনে হয়'। এখানে নোংরা শব্দটির ব্যবহারে সম্ভবত অতিকথন রয়েছে। অবশ্য এই অতিকথনতা দূর করার জন্য বলা যায়, 'কেমন যেন নোংরা লাগে', অথবা 'নোংরা নোংরা লাগে'।

(খ) মরহূম সৈয়দ আলী আহসান তাঁর 'জীবনের শীলান্যাস' গ্রন্থে লিখেছেন, 'ছোট বয়সে গ্রামে থাকতে বৃষ্টিকে অনুভব করবার জন্য এবং বৃষ্টিকে স্পর্শ করবার জন্য বৃষ্টিতে ভিজতাম।'

বৃষ্টি যে অনুভব করার এবং স্পর্শ করার বিষয়, এ ধারণাটি খুবই সুন্দর।

আরেকটি বিষয় দেখো, এখানে 'ছোট বয়সে'-এর পরিবর্তে শৈশবে লেখা হলে বাক্যটির সৌন্দর্য ক্ষুণ্ন হতো। কেননা পুরো বাক্যটির পর্ববিভক্তি এরকম– 'ছোট বয়সে/গ্রামে থাকতে/বৃষ্টিকে অনুভব করবার জন্য,/বৃষ্টিকে স্পর্শ করবার জন্য/ বৃষ্টিতে ভিজতাম।'

'শৈশবে' লিখলে প্রথম পর্বটি হতো একশব্দের, তাতে পাশাপাশি পর্বদু'টির ভারসাম্য ক্ষুণ্ন হতো। দেখো, অন্যত্র তিনি লিখেছেন, 'শৈশবে গ্রামে যখন ছিলাম...।'

এখানে কিন্তু তিনি 'ছোট বয়সে' লেখেননি। বলাবাহুল্য, এ তারতম্য তিনি বুঝেশুনেই করেছেন।২

(গ) বাইরে নিরিহ ভাব, কিন্তু ভিতরে চালাক, এধরনের লোককে বলা হয় 'ভিজে বেড়াল'। একজন লেখক শব্দটির ব্যবহারে নতুনত্ব এনেছেন এভাবে– 'তুমি ওর 'ভিজেবেড়ালি' কথায় ভুলে যেয়ো না।'

(ঘ) ইসলামের ইতিহাসে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যুগপৎ জিহাদি জাযবা ও নিষ্ঠুরতা এবং কল্যাণ ও ধ্বংসের প্রতীক। তা থেকে 'ইতিহাসের কাঠগড়ায়' আমি 'হাজ্জাজি কলম' শব্দটি ব্যবহার করেছি এমন একজন ইসলামী লেখক-গবেষক ও চিন্তাবিদ সম্পর্কে, যার কলম ইসলামের ক্ষতি ও কল্যাণ দু'টোই করেছে। বাক্যটি এই–

'তিনি তার হাজ্জাজি কলম একবার ইসলামের পক্ষে পরিচালনা করলে দশবার করেন ইসলামের বিপক্ষে, সজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞাতসারে।'৩

অনেক সময় উল্লেখের চেয়ে অনুল্লেখ বেশী অর্থময় ও আবেদনপূর্ণ হয়ে ওঠে। আবার এমনও হয় যে, শব্দটি কী হবে তা পাঠক বুঝতে পারেন, কিন্তু তার উল্লেখ করা রুচিবিরুদ্ধ। আরো কারণ হতে পারে। সেক্ষেত্রে লেখক কথাটি উল্লেখ না করে '...' দিয়ে অনুল্লেখের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। নীচে পুষ্পের একটি সম্পাদকীয়-এর অংশবিশেষ পড়ো। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম, 'আমি দেবো আমার বুকের রক্ত'।

'চোখের পানি নয়, এখন প্রয়োজন জিহাদের আগুন। কলমের কালি নয়, এখন প্রয়োজন বুকের তাজা খুন এবং দুর্বলের ফরিয়াদ নয়, এখন প্রয়োজন বজ্রের গর্জন। কিন্তু আমার মত কমযোর-বুযদিল চোখের পানি ও কলমের কালি ছাড়া আর কী ঝরাতে পারে! আমার মত ভীরু-কাপুরুষ ফরিয়াদ ও আর্তনাদ ছাড়া আর কী করতে পারে! আমার বুকে তো নেই ঈমানের কুওয়ত, আমার দিলে তো নেই মুজাহিদের হিম্মত! আমার শিরায় তো নেই রক্তের সেই উচ্ছ্বাস! আমি শুধু কাঁদতে পারি, আর লিখতে পারি। তাই ভাবছি, আজ এই নিঃসঙ্গ রাতে শুধু নিজেকে সান্ত্বনা দিতে অশ্রুর কালিতে আমি কিছু লিখবো।[৪]

আমি লিখবো আফগানিস্তানের নিঃসঙ্গ মুজাহিদদের কথা, রক্তের সফরে যাদের সঙ্গী হলো না মুসলিমবিশ্বের কোন দেশ ও দেশ-নেতা। তবু তারা শরীরের জখম এবং হৃদয়ের ক্ষত নিয়ে অবিচল রয়েছে জিহাদের পথে। অস্ত্র নেই, আশ্রয় নেই, অন্ন নেই, বস্ত্র নেই; দুনিয়ার কোন উপায়-উপকরণ নেই। তবু তারা পড়ে আছে পাহাড়ে, পর্বতে, গুহায়, গহ্বরে শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করে।

আমি লিখবো ফিলিস্তিনের মুজলুম মুসলমানদের কথা, যাদের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু এবং শহর ও জনপদ ধ্বংস হয়ে গেছে ইহুদি হায়েনাদের হাতে; পঞ্চাশ বছর ধরে যারা দেশছাড়া, বাস্তুহারা; যাদের বাঁচার কোন উপায় নেই আত্মঘাতী হামলা ছাড়া। কিন্তু মানবতার মোড়লদের চোখে তারা হলো সন্ত্রাসী, আর ইহুদি হায়েনা হলো শান্তিবাদী!

আমি লিখবো গুজরাটের অসহায় বনিআদমদের কথা, মুসলিম পরিচয়ের অপরাধে হিন্দু নরপশুদের হাতে যারা আজ ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম নিধনযজ্ঞের শিকার, অথচ মুসলিমবিশ্ব নির্বিকার! এটা নাকি ভারতের ভিতরের ব্যাপার! আর যারা মানবতার দাবিদার, কোথায় তাদের সভ্যতা? কোথায় তাদের মনবতা ও মানবাধিকার? যেখানে জীবন্ত মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়, নিষ্পাপ শিশুকে ত্রিশূলে গেঁথে হত্যা করা হয়; যেখানে আমার মা-বোনকে.... নাহ, আর পারি না, আর সহ্য হয় না। কলমও যেন অবশ হয়ে আসে আর কিছু লিখতে।

শেষ অংশটুকু আবার লিখছি–

*'যেখানে জীবন্ত মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়, নিষ্পাপ শিশুকে ত্রিশূলে গেঁথে*

*হত্যা করা হয়; যেখানে আমার মা-বোনকে.... নাহ, আর পারি না, আর সহ্য হয় না। কলমও যেন অবশ হয়ে আসে আর কিছু লিখতে।'*

তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো যে, মা-বোনদের ইজ্জত-আবরু লুণ্ঠনের কথা উল্লেখ করার চেয়ে অনুল্লেখই এখানে অধিক মর্মস্পর্শী হয়েছে। কারণ এতে বোঝা যায়, লেখক ভিতরের যন্ত্রণায় আত্মহারা ও বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন এবং তার হাত ও কলম কাঁপছে, যার কারণে তিনি সামনের ভয়ঙ্কর শব্দক'টি লিখতে পারছেন না। তবে কোন্ ক্ষেত্রে উল্লেখের পরিবর্তে অনুল্লেখের শৈলী ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করে লেখকের বোধ ও বুদ্ধি এবং রুচি ও প্রজ্ঞার উপর। আর তা একদিনে গড়ে ওঠে না, বহু দিনের চর্চা-সাধনার পরই গড়ে ওঠে।

এখানে দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি আনা হয়েছে মূলত উল্লেখের চেয়ে অনুল্লেখের অর্থময়তা ও হৃদয়গ্রাহিতা বোঝানোর জন্য, তবে অন্যান্য কিছু বিষয়ও এই সুযোগে আলোচনায় আসতে পারে।

(ক) মুসলিম উম্মাহর এখন কিসের প্রয়োজন? তিনটি জিনিসের প্রয়োজন, জিহাদের আগুন, বুকের তাজা খুন এবং বজ্রের গর্জন। একথাটি কয়েকভাবে বলা যায়, যেমন-

০ 'মুসলিম উম্মাহর এখন প্রয়োজন জিহাদের আগুন, বুকের তাজা খুন এবং বজ্রের গর্জন।' কিন্তু এতে কোন সৌন্দর্য নেই এবং কোন আবেদন নেই। পক্ষান্তরে আলোচ্য বাক্যটিতে দেখো, প্রতিটি প্রয়োজনের আগে বলা হয়েছে কিসের প্রয়োজন নেই। এটি যেন প্রয়োজনগুলো উপস্থাপনের ভিত্তি এবং তাতে বক্তব্যটি বেশ জোরালো হয়েছে।

আবার দেখো, অপ্রয়োজনগুলো যেমন একমাপের তেমনি প্রয়োজনগুলোও প্রায় একমাপের। যথা- চোখের পানি, কলমের কালি ও দুর্বলের ফরিয়াদ এবং জিহাদের আগুন, বুকের তাজা খুন ও বজ্রের গর্জন। এতে বক্তব্যের বাক্যগুলোর বিন্যাস সুন্দর হয়েছে।

যদি বলা হতো, 'এখন চোখের পানির প্রয়োজন নেই, এখন শুধু প্রয়োজন জিহাদের ..... তাহলে গ্রহণযোগ্য হলেও সৌন্দর্য অনেকাংশে কমে যেতো।

০ পুরো বক্তব্যটি এভাবেও লেখা যেতো-

'মুসলিমবিশ্বে এখন অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু এমন জানবায মুজাহিদের যারা বজ্রের মত গর্জন করে ওঠবে এবং জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকের তাজা খুন ঢেলে দেবেন।'

তাতে লেখাটি অসুন্দর হতো না, কিন্তু ওখানে গদ্যের যে একটি সুরছন্দ রয়েছে, এখানে তা অনুপস্থিত।

'দুর্বলের ফরিয়াদ নয়, এখন প্রয়োজন বজ্রের গর্জন' – এখন এত দিন পর মনে হচ্ছে এখানে একটু সংশোধন দরকার।৫ 'প্রয়োজন বজ্রের গর্জন', আগে ভেবেছি

দু'টি দন্ত্য-ন মিলে একটি সুরমূর্ছনা সৃষ্টি হবে। এখন মনে হচ্ছে, এটা খুব জরুরি ছিলো না। কারণ পূর্ববর্তী দু'টি 'প্রয়োজন'-এর ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। তার চেয়ে ভালো হয়, যদি বলি, 'দুর্বলের ফরিয়াদ নয়, এখন প্রয়োজন সবলের/মুজাহিদের/ সাহসী বীরের বজ্রনিনাদ।' তুমিও ভেবে দেখো বর্তমান সংশোধনটি।

(খ) বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশটি এই, 'কিন্তু আমার মত কমযোর-বুযদিল চোখের পানি ও কলমের কালি ছাড়া আর কী ঝরাতে পারে? আমার মত ভীরু-কাপুরুষ ফরিয়াদ ও আর্তনাদ ছাড়া আর কী করতে পারে? ...

লেখক এখানে নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে চোখের পানি এবং কলমের কালিকে একত্রে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং যুগলতা রক্ষা করার জন্য পরবর্তী অংশে 'ফরিয়াদ'-এর সঙ্গে আরেকটি শব্দের প্রয়োজন ছিলো। তাই বলা হয়েছে 'ফরিয়াদ ও আর্তনাদ'। আশা করি, এর সৌন্দর্যটুকু তুমি অনুভব করতে পারছো।

(গ) 'আমি শুধু কাঁদতে পারি, আর লিখতে পারি।' এখানে যে সুরছন্দটি রয়েছে, তা আর যেভাবেই বলো, কিছুটা হলেও ক্ষুণ্ণ হবে। যেমন–

○ কাঁদতে পারি এবং লিখতে পারি। ○ কাঁদতে পারি, আর বুকের অব্যক্ত বেদনার কথা লিখতে পারি। ○ আমি শুধু চোখের পানি ফেলতে পারি, আর অব্যক্ত বেদনার কথা লিখতে পারি। ইত্যাদি

এবার নীচের বাক্যটির পর্ববিভক্তির সৌন্দর্য দেখো–

তাই ভাবছি,/ আজ এই নিঃসঙ্গ রাতে/শুধু নিজেকে সান্ত্বনা দিতে/অশ্রুর কালিতে/ আমি কিছু লিখবো।

(ঘ) 'এটা নাকি ভারতের ভিতরের ব্যাপার' বাক্যটি পড়ো; এখানে স্বাভাবিক শব্দ হলো 'অভ্যন্তরীণ ব্যাপার'। সেটা বাদ দিয়ে কটাক্ষ করার জন্য 'ভিতরের' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এটা খুবই সুন্দর হয়েছে। অথচ প্রায় আমি বলে থাকি, ভিতর শব্দটি কিছুটা শ্রুতিকটু; যত্রতত্র এর ব্যাবাহার ঠিক নয়। অনেকে কিন্তু তাই করেন, যেমন একজন লিখেছেন, তার ভিতরে বেশ কিছু গুণ আছে। তিনি যদি 'মাঝে' পছন্দ না করেন তাহলে অন্তত 'মধ্যে' ব্যবহার করতে পারতেন। তা না, একেবারে 'ভিতরে'র মত স্থূল শব্দ!

যাক, আমি কিন্তু যথাস্থানে ভিতর শব্দটি ব্যবহার করেছি। সবখানে যা অসুন্দর, উপযুক্ত স্থানে সেটাই দেখো, কত সুন্দর! ৬

(ঙ) 'নাহ, আর পারি না, আর সহ্য হয় না।' অনেক সম্পাদনার পর সম্পাদকীয়টি পুষ্পে যখন প্রকাশিত হয় তখন এমন ছিলো। পুস্তক আকারে প্রকাশের সময় যখন বারবার দেখলাম তখনো এমন ছিলো। এখন দ্বিতীয় সংস্করণের সময় কত বার দেখলাম, এমনই থেকে গিয়েছিলো। একেবারে শেষ মুহূর্তের সম্পাদনায় হঠাৎ করেই কলম থেকে এই বাক্যটি বের হয়ে এলো, 'কলমও যেন অবশ হয়ে আসে।' তারপর মনে হলো, বাক্যটিতে পূর্ণতা আসেনি, তাই লিখলাম, 'কলমও যেন অবশ

হয়ে আসে আর কিছু লিখতে', এখন মনে হচ্ছে, বাক্যটি পূর্ণ হয়েছে বটে, তবে সামনে যে ভয়াবহ শব্দটা অনুক্ত রয়েছে, সেটার উপযোগী হয়নি বাক্যের শেষ অংশটি। তাই পরিবর্তন করে লিখলাম, 'কলমও যেন অবশ হয়ে আসে আর আগে বাড়তে'।

প্রথমে লিখেছিলাম, 'কলম যেন অবশ হয়ে আসে'। এবং তাতে সাবলীলতা বেশী ছিলো। কিন্তু এখন 'ও' যোগ করাতে বোঝা গেলো যে, বেদনায় লেখকের হাত তো অবশ হয়ে আসছেই, এমনকি বেদনার আতিশয্যে হাতের কলমটিও অবশ হয়ে আসছে। এটা অবশ্যই অতিশয়তা, কিন্তু সুন্দর। অতিশয়তার স্থূল প্রকাশ অসুন্দর ও নিন্দনীয়, কিন্তু সাহিত্যবোদ্ধাদের নিকট এর শিল্পিত প্রকাশ অবশ্যই সুন্দর ও প্রশংসিত।

আমাদের মূল বিষয় ছিলো, ক্ষেত্রবিশেষে উল্লেখের চেয়ে অনুল্লেখ যে অধিক উত্তম হয় তার উদাহরণ পেশ করা, কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে দীর্ঘ কথা হয়ে গেলো। যাক এবার মূল বিষয়ে আরেকটি উদাহরণ দেখো–

পুষ্পের দ্বিতীয় প্রকাশনার ১৫শ সংখ্যার রম্যরচনায় এ বাক্যটি ছিলো, 'আমি এখন বুবুজানের এমন একটি বুযুর্গি বয়ান করিব, যাহা অস্বীকার করিবার সাধ্য তোমার নাই, এমনকি তোমার...। আচ্ছা থাক, শোনো। ---

বলতে খারাপ শোনায়, তবু বলছি; তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো যে, এখানে বলার ইচ্ছে ছিলো, 'এমনকি তোমার বাবারও নাই'। কিন্তু রুচিতে বাধে বলে তা অনুক্ত রাখা হয়েছে। তাছাড়া অনুল্লেখ ছাড়াই তো পাঠক বুঝতে পারছে। তাহলে আমার কলমটি কেন ঐ শব্দটা দ্বারা নোংরা হবে![৭]

আজ হঠাৎ করে রবীন্দ্রনাথের লেখায় একটি উদাহরণ পেলাম। তিনি লিখেছেন. 'বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানসমিতির চেয়েও তাদের (গ্রামগাঁয়ের অশিক্ষিত লোকদের) কথার প্রামাণিকতা যে কম তা আমি বলবো না– এমনকি হয়ত... থাক, আর কাজ নেই।'

দেখো, একেবারে শেষ মুহূর্তে যেন অপূর্ব সংযমের পরিচয় দিয়ে তিনি কলমের রাশ টেনে ধরেছেন এবং উল্লেখের চেয়ে অনুল্লেখের কৌশল গ্রহণ করেছেন।

---

১। উপস্থিত করতে পারো-এর পরিবর্তে বলা যায়, 'উপহার দিতে পারো।

২। বুঝে ও শুনে দু'টি আলাদা শব্দ, কিন্তু শব্দদু'টি একত্রে নতুন অর্থ প্রদান করছে; অর্থাৎ 'ইচ্ছা করে, সচেতনভাবে, সজ্ঞানে ইত্যাদি। তাই শব্দদু'টো একত্রে হবে।

৩। এখানে অজ্ঞাতসারে-এর স্থলে 'অজ্ঞানে' হতে পারে।)

৪। এখানে আগে ছিলো, তাই ভাবছিলাম ...। প্রথমত এই ক্রিয়াটি উচ্চারণে ভারী, দ্বিতীয়ত মর্মগত দিক থেকেও এখানে বর্তমানের ক্রিয়া ব্যবহৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কত দিন কতবার পড়েছি, এ ক্রটিটা চিন্তায় আসেনি, আজ হঠাৎ করেই এসে গেলো। এতে আমি বুঝতে পারি, আসলে আমরা নিজেরা চিন্তা করি না, করতে পারি না, আড়াল থেকে কেউ

আমাদেরকে চিন্তা দান করেন। তো তাঁর কাছ থেকেই আমাদের চাইতে হবে কলমের পাথেয়।

৫। আগে ছিলো, 'এখানে একটু সংশোধনের প্রয়োজন।' এতে পুনরুক্তিদোষ ঘটেছে। তাই প্রয়োজন-এর পরিবর্তে 'দরকার শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৬। আগে ছিলো, 'আমি কিন্তু উপযুক্ত স্থানে ভিতর শব্দটি ব্যবহার করেছি। পুষ্পে ও প্রথম সংস্করণে ছিলো, 'উপযুক্ত স্থানে আমি কিন্তু শব্দটিকে ভুলিনি।' দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম সম্পাদনার সময় মনে হলো, এখানে একটি মূলনীতি উল্লেখ করলে বক্তব্যটি সারগর্ভ হয়। তাই লিখলাম, 'সবখানে যা অসুন্দর উপযুক্ত স্থানে সেটাই দেখো, কত সুন্দর!'

প্রথম বাক্যটি মনে হলো, আরো সুন্দর হতে পারে, তাই লিখলাম, 'আমি কিন্তু উপযুক্ত স্থানে ভিতর শব্দটি ব্যবহার করেছি।' 'উপযুক্ত স্থানে'-এর পুনরুক্তি দূর করার জন্য প্রথমটি পরিবর্তন করে 'যথাস্থানে' লিখলাম।)

৭। এখানে ছিলো, 'তাহলে আমার কলমটি কেন ঐ শব্দটা দ্বারা নোংরা হবে?

# বক্তব্যের সঙ্গে শব্দের সুসঙ্গতি

আজ আমরা আলোচনা করবো বিষয়, ভাব ও বক্তব্যের সঙ্গে মিল রক্ষা করে শব্দের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে। এসব ক্ষেত্রে শব্দের ব্যবহার যথার্থ হওয়া আবশ্যক। একই শব্দ একটি ক্ষেত্রে উপযোগী, আবার অন্য ক্ষেত্রে অনুপযোগী হতে পারে। এটা যিনি যত বেশী লক্ষ্য রাখেন তার ভাষা তত সুন্দর হয়। নীচের উদাহরণগুলোর আলোকে আশা করি তোমরা বিষয়টি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাবে–

(ক) একজন লিখেছেন, 'রিবা সম্পর্কে বই রচনা ও প্রকাশনার মধ্যেই আমাদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, বরং তা পৌঁছে দিতে হবে প্রতিটি মুসলিমের দোরগোড়ায়'।

এখানে বিশেষভাবে 'দোরগোড়া' শব্দটি দেখো। হকার প্রতিদিন মানুষের দোরগোড়ায় পত্রিকা পৌঁছে দেয়, কিন্তু বই দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া হয় না। বই পৌঁছানো হয় ঘরে ঘরে, বা হাতে হাতে। বিজ্ঞাপনের ভাষায়, পণ্যদ্রব্য পৌঁছে দেয়া হয় ঘরে ঘরে বা দোরগোড়ায়।

আরেকটি বিষয়, 'বই রচনা' এবং 'বই প্রকাশনা' চলতে পারে। তবে অধিকতর উপযোগী শব্দ হলো গ্রন্থরচনা এবং গ্রন্থপ্রকাশনা, তদ্রূপ বই লেখা এবং বই ছাপা/ছাপানো।

প্রসঙ্গক্রমে বলছি, প্রমাদ অর্থ ভুল, ত্রুটি। মুদ্রণপ্রমাদ এবং মুদ্রণভুল অর্থ হলো, মুদ্রণজনিত বানান ও ভাষাগত ত্রুটি, পক্ষান্তরে মুদ্রণত্রুটি ও মুদ্রণদোষ অর্থ হলো মুদ্রণজনিত ছাপার অসৌন্দর্য।

(খ) আরেকজন লিখেছেন, 'গ্রন্থপোকা বলতে যা বোঝায় তিনি ছিলেন তাই'। এটা ঠিক নয়। লেখা উচিত, গ্রন্থকীট বা বইয়ের পোকা। (যদিও আমার রুচিতে বলে, 'গ্রন্থকীট বা বইয়ের পোকা' থেকে যে ছবিটি মনে ভেসে ওঠে তা খুন সুন্দর নয়। আরবী-উর্দূ ও ফারসীভাষায় এই উপমাটি নেই। ইংরেজীতে কী বলে, আমার জানা নেই, বা এটি ইংরেজীর তরজমা কি না তাও জানি না। আমার মনে হয়, এক্ষেত্রে

'গ্রন্থপ্রেমিক' বলাই ভালো। এমনিতে অবশ্য বইপ্রেমিক মানে, যে ব্যক্তি বই সংগ্রহ করতে ভালোবাসে, পড়ুক বা না পড়ুক।

(গ) 'কারাগারে আবদ্ধ' চলে, তবে উত্তম হলো 'কারাগারে বন্দী'। একজন সুন্দর লিখেছেন, 'এ যুগের মা-বাবা সন্তানের কারাগারে বন্দী।' তিনি যদি লিখতেন 'সন্তানের কারাগারে আবদ্ধ', সুন্দর হতো না। অবশ্য কাউকে কারাগারে আবদ্ধ রাখা যায়। 'কারাগারের বন্দী জীবন/আবদ্ধ জীবন আর সহ্য হচ্ছে না', সম্পর্কেও একই কথা।

'গ্রামের মানুষ সুদখোর মহাজনের দাসত্বে আবদ্ধ/বন্দী' সঠিক নয়, বরং, দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

(ঘ) 'প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া' হয় কোন কাজে সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে। যেমন, 'বিজয় অর্জন এবং পরাজয় রোধ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাও। ('প্রাণপণ'-এর স্থলে 'যথাসাধ্য' হয়, তবে যথাসাধ্য-এর স্থলে প্রাণপণ নাও হতে পারে।)

ডাক্তার রোগীর জীবনরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন, মরণপণ চেষ্টা নয়। শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য হবে মরণপণ চেষ্টা, (প্রাণপণ চেষ্টাও হতে পারে, তবে প্রথমটি বেশী ভাল।)

(ঙ) একজন লিখেছেন, 'নফসের যাবতীয় চাহিদার মূলোৎপাটন কর।'

ইচ্ছা, চাহিদা, লোভ-লালসা, এগুলো দমন, রোধ বা সম্বরণ করা হয়। এসব ক্ষেত্রে মূলোৎপাটন করা বা নির্মূল করা বলা হয় না। ফিতনা ও রোগের মূলোৎপাটন হয়, আবার এদু'টো নির্মূলও করা হয়।

(চ) 'কুফরির পথ থেকে ফিরে আসতে হবে'। অনেকে এভাবে লিখে থাকেন। এটা ঠিক নয়। আসলে মানুষ কুফুরির পথ থেকে সরে আসে, আর হিদায়াতের পথে ফিরে আসে।

(ছ) একজন লিখেছেন, 'এ বিষয়ে মুসলিম সমাজে অপরিসীম অজ্ঞতা বিরাজ করছে।' অজ্ঞতা, উদাসীনতা, অলসতা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি অপরিসীম হয় না, সীমাহীন হয়। ভালো বিষয় অপরিসীম হয়। যেমন, অপরিসীম ভালোবাসা/দয়া ও করুণা/ সাধনা। (অবশ্য সীমাহীন সাধনাও চলে। সীমাহীন পরিশ্রম, সীমাহীন ক্লান্তি হতে পারে।)

সীমাহীন শব্দটি সাধারণত অপ্রিয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত, তবে প্রিয় ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার রয়েছে। আমরা বলি, 'তার মাঝে ছিলো জ্ঞান অর্জনের অপরিসীম চাহিদা', আবার বলি, 'সম্পদের সীমাহীন চাহিদা মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায়'। স্বেচ্ছাচার বা নির্দয়তা সীমাহীন হয়, অপরিসীম নয়। আবার সন্তানের প্রতি পিতার অপরিসীম স্নেহ হবে, সীমাহীন হবে না। তবে, সীমাহীন স্নেহ সন্তানকে নষ্ট করতে পারে। মাত্রাহীন শব্দটি শুধু মন্দ ক্ষেত্রেই হয়। যেমন, মাত্রাহীন ভোগবিলাস/স্বাধীনতা করুণ পরিণতি ডেকে আনে।

(জ) একজন লিখেছেন, 'ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তিকে অতি জোরালো ভাষায় নিরুৎসাহিত করেছে'। জোরালো ভাষায় উৎসাহিত করা হয়, নিরুৎসাহিত করতে হবে কঠোর ভাষায়। তদ্রূপ আমরা জোরালো ভাষায় সমর্থন জ্ঞাপন করি এবং কঠোর ভাষায় নিন্দা জ্ঞাপন করি। অবশ্য জোরালো ভাষায় প্রতিবাদ হয়।

(ঝ) একজন খ্যাতনামা লেখক লিখেছেন, 'অর্থনৈতিক নিপীড়নে নিমজ্জিত সমাজ', এটা ঠিক ব্যবহার নয়, কারণ নিপীড়নে ও নির্যাতনে জর্জরিত হয়, নিমজ্জিত নয়। ঋণে জর্জরিত ও নিমজ্জিত, দু'টোই ঠিক। অত্যাচারে/ শোষণে জর্জরিত হয়, নিমজ্জিত নয়। পাপে জর্জরিত ও নিমজ্জিত দু'টোই সম্ভবত ঠিক।

(ঞ) জালে আটকা পড়ে, বেড়াজালে আবদ্ধ হয়। জালে আবদ্ধ হওয়া এবং বেড়াজালে আটকা পড়া সুন্দর নয়।

(ট) আরবী 'রিবা' এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো সুদ। রিবা শব্দটি এখন বাংলায় সুপরিচিত। একজন লিখেছেন, 'জাতিকে রিবার বিষাক্ত ছোবল থেকে উদ্ধার করতে হবে'। সুদের বিষাক্ত ছোবল ঠিক আছে, সুদের অভিশাপও ঠিক আছে, তবে রিবার শুধু অভিশাপ হবে। আর অভিশাপ থেকে রক্ষা এবং উদ্ধার দু'টোই হতে পারে, কিন্তু ছোবল থেকে রক্ষা হয়, উদ্ধার হয় না।

(ঠ) একজন লিখেছেন, 'সুদের অবাধ সুযোগ খোলা আছে'। সঠিক ব্যবহার হলো, অবাধ/ অবারিত সুযোগ রয়েছে। অথবা সুযোগ খোলা/উন্মুক্ত রয়েছে। সুযোগ যখন অবাধ হবে তখন তা খোলা থাকা না থাকার প্রশ্ন আসে না। পাপের পথ খোলা হয়, আর কল্যাণের পথ হয় উন্মুক্ত।

(ড) একজন লিখেছেন, 'শোষিত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে ইসলাম যখন একটি শক্তিরূপে ভূমিকা পালন করতে যায় তখনই তা তীব্র ও চরম পৈশাচিকতার সম্মুখীন হয়।'

পৈশাচিকতা বা পাশবিকতা চরম হয়, নিষ্ঠুর ও নির্মমও হয়, কিন্তু তীব্র হয় না। বিরোধিতা চরম ও তীব্র হয়। মানুষ বিরোধিতার সম্মুখীন হয়, আর পৈশাচিকতা ও পাশবিকতার শিকার হয়, সম্মুখীন হয় না।

আরেকটি কথা, মুসলিম জাতি শত্রুদের পৈশাচিকতা বা পাশবিকতার শিকার হতে পারে, ইসলাম নয়। মক্কায় মুসলমানগণ কোরায়শের পাশবিকতার শিকার হয়েছিলো, আর ইসলাম কোরায়শের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলো।

(ঢ) 'সুদভিত্তিক অর্থনীতি বিশ্বমানবতাকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে ডুবিয়ে দিয়েছে', এটা ঠিক নয়, কারণ গহ্বরে শুধু নিক্ষেপ করা হয়। কোন কিছুর আবর্তে নিক্ষেপ করা হয়, ডোবানোও হয়।

(ণ) 'পৈশাচিক অপশক্তি' ঠিক নয়, পৈশাচিক শক্তিকে 'অপ' বলার প্রয়োজন থাকে না। পৈশাচিক/ পাশবিক আনন্দ হয়, উল্লাস হয, ফুর্তি হয় না। পাশবিক/পৈশাচিক নির্যাতন হয়, শাস্তি হয় না।

(ত) 'ঘুমন্ত মুসলিম বিশ্বকে সচেতন ও সর্তক করা' কথাটা ঠিক নয়, ঘুমন্তকে

জাগ্রত করা হয়, গাফেল ও উদাসীনকে সচেতন ও সতর্ক করা হয়।

(থ) 'ক্ষুধা নির্বাপিত করা', ঠিক নয়, ক্ষুধা নিবারণ করা হয়; আর ক্ষুধার আগুন নির্বাপিত করা হয়, তবে ক্ষুধার আগুন নেভানো উত্তম। জঠরানল নির্বাপিত করা হয়, তবে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এমন কঠিন শব্দ ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় নয়। স্বাভাবিক অবস্থায় শব্দ যত সহজ হয় তত ভালো।

(দ) বিশাল মুনাফার চেয়ে বিপুল মুনাফা উত্তম। প্রচুর মুনাফাও হতে পারে।

(ধ) 'নির্যাতন লাঘব করা', ঠিক নয়, নির্যাতনের মাত্রা কমানো যায়। লাঘব করা হয় দণ্ড বা শাস্তি।

(ন) যুক্তি, বক্তব্য ও প্রস্তাব উত্থাপন বা উপস্থাপন করা যায়। প্রতিবাদ ও অভিযোগ উপস্থাপন করা হয় না, শুধু উত্থাপন করা হয়। ধারণা উত্থাপন করা হয় না, উপস্থাপন করা হয়।

যুক্তি, বক্তব্য, মত ও অভিযোগ খণ্ডন ও প্রত্যাখ্যান করা হয়, প্রতিবাদ খণ্ডন করা হয় না, প্রত্যাখ্যান করা হয়। দাবী উপস্থাপন বা খণ্ডনও করা হয় না, উত্থাপন ও প্রত্যাখ্যান করা হয়।

(প) দুর্নীতির প্রবেশ ঘটে না, অনুপ্রবেশ ঘটে। অবৈধ, অননুমোদিত ও অপ্রিয় ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ ব্যবহৃত হয়। সমস্যার গভীরে আমরা অনুপ্রবেশ করি না, প্রবেশ করি। আর শত্রুরা আমাদের সীমান্তের ভিতরে প্রবেশ করে না, অনুপ্রবেশ করে।

(ফ) কঠোর তিরস্কার, এই ব্যবহার সুন্দর, কিন্তু কঠোর ঘৃণা তত সুন্দর নয়। কঠিন ঘৃণা/ তিরস্কার দু'টোই ঠিক আছে। কঠোর প্রতিবাদ হয়; কঠিনও চলতে পারে। কঠিন সমস্যা/পরিস্থিতি ঠিক আছে, কঠোর নয়। কোন বিষয়ে কঠোর অবস্থান হয়, কঠিন হয় না

কঠিন সাজা/শাস্তি এবং কঠোর শাস্তি গ্রহণযোগ্য, কিন্তু কঠোর সাজা নয়। বাস্তবতা কঠিন ও কঠোর দু'টোই হতে পারে, রূঢ় বাস্তবতাও হয়।

(ব) ধ্বংসের/মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে বলা হয়, এক্ষেত্রে দোরগোড়ায় শব্দটি সুন্দর নয়। সাফল্যের/ মুক্তির দ্বারপ্রান্তে বলা হয়, তবে দোরগোড়ায়ও বলা যায়।

উপরে যা আলোচনা করা হলো এটা আমার নিজস্ব বিবেচনা, কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিমতের অবকাশ থাকতে পারে। আমি নিজেও খুব কম জানি, জানার চেষ্টা করছি মাত্র। আল্লাহ আমাদের সকলকে কল্যাণের পথে তাওফীক দান করুন, আমীন।

# শব্দের সঠিব ব্যবহার

শব্দের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে গত সংখ্যায় আলোচনা করেছিলাম। সে বিষয়েই আরো কিছু নমুনা আলোচনা করি। একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির মৃত্যুতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে জনৈক লেখক একটি জাতীয় দৈনিকে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার শিরোনাম ছিলো, 'একটি সটান মিনারের কাঠামো'।
মরহূমকে মিনার না বলে মিনারের কাঠামো বলার সার্থকতা কী? তিনি কি সত্যের বা আলোর মিনার ছিলেন, না শুধু মিনারের কাঠামো?
সটান বলা হবে এমন কিছুকে যা গুটিয়ে থাকতে পারে, যেমন, সটান রশি, সটান শরীর। মানুষ সটান শুয়ে বা দাঁড়িয়ে থাকে। বৃক্ষ, মিনার, পাহাড় ইত্যাদি সটান দাঁড়িয়ে থাকে না। এরূপ ব্যবহার নেই। সটান মিনার শুনতেও শ্রুতিমধুর নয়। সটান মানে সোজা, সুতরাং বলা যায় 'সটান রাস্তা', কিন্তু এরূপ ব্যবহার সুন্দর নয়।
এসব ক্ষেত্রে সাধারণত বলা হয়, 'একটি আলোর মিনার', সম্ভবত নতুনত্ব আনার জন্য এরূপ বলা হয়েছে, কিন্তু কথা হলো, শুধু নতুন হলেই তো হবে না, সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহীও হতে হবে।
একটি লেখার শিরোনাম এরকম, 'মাহে রমযান, আনন্দ ও সংযমের এক অনন্য মোহনা'। খুব চিন্তা করে শিরোনামটি তৈরী করা হয়েছে, বোঝা যায়। কোন কিছুতে চিন্তার ছাপ পাওয়া গেলে ভালো লেগে। তবে এখানে চিন্তাটি সঠিক খাতে প্রবাহিত হয়নি।
শিরোনামটির তাৎপর্য চিন্তা করে যা পাওয়া যায় তা হলো, আনন্দ ও সংযমকে দুটি নদীর সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। আর যেহেতু মাহে রমযান আমাদের যুগপৎ আত্মিক আনন্দ এবং আত্মসংযম শিক্ষা দেয় সেহেতু মাসটিকে মোহনার সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। তবে এখানে প্রথম কথা হলো আনন্দের মাঝে যেহেতু উচ্ছ্বাস রয়েছে সেহেতু আমরা বলে থাকি, আনন্দের ঢেউ, আনন্দের বন্যা, জোয়ার, ঢল ইত্যাদি। পক্ষান্তরে সংযম হলো ভাবগম্ভীর ও ধীর-স্থির বিষয়। সুতরাং

আনন্দের উপমারূপে নদী গ্রহণযোগ্য হলেও সংযমের উপমারূপে তা গ্রহণযোগ্য নয়, যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, সংযমের ঢেউ, বন্যা, জোয়ার, ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত এসকল ক্ষেত্রে শুধু 'মোহনা' এর পরিবর্তে 'মিলন মোহনা ব্যবহার করা হয়। যেমন একজন লিখেছেন, 'জীবন হলো আনন্দ-বেদনার মিলন-মোহনা'। তাছাড়া 'অনন্য মোহনা'য় 'ন' এর আধিক্যের কারণে উচ্চারণ-কঠিনতা সৃষ্টি হয়েছে। যদি বলি অপূর্ব/আশ্চর্য এক মোহনা তাহলে উচ্চারণ অধিকতর শ্রুতিমধুর হয়।

শেষ কথা এই যে, মাহে রমযানের জন্য এই উপমাটি 'গারীব' বা অপরিচিত, ফলে তাতে পূর্ণ হৃদয়গ্রাহিতা নেই। যদি বলি, 'আনন্দ ও সংযমের অপূর্ব এক সম্মিলন তাহলে উপমা হয়ত থাকলো না, কিন্তু কথাটা অধিকতর 'মুস্তাছির' ও আকর্ষণীয় হবে।

'জীবন সম্পর্কে বাস্তবসম্মত ধারণা লাভের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য' – এক্ষেত্রে সঠিক শব্দটি হলো 'অনস্বীকার্য'। 'অপরিহার্য প্রয়োজন' চলে, কিন্তু 'প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য' চলে না।

'ভোগসম্ভার' হয়ত চলবে, তবে ভোগসামগ্রী হলো সঠিক ব্যবহার। ভোগের সামগ্রী সঠিক, কিন্তু 'ভোগের সম্ভার' নয়।

অনাবিল শান্তি হয়, অনাবিল প্রশান্তি হয় না। আবার গভীর প্রশান্তি যত সুন্দর, গভীর শান্তি তত সুন্দর নয়। অটুট প্রশান্তি মোটেই সুন্দর নয়। অটুট শান্তি কোনক্রমে চলতে পারে। অটুট শব্দের সঠিক ব্যবহারক্ষেত্র হলো বন্ধন। যেমন, আশা করি আমাদের মাঝে বন্ধুত্বের এ বন্ধন চিরকাল অটুট থাকবে। 'তিনি অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী', 'এত ঘাত-প্রতিঘাতের পরও তার মনোবল অটুট রয়েছে, 'ঐক্য অটুট রাখার জন্য আমরা সবকিছু করতে প্রস্তুত', এগুলো সুন্দর। 'শান্তি শৃংখলা অটুট রাখার জন্য' সুন্দর নয়। এক্ষেত্রে বলা হয়, 'শান্তি-শৃংখলা বহাল/অক্ষুণ্ন রাখার জন্য'।

শুভ ইশারা হয় না, শুভ ইঙ্গিত হয়, যেমন শুভশক্তি হয় না, শুভবিবাহ হয়, তদ্রূপ শুভনযর হবে না, হবে শুভদৃষ্টি। নযরের ক্ষেত্রে হবে নেক নযর

সংক্ষিপ্ত প্রতিচ্ছবি কথাটা ঠিক নয়, ছবি বা প্রতিচ্ছবি সংক্ষিপ্ত হয় না, বিবরণ/ভাষণ/আলোচনা, ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ হতে পারে। জীবনের সামগ্রিক বা খণ্ডিত প্রতিচ্ছবি হয়, ছবি ও প্রতিচ্ছবি উভয়ের সঙ্গে জীবন্ত হতে পারে। পক্ষান্তরে বাস্তব ছবি হলেও বাস্তব প্রতিচ্ছবি সম্ভবত হবে না

'মাহে রমযানে আল্লাহ যেন আমাদেরকে দান করেন আনন্দের সংযম এবং সংযমের আনন্দ' এ বাক্যটি একজন লিখেছেন, এটি সুন্দর হয়েছে

তীক্ষ্ম চিৎকার শোনা গেলো, 'একদম চড় মেরে দাঁত ফেলে দেবো'। তীক্ষ্ণ চিৎকার

ঠিক আছে, কিন্তু এখানে তা ঠিক নয়, এখানে হতে পারে প্রচণ্ড চিৎকার, আর হতে পারে, বিকট গর্জন।

আম্মার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সফরে বের হলাম, ফলে ...। এখানে সঠিক শব্দ হবে, 'নিষেধ সত্ত্বেও', নিষেধাজ্ঞা হয় শাস্তি বা আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে। নিষেধটিকে বিশেষ মাত্রা দেয়ার জন্য নিষেধাজ্ঞা অবশ্য বলা যায়, কিন্তু সাধারণভাবে তা চলবে না। প্রসঙ্গত, 'নিষেধাজ্ঞা জারি করা' গ্রহণযোগ্য, যদিও এখানে সমশ্রেণিতা রক্ষিত হচ্ছে না। আইন জারি করা যেমন, বিধান জারি করা তেমন সুন্দর নয়। বিধানের ক্ষেত্রে সঠিক শব্দ হলো প্রবর্তন করা।

'বর্তমান দ্রব্যমূল্যের চড়া পরিস্থিতি' ... পরিস্থিতি কখনো চড়া হয় না, অস্বাভাবিক বা অসহনীয় হতে পারে, গরমও হতে পারে, আবার হতে পারে টালমাটাল। চড়া দাম, চড়া মূল্য হতে পারে, চড়া মেজাজও হতে পারে। চড়া সুরে কথা বলা যায়, চড়া স্বরে বা কণ্ঠে নয়। রাগত/ ক্রুদ্ধ স্বরে হতে পারে। চড়া রোদ হয়, চড়া রৌদ্র হয় না, প্রখর রৌদ্র হয়।

'তখন বুদ্ধিজীবীগণ লজ্জায় মুখ ও মাথা গুটিয়ে রাখেন'। এটা ঠিক নয়। এক্ষেত্রে সঠিক ব্যবাহার হলো মুখ লুকানো এবং মাথা নত করা।

হাত-পা গুটিয়ে রাখা যায়, মুখ বা মাথা গুটিয়ে রাখার জিনিস নয়। অর্থাৎ যেসব জিনিস ছড়ানো বা প্রসারিত করা যায় সেগুলোই গুটিয়ে রাখা যায়। এজন্যই তুমি জাল, কাপড় ও কাগজপত্র গুটিয়ে রাখতে পারো, কিন্তু কলম বা দোয়াত গুটিয়ে রাখতে পারো না। (তবে তুলে গুছিয়ে তুলে রাখা অর্থে এটা বলা যেতে পারে।)

'দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মিটিংয়ে বসার সংবাদ সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে'। খবর ছাপা হওয়া এবং সংবাদ ছাপা হওয়া একরকম নয়। সংবাদ প্রকাশিত হলে ভালো। তদ্রূপ এখানে মিটিংয়ে না বসে আলোচনায় বসলে সবদিক থেকে ভালো হয়।

'বাজারের উপর থেকে নযরদারি তুলে নিলে মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে'। – এখানে সঠিক শব্দ হলো 'আশঙ্কা'। বিজয়ের সম্ভাবনা এবং পরাজয়ের আশঙ্কা বলতে হবে। অর্থাৎ ভালো ও পিয়-এর ক্ষেত্রে সম্ভাবনা এবং মন্দ বা অপ্রিয়-এর ক্ষেত্রে আশঙ্কা ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সম্ভাবনা-এর ব্যবহার সুন্দর নয়। হাঁ তুমি বলতে পারো, 'শত্রুর জয়ী হওয়ার আশঙ্কা নেই বরং পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

'অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করছে' ঠিক আছে, অখণ্ড নির্জনতাও চলতে পারে, কিন্তু অখণ্ড নিস্তব্দতা নয়।

অনাবিল শান্তি/আনন্দ ঠিক আছে। অনাবিল সুখ হয়ত চলবে, তবে অনাবিল পুলক চলবে না।

বসবাস শান্তিপূর্ণ হতে পারে, শান্তিময় হবে না। জীবন শান্তিপূর্ণ এবং শান্তিময়

দু'টোই হয়। তদ্রূপ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হবে, শান্তিময় হবে না। আমরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা করি, শান্তিময় পরিবেশে নয়।

হাত পাতা, মাথা পাতা, বুক পাতা বিভিন্ন অর্থে এই ব্যবহারগুলো ঠিক আছে, কিন্তু কাঁধ পেতে দেয়া অত সুন্দর নয়। কান পেতে শোনা ঠিক আছে, কিন্তু চোখ পেতে দেখা ঠিক নয়।

একজন লিখেছেন, 'নযর বিনিময় করলাম', এটা নতুন ব্যবহার হলেও সুন্দর নয়, এটা দৃষ্টিবিনিময়-এর বিকল্প হতে পারে না। মূল্যবিনিময় ও দামবিনিময়ের ক্ষেত্রেও একই কথা। মতবিনিময় যেমন সুন্দর, চিন্তাবিনিয়ম তেমন সুন্দর নয়। বন্ধুত্ব বিনিময় হয়। শত্রুতা বিনিময় বলা হয় না। পণ্যবিনিময় ঠিক আছে। পত্রবিনিময় ভালো, চিঠিবিনিময় তত ভালো নয়, এক্ষেত্রে আদান-প্রদান হতে পারে। খোলা চিঠি ঠিক আছে। খোলা পত্র তত ভালো নয়। উন্মুক্ত পত্র সম্ভবত হতে পারে। হৃদয়ের উত্তাপ/উষ্ণতা ঠিক আছে। মনের হবে শুধু উত্তাপ। দিলের হবে গরমি।

আমার ক্ষুদ্র বিবেচনা অনুযায়ী উপরের আলোচনা করা হলো। প্রতিটি মন্তব্য নির্ভুল না হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ আমারও জানার পরিমাণ অত্যন্ত সীমিত, তবে যা কিছু বলা হয়েছে যথাসম্ভব চিন্তাভাবনা করেই বলা হয়েছে, আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

# শব্দের সঠিক প্রয়োগ

আজকের মজলিসে শব্দের সঠিক প্রয়োগ সম্পর্কে আরো কিছু আলোচনা করা যাক।

০ অসীম ও অপরিসীম শব্দদুটির ব্যবহারে আমরা প্রায় ভুল করে থাকি।

অপরিসীম-এর মূল অর্থ হচ্ছে, অতি অধিক বা সুপ্রচুর,

পক্ষান্তরে অসীম অর্থ যার কোন সীমা নেই। অবশ্য অসীমতা দৃশ্যত ও বাহ্যত যেমন হতে পারে, তেমনি হতে পারে প্রকৃত অর্থে, যেমন বলা হয়, অসীম আকাশ, আবার বলা হয়, আলাহর কুদরত অসীম।

আনন্দের ক্ষেত্রে অপরিসীম বা সীমাহীন বা অশেষ বলাই সঙ্গত, অসীম আনন্দ সঠিক নয়। তদ্রূপ আমরা বলি, আলাহ তা'আলা অসীম জ্ঞানের অধিকারী, আর মানুষের ক্ষেত্রে বলি, তিনি অপরিসীম জ্ঞানের অধিকারী।

মানুষ অপরিসীম পাপ বা অন্যায় করে না, পাপ বা অন্যায় হচ্ছে সীমাহীন। 'অপরিসীম অন্যায়' যদি লেখো তাহলে 'সীমাহীন অপরাধ' হবে।

০ অক্ষয় মানে যার ক্ষয় নেই। সাধারণত এটা ভালো অর্থে ব্যবহৃত, যেমন অক্ষয় কীর্তি/ মর্যাদা/গৌরব, কিন্তু অক্ষয় কলঙ্ক নয়। অমোচনীয় কলঙ্ক হতে পারে।

০ 'আমাদের সম্পর্ক অক্ষুণ্ন থাকবে', এটা ঠিক আছে, তবে অক্ষুণ্ন সম্পর্কের চেয়ে অটুট সম্পর্ক এবং অক্ষুণ্ন স্বাস্থ্যের পরিবর্তে অটুট স্বাস্থ্য বলা উত্তম। আমরা বলি 'তার মনোবল অটুট/ অক্ষুণ্ন রয়েছে।' তবে 'অটুট মনোবলের কারণে তিনি জয়ী হয়েছেন', এক্ষেত্রে অক্ষুণ্ন শব্দটি তেমন সুন্দর নয়। 'তার শক্তি অক্ষুণ্ন রয়েছে', এক্ষেত্রে অটুট নয়।

০ অখণ্ড ভারত/পাকিস্তান, অখণ্ড মনোযোগ/ অবসর, অখণ্ড প্রতাপ/বিশ্বাস/আস্থা, এগুলো ঠিক আছে। আমরা বলি, 'শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান আর অখণ্ড থাকলো না,' কিন্তু 'তার আগের প্রতাপ/বিশ্বাস/আস্থা এখন আর অখণ্ড নেই', এটা ঠিক নয়, বরং 'অক্ষুণ্ন নেই' বলতে হবে ।

অখণ্ড যুক্তি নয়, বরং অখণ্ডনীয় বা অকাট্য। 'পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য,

আঞ্চলিক অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য', এগুলো ঠিক আছে, কিন্তু যুক্তির অখণ্ডতা নয়, বরং অকাট্যতা।

০ অগত্যা মানে অন্য গতি বা উপায় নেই বলে। যেমন – 'অগত্যা সব নির্যাতন আমাকে সহ্য করে যেতেই হবে।' কিন্তু 'অগত্যা সব নির্যাতন সহ্য করে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই', এটা ঠিক নয়, কারণ তখন অর্থ দাঁড়ায়, 'কোন উপায় নেই বলে সব নির্যাতন সহ্য করা ছাড়া কোন উপায় নেই'।

০ অগাধ মানে যার তলদেশ নেই, অর্থাৎ অতি গভীর। অগাধ জ্ঞান/পাণ্ডিত্য/সম্পদ/ঐশ্বর্য বলা হয়, কিন্তু অগাধ সমুদ্র তেমন সুন্দর নয়। রবীন্দ্রনাথ নাকি 'অগাধ আকাশ' বলেছেন, কিন্তু এটা সুপ্রয়োগ মনে হয় না। অগাধ জ্ঞানী/পণ্ডিত-এর পরিবর্তে অগাধ জ্ঞানের/পাণ্ডিত্যের অধিকারী বলা উত্তম। অগাধ বিশ্বাস/আস্থা বলা হয়। অগাধ সাহস ঠিক নয়, অপরিসীম সাহস হতে পারে।

০ ঘোর মানে ভীষণ বা গভীর বা অত্যন্ত। যেমন, ঘোর বিপদ/ অন্ধকার/মাতাল। ঘোর নাস্তিক বলা হয়, তবে কিঞ্চিৎ কটাক্ষের অর্থে।

ঘোর নিদ্রা, ঠিক আছে. তবে ঘোর ঘুম বলা ঠিক নয়। গভীর নিদ্রা/ঘুম দুটোই সঠিক। নিদ্রার ঘোরে-এর চেয়ে ঘুমের ঘোরে অধিকতর উত্তম।

ঘোরদর্শন মানে দেখলে ভয় লাগে এমন, তবে এক্ষেত্রে বিকট/ভীষণদর্শন বলা বেশী ভালো।

ঘোরতর, এর মূল অর্থ হলো যে কোন দুটির মধ্যে **বেশী** ঘোর। যেমন, 'গতকাল ঘোর যুদ্ধ হয়েছে, তবে আজকের যুদ্ধটা ঘোরতর।'

অবশ্য এর সাধারণ ব্যবহার হচ্ছে অত্যন্ত ভীষণ অর্থে, যেমন 'লোকটি ঘোরতর নাস্তিক।' 'এ বিষয়ে ঘোর সন্দেহ/ঘোরতর সন্দেহ দেখা দিয়েছে।'

অঘোর, এর অর্থ হওয়া উচিত ছিলো ঘোর বা ভয়ঙ্কর নয়, কিন্তু এর সাধারণ ব্যবহার হচ্ছে অত্যন্ত ঘোর অর্থে, যেমন– অঘোর মেঘ/ বাদল এবং অঘোর নিদ্রা। অঘোর ঘুমও বলা যায়, যদিও ঘোর ঘুম বলা হয় না।

অঘোরে এবং বেঘোরে শব্দদুটি সমার্থক। অঘোরে ঘোমানো হয়, কিন্তু বেঘোরে নয়, তদ্রূপ বেঘোরে প্রাণ যায়, কিন্তু অঘোরে নয়।

০ অতুলনীয় শব্দটি ভালো অর্থে ব্যবহৃত, অর্থাৎ অতি উত্তম, সুতরাং অতুলনীয় সাহস/বীরত্ব/ শৌর্যবীর্য হয়, কিন্তু অতুলনীয় ভীরুতা/কাপুরুষতা নয়। একজন লিখেছেন, তার কৃপণতা অতুলনীয়, এটা কটাক্ষের ক্ষেত্রে চলতে পারে, অর্থাৎ তুমি যেন তার কৃপণতার প্রশংসা করছো।

০ বিরাট/বিশাল অঞ্চল/এলাকা/ দেশ/নদী/সমুদ্র ইত্যাদি হতে পারে, তবে বিশাল হৃদয়ের চেয়ে বিরাট হৃদয় উত্তম।

বিরাট/বিশাল অট্টালিকা/ঐশ্বর্য, তবে বিশাল পার্থক্য, এর চেয়ে বিরাট পার্থক্য

উত্তম। বিশাল ব্যবধানের চেয়ে বিরাট ব্যবধান ভালো।
'আমাদের জন্য এটা বিরাট/ বিশাল অর্জন', বলা হয়, তবে গৌরবের ক্ষেত্রে বিরাট হয়, বিশাল হয় না।

০ পরিপাটি/পরিচ্ছন্ন শয্য/ বিছানা/ কক্ষ/কামরা বলা হয়। পরিপাটি ভাষা বলা হয় না, পরিচ্ছন্ন ভাষা বলা হয়। কথা অবশ্য পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন দুটোই হয়।
'সবকিছুতেই তিনি বেশ পরিপাটি।' বলা হয়, অর্থাৎ সবকিছু তিনি গুছিয়ে সুন্দর-ভাবে করেন।
পরিপাটি জীবন মানে সুশৃঙ্খল ও গোছালো জীবন। পরিচ্ছন্ন জীবন কথাটা উপরোক্ত অর্থে যেমন হয় তেমনি সুন্দর ও নিষ্কলঙ্ক জীবন অর্থেও হয়, কিন্তু দ্বিতীয় অর্থে পরিপাটি জীবন বলা হয় না।

০ ভাঙ্গা মন এবং ভগ্ন হৃদয়, ভাঙ্গা শরীর এবং ভগ্ন স্বাস্থ্য বলা হয়; ভগ্ন মন, ভাঙ্গা হৃদয়, তদ্রূপ ভগ্ন শরীর এবং ভাঙ্গা স্বাস্থ্য সাধারণত হয় না।

০ প্রসন্ন/সন্তুষ্ট/হৃষ্ট চিত্তে, বলা হয়। প্রসন্ন/সন্তুষ্ট হৃদয়ে বা মনে বলা হয়, কিন্তু হৃষ্ট হৃদয়ে বা মনে বলা হয় না।

০ প্রবল ও প্রচণ্ড শব্দদুটি সমার্থক, তবে ব্যবহারে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। 'তিনি প্রবল প্রতাপের/পরাক্রমের অধিকারী' বলা হয়। প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিও বলা হয়, এক্ষেত্রে প্রচণ্ড বলা হয় না।
প্রবল রোদ নয়, বরং প্রচণ্ড/ প্রখর/তীব্র রোদ। 'প্রবল বা প্রচণ্ড বেগে ঝড় শুরু হয়েছে' বলা যায়। 'প্রবল বা প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী' বলা হয়। প্রবল ব্যথা/ বেদনা নয়, বরং প্রচণ্ড/তীব্র ব্যথা এবং সীমাহীন বেদনা। ব্যথা যদি শারীরিক হয় তবে তা সীমাহীন নয়, বরং প্রচণ্ড/তীব্র/অসম্ভব। ব্যথা যদি মনের হয় তাহলে হবে সীমাহীন ব্যথা।
প্রচণ্ড জ্বর বলা যায়, তবে প্রবল/ তীব্র জ্বর উত্তম। প্রবল তেজ নয়, বরং প্রচণ্ড তেজ। তদ্রূপ প্রবল কষ্ট বলা সঠিক নয়, বরং প্রচণ্ড বা সীমাহীন কষ্ট

০ খোলা মনে, উদার মনে বলা যায়, কিন্তু খোলা হৃদয়ে নয়, বরং উদার হৃদয়ে, তদ্রূপ খোলা চিত্তে নয়, উদার চিত্তে। সমুদ্রের গভীর দূরের এলাকা বোঝানোর জন্য খোলা সমুদ্র বলা হয়। খোলা আকাশ তেমন একটা বলা হয় না, উন্মুক্ত আকাশ বলা হয়। খোলা/উন্মুক্ত পরিবেশ বলা হয়। খোলা মাঠ এবং উন্মুক্ত প্রান্তর বলা হয়। বিপরীতভাবে বলা যায়, তবে সুন্দর নয়। মুক্ত/উন্মুক্ত পরিবেশ বলা হয় প্রাকৃতিক দিক থেকে। যেমন বলা হয় গ্রামের মুক্ত পরিবেশ এবং শহরের বদ্ধ পরিবেশ।
বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার মুক্ত পরিবেশ রয়েছে। 'খোলামেলা পরিবেশে আলোচনা হয়েছে' এক্ষেত্রে মুক্ত বা উন্মুক্ত তেমন বলা হয় না। তবে গ্রামের এবং বিশ্ববিদ্যালয়েল খোলামেলা পরিবেশও বলা হয়। খোলামেলা পরিবেশ প্রাকৃতিক দিক

থেকে হতে পারে, আচরণগত দিক থেকেও হতে পারে।

o সাহস দেয়া এবং সাহস যোগানো, একই কথা, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য হয়, যেমন 'দুর্যোগকালে জাতিকে যিনি সাহস যোগাতে পারেন তিনিই আদর্শ নেতা' এখানে 'সাহস দিতে পারেন' সঠিক নয়। 'তিনি আমাকে সাহস দিয়ে বললেন, ভয় কী, আমি তো আছি তোমার সাথে।' এক্ষেত্রে 'সাহস যুগিয়ে' বলা হয় না। 'আমি যখন ভেঙ্গে পড়েছিলাম তখন তিনি আমাকে সাহস যুগিয়েছেন, এখানে সাহস দিয়েছেনও হতে পারে। এমন অসাধ্য সাধন করার ক্ষেত্রে কে তোমাকে সাহস যুগিয়েছে? এখানে 'সাহস দিয়েছে' নয়।

প্রেরণা দিয়েছেন ও যুগিয়েছেন সমানভাবেই ব্যবহৃত হয়।

o গানের তালে তালে নৃত্য করা বলা হয়। কিন্তু মিসিলটি শ্লোগানের তালে তালে এগিয়ে গেলো, এটি তেমন ঠিক নয়। প্রচণ্ড কিছুর 'তালে তালে' হয় না। যেমন গর্জনের তালে তালে নয়। সুরের এবং নৃত্যের তালে তালে ঠিক আছে।

সময়ের দাবী/প্রয়োজন/চাহিদা, এগুলো ঠিক আছে। সময়ের তাগাদা তেমন ঠিক নয়, তবু কেউ কেউ লিখেছেন।

যুগের দাবী ও চাহিদা ঠিক আছে, যুগের প্রয়োজন কথাটা 'সময়ের প্রয়োজন'-এর মত ঠিক নয়।

শরীর কাঁটা দিয়ে উঠলো এবং দেহ কণ্টকিত হলো। শরীর কণ্টকিত হলো এবং দেহ কাঁটা দিয়ে উঠলো, তেমন ভালো নয়।

শিশিরস্নাত, শিশির-ধোয়া সকাল, শিশিরসিক্ত ফুল, শিশির ধোয়া ঘাস। জোসনাস্নাত ও জোস্না-ধোয়া রাত। কিন্তু জোসনাসিক্ত নয়।

আমি যদ্দুর জানি, তোমাদের বললাম, আমার জানা ভুলও হতে পারে। কামনা করি, তোমরা সোজা পথ ধরে বহু দূর এগিয়ে যাও।

# সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ

আমাদের তো বটেই, ভালো ভালো লেখক-সাহিত্যিকেরও লেখায় সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দেখা যায়। আগে সাধুভাষার ব্যাপক ব্যবহার ছিলো, এখন তা প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। এখন বই বলো, পত্রপত্রিকা বলো সবই লেখা হয় কথ্য বা চলিত ভাষায়। সাধুভাষা এভাবে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হওয়া বাংলাভাষার জন্য কল্যাণকর হয়েছে কি না, সেটা ভিন্ন বিষয়; তবে বড় সমস্যার কথা এই যে, কথ্যভাষায় প্রায় আমরা সাধুভাষার শব্দ ব্যবহার করে থাকি। সাহিত্যের মানদণ্ডে এটা খুব দোষের। যেমন একজন লিখেছেন–

'তিনি স্বীয় স্ত্রীর প্রতি সদয় আচরণ করতেন।'

শুদ্ধ ব্যবহার হলো তিনি নিজের/আপন স্ত্রীর প্রতি সদয় আচরণ করতেন।

স্বীয় হচ্ছে খাঁটি সাধুভাষার শব্দ। বাক্যটি সাধুভাষায় লিখলে এরূপ হবে, 'তিনি স্বীয় পত্নির প্রতি সদয় আচরণ করিতেন।' গোড়ার দিকে সাধুভাষার রূপ এরূপই ছিলো। তবে পরবর্তী কালে সাধুভাষাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় কথ্যভাষার কাছাকাছি আনার চেষ্টা করা হয়েছে। পরিবর্তিত সাধুভাষায় এমন লেখা হয়, 'তিনি আপন স্ত্রীর প্রতি সদয় আচরণ করিতেন।'

অতঃপর শব্দটিও সাধুভাষা ব্যবহৃত; কথ্যভাষার শব্দ হলো তারপর, কিংবা এরপর। বিনা প্রয়োজনে অতঃপর লেখা ঠিক নয়। তবে কথ্যভাষায় অতঃপর লিখতে গিয়ে সাধারণত বিসর্গ ছেড়ে দেয়া হয়। কেন ছেড়ে দেয়া হয়, তা অবশ্য আমার জানা নেই।

ইহা, উহা, যাহা ইত্যাদি শব্দ চলিত ভাষায় আজকাল অনেকে লিখছেন। এটা কিন্তু ভাষার অনাচার। লিখতে হবে এটি, সেটি, যা। সাধুভাষার শব্দ 'নহে', কথ্যভাষায় 'নয়', অনেকে ভুলে লিখে ফেলেন, বিশেষত উপদেশমূলক কথায়, 'এটি ভালো গুণ নহে।'

'ছাহাবা কেরামের ন্যায় উত্তম চরিত্রের মানুষ পৃথিবীতে আর হবে না।' এ বাক্যের ন্যায় শব্দটি হলো সাধু, চলিত শব্দ হলো 'মত'। কথ্যভাষায় দেদার লেখা হচ্ছে,

বীরের ন্যায়, কাপুরুষের ন্যায়। একজন লিখেছেন, কলম তরবারির ন্যায় ধারালো অস্ত্র।' লিখতে হবে 'তলোয়ারের মত'। তরবারি শব্দটি প্রয়োজনে চলিত ভাষায় ব্যবহার করা যায়।

কোষমুক্ত শব্দটিও চলিত ভাষায় চলবে। অর্থাৎ বহু তৎসম শব্দ চলিত ভাষায়ও গ্রহণযোগ্য, তবে সে ক্ষেত্রে শব্দের সমশ্রেণিতা রক্ষা করতে হবে।

নীচের বাক্যে তন্মধ্যে শব্দটির ব্যবহার ঠিক নয়–

'তিনি আমাকে কয়েকটি মূল্যবান বই উপহার দিলেন, তন্মধ্যে একটি বই আমার খুবই পছন্দ হলো।' বলা উচিত, 'তার/সেগুলোর মধ্যে একটি বই'।

অনেক লেখককে তন্মধ্যে শব্দটিকে যত্রতত্র ব্যবহার করতে দেখা যায়। এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

যত্রতত্র শব্দটিও সাধুভাষার শব্দ। কথ্যভাষায় বলা হয়, 'যেখানে সেখানে'। তবে কথ্যভাষায় এটি বহুল প্রচলিত বলে গ্রহণযোগ্য।

একজন লিখেছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তদীয় কন্যা ফাতেমাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন।' তদীয় হচ্ছে সাধুভাষার শব্দ; কথ্যভাষায় এর ব্যবহার সঙ্গত নয়। এখানে আপন কন্যা, তাঁর কন্যা, বা শুধু কন্যা ফাতিমা হতে পারে।

দিবস ও রজনী হচ্ছে সাধুভাষার শব্দ। তাই চলিত ভাষায় সাধারণভাবে শব্দদু'টি ব্যবহার করা ঠিক নয়। যেমন 'আমার জীবনে এমন বহু দিবস-রজনী এসেছে যখন ...' লিখতে হবে, 'বহু দিন-রাত'। তবে ক্ষেত্রবিশেষে তা ব্যবহার করা সঙ্গত, বরং অপরিহার্য হয়ে থাকে। যেমন, মুক্তিদিবস, স্বাধীনতাদিবস, মেরাজরজনী।

অনেকে লিখে থাকেন, এতদ্‌সংক্রান্ত, এতদ্‌সম্পর্কে, এতদ্‌বিষয়ে ইত্যাদি, এতে সাধু-কথ্যের মিশ্রণ ঘটে। লিখতে হবে, 'এসংক্রান্ত, এসম্পর্কে এবং এ বিষয়ে। তাতে ভাষা যেমন নির্ভুল হবে তেমনি হবে সহজবোধ্য।

## পঞ্চম অধ্যায়ঃ *কিছু লেখার সমালোচনা*

*বিভিন্ন সময় আমরা বিভিন্ন লেখা পড়ি। ভালো লেখা পড়ে আমাদের ভালো লাগে এবং তা থেকে হয়ত যথেষ্ট আনন্দ লাভ করি, কিছু শিখতেও যে পারি না, তা নয়। কিন্তু সত্য কথা এই যে, কোন লেখা সাধারণত আমরা সমালোচনার দৃষ্টিতে পড়ি না। যদি পড়তাম তাহলে সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে অনেক বেশী উপকৃত হতে পারতাম। অন্যের লেখা থাক, নিজের লেখাকেও আমরা কখনো সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখি না, অথচ লেখার উন্নতি লাভের জন্য এই সমালোচনার কোন বিকল্প নেই। এ অধ্যায়ে আমরা লেখার সমালোচনা ও পর্যালোচনার কিছু নমুনা তুলে ধরতে চাই।*

# একটি লেখার সমালোচা – ১

আনিসুর-রহমান নামে পুষ্পের এক বন্ধু তার রোযনামচার পাতা থেকে একটি লেখা পাঠিয়েছিলো। পুষ্পের পাতায় তার লেখাটি প্রকাশিত হয়নি, তবে তাকে সম্বোধন করে তার লেখার কিছু আলোচনা করেছিলাম, যা পুষ্পে প্রকাশিত হয়েছিলো। এখানেও তা তুলে দেয়া হলো–

ভাই আনিস! তোমার 'রোযনামচার একটি পাতা' লেখাটি বলা যায় সুন্দর এবং তাতে সম্ভাবনার ইঙ্গিত রয়েছে। তোমার এবং তোমাদের লেখায় ত্রুটি থাকতে পারে, থাকাটাই স্বাভাবিক। আমাদের এবং আমাদের যারা বড় তাদের লেখায়ও ত্রুটি থাকে। আলোচনা ও সমালোচনার মাধ্যমে ত্রুটিগুলো আমরা বুঝতে পারি এবং সংশোধন করতে পারি। তাতে আমাদের আগামী দিনের লেখা হয়ে ওঠে সুন্দর ও নিখুঁত। এই শুভ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তোমার আজকের লেখাটির প্রয়োজনীয় সমালোচনা করছি।

তুমি লিখেছো– 'শুক্রের দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো'। এটা ঠিক হয়নি। তোমাকে লিখতে হবে, 'শুক্রবারের দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো'। 'শুক্রের পর শনি, তারপর রবি' এটা হতে পারে, কিন্তু শুক্রের সকাল, শনির দুপুর, রবির সন্ধ্যা, এগুলো হতে পারে না। বলতে হবে, শুক্রবারের সকাল, শনিবারের দুপুর এবং রবিবারের সন্ধ্যা।

তারপর তুমি লিখেছো, 'আজ এই সময়ে পৃথিবীর পথে কত মানুষ পথ চলছে কত মনে কে জানে! আমরা তিন বন্ধু পথ চলছি একমনে...।'

'কত মনে' দ্বারা সম্ভবত তুমি 'কত উদ্দেশ্যে' বুঝিয়েছো, আর 'একমনে' দ্বারা অভিন্ন উদ্দেশ্য বোঝাতে চেয়েছো। আসলে একমনে অর্থ একাগ্রচিত্তে। যেমন, 'সে একমনে লেখাপড়া করছে।' সুতরাং এখানে শব্দপ্রয়োগ যথার্থ হয়নি।

'পৃথিবীর পথে'– এর একটি অর্থ হলো পৃথিবীর উদ্দেশ্যে/উদ্দেশে। যেমন, চাঁদের পথে এ্যাপলোর যাত্রা এবং পৃথিবীর পথে তার ফিরতি যাত্রা।

'পৃথিবীর পথে'– এর আরেকটি অর্থ হলো, পৃথিবী যে পথ ধরে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। যেমন, পৃথিবীর পথে যদি অন্য গ্রহ এসে পড়ে তাহলে কী সর্বনাশ ঘটতে পারে?'

'পৃথিবীর পথে' দ্বারা তুমি সম্ভবত বোঝাতে চেয়েছো পৃথিবীতে মানুষের চলাচলের যে পথ সেই পথে। তাহলে তোমাকে লিখতে হবে, 'পৃথিবীর পথে পথে'।

দেখো তো, তোমার বাক্যটা এমন হলে কেমন হতো! 'আজ/এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কত মানুষ কত উদ্দেশ্যে পথ চলছে, কে জানে! আমরা তিন বন্ধু চলেছি অভিন্ন এক উদ্দেশ্যে।'

যেহেতু প্রথমে বলা হয়েছে, 'কত মানুষ কত উদ্দেশ্যে পথ চলছে' সেহেতু 'আমরা তিন বন্ধু চলেছি' বলাই যথেষ্ট। এখানে আর 'পথ চলেছি' বলার দরকার করে না। একান্ত যদি পথ শব্দটি রাখতে চাও তাহলে এভাবে বলতে পারো, 'কিন্তু আমাদের তিন বন্ধুর পথ চলা ছিলো অভিন্ন এক উদ্দেশ্যে।' এটা বোধ হয় আগের চেয়ে সুন্দর হলো।

তুমি আরো লিখেছো, 'তিন বন্ধুর কথার ব্যস্ততায় কখন যে দীর্ঘ পথটা ফুরিয়ে এলো ..।'

এটা সুন্দর হয়নি। কারণ কাজের ব্যস্ততা, অফিসের/দফতরের ব্যস্ততা, লেখার/লেখালেখির/লেখাপড়ার ব্যস্ততা, সফরের ব্যস্ততা ইত্যাদি অনেক প্রকার ব্যস্ততার কথা বলা হলেও কথার ব্যস্ততা এপর্যন্ত কেউ বলেনি। গল্পেরও ব্যস্ততা হয় না, যেমন হয় না ঘুমের ব্যস্ততা; এমনকি খাওয়াদাওয়ার ব্যস্ততাও অচল।১

দ্বিতীয়ত কথা যদি গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে আলোচনার ব্যস্ততার মত কথার ব্যস্ততাও হয়ত চলবে, কিংবা চালিয়ে নেয়া যাবে, তবে সেটা হবে মজলিসের কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথাবার্তা, চলতি পথের লঘু কথাবার্তা নয়। শব্দব্যবহারের ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়, নইলে লেখার সৌন্দর্য ক্ষুণ্ন হয়। এখানে তুমি লিখতে পারতে–

'তিন বন্ধুর আলাপনিমগ্নতায় কীভাবে যে/কখন যে দীর্ঘ পথটা ফুরিয়ে গেলো ...।'

'তিন বন্ধু' অংশটা বাদ দিয়ে শুধু বলতে পারো, 'কথায় কথায় দীর্ঘ পথটা কখন যে ফুরিয়ে গেলো...।' কেননা সংখ্যায় তোমরা যে তিনজন এবং তোমরা পরস্পর যে বন্ধু তা তো আগেই আমরা জেনেছি; সুতরাং সেটার পুনরুক্তি না হলেও ক্ষতি নেই। যদিও বিভিন্ন প্রয়োজনে এধরনের পুনরুক্তি গ্রহণযোগ্য।

তুমি লিখেছো, 'হতাশা আমাদের পিষে ফেললো।' হতাশা হলো নির্জীবতার অবস্থা; হতাশা মানুষকে কুরে কুরে খায়, পিষে ফেলে ফেলে না। পক্ষান্তরে পিষে ফেলার জন্য প্রয়োজন এমন একটা কিছু যার মধ্যে ক্ষিপ্ততা ও প্রচণ্ডতা রয়েছে। যেমন ধরো, মত্ত হাতি মানুষকে তার পায়ের নীচে পিষে ফেলে। হতাশায় ভেঙ্গে

পড়া/বিপর্যস্ত হওয়া, ঠিক আছে, কিন্তু হতাশায় পিষ্ট হওয়া ঠিক নেই।

আমরা হতাশায় মুষড়ে পড়ি/মুহ্যমান হই/ভেঙ্গে পড়ি, আর প্রচণ্ড যন্ত্রণায় পিষ্ট হই। তুমি লিখতে পারো, 'হতাশা আমাদের আচ্ছন্ন করে ফেললো/কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ফেললো।'

বানান সম্পর্কে তোমার আরো সচেতন হওয়া দরকার। তুমি লিখেছো, 'পথচলার অস্বস্থি', অথচ শুদ্ধ বানান হলো 'অস্বস্তি'। এধরনের বানানভুল সত্যি অস্বস্তিকর। আর পথচলার অস্বস্তির চেয়ে বলা ভালো, 'পথচলার কষ্ট/ক্লান্তি/শ্রান্তি ইত্যাদি।

তুমি লিখেছো, 'তার সান্নিদ্ধ ছিলো তাজা ফুলের সুবাসের মত, যা দ্বারা তিনি আমাদের প্রান-মন কেড়ে নিলেন।'

লেখার সময়, কিংবা লেখা শেষে তুমি যদি অভিধানের একটুখানি 'সান্নিধ্য' গ্রহণ করতে তাহলে শব্দটির বানানে এমন শোচনীয় ভুল হতো না। (শোচনীয়-এর বানানটা এই সুযোগে দেখে রাখো, যাতে পরে আবার দন্ত্য-স, বা হ্রস্ব-ইকার দিয়ে অনুশোচনা করতে না হয়।) আর প্রাণে যে মূর্ধন্য-ণ তা কি এখনো বলে দিতে হবে?

প্রিয় মানুষের সান্নিধ্যকে তাজা ফুলের সঙ্গে উপমা দিয়েছো, এটা খুব সুন্দর এবং তা তোমার মন কেড়ে নিতে পারে, কিন্তু প্রাণ যদি কেড়ে নেয় তাহলে তোমার কী অবস্থা হবে! প্রাণ কেড়ে নিলে কি কেউ বাঁচে!

আর ভাই, কেড়ে নেয়ার কাজটা তোমার প্রিয় মানুষটিকে দিয়ে করাতে গেলে কেন? 'তাজা ফুলের সুবাস দ্বারা তিনি কেড়ে নিলেন' না বলে তুমি সহজেই বলতে পারতে, 'তাজা ফুলের সুবাসের মত, যা আমাদের মন কেড়ে নিলো। তাছাড়া সুবাসের মত কোমল ও স্নিগ্ধ বিষয়ের ক্ষেত্রে 'কেড়ে নেয়া' একেবারে বেমানান। তুমি যদি বলো, 'ফুলের সৌন্দর্য আমার মন কেড়ে নিয়েছে' আমি বিশেষ আপত্তি করবো না, যদিও বেশী পছন্দ করবো, 'আমাকে মুগ্ধ করেছে', কিন্তু প্রাণ কেড়ে নিতে দেবো না কিছুতেই।

তুমি লিখতে পারতে– 'তার সান্নিধ্য ছিলো তাজা ফুলের মত যা আমাদের প্রাণ-মন আশ্চর্য এক স্নিগ্ধতায় পূর্ণ করে দিলো।' অথবা 'আমাদের প্রাণ-মনে আশ্চর্য এক স্নিগ্ধতা এনে দিলো।'

'অপলক নযরে তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন' প্রথম কথা হলো অপলক দৃষ্টি হবে, অপলক নযরে শব্দের সঙ্গে শব্দের সমশ্রেণিতা নেই। দ্বিতীয় কথা হলো, অপলক দৃষ্টি তাকিয়ে থাকবে তোমার প্রতি মুগ্ধ হওয়ার কারণে। কিন্তু এখানে তো মুগ্ধতার কিছু ঘটেনি! যদি বলো, তিনি আমাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন তাহলে অবশ্য চলে।

যাই হোক, শুরুর কথাটা শেষেও আবার বলছি, লেখায় ভুলত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক। আমাদের এ আলোচনা শুধু কিছু শেখার জন্য, তোমাকে হতাশ করার

জন্য নয়, হতাশায় 'পিষ্ট' করার জন্য তো নয়ই। তুমি কলম মেরামতবিষয়ক লেখাগুলো নিয়মিত পড়তে থাকো এবং লিখতে থাকো। লিখতে লিখতে এবং শিখতে শিখতেই উন্নতি হতে থাকবে ইনশাল্লাহ। এবং আশ্চর্য কী, হয়ত একসময় তুমিই পরবর্তীদের কলম মেরামত করার গুরুদায়িত্ব পালন করবে! তোমার কলমটি মেরামত করে আগামী দিনের জন্য তোমাকে প্রস্তুত করে তোলাই তো আমাদের উদ্দেশ্য, যদিও যোগ্যতা এবং সাধ্য ও সামর্থ্য আমাদেরও সীমিত।

---

১। এখানে ছিলো 'অনেক প্রকারের ব্যস্ততা', তাতে ব্যস্ততা শব্দটি ভাঙ্গা পড়ে যায়। অর্থাৎ 'ব্যস্ত' থাকে উপরের লাইনে, 'তার' থাকে নীচের লাইনে। কম্পোজের সজ্জাগত দিক থেকে এটা ছিলো খারাপ। ভাবলাম কী করা যায়? দৃষ্টিটা এখন তীক্ষ্ণ হলো এবং 'প্রকারের' উপর নযর গেলো। র ও একার কেটে 'প্রকার' করে দিলাম, তাতে 'ব্যস্ততার' চলে এলো উপরের লাইনে। যদি কম্পোজের সজ্জাগত প্রয়োজনটি দেখা না দিতো তাহলে আমার দৃষ্টি এভাবে সন্ধানী এবং মনোযোগ এমন গভীর হয়ে উঠতো না এবং 'প্রকারের'-এর সংশোধন হতো না। অথচ 'অনেক প্রকারের ব্যস্ততা'-এর চেয়ে অনেক প্রকার ব্যস্ততা, বেশী ভালো। তো আমি বলতে চাচ্ছি, এভাবেও লেখার সম্পাদনা হয়।

# একটি লেখার সমালোচনা- ২

এ লেখাটি লিখেছিলো শরীফুল ইসলাম নামে পুষ্পের আরেক বন্ধু। তবে আনিসুর-রহমানের লেখাটির সমালোচনা করেছিলাম স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। কিন্তু শরীফুল ইসলাম খুব জোরালো ভাষায় আমাকে অনুরোধ করেছিলো তার লেখার ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দেয়ার জন্য, যাতে সে আগামী দিনের 'কলম সৈনিক' হতে পারে। অনেক কথাই সে লিখেছিলো। আমি তার কথায় বেশ প্রভাবিত হয়েছিলাম এবং যত্নের সাথে তার লেখাটির সমালোচনা করেছিলাম, যা পুষ্পে প্রকাশিত হয়েছিলো। কিন্তু আফসোস, এর পর না কোন খোঁজ পেলাম আনিসুর-রহমানের, না শরীফুল ইসলামের! কোথায় যে ওরা হারিয়ে গেলো!

যাক নীচের সমালোচনাটি তোমরা মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং তা থেকে কিছু শেখার চেষ্টা করো।

ভাই শরীফ! গণতন্ত্র ও ইসলাম শিরোনামে তোমার লেখাটি মন্দ হয়নি। তুমি যদি নিয়মিত লিখতে থাকো তাহলে যথেষ্ট উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়।

লেখার উন্নতির জন্য লোখা-সমালোচনার অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার। নিজেই নিজের লেখার সমালোচনা করো। বিভিন্নদিক থেকে বিভিন্নভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার পড়ো এবং চিন্তা করো।

শব্দপ্রয়োগ সম্পর্কে চিন্তা করো, কোন ত্রুটি রয়ে গেছে কি না? আওয়াজ করে করে কানে বাজিয়ে পড়ে দেখো, শ্রুতিমধুরতা ক্ষুণ্ন হয়েছে কি না? বাক্যবিন্যাস ও পর্ববিভক্তি সুন্দর হয়েছে কি না? বাক্যের শব্দগুলোকে আগে-পিছে করে বা কোন শব্দকে পরিবর্তন করে দেখো, তাতে বাক্যটি আরো সুন্দর হয় কি না? এভাবে নিজের লেখাকে নিজেই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে নির্মমভাবে জেরা করো, বিচার করো, তারপর অস্ত্রচিকিৎসকের মত কাটা-চেরা করো। এতে তোমার লেখা প্রথমে যদি হয় কলি, এখন হবে পূর্ণ প্রস্ফুটিত একটি ফুল। কলি ছাড়া ফুল হয় না, তবু একথা সত্য যে, কলিতে কোন সুবাস নেই। সব সুবাস থাকে প্রস্ফুটিত ফুলের পাপড়িতে। সুতরাং কোন৷ লেখাকে অস্ফুট কলি থেকে ধীরে ধীরে পরিস্ফুটিত

ফুলে রূপান্তরিত করার জন্য তোমাকে অব্যাহতভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, যদি তুমি সফল লেখক হতে চাও।

লেখার ভাষাগত সৌন্দর্য যেমন চিন্তা করার বিষয় তেমনি লেখার কাঠামো সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ করার বিষয়টিও আরো গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তা করার বিষয়। সে সম্পর্কে অবশ্য আমরা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করবো। আমাদের আজকের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে শুধু লেখার ভাষাগত বিষয়ে।

আরেকটা জরুরি বিষয় মনে রাখতে হবে। মূল লেখাটি তৈরী করার সময় লেখার কাঠামোসৌন্দর্য বা ভাষাসৌন্দর্য, কোন কিছু সম্পর্কে খুব বেশী চিন্তা-ভাবনা করবে না। কলমে যা আসে এবং যেভাবে আসে স্বাভাবিক গতিতে তাই লিখে যাবে। লেখাটা শেষ হওয়ার পর, আরো সঠিকভাবে যদি বলি, লেখাটা জন্মলাভ করার পর শুরু হবে তোমার আসল কাজ; লেখাকে পূর্ণাঙ্গ করার এবং সুন্দর করার কাজ। এবং তা দীর্ঘ সময়ের ও কঠিন অধ্যবসায়ের কাজ। লেখার পরিমার্জন ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে তোমাকে অকৃপণভাবে সময় ব্যয় করতে হবে। একটি লেখা তুমি লিখে ফেলতে পারো একদিনে বা আরো কম সময়ে। কিন্তু তার পরিমার্জন ও পরিচর্যায় তোমাকে আত্মনিমগ্ন থাকতে হবে দিনের পর দিন।

অনেক কষ্টের কাজ, কিন্তু এর সবচে' বড় সুফল এই যে, কলমের সঙ্গে তোমার আশ্চর্য একটি হৃদ্যতার বন্ধন তৈরী হবে এবং লেখার সঙ্গে গড়ে ওঠবে তোমার আত্মার আত্মীয়তা। তখন লেখার মধ্যে তুমি শুধু আনন্দই পাবে না, তৃপ্তিও অনুভব করবে। কলম তোমাকে শুধু লেখাই দেবে না, আত্মিক প্রশান্তিও দান করবে। আগে পিপাসা, তারপর পানি, আগে তৃষ্ণা, তারপর তৃপ্তি। এটাই তো জীবন ও জগতের রীতি।

আবেগের স্রোতে চলে গেছি কত দূর! ফিরে আসি আগের কথায়। তোমার লেখার তুমি নিজে যেমন সমালোচনা করবে তেমনি সুযোগ হলে সাহিত্যবোধসম্পন্ন কোন ব্যক্তির সামনে সমালোচনার জন্য তা পেশ করবে এবং মনোযোগের সাথে তার সমালোচনা ও মন্তব্য শোনবে এবং পরবর্তী লেখায় তা থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করবে। যিনি তোমার লেখার গঠনমূলক সমালোচনা করে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেবেন তিনিই তোমার কলমের প্রকৃত বন্ধু।

লেখার সত্যিকার উন্নতির জন্য তোমাকে আরেকটি কাজ করতে হবে। বাংলাভাষার প্রতিষ্ঠিত ও দিকপাল লেখক যারা তাদের লেখা সমালোচকের দৃষ্টিতে পড়বে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লেখা ও বক্তব্যকে তিনি কীভাবে সাজিয়েছেন? কীভাবে বক্তব্যের উদ্বোধন করেছেন? কীভাবে বক্তব্যকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং তার পরিসমাপ্তি টেনেছেন? এসব বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করে দেখবে।

এটা তো গেলো কাঠামোগত দিক; একই ভাবে চিন্তা করে দেখবে, কোথায় তিনি কোন্ শব্দ প্রয়োগ করেছেন? বাক্যটি কীভাবে গঠন করেছেন? কোথায় কোন্ শৈলী

ব্যবহার করেছেন? কী কী উপমা ব্যবহার করেছেন এবং সেগুলোর সৌন্দর্য কোথায়? এসব বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করে দেখবে। কোন লেখা তাড়াহুড়া না করে সময় নিয়ে পড়বে। আসলে সাহিত্যচর্চার জন্য প্রয়োজন পড়ার নয়, প্রয়োজন গভীর অধ্যয়নের। একই লেখা বারবার পড়বে এবং ভাষাসৌন্দর্য শেখার উদ্দেশ্যে পড়বে। তাহলে ইনশাআল্লাহ অল্প সময়ে তোমার মধ্যে ভাষাজ্ঞান ও সাহিত্যরুচি সৃষ্টি হবে এবং তোমার নিজের লেখায় সৌন্দর্যের ছাপ পরিস্ফুট হবে।

অনেক কথা হলো, এসো এবার কাজ করি। এখন আমরা তোমার লেখাটির ভাষাগত দিক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা বা সমালোচনা তুলে ধরবো। তুমি লিখেছো–

'গণপ্রসূত কোন নীতির মাধ্যমে মানবজীবনে শান্তি আসতে পারে না।'

খুবই সত্য কথা, তবে সমস্যা হলো, মস্তিষ্কপ্রসূত, আবেগপ্রসূত, চিন্তাপ্রসূত ইত্যাদির ব্যবহার তো আছে, কিন্তু গণপ্রসূত বা মানবপ্রসূত-এর ব্যবহার নেই। তাই বলতে হয়, ভাষার কারণে তোমার সত্য কথাটি সুন্দর কথা হলো না। তুমি এভাবে লিখলে সুন্দর হবে–

'মানবমস্তিষ্কপ্রসূত নীতি ও বিধান দ্বারা শান্তি আসতে পারে না।'

আরো সহজ ভাষায় লিখতে পারো–

'মানুষের তৈরী নীতি ও বিধান দ্বারা শান্তি আসতে পারে না।'

আবার প্রশ্নের শৈলী ব্যবহার করে বলা যায়, 'মানুষের তৈরী নীতি ও বিধান দ্বারা কীভাবে শান্তি আসতে পারে? ( ..... দ্বারা কি শান্তি আসতে পারে? কিছুতেই না।)

তুমি লিখেছো–

'এজন্যই সুখ ও শান্তি নামের সোনার হরিণ আজো আমাদের জীবনে রয়ে গেছে ধরাছোঁয়ার বাইরে।'

তোমার এ বাক্যটি সুন্দর হয়েছে। যা পাওয়ার জন্য মন ব্যাকুল, অথচ কিছুতেই নাগাল পাওয়া যায় না, বাংলাভাষায় সেটার উপমারূপে 'সোনার হরিণ' ব্যবহার করা হয়। উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র হলো দুর্লভ ও কাঙ্ক্ষিত হওয়া। যেমন আমরা বলি, 'দেশের লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক চাকুরী নামের সোনার হরিণের পিছনে ছুটছে।'

যাই হোক তোমার উপমাপ্রয়োগ সুন্দর হয়েছে। কোন লেখায় এভাবে বিভিন্ন প্রসঙ্গে যদি উপযুক্ত উপমা ব্যবহার করা যায় তাহলে লেখা সুন্দর ও সুখপাঠ্য হয়।

তুমি লিখেছো–

'সারা বিশ্বে আজ গণতন্ত্রের জোয়ার, তাই বলে আমরাও কি 'গড্ডালিকা' প্রবাহের ন্যায় ভেসে পড়বো, নাকি চিন্তা এবং বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে?'

'গণতন্ত্রের জোয়ার' উপমাটি সুন্দর। নদী ও সাগরের জোয়ার যেমন সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায় তেমনি গণতন্ত্র নামের চিন্তা ও দর্শন সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে

যাচ্ছে। সুতরাং নদীর জোয়ারের সঙ্গে এই সাদৃশ্যের কারণে 'গণতন্ত্রের জোয়ার' অবশ্যই বলা যায়। কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে যে, আমরা ঝুলে পড়ি, শুয়ে পড়ি এবং বসে পড়ি, কিন্তু ভেসে পড়ি না, বরং ভেসে যাই। তদুপরি আমরা কোনকিছুর প্রবাহে ভেসে যাই, প্রবাহের ন্যায় ভেসে যাই না। সুতরাং তোমার বাক্যটা এমন হলে সুন্দর হতো–

'সারা বিশ্বে আজ গণতন্ত্রের জোয়ার। তাই বলে আমরাও কি গড্ডলিকাপ্রবাহে ভেসে যাবো?'

আরেকটা কথা, প্রথমে 'কি' এবং পরে 'নাকি' ব্যবহার করা ঠিক নয়, বরং কি-এর পর শুধু 'না' হবে, আর 'নাকি' ব্যবহার করলে শুরু থেকে 'কি' বাদ যাবে। যেমন– (ক) তুমি কি মাদরাসায় পড়বে না স্কুলে? (খ) তুমি মাদরাসায় পড়বে, নাকি স্কুলে?

তুমি লিখেছো, 'নাকি চিন্তা ও বিবেচনার প্রয়োজন আছে?' চিন্তা ও বিবেচনা, এ শব্দদু'টির পরস্পর বন্ধন সুন্দর নয়। চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনা লিখলে ভালো হতো। তোমার বক্তব্যটি এমন হলে আরো সুন্দর হতো–

'সারা বিশ্বে আজ গণতন্ত্রের জোয়ার। আমাদের দেশেও চলছে গণতন্ত্রের জয়গান। তাই বলে আমরাও কি এ গড্ডলিকাপ্রবাহে ভেসে যাবো। আমাদের কি কর্তব্য নয় চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ করা এবং ভালো-মন্দ ও সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করে পথ চলা?

এবার বানানপ্রসঙ্গ। সেই সঙ্গে আমারও লজ্জার প্রসঙ্গ। তুমি লিখেছিলে 'গড্ডালিকা'। আমিও জানতাম 'গড্ডালিকা'। তোমার লেখা সম্পাদনা করতে গিয়ে হঠাৎ মনে হলো, হাতের কাছেই তো আছে, অভিধানটা খুলে দেখি না কেন! তাতে বড় একটা অজ্ঞতা দূর হলো এবং নিজে নিজে খুব লজ্জা পেলাম। বলা ভালো, বেশ একটা কানমলা খেলাম।

অভিধানমতে গড্ডল হচ্ছে সংস্কৃত শব্দ, মানে ভেড়া। গড্ডলের স্ত্রী হলো গড্ডলিকা। পালের মধ্যে সর্বাগ্রবর্তিনী ভেড়াকেও বলে গড্ডলিকা। সেখান থেকে এসেছে 'গড্ডলিকা-প্রবাহ', অর্থাৎ পালের ভেড়াগুলো যেমন অন্ধের মত সামনের ভেড়ী বা ভেড়াকে অনুসরণ করে তেমনি ভালো-মন্দ বিচার না করে অন্যসবার সঙ্গে অগ্রবর্তী কাউকে, বা কোনকিছুকে অনুসরণ করা।

দেখো, তোমাদের বারবার অভিধান দেখার কথা বলি এবং অভিধানবিমুখতার কারণে কত তিরস্কার করি, অথচ আমি নিজেই আজকের আগে এ শব্দটি কখনো অভিধান খুলে দেখিনি। দেখিনি মানে দেখার কথা মনেই হয়নি। শুনে এসেছি 'গড্ডালিকা', আর গড্ডলিকা-প্রবাহে ভেসে চলেছি! যেমন সম্পাদক, তেমন তার লেখক, আর তেমনই তার পাঠক! কীভাবে যে আমাদের উন্নতি হবে!

পূজারী শব্দটি কিন্তু দীর্ঘ-ঊকার দিয়ে। তো গণতন্ত্রের অন্ধ পূজারিদের তুমি 'স্বরন' করতে বলেছো খেলাফাতে রাশেদার সোনালী যুগ। আমিও তাই বলি, সেই সঙ্গে তোমাকে বলি, 'স্বরন'-এর শুদ্ধ বানানটা একবার স্মরণ করো এবং 'উহাকে চিরতরে বরণ কর, আর বরণ করিতে গিয়া দন্ত্য-ন প্রয়োগ করিও না।'

তুমি লিখেছো–

'অভিসপ্ত' আমেরিকার ১৬তম 'প্রেসিডেন্ট' আবরাহাম লিঙ্কন বলেছেন, ...।'

আগে কোটকরা শব্দদু'টির বানান ঠিক করো, তারপর আমার প্রশ্নের জবাব দাও; আমেরিকা অভিশপ্ত হতে যাবে কেন? এটা কিন্তু অসংযত ভাষা। এসব ক্ষেত্রে আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং সংযম রক্ষা করা দরকার। দ্বীনের দাওয়াতের ময়দানে যাদের কলম কাজ করবে তাদের মনে রাখতে হবে যে, প্রতিপক্ষ আমার সম্পর্কে অশালীন ভাষা ব্যবহার করলেও আমার কলম যেন সংযম ত্যাগ না করে। কারণ আমার প্রতিপক্ষ হয়ত লিখছে (আগে 'হয়ত' ছিলো না, এখন তা যোগ করেছি কলমকে আরো সংযমের ভিতরে আনার জন্য।) সত্যের প্রতি এবং সত্যচারীদের প্রতি বিদ্বেষ থেকে, পক্ষান্তরে আমি তো লিখছি মানুষকে সত্যের প্রতি আহ্বান জানানোর আকুতি থেকে।

কখনো কখনো এরকম কঠিন শব্দও হয়ত প্রয়োগ করতে হয়, কিন্তু সে জন্য কোন না কোন বৈধতা অবশ্যই লাগবে।

তুমি লিখেছো–

'যারা অবৈধ পথে পাহাড়-পরিমাণ সম্পদ সঞ্চয় করেছে ...।' তোমার এ বাক্যটার সাথে সামনের বাক্যটি তুলনা করো, 'যারা অবৈধ পথে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে'। মাত্র একটি শব্দের কমবেশী, অথচ দ্বিতীয় বাক্যটির গাঁথুনি ও বাঁধন কত মজবুত! তাছাড়া সম্পদ সঞ্চয় করা তো খারাপ কিছু না, খারাপ হচ্ছে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা। তুমি যদি লিখতে–

লক্ষ লক্ষ মানুষকে বঞ্চিত করে (এবং তাদের রক্ত শোষণ করে) যারা সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে ....।' তাহলে তোমার বক্তব্যটি আরো জোরদার হতো এবং সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা যে কত ঘৃণ্য কাজ তা পাঠকের সামনে সুসাব্যস্ত হয়ে যেতো। এখন আর 'অবৈধ পথে' কথাটি রাখার প্রয়োজন নেই। কারণ বিষয়টির অবৈধতা ও ঘৃণ্যতা আরো জোরালোভাবে এসে গেছে। এভাবে একটি কথা না বলেও বলা হয়ে যেতে পারে।

কথা ছিলো, এখানে শুধু লেখার ভাষাগত বিষয় আলোচনা করবো, লেখার কাঠামোগত বিষয় নয়। কিন্তু এখন এ বিষয়েও সামান্য একটু কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছে। তুমি লিখেছো–

'গণতন্ত্র আমাদের সবকিছু দিতে পারে, কিন্তু শান্তি দিতে পারে না।'

শান্তি দিতে না পারার বিষয়টি জোরালো করার জন্য তুমি এ শৈলী গ্রহণ করেছো।২ ঠিক আছে। কিন্তু 'সবকিছু দিতে পারে' বলে প্রকারান্তরে তুমি গণ-তন্ত্রের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছো। এই ত্রুটিটা দূর হতে পারে যদি তুমি এভাবে লেখো, 'হয়ত গণতন্ত্র আমাদের সবকিছু দিতে পারে, কিন্তু শান্তি দিতে পারে না।' তাছাড়া কী কারণে গণতন্ত্র শান্তি দিতে পারে না, সেটা কিন্তু তুমি যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে তুলে ধরোনি। শুধু দাবি করেছো, প্রমাণ করোনি। যেমন ইসলামী শাসন-ব্যবস্থা মানবজাতিকে কেমন শান্তি দিতে পারে তার প্রমাণস্বরূপ৩ তুমি খেলাফতে রাশেদার সোনালী যুগের কথা সংক্ষেপে তুলে ধরেছো। তো একই ভাবে তোমার কর্তব্য ছিলো, মানব-জীবনে শান্তি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের ব্যর্থতার কথা সংক্ষেপে হলেও তুলে ধরা। এটা হলো লেখার বড় ধরনের কাঠামোগত ত্রুটি। বলতে পারো, এতে তোমার লেখাটির কিছুটা অঙ্গহানি ঘটেছে।

এ পর্যন্ত যে আলোচনা হলো সেগুলোর আলোকে তুমি লেখাটি আরেকবার তৈরী করতে পারো, কিংবা কাঁথা মুড়ি দিয়ে লম্বা একটা ঘুম দিতে পারো।৪

শেষ কথা, তুমি প্রবন্ধটির নাম দিয়েছো,'গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা কি সম্ভব?'

নামটা দেখো, কত বড়! ৫ অথচ নাম সাধারণত সুসংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন, 'গণতন্ত্রের পথে/মাধ্যমে ইসলামী হুকুমত কি সম্ভব?' অথবা 'গণতন্ত্র, না ইসলাম, কোন পথে শান্তি?' অথবা, 'গণতন্ত্র ও ইসলাম'। যেহেতু তোমার লেখার মূল বিষয় হচ্ছে গণতেন্ত্রর স্বরূপ তুলে ধরা; ইসলামী শাসনব্যবস্থার কথা এসেছে শুধু প্রসঙ্গ ধরে, সেহেতু শিরোনামে আগে গণতন্ত্র শব্দটি আনা হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি ইসলামী শাসনব্যবস্থার সৌন্দর্য তুলে ধরা হতো মূল উদ্দেশ্য, আর গণতন্ত্রের কথা আসতো প্রসঙ্গক্রমে তাহলে ইসলাম শব্দটি আগে আসতো। অবশ্য এমনিতেই যে শব্দদু'টিকে অগ্র-পশ্চাৎ করা যাবে না তা নয়।

উপরে পরিহাস করে বলেছি কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমানোর কথা। আসলে বলতে চাচ্ছি, এ গঠনমূলক সমালোচনা থেকে তুমি এবং অন্য বন্ধুরা লেখালেখির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতে পারো এবং পরবর্তী লেখায় তা অনুসরণের চেষ্টা করতে পারো। যদি এটা করো তাহলে তোমাদেরই লাভ।

শেষ কথার পরের কথা, যে বিষয়ে তুমি লিখতে চাও সে বিষয়ে আগে কিছু পড়াশোনা করে নেয়া ভালো। তাতে তোমার লেখা তথ্যপূর্ণ ও যুক্তিসিদ্ধ এবং পূর্ণাঙ্গ ও বলিষ্ঠ হবে ইনশাআল্লাহ।

---

১। কোন শব্দটি ছিলো না। যখন দেখলাম রূপান্তরিত শব্দটি ভাঙ্গা পড়েছে, অর্থাৎ 'রিত' চলে গেছে নীচে, তখন 'কোন' যোগ করলাম, যার আসলেই প্রয়োজন ছিলো, কিন্তু রূপান্ত রিত ভেঙ্গে না গেলে এই ত্রুটির দিকে নযর যেতো না।

২। এখানে ছিলো 'এ শৈলী অনুসরণ করেছো' তাতে 'করেছো।'-অংশটি নীচে যাওয়ায়

শব্দগুলো ফাঁক ফাঁক ছিলো এবং দেখতে অসুন্দর লাগছিলো। কী করা যায়! ভেবে দেখলাম,'অনুসরণ'-এর পরিবর্তে 'গ্রহণ' লিখলে কোন সমস্যা নেই। তখন 'করেছো।' উপরে চলে এসে জায়গাটা ভরাট হয়ে যাবে এবং দেখার অসৌন্দর্য দূর হয়ে যাবে।

৩। আগে ছিলো, 'তা প্রমাণ করতে গিয়ে', তাতে শব্দগুলো ফাঁক ফাঁক ছিলো। 'তার প্রমাণস্বরূপ' লেখায় দেখার অসৌন্দর্যটা যেমন দূর হয়েছে তেমনি ভাষাও অধিকতর সুন্দর হয়েছে, অন্তত আগের চেয়ে খারাপ হয়নি।

৪। আফসোস, আমার কথাটা হুবহু ফলে গেছে। ছেলেটি এমনভাবেই কাঁথা মুড়ি দিয়েছে যে, পুষ্পের পাতায় তার 'কলমের মুখ' আর কখনো দেখতেই পেলাম না!

৫। আগে ছিলো, 'কত বড় হয়ে গেছে!' তার চেয়ে কি এটা ভালো হয়নি? অথচ সম্পাদনার তাগাদা অনুভব করেছি লাইনের মধ্যে শব্দের মাঝখানের ফাঁকগুলো দূর করার জন্য!

# একটি লেখার সমালোচনা-৩

সেদিন এক বিখ্যাত লেখকের একটি দ্বীনী বই পড়ার সুযোগ হলো। বিষয়বস্তু খুব উচ্চ স্তরের, কিন্তু দ্বীনী বইয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত যা হয় এখানেও তার ব্যতিক্রম হলো না। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভাষাগত দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতিতে পরিপূর্ণ।[১] অবহেলা ও অযত্নের ছাপ সর্বত্র।

এখানে দু'একটি নমুনা তুলে ধরছি, যাতে এ বিষয়ে তোমরা সতর্ক হতে পারো এবং কোন লেখা পড়ার সময় সেটির ভাষাগত সমালোচনার যোগ্যতা অর্জন করতে পারো। একস্থানে লেখা হয়েছে-

'সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন নিদর্শনের ভেতরে আল্লাহ মানুষের কাছে ধরা দিয়েছেন।'

আল্লাহর শানে 'ধরা দেয়া' শব্দটা ব্যবহার করতে একজন লেখকের কলম সায় দিলো কীভাবে!

'ভেতর' শব্দটির এরূপ যথেচ্ছা ব্যবহার কেন? আরেকজন লিখেছেন, 'চিঠির ভিতরে পুত্রের জন্য অনেক মূল্যবান উপদেশ ছিলো।' চিঠির ভিতরে কেন? চিঠিতে, কিংবা চিঠির মধ্যে নয় কেন? অনেক লেখকই 'ভিতর/ভেতর' শব্দটি যত্রতত্র ব্যবহার করেন, কিন্তু শব্দটি শ্রুতিকটু এবং বিরক্তিকর, অন্তত খুব সুখকর নয়। অতি প্রয়োজন ছাড়া এর ব্যবহার ঠিক নয়।

যাই হোক, উপরের বাক্যটা তিনি এভাবে লিখতে পারতেন, 'সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন নিদর্শনের মাঝে/মাধ্যমে আল্লাহ নিজেকে মানুষের সামনে 'প্রকাশ' করেছেন।'

আলোচ্য বাক্যদু'টি তুমি তুলনা করে বারবার পড়ো এবং সংক্ষেপে তোমার মতামত খাতায় লেখো।

এখানে 'নিজেকে'-এর পরিবর্তে বলা যায়, '... আল্লাহ তাঁর মহান সত্তাকে মানুষের সামনে সুপ্রকাশিত/সমুদ্ভাসিত করেছেন।'

অন্যস্থানে লেখা হয়েছে-

'সাধারণভাবে দৃষ্টি ফেলে একবার পশু-পাখীর অবস্থা দেখুন।'

দৃষ্টির সাথে ফেলা শব্দের ব্যবহার সাহিত্যে অগ্রহণযোগ্য। সাহিত্যসম্মত ব্যবহার হলো, 'দৃষ্টিপাত/ দৃষ্টি নিক্ষেপ'। তাছাড়া বাক্যের কাঠামোটাও বেশ দুর্বল। কথাটা

এভাবে বলা যায়, 'সাধারণ দৃষ্টিতে একবার পশু-পাখীর সার্বিক অবস্থা অবলোকন করুন। (বা পর্যবেক্ষণ করুন, কিংবা দেখুন)

অন্যস্থানে লেখা হয়েছে–

'মানুষের ভেতরে যখন দুর্বলতা দেখা দেয়, পংগুতা আত্মপ্রকাশ করে এবং অচল অবস্থা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তখন সে আর বেঁচে থাকার যোগ্যতা রাখে না। প্রকৃতি তাকে ঝেড়ে ফেলবেই। কেননা প্রকৃতির ঘোষণাই হচ্ছে এই যে, পৃথিবীতে শুধুমাত্র আমরা সুস্থ-সবল ও যোগ্যরাই বেঁচে থাকতে পারবো এবং দুর্বল ও পংগুদের বিদায় নিতে হবে।'

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করো–

(ক) দুর্বলতা, পংগুতা ও অচল অবস্থা– এই তিনটির জন্য আলাদা তিনটি ক্রিয়া, যথা, 'দেখা দেয়া, আত্মপ্রকাশ করা ও মাথাচাড়া দেয়া' ব্যবহার করা হয়েছে। এর কোন প্রয়োজন ছিলো না। এতে কথা অনাবশ্যক দীর্ঘ হয়েছে এবং শব্দের অপচয় ঘটেছে।

তাছাড়া পংগুতার সাথে আত্মপ্রকাশ-এর ব্যবহার রীতিমত হাস্যকর। তদ্রূপ অচল অবস্থা হলো নিষ্ক্রিয়তার অবস্থা, পক্ষান্তরে 'মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা' হলো সক্রিয়তার অবস্থা। তাহলে অচল অবস্থা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে কীভাবে?! অচল অবস্থা তো দেখা দেয়, সৃষ্টি হয়!

পংগু শব্দটির বানান হবে বোধ হয় পঙ্গু। (অর্থাৎ ঙ+গ= ঙ্গ) কারণ 'কখগঘঙ' হচ্ছে একই বর্গের এবং পরিবারের বর্ণ। তাই 'কখগঘ'-এই চার বর্ণের পর 'ঙ' হবে, 'ং' হতে পারে না।

(খ) দুর্বল থেকে দুর্বলতা যেমন, পঙ্গু থেকে পঙ্গুতা তেমন নয়। এ ক্ষেত্রে পঙ্গুত্বই যথার্থ। যদি বলো, দুর্বলতা-এর সঙ্গে সুরছন্দ রক্ষা করার জন্য পঙ্গুত্ব-এর পরিবর্তে 'পঙ্গুতা' বলা হয়েছে তাহলে বলবো, সে ক্ষেত্রে তো অচল অবস্থা-এর পরিবর্তে 'অচলতা' বলাই সঙ্গত ছিলো! তাছাড়া এই সুরছন্দ তো এতটা জরুরি নয়, যার জন্য 'পঙ্গুতা'-এর খুঁত মেনে নেয়া যায়!

(গ) শুধু ও মাত্র– শব্দদু'টির একত্রব্যবহার ঠিক নয়। হয় 'শুধু' লেখো, না হয় শুধু 'মাত্র' লেখো। কিন্তু কখনই দু'টোকে একত্র করে 'শুধুমাত্র' লিখো না।

(ঘ) সুস্থ, সবল ও যোগ্য– এই তিনটি শব্দের বিপরীতে তিনটি শব্দই ব্যবহার করা উচিত ছিলো। অথচ বিপরীতে এসেছে 'দুর্বল' ও 'পঙ্গু'- এদু'টি শব্দ। তদুপরি পঙ্গু শব্দটি উপরের কোন শব্দের বিপরীত শব্দ নয়। এতে বাক্যের অলঙ্কারসৌন্দর্য নষ্ট হয়েছে।

(ঙ) 'এবং' ও 'আর'-এ অব্যয়দু'টির ব্যবহারে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। 'এবং' দ্বারা সাধারণত বোঝা যায় যে, পরবর্তী অংশটি পূর্ববর্তী অংশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। যেমন 'আমি মাদরাসায় যাবো এবং শ্রেণীকক্ষে অধ্যয়ন করবো।' এখানে 'আর' নয়।

'আমি সকাল সতটায় মাদরাসায় যাবো এবং সন্ধ্যা সাতটায় ফিরে আসবো।' এখানে 'এবং' ও 'আর' দু'টোই চলবে।

'আমি মাদরাসায় যাবো, আর তুমি বাজারে যাবে।' এখানে 'এবং' নয়। উপরে আমাদের আলোচ্যক্ষেত্রে (অর্থাৎ 'আমরা সুস্থ, সবল ও যোগ্যরাই বেঁচে থাকতে পারবো এবং দুর্বল ও পঙ্গুদের বিদায় নিতে হবে।') তুমি চিন্তা করে দেখো, 'এবং' হবে নাকি 'আর'?

(চ) প্রকৃতি মানে কী? প্রকৃতি মানে যদি হয় সৃষ্টিজগত তাহলে সবল ও দুর্বল সকল সৃষ্টিই প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। তাহলে সবলের পক্ষে এবং দুর্বলের বিপক্ষে এ ঘোষণাটি প্রকৃতির কীভাবে হতে পারে? পক্ষান্তরে প্রকৃতি মানে যদি হয় সৃষ্টিজগতের ব্যবস্থাপনা, যা স্রষ্টা নির্ধারণ করেছেন, তাহলে প্রকৃতির ঘোষণা হবে সবল ও দুর্বল উভয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। এখানে 'আমরা' ও 'তারা' থাকতে পারে না। লেখক লিখেছেন, 'প্রকৃতি তাকে ঝেড়ে ফেলবেই।' নীচে কয়েকটি ব্যবহার দেয়া হলো। এগুলোর মধ্যে কোনটি উত্তম, তুমি ভেবে দেখো–

(ক) প্রকৃতি তাকে ঝেড়ে/ছেঁটে ফেলবে।

(খ) প্রকৃতি তাকে নিশ্চিহ্ন/বিলুপ্ত করে দেবে।

(গ) প্রকৃতি থেকে সে হারিয়ে/নিশ্চিহ্ন হয়ে/বিলুপ্ত হয়ে যাবে (কিংবা ঝরে যাবে)।

উপরের পুরো সমালোচনাটি আরেকবার পড়ো, তারপর পুরো বক্তব্যটি এভাবে লিখলে কেমন হতো, তুমি নিজে বিবেচনা করো–

*'মানুষের মধ্যে যখন দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক বিভিন্ন দুর্বলতা, অচলতা ও পঙ্গুত্ব দেখা দেয় তখন তার বেঁচে থাকার যোগ্যতা বিলুপ্ত হয় এবং প্রকৃতি তাকে ছাঁটাই করে ফেলে। কেননা প্রকৃতির শাশ্বত বিধান এই যে, সুস্থ, সবল ও যোগ্যরাই শুধু বেঁচে থাকবে; অসুস্থ, অযোগ্য ও দুর্বলের বেঁচে থাকার অধিকার নেই।'*

**পর্যালোচনা–**

এখানে আমরা উপরের বক্তব্যটির বিভিন্ন ভাষাগত দিক পর্যালোচনা করে দেখার চেষ্টা করবো।

প্রথমত, বক্তব্যটিকে সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ করার জন্য 'দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক' অংশটিকে যোগ করা হয়েছে।

দুর্বলতার সঙ্গে 'সুরছন্দ' রক্ষা করার জন্য 'অচল অবস্থা'-এর পরিবর্তে 'অচলতা' ব্যবহার করা হয়েছে এবং পঙ্গুত্ব শব্দটিকে পরে আনা হয়েছে।

গুরুগম্ভীর বক্তব্যের জন্য অনুরূপ শব্দব্যবহার করাই সঙ্গত। এজন্য 'প্রকৃতির ঘোষণা'-এর পরিবর্তে 'প্রকৃতির বিধান' ব্যবহার করা হয়েছে। আর এ বিধান যেহেতু চিরন্তন সেহেতু বিধানের বিশেষণরূপে শাশ্বত শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

স্থানাভাব না হলে এখানে আরো বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ ছিলো। তবে আশা করি, ভাষাচর্চা ও লেখা মশকের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট এবং সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য।

শেষ কথা এই যে, আজকের যুগ হলো কলমযুদ্ধের যুগ। বাতিল শক্তি কলম ও সাহিত্যকে আজ ইসলামের বিরুদ্ধে প্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহার করছে। আধুনিক যুগের জাদুগররা হলো কলম-জাদুগর এবং তারা ফেরাউনের সর্প-জাদুগরদের চেয়ে অনেক বেশী দক্ষ ও কুশলী।২ সুতরাং আমরা যখন বাতিলের বিরুদ্ধে 'সাহিত্যসমরে' লিপ্ত হবো এবং কলমের সঙ্গে কলমের টক্কর হবে তখন বিজয়ের জন্য না হোক, অন্তত টিকে থাকার জন্য হলেও আমাদের দক্ষতা ও কুশলতার পরিচয় দিতে হবে। নইলে আল্লাহ না করুন, আমাদের ক্ষেত্রেও 'অযোগ্য, দুর্বল ও পঙ্গুদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই', প্রকৃতির এ শাশ্বত বিধান কার্যকর হতে পারে। আমাদের প্রাণপ্রিয় মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নাদাবী (রহ,)-এর ভাষায় বলতে চাই–

'ভাষা ও সাহিত্য এমনভাবে আয়ত্ত করো, বাতিলের বিরুদ্ধে তোমার কলমে যেন থাকে জলপ্রপাতের গতি ও উচ্ছলতা, বিদ্যুতের চমক ও ঝলক এবং সিংহের গর্জন ও হুঙ্কার।

বাতিলের মোকাবেলায় ঈমান ও ইখলাছই হলো আমাদের আসল হাতিয়ার, একথা অবশ্যই সত্য, তবে–

و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة

(আর প্রস্তুত করো তোমরা তাদের জন্য যদ্দুর পারো, শক্তি...)

এ আসমানী আদেশও চিরসত্য।

হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের দিকে তাকিয়ে দেখো, ভাষা ও সাহিত্য সেখানে আলিম-সমাজের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। তারা আল্লাহর আদেশ–

ترهبون به عدو الله و عدوكم

(সন্ত্রস্ত করবে তোমরা তা দ্বারা আল্লাহর শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে)

এর উপর শুরু থেকেই আমল করেছেন। তাই সেখানকার বাতিল শক্তি আলিম-সমাজের কলমের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে। দুঃখের বিষয়, আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে এমন একটি কলমও আলিমসমাজের নেই, যাকে বাতিল ভয় পাবে, অন্তত কিছুটা সমীহ করবে। তাই সমগ্র জাতি আজ তাকিয়ে আছে তোমাদের দিকে।

অন্তরে এ বিশ্বাস রেখে আল্লাহর দ্বীনের খিদমতের নিয়তে তোমরা যদি সাহিত্যচর্চা ও কলম-সেবায় নিয়োজিত হও তাহলে ইনশাআল্লাহ কলমের জিহাদেও তোমরা পাবে তলোয়ারি-জিহাদের ছাওয়াব।৩

অবশ্য একথাও মনে রাখতে হবে যে, ইসলামের জিহাদে কলম ও তলোয়ার

দু'টোই আলাদা আলাদা অস্ত্র এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে দু'টোই সমান কার্যকর এবং অপরিহার্য। একটি অন্যটির বিকল্প নয় কিছুতেই। আমরা শুধু বলতে চাই, আমাদের ক্ষেত্র এখন কলমের জিহাদ।

---

১। লেখা উচিত ছিলো, ভুলক্রটির ছাড়ছড়ি।
২। আগে ছিলো শুধু 'জাদুগর' এখন দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদনার একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে হঠাৎ মনের পর্দায় উদিত হলো, এ যুগের আহলে বাতিল কলমের জাদু দেখায়, তাই তারা কলমজাদুগর; সে যুগের আহলে ফেরাউন তো সাপের জাদু দেখিয়েছিলো, তাহলে তাদেরকে 'সর্প-জাদুগর' বললে কেমন হয়, যেমন বাংলায় সর্পরাজ বলা হয়?! কলমজাদুগর ও সর্পজাদুগর, পাশাপাশি বেশ সুন্দরই তো মনে হয়! কিন্তু এত দিন কথাটা মনে হয়নি কেন? এখান থেকেই তুমি বুঝে নাও, লেখার জন্য তোমাকে কী পরিমাণ সময় দিতে হবে!
৩। কলমি-জিহাদ শব্দটি আমাদের সুপরিচিত, এর পাশাপাশি তলোওয়ারি-জিহাদ ভালোই তো হয় মনে হয়!

# একটি লেখার সমালোচনা-৪

এক ভদ্রলোক, ছোটদের একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। ভদ্রলোককে আমি ভদ্র লোক বলেই জানি।১ কিন্তু একদিন এক আলোচনায় আলিমদের সম্পর্কে তার অন্যায় অশ্রদ্ধা দেখে আমি মর্মাহত হলাম। 'হুযূর-মাওলানা'দের বাংলা দেখে তার নাকি পিত্তি জ্বলে! শুনে কষ্ট পেলাম। কৌতূহলী হয়ে তার কিছু লেখা পড়লাম এবং অবাক হলাম। তার নিজের বাংলা লেখার যে চেহারা-ছূরত তাতে তো আমার মনে হলো, তার লেখা 'হুযূর-মাওলানা'দের চেয়েও নিম্নমানের। এখানে তার লেখা একটি সম্পাদকীয়-এর নমুনা দেখো–

*'আরবী বছরের প্রথম মাস মুহররম। এই মাসের গুরুত্ব অনেক। এই মাসের দশ তারিখে বহু ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে। সবচেয়ে বেদনাদায়ক ও শোকার্ত ঘটনা ঘটেছে কারবালাপ্রান্তরে। ইয়াযীদের সৈন্যদের হাতে মর্মান্তিকভাবে শাহাদাত বরণ করেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নাতি, হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতিমা (রা.)-এর পুত্র হযরত ইমাম হোসায়ন (রা.) ও তাঁর পরিবার-পরিজনসহ ৭২জন সঙ্গী। ... ।'*

লেখাটির সাহিত্যমান বলতে গেলে শূন্যের কোঠায়। এখানে মাত্র দু'একটি বিষয় তুলে ধরছি।

(ক) 'আরবী বছর' শুনে শিশু-কিশোররা হয়ত ভাববে, এটা আরবদেশের কোন ব্যাপার। অথচ 'হিজরী সালের/বছরের প্রথম মাস' কিংবা 'ইসলামী বর্ষপঞ্জীর প্রথম মাস' বললে আদর্শিক দিকটা সামনে আসতো। সেটাই কি ভালো হতো না!

(খ) 'এই মাসের' কথাটার কাছাকাছি দু'বার উচ্চারণ শ্রুতিকটু।

তিনি যদি এভাবে বলতেন, 'এই মাসের গুরুত্ব অনেক। বহু ঐতিহাসিক ঘটনা এই মাসের দশ তারিখে ঘটেছে।' তাহলে উভয়ের মধ্যে পর্যাপ্ত দূরত্বের কারণে শ্রুতি-কটুতা থাকতো না; অন্তত কিছুটা কমে আসতো। আমার এ মন্তব্য সম্পর্ক তোমরা কী বলো?

(গ) ঘটনা হয় শোকাবহ (শোক সৃষ্টিকারী), আর সেই ঘটনায় মানুষ হয় শোকার্ত (বা শোকে কাতর)। কিন্তু তিনি ঘটনাকেই শোকার্ত বানিয়ে ফেলেছেন। শোকার্ত

জাতি হতে পারে, এমনকি শোকার্ত দেশও হতে পারে; কারণ এখানে দেশ মানে দেশবাসী। শোকার্ত পরিবেশও হতে পারে; কারণ পরিবেশ মানুষজন দ্বারাই হয়। সুতরাং শোকার্ত মানুষজনের কারণে পরিবেশও শোকার্ত হতে পারে। কিন্তু শোকার্ত ঘটনা হয় না। এরূপ ব্যবহার নেই। এজন্যই পরবর্তীতে তিনি 'বেদনার্ত ঘটনা'-এর পরিবর্তে 'বেদনাদায়ক ঘটনা' লিখেছেন। তাছাড়া এটা ছোটদের উপযোগী শব্দও নয়।

(ঘ) 'সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছে কারবালায়' বাক্যটা থেকে বোঝা যায়, এর আগে দু'একটি স্থানের দু'একটি বেদনাদায়ক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। আর সেগুলোর মধ্যে কারবালা নামক স্থানের ঘটনাটি সবচেয়ে বেদনাদায়ক। অথচ এর আগে কোন স্থানের কোন বেদনাদায়ক ঘটনার উল্লেখ নেই। আছে শুধু 'দশ তারিখ'-এর কথা এবং 'বহু ঐতিহাসিক ঘটনা'-এর কথা। ফলে দু'টি বাক্যের মধ্যে ভাবগত সঙ্গতি সাধিত হয়নি। তিনি যদি লিখতেন–

'এই মাসের দশ তারিখে বহু ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে, তবে দশ তারিখে কারবালাপ্রান্তরে ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের বেদনাদায়ক ঘটনাই হলো সব-চেয়ে উল্লেখযোগ্য।' তাহলে লেখাটা মোটামুটি ত্রুটিমুক্ত হতো।

(ঙ) পরবর্তী বাক্যটা এতই দীর্ঘ যে, ছোটরা তো বটেই, বড়রাও পড়তে গিয়ে দম হারিয়ে ফেলবে। তাই বাক্যটাকে দু'তিন বাক্যে বিভক্ত করলে ভালো হতো। তাছাড়া শব্দ ও হরফসংখ্যা কমিয়েও সংক্ষেপণ হতে পারে। 'ইয়াযীদের সৈন্যদের হাতে' না বলে 'ইয়াযীদবাহিনীর হাতে' বললে ভালো হতো।

মহামানবদের নাতি হয় না, হয় পৌত্র বা দৌহিত্র। অবশ্য শব্দদু'টো ছোটদের জন্য কঠিন; যদি 'নবীজীর নাতি' লেখা হয় তাহলে বর্ণনায় আপনত্বের ভাব আসে; শব্দসংখ্যাও কমে আসে। তখন নাতি শব্দটির ব্যবহার আর অসুন্দর মনে হবে না, কিন্তু 'মহানবী'-এর সঙ্গে 'নাতি'-এর ব্যবহার অবশ্যই অসুন্দর।

ছেলে বা মেয়ে-এর সাথে নাতি শব্দের ব্যবহার হতে পারে, কিন্তু পুত্র ও কন্যা-এর সাথে যথাক্রমে পৌত্র ও দৌহিত্র লিখতে হবে। সুতরাং 'নাতি' শব্দটির পরে হযরত আলী ও ফাতিমা (রা.)-এর পুত্র বলা ঠিক নয়। যদি হযরত আলী ও হযরত ফাতিমা (রা.)-এর কলিজার টুকরা, লেখা হতো তাহলে এই ত্রুটিটা যেমন দূর হতো তেমনি বক্তব্যটি আবেদনপূর্ণ হতো।

এবার নীচের নমুনাটির সঙ্গে উপরের নমুনাটা মিলিয়ে দেখো–

*'ইসলামী বর্ষপঞ্জীর (বা হিজরী সালের) প্রথম মাস মুহররম। এ মাসের গুরুত্ব অনেক। বহু ঐতিহাসিক ঘটনা এ মাসের দশ তারিখে ঘটেছে। তবে কারবালার মাঠে নবীজীর নাতি, হযরত আলী ও ফাতিমা (রা.)-এর কলিজার টুকরা হযরত ইমাম হোসাইনের মর্মান্তিক শাহাদতের ঘটনাই হলো সবচে' উল্লেখযোগ্য।*

*মুহররমের দশ তারিখে ইয়াযীদবাহিনীর হাতে ইমাম হোসাইন ও তাঁর পরিবার-পরিজনসহ ৭২জন সঙ্গী শহীদ হয়েছিলেন।'*

একপৃষ্ঠার পুরো লেখাটাই এরকম দোষ-দুর্বলতায় পরিপূর্ণ। তো তিনি কেন 'হুযূর-মাওলানা'দের দোষ বলবেন! তিনি লিখেছেন, ইয়াযীদেরবাহিনী তখন খুশিতে আটখানা। তিনি হয়ত ভেবেছেন, ছোটদের জন্য শব্দটা বেশ মানানসই। কিন্তু ব্যক্তির ক্ষেত্রে এর ব্যবহার থাকলেও দল, গোষ্ঠী, বাহিনী, দেশ ইত্যাদির ক্ষেত্রে এর ব্যবহার নেই। শত্রুর ক্ষেত্রে সাধারণত উল্লাস শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এখানে বলা যেতে পারে, 'তখন ইয়াযীদবাহিনী যেন উল্লাসে ফেটে পড়লো।' অথবা 'তখন ইয়াযীদবাহিনীর সেকি (নারকীয়) উল্লাস!

'নারকীয়' শব্দটি বন্ধনীতে দেয়ার উদ্দেশ্য হলো, শব্দটিকে রাখা যেতে পারে উল্লাসের জঘন্যতা বোঝানোর জন্য, আবার ছোটদের জন্য কঠিন মনে করে বাদও দেয়া যেতে পারে।

---

১। 'ভদ্রলোক' দ্বারা যখন কোন লোকের ভদ্রত্ব উদ্দেশ্য না হয়, বরং শুধু ব্যক্তি উদ্দেশ হয় তখন একত্রে লেখা হয়। পক্ষান্তরে যদি উদ্দেশ্য হয় ভদ্রত্ব বিশেষণে ভূষিত ব্যক্তি তখন আলাদা লেখা হয়। যেমন, 'তিনি অতি ভদ্র লোক।' এখানে শব্দদু'টি আলাদা হবে। কারণ 'ভদ্র' হচ্ছে লোকটির বিশেষণ। অর্থাৎ লোকটি কেমন সে সম্পর্কে মন্তব্য করা উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে 'এক ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।' এখানে শব্দদু'টি একসঙ্গে হবে। কারণ এখানে বিশেষণ উদ্দেশ্য নয়। তাই ভদ্র-অভদ্র সবার সম্পর্কেই এটা বলা হয়। যেমন, 'ভদ্রলোক এমন নীচু আচরণ করলেন যে, আমি হতবাক হয়ে গেলাম। এ আলোচনার প্রেক্ষিতে 'ভদ্রলোককে আমি ভদ্র লোক বলেই জানতাম' বাক্যে ভদ্র ও লোক শব্দদু'টির একত্র ও পৃথক ব্যবহার সম্পর্কে চিন্তা করো।)

# নিজের লেখার সমালোচনা

অন্যের লেখা যেমন তেমনি নিজের লেখাও সমালোচনার দৃষ্টিতে পড়া দরকার। বিচারক যেমন কাঠগড়ায় আসামীকে বিচার করেন; পক্ষ-বিপক্ষের যুক্তিতর্ক ও প্রমাণাদি নিরপেক্ষভাবে শুনে রায় জারি করেন, তেমনি নিজের লেখাকে আসামীর কাঠগড়ায় খাড়া করে নিজে বিচারক হয়ে সেই লেখার ভালো-মন্দ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি খুঁজে বের করা দরকার।১

এটা যারা নিয়মিত করতে পারে তাদের লেখা সুন্দর থেকে সুন্দর হয় এবং উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়। কিন্তু মানুষের যেমন স্বভাব, নিজের লেখার কোন সমালোচনা সে শুনতে প্রস্তুত নয়, বরং প্রশংসা ও স্তুতি শুনতে উন্মুখ।২ অন্যদিকে নিজের পিছনের লেখা একে তো মানুষ খুব কমই পড়ে, বরং পড়েই না; তদুপরি সামলোচনার নিয়তে বিচারকের দৃষ্টিতে মোটেই পড়ে না, বরং মুগ্ধ ও আত্মতুষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টিতে পড়ে। নিজের লেখার নিজেই সে হয়ে পড়ে ভক্ত পাঠক। ফলে লেখার দোষ ও ত্রুটিগুলো কখনই তার সামনে ধরা পড়ে না। অনেক বছর লেখালেখি করার পরো দেখা যায়, তাদের লেখার মান প্রায় একই স্থানে স্থির হয়ে আছে।৩

আল্লাহর শোকর, শুরু থেকেই আমি ছিলাম আমার লেখার একনিষ্ঠ পাঠক এবং নির্মম সামালোচক। অর্থাৎ আমি আমার বর্তমান লেখাটি যেমন বারবার পড়ি তেমনি বিগত লেখাগুলোও নিয়মিত পড়ি এবং মানুষ যেভাবে শত্রুর দোষ খুঁজে বের করে, ঠিক সেভাবে নিজেই নিজের লেখার দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। অবশ্য সেই সঙ্গে লেখার ভালো দিকগুলোও ভেবে দেখি এবং সামনের লেখায় তা ধরে রাখার এবং আরো এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করি।

কোন লেখার সমালোচনা করার কিছু সূত্র রয়েছে।৪ সেই সব সূত্র অনুসরণ করে যদি সমালোচকের দৃষ্টিতে লেখাটি পড়া হয় তাহলেই শুধু লেখার ভালো-মন্দ দিকগুলো সামনে আসে।

প্রথম কাজ হলো, বাক্যগুলো শব্দ করে কানে বাজিয়ে বারবার পড়া এবং ভেবে দেখা যে, কোথাও সুরের ছন্দপতন আছে কি না, কানে খসখসে ও অমসৃণ হয়ে বাজে কি না? এমন হলে শব্দ অগ্র-পশ্চাত করে বা পরিবর্তন করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্নভাবে কানে বাজিয়ে পড়ো এবং অমসৃণতার কারণটি চিহ্নিত করো, তারপর ভেবে দেখো, তা দূর করার উপায় কী। লেখার প্রতিটি শব্দ ও বাক্য এভাবে কানে বাজিয়ে পরখ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে একসময় দেখবে, তোমার লেখায় একটি রিনিঝিনি সুর এসেছে। সে লেখা যখন পাঠকের সামনে 'পরিবেশিত' হবে, তখন সেই সুরমূর্ছনায় পাঠকও অভিভূত হবেন।

কোন কোন ত্রুটি তো প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারেই ধরা পড়ে যায়, আবার কোন কোনটা অনেক পরে গিয়ে ধরা পড়ে। তখন নিজের কাছেই অবাক লাগে যে, এত দিন এতভাবে কানে বাজিয়ে বাক্যটি পড়লাম, অথচ ত্রুটিটা কানে বাজলো না! এজন্য মাঝে কয়েক দিনের বিরতি দিয়ে আবার পড়বে। তাহলে যেসব ত্রুটি আগে ধরা পড়েনি সেগুলো এখন ধরা পড়বে।

ছোটদের আকীদা সিরিজের বইগুলো লেখার পর প্রতিটি লেখা কানে বাজিয়ে বারবার পড়েছি। প্রতিবারই নতুন নতুন ত্রুটি ধরা পড়েছে। আমার এক প্রিয় সহকর্মী তো একবার বিরক্ত হয়ে বলেই বসলেন, অনেক হয়েছে, আর কত! এবার ছাপাখানায় পাঠিয়ে দিন। আমি মৃদু হেসে বললাম, তারপর আমাকে যদি যেতে হয় সাহিত্যের 'জেলখানায়'!

সেই লেখা ছাপা হয়ে এলো। নিজের লেখার পাঠক হয়ে, বরং বলা ভালো, বিচারক হয়ে যখন বসলাম, অবাক হয়ে দেখি, অসংখ্য ভুল নতুনভাবে ধরা পড়ছে, যা আগে চোখেও পড়েনি, কানেও বাজেনি। শেষে আমার কৌতুক করে বলা কথাটাই সত্য হলো, অর্থাৎ নিজের কাছেই মনে হলো, সাহিত্যের আদালতে লেখকের বিচার হওয়া উচিত। এখানে দু'একটি উদাহরণ তুলে ধরছি–

সিরিজের 'নবী ও রসূল' বইটির একাদশ পৃষ্ঠার তৃতীয় লাইনে আছে, '(শয়তান) কীভাবে তাকে সুখশান্তির জান্নাত থেকে বের করেছে!'

আগে কত বার কানে বাজিয়ে পড়েছি, ধরা পড়েনি। এখন মনে হচ্ছে, 'সুখ-শান্তির জান্নাত' কথাটা ঠিক শ্রুতিমসৃণ নয়; কেমন যেন খসখসে। শব্দ আগপিছ করে যখন পড়লাম, 'কীভাবে তাকে শান্তি-সুখের জান্নাত থেকে বের করেছে!' মনে হলো, সুরের খসখসে ভাবটা কেটে গেছে এবং পুরো বাক্যটি আগের চেয়ে শ্রুতিমসৃণ হয়েছে। তোমরাও বাক্যদু'টি দু'ভাবে কানে বাজিয়ে পড়ে দেখো; আশা করি, তোমাদেরও এমন মনে হবে।

এমনিতে কিন্তু 'সুখ-শান্তি'ই হচ্ছে শব্দদু'টির স্বাভাবিক ব্যবহার। যেমন আমরা বলি, 'আমি তোমার সুখ-শান্তি কামনা করি।' কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে বিশেষ অবস্থান -গত কারণে শব্দদু'টির শ্রুতিমসৃণতা বিঘ্নিত হয়েছে।

আবার দেখো, 'জীবনের সুখ-শান্তির জন্য মানুষ দিন-রাত পরিশ্রম করে।' এখানে 'সুখ-শান্তির' যেমন শ্রুতিসম্মত তেমনি 'শান্তি-সুখের'ও শ্রুতিসম্মত। উপরের বাক্যদু'টি দু'ভাবে বারবার পড়লেই বিষয়টি তুমি বুঝতে পারবে।
একই পৃষ্ঠার শেষ দিকে দেখো–

'কেউ জাহান্নামী হতো না, সকলেই জান্নাতী হতো, তাহলে কত ভালো হতো!'
'সকল' শব্দটি সচরাচর কথ্যভাষায় আসে না। বিশেষত এখানে জান্নাত শব্দটির পড়শী হিসাবে 'সকল'-এর স্থানে 'সবাই' হলেই ভালো হয়।
দ্বিতীয়ত অনেক চিন্তাভাবনা করেই জাহান্নামী-এর সাথে মিলিয়ে জান্নাতী শব্দটি লিখেছিলাম, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, 'জাহান্নামী হতো না' কথাটিতে যে সুরমসৃণতা রয়েছে, 'জান্নাতী হতো' কথাটায় তা নেই। 'তী' ও 'তো'-এর নৈকট্যে সামান্য হলেও 'তানাফুরুল হরূফ' সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া ত-বর্ণটির আধিক্যও কানে কিছুটা বাজে।৫
এখন লিখেছি, 'কেউ জাহান্নামী হতো না, সবাই জান্নাতবাসী হতো।'
তদুপরি 'তাহলে' শব্দটা এখানে অপ্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে, তাই সেটা বাদ দিয়ে কানে বাজিয়ে পড়লাম, 'কেউ জাহান্নামী হতো না, সবাই জান্নাতবাসী হতো, কত ভালো হতো!'

হতো, এর পরে একটু থেমে 'কত' শব্দটি পড়লে আর 'তানাফুর' থাকে না, কিন্তু না থেমে পড়লে তানাফুর সৃষ্টি হয়। এ পর্যন্ত চিন্তা করার পর হঠাৎ মনে হলো, এখানে 'তামান্না'-এর লাফয ব্যবহার করা যায়, তাতে 'হতো' ও 'কত'-এর মাঝে একটি আড়াল সৃষ্টি হয় এবং তানাফুর-এর সম্ভাবনা দূর হয়। যেমন, 'কেউ জাহান্নামী হতো না, সবাই জান্নাতবাসী হতো, আহা, কত ভালো হতো!'
এবার তুমি নিজে নীচের বাক্যদু'টি পরপর কানে বাজিয়ে পড়ো এবং বিচার করে দেখো।
(ক) কেউ জাহান্নামী হতো না, সকলেই জান্নাতী হতো, তাহলে কত ভালো হতো!
(খ) কেউ জাহান্নামী হতো না, সবাই জান্নাতবাসী হতো, আহা, কত ভালো হতো!৬

বামপাড়ার লেখক সৈয়দ শামসুল হক 'গল্পের কলকব্জা' নামে একটি বই লিখেছেন। তিনি নিজে সুন্দর কি অসুন্দর, সে প্রসঙ্গ থাক, তবে বলতেই হবে, বইটি তার বেশ সুন্দর। সেখানে তিনি লিখেছেন, ছন্দ শুধু কবিতাতেই হয় না, গদ্যেরও ছন্দ আছে। তেমন গদ্য পাঠকের কানে সুরের রিনিঝিনি সৃষ্টি করে এবং চিত্তকে বিমুগ্ধ করে।
আজকের মজলিসে শুধু লেখার সুরছন্দ নিয়ে আলোচনা করা হলো এবং মাত্র দু'টি উদাহরণ পেশ করা হলো। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী কোন সুযোগে এ বিষয়ে আরো

কিছু উদাহরণসহ আরো বিশদ আলোচনা করা হবে এবং সমালোচনার অন্যান্য সূত্র সম্পর্কেও আলোচনা করা হবে।

তবে একটি কথা আগেও বলেছি, আবার বলছি, মূল লেখাটি তৈরী করার সময় এসব বিষয়ে চিন্তাভাবনার তেমন কোন সুযোগ নেই। তখন শুধু বিষয়বস্তু চিন্তা করে কলমে যা আসে, যেভাবে আসে তাই লিখে ফেলা উচিত। লেখাটি যখন তৈরী হয়ে যাবে তখন দীর্ঘ সময় নিয়ে তার ভাষাগত (কাঠামোগত) সৌন্দর্যের দিকগুলো ভাবতে হবে।

---

১। আগে ছিলো 'নিজের লেখার', এখন মনে হচ্ছে একই বাক্যে 'নিজ' শব্দটি তিনবার ব্যবহার করা ভালো হয়নি, তাই একটা কমানো দরকার। বাক্যটি বারবার পড়ার পর তৃতীয়টিকে বাদ দিয়ে 'নিজের লেখার ভালো-মন্দ'-এর স্থানে লিখলাম, 'সেই লেখার ভালো-মন্দ'। বিষয়টি তুমিও চিন্তা করো।

২। আগে ছিলো, কিন্তু মানুষের স্বভাব এই যে, ...। এর সঙ্গে বর্তমান সম্পাদনাটি মিলিয়ে তুমিও বিচার করো।

৩। আগে ছিলো, 'একই জায়গায়'। এখন মনে হলো, 'স্থির'-এর আগে স্থান শব্দটি অধিকতর উপযোগী হবে।

৪। বাক্যটির পর্ববিভক্তি হলো এই–

'কোন লেখার/ সমালোচনা করার/কিছু সূত্র রয়েছে।' এখানে 'কোন' শব্দটি বাদ দিলে পর্ববিভক্তির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়।

৫। 'তানাফুরুল হুরূফ' আরবী অলঙ্কারশাস্ত্রের একটি পরিভাষা, যার অর্থ হলো শব্দস্থ হরফগুলোর পরস্পর অবস্থানজনিত অশ্রুতিমধুরতা।)

৬। দ্বিতীয় মুদ্রণের সম্পাদনার চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে এখন মনে হচ্ছে, জান্নাতী শব্দটিকে বহাল রেখে বাক্যটিকে এভাবে বলা যায়– 'কেউ জাহান্নামী হতো না, সবাই হতো জান্নাতী, আহা, কী শান্তি!' এখন বাক্যটির এই তিনটি বিন্যাস আলাদাভাবে কানে বাজিয়ে পড়ে দেখো।

# লেখার সমালোচনা শিখি

পিছনের এক আলোচনায় আমরা বলেছিলাম, ভাষাগত ও শব্দগত দিক থেকে কোন লেখার সমালোচনা করার কিছু কৌশল ও সূত্র রয়েছে। এবিষয়ে এখানে আরো বিশদ আলোচনা করতে চাই। আগের লেখায় আমাদের মূল আলোচনা ছিলো গদ্যের সুরছন্দ। অর্থাৎ পদ্যের যেমন ছন্দ রয়েছে তেমনি গদ্যের বাক্যগুলোরও রয়েছে নিজস্ব সুরছন্দ। তোমাকে প্রতিটি শব্দ ও বাক্য কানে বাজিয়ে পড়ে দেখতে হবে যে, তাতে কোন ছন্দপতন ও সুরের বেমিল আছে কি না। দু'একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি সেখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছিলো। এসম্পর্কে এখানে আরো কিছু উদাহরণ পেশ করছি। জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে একটি কিতাবে নীচের বাক্যটি আছে–

'জাহান্নামের সাপ হবে সত্তর গজ লম্বা, কিংবা আরো বেশী। জাহান্নামের বিচ্ছু হবে গাধার মত, কিংবা তার চেয়ে বড়।'

বাক্যদু'টি বারবার কানে বাজিয়ে দেখো, 'কিংবা আরো বেশী' এবং 'কিংবা তার চেয়ে বড়' এদু'টিতে ছন্দপতন এবং সুরের বেমিল রয়েছে। 'কিংবা আরো বেশী'-এর পর যদি বলা হতো, 'কিংবা আরো বড়' তাহলে ছন্দ ও সুরের সঙ্গতির কারণে তাতে শ্রুতিমধুরতা আসতো। কিতাবে যা আছে সেটা যে অসুন্দর, তা অবশ্য নয়। তবে আমি বলছি সুন্দর থেকে সুন্দরতরের কথা। মানুষ তো জীবনের সবকিছুতেই সুন্দর থেকে সুন্দরতরের জন্য সাধনা করছে। লেখার ক্ষেত্রে আমরা কেন সেটা করবো না?

একই কিতাবে জাহান্নামের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে– 'সেখানে ফুল ও ফলের গাছ নেই, গাছের ছায়াও নেই। আরাম-আয়েশের কোন ব্যবস্থা নেই।'

এখানে 'কোন ব্যবস্থা নেই'-এর বদলে 'কোন উপায় নেই' বলা হলে 'ছায়াও নেই' এবং 'উপায় নেই'-এর মাঝে একটা সুরছন্দ রক্ষা হতো। তাছাড়া জাহান্নামে 'ব্যবস্থা' থাকা না থাকার প্রসঙ্গ অবান্তর। হাঁ, উপায় থাকা না থাকার প্রসঙ্গ আসতে পারে।

আরেকটা কথা, ফুল ও ফলের গাছ নেই'-এর পরিবর্তে যদি বলা হতো 'ফল-ফুলের গাছ নেই' তাহলে 'ফল-ফুল ও আরাম-আয়েশ' দু'টিতে সুরছন্দ রক্ষা পেতো।

এপর্যন্ত লেখার পর এখন মনে হচ্ছে। পুরো আলোচনাটা এখানে বেমানান। ফুল ও ফল এবং গাছ ও গাছের ছায়া এবং আরাম-আয়েশের সুযোগ জাহান্নামে থাকবে না সে তো বলাই বাহুল্য। তাছাড়া কোরআন-হাদীছে জাহান্নামের যে আলোচনা আছে তার সাথেও এটা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সেখানে কী নেই তা বলা হয়নি, কী আছে তা বলা হয়েছে।

আবার দেখো– 'জাহান্নামীদেরকে দূর থেকে দেখামাত্র জাহান্নাম গর্জন শুরু করবে।' সাধারণভাবে দেখলে এ বাক্যে কোন ত্রুটি নেই। কিন্তু একটু ভেবে দেখো, বাক্যটি যদি এভাবে বলি, 'দূর থেকে জাহান্নামিদের দেখামাত্র জাহান্নাম গর্জন শুরু করবে।' তাহলে বাক্যটি অধিক সাবলীল ও শ্রুতিমসৃণ হয়।

এজন ভালো লেখকের বইয়ে আছে– 'আজ শিক্ষাঙ্গন রণাঙ্গনে পরিণত হয়েছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ক্যাম্পাস বন্দুকবাজি-বোমাবাজিতে প্রকম্পিত।'

এখানে দু'টি বাক্যের একটি বক্তব্য। কিন্তু বাক্যদু'টির সুরছন্দগত সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে শুধু 'হয়েছে' শব্দটির কারণে।

দ্বিতীয় বাক্যটি শেষ হয়েছে 'প্রকম্পিত' দিয়ে। তাই প্রথম বাক্যটি 'পরিণত' দিয়ে শেষ করতে পারলে গদ্যের যে সুরছন্দ, সেটা রক্ষা পেতো। তাছাড়া দ্বিতীয় বাক্যটির দীর্ঘতার কারণে বাক্যদু'টির ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে, অথচ সহজেই তা ছোট করে আনা যায়। কেননা ক্যাম্পাসের পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রকম্পিত বলা যেতো। আর পরিস্থিতির ভয়াবহতা বোঝানোর জন্য 'বোমাবাজি' যথেষ্ট ছিলো, 'বন্দুকবাজি'র দরকার ছিলো না।

এবার বাক্যদু'টি দেখো– 'শিক্ষাঙ্গন আজ রণাঙ্গনে পরিণত, বিশ্ববিদ্যালয় বোমাবাজিতে প্রকম্পিত।'

এখানে 'বোমাবাজি'র পরিবর্তে 'অস্ত্রের গর্জনে' বা 'বন্দুকের আওয়াযে' হতে পারে।

এতক্ষণ আমরা লেখার ভাষা ও শব্দগত সমালোচনার একটি দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছি, অর্থাৎ সুরছন্দগত দিক থেকে বাক্যগুলোর এবং বাক্যস্থ শব্দগুলোর অবস্থা বিচার বিশ্লেষণ করা।

সমালোচনার দ্বিতীয় সূত্র হলো, স্থান-কাল-পাত্রোপযোগিতা। অর্থাৎ প্রতিটি বাক্য এবং বাক্যস্থ শব্দ বক্তব্যের স্থান, কাল ও পাত্র-উপযোগী কি না সেদিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের ত্রুটি প্রচুর এবং অসচেতনতা অত্যন্ত দুঃখজনক। এ লেখাটি যখন সম্পাদনা করছি তখন একটি বইয়ে একটি

বাক্য দেখলাম, 'তিনি হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। বাক্যটি পড়ে আমারই কান্না পাওয়ার যোগাড়, না, যিনি 'হাউমাউ করে' কেঁদেছেন তার প্রতি সমবেদনার কারণে নয়, লেখকের করুণ অবস্থার প্রতি সমবেদনার কারণে, যিনি ইতিহাসের একজন বরণীয় ব্যক্তিকে অবলীলায় 'হাউমাউ করে কাঁদালেন। যে কোন মানুষ কাঁদতে পারে। সাধারণ মানুষও কাঁদে, অসাধারণও ব্যক্তিও কাঁদেন, এমনকি শোকের আতিশয্যে তিনি কান্নায় ভেঙ্গেও পড়তে পারেন। কিন্তু সেটা 'হাউমাউ' ধরনের কান্না হবে না।

যাক এখন আমরা এবিষয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই। নীচের বাক্যটি দেখো। ছোটদের একটি সীরাতগ্রন্থে এ বাক্যটি আছে–

'নাতির জন্মগ্রহণের সুসংবাদ পেয়ে আব্দুল মুত্তালিব খুশিতে নাচতে নাচতে বিবি আমেনার ঘরে গেলেন।'

এখানে বাক্যটিতে সুরছন্দগত ত্রুটি নেই, কিন্তু 'নাচতে নাচতে' কথাটা মোটেই পাত্রোপযোগী নয়। নবীজীর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তো দূরে, লেখক কি নিজের দাদার জন্যও এ শব্দটি এবং তা থেকে যে দৃশ্য ভেসে ওঠে তা পছন্দ করবেন? তিনি লিখতে পারতেন, 'খুশিতে বাগবাগ হয়ে/আনন্দে অধীর হয়ে/ আনন্দিত চিত্তে'। এমনকি 'আনন্দে আত্মহারা হয়ে'ও চলতে পারে। আরো অনেক কিছু চলতে পারে, শুধু ঐ 'নাচতে নাচতে'টা ছাড়া। সত্যি, অদ্ভুত মানুষের রুচি!

আরেকটি বাক্য হলো–

'আনসারী দুই তরুণ বুলেটের মত আবু জেহেলের দিকে ছুটে গেলেন।'

বুলেট শব্দটি এখানে কালোপযোগী হয়নি। কেননা ঘটনাটি যে সময়ের তখন বুলেট ছিলো না। এখানে লেখক নিজের কাল দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তার লেখা উচিত ছিলো, 'তীরবেগে ছুটে গেলেন', কিংবা 'বাজপাখীর মত উড়ে গেলেন/ ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

আরেকটি উদাহরণ দেখো; আরবের রাখালদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

'গোধূলিলগ্নে তারা ফিরে আসে'– গোধূলি মানে সূর্যাস্তকাল; কারণ এ সময় গরুর পাল খুরের আঘাতে ধূলি উড়িয়ে গোয়ালে ফেরে। সুতরাং 'গোধূলিলগ্ন' শব্দটি আরবের স্থানোপযোগী নয়। কেননা আরবে উট আছে প্রচুর, আছে ভেড়া-বকরীও, কিন্তু গরু তেমন নেই।

মোটকথা, তোমার কর্তব্য হবে; যে লেখাটি তুমি লিখছো তা গভীরভাবে বিচার-পর্যালোচনা করে দেখা যে, তাতে স্থান, কাল ও পাত্র-অনুপযোগী শব্দ, বাক্য, বা বক্তব্য রয়েছে কি না?

লেখার সমালেচানার তৃতীয় সূত্রটি হলো, প্রয়োজনীয়তা। অনেক সময় আমারা এমন শব্দ, বাক্য ব্যবহার করে ফেলি যার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। এমনকি অপ্রয়োজনীয় বক্তব্যও চলে আসে আমাদের কলমে। এতে কথা অনাবশ্যক দী-

হয়, ভাষাসৌন্দর্য ক্ষুণ্ন হয়। সুতরাং প্রয়োজনীয়তার দিক থেকেও লেখার বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা কর্তব্য। বাক্যে যে ক'টি শব্দ ব্যবাহার করা হয়েছে, তদ্রূপ বক্তব্যে যে ক'টি বাক্য উল্লেখ করা হয়েছে সবক'টি শব্দ বা বাক্যের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না। অপ্রয়োজনীয় শব্দ বা বাক্য অবশ্যই ছেঁটে ফেলতে হবে। একটি উদাহরণ দেখো; জান্নাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি কিতাবে আছে–

'জান্নাতী যখন ইচ্ছা গাছ থেকে পেড়ে ফল খাবে।'

এখানে 'গাছ থেকে পেড়ে' অংশটি অপ্রয়োজনীয়। এভাবে লিখলে ভালো হতো–

'জান্নাতে মানুষ যখন ইচ্ছা তখন জান্নাতী গাছের ফল খাবে।'

ছোটদের জন্য লেখা সীরাতের একটি কিতাবে মেরাজের বর্ণনাপ্রসঙ্গে রয়েছে–

'নবীজীও বোরাকটিকে সেখানে নিয়ে বেঁধে রাখলেন, তারপর বাইতুল মুকাদ্দাসের ভিতরে ঢুকলেন। নামাযের জন্য সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেলেন। জিবরীল (আ.) নবীজীর হাত ধরে সামনে ঠেলে দিলেন। ...

'নিয়ে' শব্দটি এখানে অতিরিক্ত। কারণ বাঁধতে হলে তো বাঁধার স্থানে নিতে হবেই। সেটা আলাদা করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। উল্লেখ ছাড়াই সেটা মাফহূম হয়। তাছাড়া 'বেঁধে রাখলেন'-এর পরিবর্তে শুধু 'বাঁধলেন' বলা ভালো ছিলো। একই ভাবে 'দাঁড়িয়ে গেলেন'-এর পরিবর্তে 'দাঁড়ালেন' বললে ভালো হতো।

আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায় বলতে পারি, 'দাঁড়ালো' হচ্ছে 'মুফরাদ ফেয়েল', আর 'দাঁড়িয়ে গেলো' হচ্ছে মুরাক্কাব ফেয়েল। তো মুফরাদ ও মুরক্কাব ফেয়েলের ব্যবহারক্ষেত্র আমাদের বুঝতে হবে। স্বাভাবিকভাবে আমরা ব্যবহার করি মুফরাদ ফেয়েল, পক্ষান্তরে দ্রুততা, অপ্রিয়তা, বিস্ময় বা অন্যকোন বিশেষ অবস্থা বোঝাতে ব্যবহার করি মুরাক্কাব ফেয়েল। যেমন, 'তিনি কথা বলার জন্য মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়ালেন। একপর্যায়ে তিনি একটি বিতর্কিত কথা বললেন, আর লোকেরা প্রতিবাদ করার জন্য দাঁড়িয়ে গেলো।' প্রথম স্থানে 'দাঁড়িয়ে গেলেন', আর দ্বিতীয় স্থানে 'দাঁড়ালো' ঠিক নয়।

'ঢুকলেন' শব্দটি পাত্রের শান-উপযোগী নয়। কেননা বিশিষ্ট লোকেরা ঢোকেন না, প্রবেশ করেন। তদ্রূপ বিশিষ্ট, বা পবিত্র স্থানে ঢোকা হয় না, প্রবেশ করা হয়। সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষও উত্তম স্থানে ঢোকে না, প্রবেশ করে।

বাইতুল মুকাদ্দাস-এর পরিবর্তে 'মসজিদে' বললে ভালো হতো। এখানে 'ভিতরে' না বললেও চলে; কারণ মানুষ ভিতরেই প্রবেশ করে, বাইরে নয়। অবশ্য অনেক সময় একেবারে ভিতরের অংশ বোঝানোর জন্য বলা হয়, 'তিনি মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করলেন।'

নামাযের সঙ্গে 'কাতার' শব্দটির আলাদা মুনাসাবাত রয়েছে। তাই 'সারি বেঁধে দাঁড়ালেন'-এর পরিবর্তে 'কাতার বেঁধে/ করে দাঁড়ালেন' বললে ভালো হয়। কাতার হলো ছালাত ও জামাতের অনিবার্য শব্দ।১

জিবরীল (আ.) নবীজীকে 'ঠেলে' দিলেন কথাটা লিখতে কলমে বাধা উচিত ছিলো। তিনি লিখতে পারতেন, 'নবীজীকে এগিয়ে দিলেন', বা 'সামনে বাড়িয়ে দিলেন'।

একই আলোচনায় রয়েছে–

'নবীজীর সামনে তিনটি পেয়ালা দেয়া হলো। একটার মধ্যে ছিলো পানি, একটার মধ্যে ছিলো দুধ, আরেকটার মধ্যে ছিলো শরাব। নবীজী বেছে দুধের পেয়ালাটা পান করলেন।'

'ছিলো' শব্দটি তিনবার ব্যবহার করার প্রয়োজন ছিলো না। তদ্রূপ তিনবার 'মধ্যে, মধ্যে, মধ্যে' শুনতে ভালো লাগে না। আর বাছাই করার বিষয়টিও এখানে অসঙ্গত। পুরো বাক্যটি এমন হলে ভালো হতো বলে মনে হয়–

'নবীজীও বোরাকটিকে সেখানে বাঁধলেন এবং মসজিদে প্রবেশ করলেন। ..... নামাযের জন্য কাতার বেঁধে/করে দাঁড়ালেন। হযরত জিবরীল (আ.) নবীজীর হাত ধরে তাঁকে সামনে বাড়িয়ে দিলেন।

নবীজীর সামনে তিনটি পেয়ালা রাখা হলো। একটিতে ছিলো পানি, একটিতে দুধ, আরেকটায় ছিলো শরাব। নবীজী দুধের পেয়ালাটি নিলেন এবং দুধ পান করলেন।'

যেহেতু দুধ পান করার বিষয়টি এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তাই শুধু 'পান করলেন' না বলে 'দুধ শব্দটিকে পুনরুক্ত করা হয়েছে। এই পুনরুক্তি দোষণীয় নয়, বরং শোভনীয়।[২]

লেখার ভাষাগত ও শব্দগত সমালোচনা করার আরো কিছু সূত্র রয়েছে, যা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব হলো না। সময় ও সুযোগ হলে পরবর্তীতে আরো বিশদ আলোচনার ইচ্ছে আছে।[৩]

---

১। আগে ছিলো, 'কাতার হলো নামাযের জামাতের অনিবার্য শব্দ', এখানে দুই ইযাফত দ্বারা তানাফুর সৃষ্টি হচ্ছে বলে মনে হয়। প্রথমে লিখলাম, 'নামায ও জামাতের', তারপর মনে হলো আতফের উভয় দিকে আরবী শব্দ হলে ভালো হয়, তাই লিখলাম, 'ছালাত ও জামাতের'।

২। অনেকে দোষণীয় শব্দটিকে 'দোষণীয়' মনে করেন, তবে এটিকে 'শোভনীয়' বলার লোকও কম নন।

৩। 'আগামীতে ও পরবর্তীতে' সম্পর্কে কারো কারো আপত্তি। ব্যাকরণের যুক্তিতে তারা বলতে চান আগামী ও পরবর্তী-এর পরে এ-বিভক্তিটি যুক্ত করা ঠিক নয়, এটিকে পরবর্তী কোন শব্দের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। যেমন, পরবর্তীকালে, বা পরবর্তী কোন সুযোগে। কিন্তু বাংলায় এটি স্বচ্ছন্দেই চলতে পারে বলে মনে হয়। বরং অনেক সময় অতিরিক্ত শব্দসংযোজন গতিময়তাকে ব্যাহতও করে।

# লেখার কল্পরূপ

বিভিন্ন সূত্র ধরে একটি লেখার সমালোচনা করা যায় এবং লেখার ত্রুটিগুলো সংশোধন করা যায়। ইতিপূর্বে সুরছন্দের কথা বলেছি, স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী শব্দচয়ন ও শব্দের পরিমিতি রক্ষার কথা বলেছি: এধরনের বিভিন্ন সূত্র উল্লেখ করেছি। তুমি যখন এভাবে প্রতিটি সূত্র ধরে নিজের এবং অন্যের লেখার সমালোচনা করবে এবং প্রতিটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করবে তখন ধীরে ধীরে তোমার মধ্যে একটি মানোত্তীর্ণ সাহিত্যরুচি ও সমালোচনাবোধ তৈরী হবে। তখন তোমার কলমের লেখা হবে নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসুন্দর। এখানে আমরা সমালোচনার নতুন একটি সূত্রের কথা আলোচনা করতে চাই। এর নাম হতে পারে 'কল্পরূপ'।

যে কোন শব্দ, বাক্য, বা কথা থেকে পাঠকের কল্পনায় একটি চিত্র বা রূপ অবশ্যই ফুটে ওঠবে। সেই কল্পরূপটি যদি সুন্দর, স্থানোপযোগী ও গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে লেখার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় এবং পাঠককে তা বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে কল্পরূপ যদি অসুন্দর ও অগ্রহণযোগ্য হয় তাহলে লেখার সৌন্দর্য ক্ষুণ্ন হয় এবং পাঠকচিত্তে তার আবেদন কমে যায়। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি সহজভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

একজন বিখ্যাত লেখকের একটি উপন্যাস পড়তে গিয়ে দেখি, ভালোবাসার আবেগে একজন দু'হাতে অপরজনের গলা জড়িয়ে ধরেছে। এই দৃশ্যটি পাঠকের সামনে পরিবেশন করতে গিয়ে তিনি একটা উপমা প্রয়োগ করেছেন। দেখো–

'মীনা তার দু'বাহু দিয়ে সাপের মত রাহুলের গলা পেঁচিয়ে ধরলো।'

ভালোবাসার আবেগময় মুহূর্তে সাপের কল্পনা পাঠকের মনে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে! সাপ এমনই এক বস্তু যার কল্পনা যে কোন মানুষকে যে কোন সময় ভড়কে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। ভালোবাসার ক্ষেত্রে সাপের এই উপমাপ্রয়োগকে কোনভাবেই সুপ্রয়োগ বলা চলে না। এখানে লেখার কল্পরূপ মাটি হয়ে গেছে।

লেখক যদি বলতেন, 'মীনা রাহুলকে দু'হাতে কচি-কোমল লতার মত পেঁচিয়ে ধরলো' তাহলে পাঠকের চিন্তায় সুন্দর ও কোমল একটি কল্পরূপ ফুটে উঠতো।
সাপের উপমা চলতে পারে যে কোন বিরূপ ও বৈরী পরিবেশে। যেমন–
দু'হাতে সে সাপের মত শত্রুর গলা পেঁচিয়ে ধরলো।'
আরেকটি উদাহরণ দেখো, বিধবার করুণ অবস্থা ফুটিয়ে তোলার জন্য এক হিন্দু লেখক লিখেছেন, 'দিন-রাত যেন সে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরে ঝুলে আছে।'
একই বিষয়ে অন্য একজন লিখেছেন, 'দিন-রাত যেন সে বৈধব্যের চিতায় জ্বলছে।'
দু'টি বাক্য থেকে ভিন্ন ভিন্ন দু'টি রূপ তোমার কল্পনায় নিশ্চয় ভেসে উঠছে। এখন তুমিই বলো, দু'টি কল্পরূপের কোনটি তোমার মনকে স্পর্শ করবে এবং বিধবার প্রতি তোমার সহানুভূতিকে বেশী উদ্বেলিত করবে?
দ্বিতীয় লেখক বৈধব্যকে চিতার সঙ্গে উপমা দিয়েছেন। চিতার আগুনে যেমন শবদেহ জ্বলতে থাকে তেমনি বিধবার জীবন্ত দেহ যেন বৈধব্যের চিতায় জ্বলছে। হিন্দুবিধবার জীবনযন্ত্রণার মর্মান্তিক চিত্র তুলে ধরার জন্য এর চেয়ে সুন্দর ও মর্মস্পর্শী উপমা আর কী হতে পারে? এর সঙ্গে উপরের চিত্রটা কি কোন তুলনায় আসতে পারে?
আরেকটি উদাহরণ দেখো, 'ক্ষুধায় আমার পেটের ভেতরের ছুঁচোগুলো ছোটাছুটি শুরু করেছে।' ক্ষুধার আতিশয্য বোঝানোর জন্য এটা বেশ পরিচিত উপমা। কিন্তু দৃশ্যটা কল্পনা করতে কেমন? বলি, মহাশয়ের পেটটা ছুঁচোদের আস্তানা হলো কীভাবে! এর চেয়ে অনেক ভালো উপমা হলো, 'ক্ষুধায় পেটের নাড়িভুঁড়ি জ্বলছে'। আরো ভালো যদি বলি, পেটে ক্ষুধার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে।
একটি কিশোর সীরাতগ্রন্থের লেখকের ভাষায়–
'পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে বৃদ্ধ আব্দুল মুত্তালিব দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন।'
উপরের বাক্য থেকে তোমার কল্পনায় যে দৃশ্য ভেসে উঠলো তা কি সুন্দর এবং নবীজীর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের জন্য শোভনীয়? লেখক যদি লিখতেন, 'পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে বৃদ্ধ আব্দুল মুত্তালিব শোকে নির্বাক/পাথর হয়ে গেলেন।' তাহলে কি কল্পরূপটি সুন্দর হতো না?১
একটি বইয়ে দেখি, বন্ধুকে সান্ত্বনা দিয়ে বন্ধু বলছে, 'বুকের কষ্টগুলোকে বুক থেকে তুলে পচা ইঁদুরের মত ছুঁড়ে ফেলে দাও।' তার মানে যতগুলো কষ্ট ততগুলো পচা ইঁদুর! বন্ধুর বুকটা তাহলে পচা ইঁদুরের ভাণ্ডার! এমন উপমাও মানুষ পছন্দ করে বন্ধুর জন্য!২
সিংহাসন থেকে বিতাড়িত ইরানের শাহ দুঃখ করে বলেছিলেন, 'প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার পর আমেরিকা আমাকে পচা ইঁদুরের মত ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।'

একসময় যিনি ছিলেন 'শাহ', হোন তিনি জনগণের রক্তশোষণকারী, নিজেকে পচা ইঁদুর ভাবতে রুচিতে তার বাধা উচিত ছিলো। তার চেয়ে পাকিস্তানের পারভেয মুশাররফের রুচিবোধ ভালো, একই প্রসঙ্গে নিজেকে তিনি ভেবেছেন কলার খোসা। পচা ইঁদুরের চেয়ে কলার খোসা অনেক ভালো।

তাহলে কি পচা ইঁদুর কোথাও চলবে না? কেন চলবে না, অবশ্যই চলবে। তুমি বলতে পারো, 'কারযাইর মনে রাখা উচিত, দেশ ও জনগণের সাথে গাদ্দারি করে যারা আমেরিকার তাবেদারি করে, প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার পর আমেরিকা তাদের পচা ইঁদুরের মত ছুঁড়ে ফেলে দেয়।'

গাদ্দারি ও বেঈমানির ঘৃণ্যতা প্রকাশ করার জন্য এমন কুৎসিত উপমাই তো হবে 'সুন্দর'!

আরেকটি উদাহরণ দেখো–

'দীর্ঘ পাঁচ বছর পর বিদেশ থেকে বড় ভাইয়ের আগমনে আম্মা খুশিতে নাচতে লাগলেন।'

এ বাক্যে একজন আনন্দিতা মায়ের যে কল্পরূপ ফুটে ওঠে তা কি পাঠকচিত্ত গ্রহণ করবে? পক্ষান্তরে লেখক যদি লিখতেন, 'আম্মা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেলেন।' কিংবা 'খুশিতে আম্মার মুখটা যেন চাঁদের মত ঝলমল করে উঠলো।' তাতে যে কল্পরূপ ফুটে উঠতো তা কি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হতো না? একজন তরুণ গল্পকার লিখেছেন–

'শিক্ষক লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে দাঁড়ালেন এবং তেড়ে মেরে তার দিকে ছুটে গেলেন।'

এ বাক্যটি পড়ে শিক্ষকের যে রূপ তোমার কল্পনায় ভেসে উঠলো তা কি খুব সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য হলো? এ লেখা কি পাঠকস্তুতি লাভ করবে? তিনি যদি লিখতেন, 'শিক্ষক দ্রুত চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং তার দিকে ছুটে গেলেন' তাহলে কি কল্পরূপটা অধিকতর সহনীয় হতো না?

অবশ্য এখানে আমাকে লেখকের উদ্দেশ্য ভেবে দেখতে হবে। তিনি যদি শিক্ষকের হাস্যকর রূপ তুলে ধরে রস সৃষ্টি করতে চান তাহলে মোটামুটি ঠিক আছে। লেখকের জন্য তা সঙ্গত হলো কি না সেটা অবশ্য ভিন্ন কথা।

উদাহরণ আরো দেয়া যেতে পারে, তবে বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্য আশা করি এতটুকুই যথেষ্ট।

এবার বিভিন্ন লেখকের লেখা থেকে কিছু সুন্দর কল্পরূপের উদাহরণ তোমার সামনে তুলে ধরছি–

(ক) 'জানি, একা একাই আমাকে এখন দুঃখের ভেলায় অশ্রুর নোনা দরিয়া পাড়ি দিতে হবে।'

উপরের বাক্যটি থেকে তোমার কল্পনায় যে দৃশ্য উপস্থিত হলো তা কি তোমার

হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করবে না! পক্ষান্তরে 'জানি, আমাকে এখন অশ্রুর সাগরে হাবুডুবু খেতে হবে।' এ বাক্যটির কল্পরূপ হয়ত সুন্দর, কিন্তু তেমন আবেদনপূর্ণ কি হলো?

(খ) হাবশার উদ্দেশ্যে যে মুহাজির কাফেলা মক্কা থেকে যাত্রা করেছে তাদের পথচলার দৃশ্যটি সাহিত্যের ভাষায় উপস্থাপন করেছেন 'তোমাকে ভালোবাসি হে নবী!'-এর লেখক এভাবে–

*'নির্যাতনের বিভীষিকা থেকে মুক্তির আনন্দ এবং নতুন দেশে নিরাপদ জীবনের সম্ভাবনা একদিকে তাদেরকে পথচলার প্রেরণা যোগাচ্ছিলো, অন্যদিকে বিভিন্ন শঙ্কা ও আশঙ্কার ঝড়-ঝাপটা তাদের আশার প্রদীপ নিভিয়ে দিতে উদ্যত ছিলো; তবু তাদের পথচলা অব্যাহত ছিলো। দিনের আলো ও রাতের অন্ধকার এবং মরীচিকার ঝিকিমিকি ও তারকার ঝিলিমিলির মাঝে অদৃশ্যলোকের একটি আলোকরেখা যেন তাদের পথ দেখিয়ে চলেছিলো।'*

পুরো বক্তব্যটি পড়ার সময় ভেবে দেখো, কী অপূর্ব সুন্দর একটি কল্পরূপ তোমার হৃদয়কে অভিভূত করে!

মুহাজিরদের কাফেলা পথ চলছে; একবার আশা জাগে যে, হয়ত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে নিরাপদ আশ্রয়স্থানে পৌঁছে যাবে; আবার আশঙ্কা জাগে যে, হয়ত তার আগেই তারা শত্রুর হাতে ধরা পড়ে যাবে, কিংবা হয়ত হাবশায় তারা পাবে না কোন আশ্রয়। পথচলা কাফেলার মনে এই যে আশা ও নিরাশার পাশাপাশি দু'টি রূপ, এ যেন ঝড়ের রাতে কারো হাতের সেই প্রদীপ যা বাতাসের ঝাপটায় একবার নিভু নিভু হয়ে যায়, আবার বাতাসের ঝাপটা কমে গেলে প্রদীপের শিখাটি পূর্ণরূপে প্রজ্বলিত হয়! অতি সুন্দর ও অত্যন্ত আবেদনপূর্ণ একটি কল্পরূপ, তাই না!

তারপর কল্পনার চোখে দেখো তো সেই কাফেলাটিকে, যারা দিনের আলোতে পথ চলছে! মরুভূমিতে পথের কোন দিশা নেই, আছে শুধু মরীচিকার ঝিকিমিকি! রাতের অন্ধকারেও তারা পথ চলছে; তখনো তাদের কাছে পথের দিশা নেই, আছে শুধু দূর আকাশে তারাদের ঝিলিমিলি! কিন্তু দিনে বা রাতে একটি আলোর রেখা যেন তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে! এরূপ একটি দৃশ্য কল্পনা করে কেমন পুলকিত হচ্ছে তোমার হৃদয়!

(গ) 'লোভের জলে এবং উপঢৌকনের জালে সে আটকা পড়েছে।'

একজন লোভী মানুষ যখন অর্থগ্রহণ করে অর্থদাতার ইচ্ছার কাছে অসহায়ভাবে আটকা পড়ে, তার উপমারূপে পানিতে থেকেও জালে আটকা পড়া মাছের ছটফটানির যে কল্পরূপ তোমার সামনে ফুটে উঠলো তার কি কোন তুলনা আছে! লোভ যেন জলভরা একটি বদ্ধ জলাশয়; লোভী মানুষটি যেন একটি মাছ, নিশ্চিন্ত মনে সাঁতার কাটছে। উৎকোচের টাকা যেন একটি জাল। পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা

লোকটি জাল নিক্ষেপ করলো, আর জালটি ছড়িয়ে গিয়ে মনের আনন্দে সাঁতার কাটা মাছটির উপর পড়লো। চমৎকার!

(ঘ) পুষ্পের একটি সম্পাদকীয়-এর শেষাংশ–

'এখনো তোমার মস্তিষ্ক চিন্তার জাল বিস্তার করে, এখনো তোমার কলম থেকে শব্দের মিছিল যাত্রা করে, তবু বান্দা, তুমি অনুভব করো না আমার রহমতের সুশীতল ছায়া!

কী আমল করেছো তুমি? বন্দেগির কী হক আদায় করেছো তুমি? আমার কোন নেয়ামতের কী শোকর আদায় করেছো তুমি?

না বান্দা, ভয় পেয়ো না, পেরেশান হয়ো না! তারপরো আমি তোমার পাশে আছি, আমি তোমার পাশে থাকবো, যত দিন তুমি কারো অকল্যাণ চাইবে না, যত দিন তুমি কারো প্রতি ঈর্ষাকাতর হবে না এবং যত দিন তুমি বিশ্বাস করবে, তুমি কিছু জানো না, তুমি কিছু পারো না!

আমার করুণা ও রহমত তোমাকে ছায়া দান করে যাবে, যত দিন তুমি আপন-পর সবার জন্য ছায়া হয়ে থাকবে। পারবে না বান্দা! পারতে তোমাকে হবে। এটাই হলো আমার নেয়ামতের শোকর, আর তোমাকে আমি দেখতে চাই শোকরগুযার বান্দারূপে।৩

উপরের রেখাটানা অংশটি আবার পড়ো, *'এখনো তোমার কলম থেকে যে শব্দের মিছিল যাত্রা করে ....।* পরপর শব্দ সাজিয়ে লিখে যাওয়ার কথা বোঝাতে গিয়ে 'শব্দের মিছিল যাত্রা করে' বলে, যে কল্পরূপ তোমার সামনে তুলে ধরা হলো তা কি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক নয়!? মানুষের মিছিল এবং শব্দের মিছিলের যোগসূত্রটিও চিন্তা করার মত। মানুষ মিছিল করে জীবনের কোন একটি উদ্দেশ্যকে অর্জন করার জন্য; শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের পক্ষে দাবী আদায়ের জন্য, তেমনি শব্দের মিছিল যাত্রা করে জীবনের কোন আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য; বাতিলে বিরুদ্ধে এবং হকের পক্ষে বিজয় অর্জন করার জন্য। 'শব্দের মিছিল' কথাটি এই পুরো অনুভব-অনুভূতিকে পাঠকের অন্তরে জাগ্রত করে।

যদি বলা হতো, *'এখনো তোমার কলম থেকে শব্দের স্রোত প্রবাহিত হয়'* তাহলেও একটি কল্পরূপ তোমার মনের পর্দায় ভেসে উঠতো, তবে তা পূর্বোক্তটির মত সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হতো না।

এছাড়া পুরো বক্তব্যে দেখো না, এক অদৃশ্য সত্তা তোমার মাথার উপর কীভাবে শীতল স্নিগ্ধ একটি ছায়া বিস্তার করে রেখেছেন!

(ঙ) নীচে 'সৃষ্টির প্রসববেদনা' নামে পুষ্পের একটি সম্পদকীয় থেকে তুলে আনা অংশটুকু মনোযোগ দিয়ে পড়ো–

*'কোন দিকে আশার আলো নেই। সামনে আমার শুধু হতাশার অন্ধকার। আমি যেন অকূল দরিয়ার মাঝি, যেখানে ঝড়-তুফানের দাপাদাপি, ঢেউ-দানবের*

*মাতামাতি। ভাঙ্গা কিশতি, আর ছেঁড়া পাল, এই তো সম্বল আমার। কিন্তু ঝড়ঝঞ্ঝা আমার ছেঁড়া পালও যে উড়িয়ে নিতে চায়! উন্মত্ত ঢেউ আমার ভাঙ্গা কিশতিও যে ডুবিয়ে দিতে চায়।*[৪]

এখানে চিত্র আঁকা হয়েছে জীবনসফরের প্রতিকূল অবস্থায় দিশেহারা একজন মুসাফিরের। দেখো, এ লেখা থেকে তোমার কল্পনায় যে দৃশ্যটি ফুটে উঠছে তা তোমার মর্মকে স্পর্শ এবং তোমার চিত্তকে অভিভূত করে কি না!

আদর্শ লেখকের মানসম্মত লেখা তুমি যত বেশী পড়বে এবং তাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কল্পরূপগুলোর সৌন্দর্য অনুভব ও আত্মস্থ করার চেষ্টা করবে ততই তোমার নিজের মধ্যেও সুন্দর সুন্দর কল্পরূপ নির্মাণের যোগ্যতা গড়ে ওঠবে, ইনশাআল্লাহ। সুন্দর সুন্দর কল্পরূপের আরো উদাহরণ এখানে দেয়া যেতে পারে, তবে আশা করি, উপরের আলোচনা দ্বারাই তুমি বিষয়টির গুরুত্ব কিছুটা হলেও উপলব্ধি করতে পেরেছো।

এবার তুমি তোমার লেখাটি সামনে নিয়ে বসো এবং কল্পরূপের সূত্র ধরে সমালোচনার দৃষ্টিতে পড়ো, দেখো, কল্পরূপের কোন অসৌন্দর্য বা অসঙ্গতি তোমার চিন্তায় ধরা পড়ে কি না? তাহলে আরো সুন্দর এবং অধিকতর উপযোগী কল্পরূপ তৈরী করার চেষ্টা করো। আল্লাহ আমাদের সবার সহায় হোন, আমীন।

---

১। আগে ছিলো, 'তাহলে কি কল্পরূপটি অধিকতর সুন্দর হতো না?' এতে বোঝা যায়, আগের কল্পরূপটিও সুন্দর! কী অদ্ভুত ত্রুটি!

২। আগে ছিলো, 'এমন উপমাও মানুষ দেয়!' তারপর লিখলাম, 'মানুষ দিতে পারে!' তারপর মনে হলো, নিজস্ব সত্তাগতভাবে তো উপমাটায় কোন খারাবি নেই। যদি প্রতিপক্ষ সম্পর্কে বলা হতো, 'একেকটাকে ধরো, আর পঁচা ইঁদুরের মত ছুঁড়ে ফেলো' তাহলে তো খারপ হতো না। বন্ধুর বুকে হওয়াতেই না খারাপ হলো! তাই লিখলাম, এমন উপমাও মানুষ দেয়/দিতে পারে বন্ধু সম্পর্কে!

৩। আগে ছিলো. 'আমি তোমাকে দেখতে চাই শোকরগোযার বান্দা হিসাবে।' এখানে 'হিসাবে' শব্দটি এখন বেমানান মনে হচ্ছে, তাই বর্তমান পরিবর্তনটি করা হলো।

৪। আগে ছিলো 'তলিয়ে দিতে চায়'; এখন দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদনার সময় মনে হলো, কাছাকাছি দু'টি 'ত'-এর উপস্থিতিতে কিছুটা তানাফুর সৃষ্টি করছে। তার চেয়ে 'ডুবিয়ে দিতে চায়' ভালো। তাছাড়া ঢেউ আসলে কিশতিকে শুধু ডুবিয়ে দেয়। তারপর তা নিজে নিজেই তলিয়ে যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এত দিন এমন একটা ত্রুটি লেখাটির গায়ে লেগে ছিলো, যা আমি ধরতে পারিনি!

# লেখকের আত্মসমালোচনা

বড় বড় লেখক সবাই বলেছেন, লেখার ক্ষেত্রে উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভের অন্যতম প্রধান শর্ত হলো লেখকের আত্মসমালোচনা, অর্থাৎ নিজেই নিজের লেখার সমালোচনা করার অভ্যাস গড়ে তোলা। সেই সঙ্গে অন্য লেখকের লেখা সমালোচকের দৃষ্টিতে পড়া। তাতে তোমার সামনে নিজের এবং অন্যের লেখার সৌন্দর্যগুলো যেমন ফুটে ওঠবে তেমনি খুঁত ও ত্রুটিগুলোও ধরা পড়বে। তখন তোমার কলম সৌন্দর্যকে ধারণ করার এবং অসৌন্দর্যকে পরিহার করার সক্ষমতা অর্জন করবে।

এ মূলনীতি অনুসরণ করে আমি অনেক উপকার পেয়েছি। এটা আমি সাধ্যমত করেছি, এখনো সুযোগমত করি।

সৈয়দ শামসুল হককে তুমি পছন্দ করো না! আমিও করি না, কিন্তু তার কলমের শক্তিকে তুমি উপেক্ষা করবে কীভাবে? তার সাহিত্য-প্রতিভাকে তুমি অস্বীকার করবে কীভাবে? তার মন্তব্য শোনো–

*'একজন লেখককে বড় হতে হলে তাকে হতেই হয় তার লেখারই সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে নির্মম, সবচেয়ে নিরপেক্ষ সমালোচক। আত্মসমালোচনার পথেই আরো উত্তরণ ঘটে, হয় ভালো থেকে আরো ভালো লেখা।'*[১]

*'একজন লেখককে বড় হতে হলে তাকে হতেই হয় তার লেখারই ...'* দেখো, তিনি এত জোর দিয়ে গদ্যের যে সুরছন্দের কথা বলে আসছেন, এখানে তার নিজের লেখাতেই তা অনুপস্থিত। বাক্যটির পর্ববিভক্তি হবে এরূপ– একজন লেখককে বড় হতে হলে/ তাকে হতেই হয়/তার লেখারই/সবচেয়ে বড়/সবচেয়ে নির্মম/সবচেয়ে নিরপেক্ষ সমালোচক।

প্রথম পর্বটি গায়ে গতরে বেশী হয়ে গেছে। তাছাড়া *'তাকে হতেই হয় তার লেখারই'*– এখানে তিনটি 'ত'-এর মিলিত উচ্চারণে কিছুটা জড়তা আসে। (আমি বলতে চাচ্ছিলাম, তোতলানি আসে।) হতেই হয়-এর উচ্চারণও মসৃণ নয়। বাক্যটি এমন হলে মনে হয় আরো ভালো হয়–

*লেখক যদি বড় হতে চায়/ তাকে হতেই হবে নিজেরই লেখার/সবচেয়ে বড়/সবচেয়ে নিরপেক্ষ/সবচেয়ে নির্মম সামালোচক।*

তিনি আরো লিখেছেন–

*'লেখা শিখতে হয় অন্যের লেখা পড়ে। খারাপ লেখকের কাছেও শেখার আছে। তার থেকে শেখা যায় সবচেয়ে বড় শেখা যে, ওই রকম লিখতে নেই।'*[২]

সৈয়দ শামসুল হকের এ সাহিত্য-উপদেশ আমি দেখেছি অনেক পরে, তবে তা পালন করেছি অনেক আগে থেকে। যদি জানতে চাও, এ উপদেশ পেয়েছি কোত্থেকে? একটি উত্তরই দিতে পারবো, 'আকাশ থেকে'!

ছাপার অক্ষরে প্রকাশের আগে যেমন আমি আমার লেখা বারবার পড়ি এবং কঠোর সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখি, তেমনি ছাপা হওয়ার পরও সময়-সুযোগে দেখতে থাকি।[৩] তাতে প্রকাশিত লেখায়ও এমন সব ত্রুটি প্রকাশ পায় যে, রীতিমত অবাক হই এবং লজ্জায় পড়ে যাই যে, এত বার এতভাবে দেখার পরও এমন ত্রুটি কীভাবে থেকে গেলো![৪]

নীচে পুষ্পের একটি সম্পাদকীয় 'সৃষ্টির প্রসববেদনা'-এর অংশবিশেষ পড়ো–

*'কিছুদিন থেকে বিভিন্ন রকম যন্ত্রণা ভোগ করছি। কষ্টের কাঁটাগুলো বুকে এসে বিঁধছে, আর তা থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে। আমি শুনতে পাই আমার আহত হৃদয়ের আর্তনাদ।*

*হে আল্লাহ চারপাশে আমার এত জহর, এত কহর, এত বিষ, এত ছোবল; আর যে সইতে পারি না! হে আল্লাহ, তবু তুমি কাছে আসবে না! অসহায় বান্দাকে তবু সান্ত্বনার বাণী শোনাবে না!*[৫]

এ লেখাটি বহু পরিমার্জন ও সংশোধনের পর ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছিলো। কিছুদিন আগে যখন আবার পড়লাম, একটা ত্রুটি নযরে পড়লো, যা এতবার দেখার পরও নযর এড়িয়ে রয়ে গিয়েছিলো।

কী সেই ত্রুটি! আবার পড়ো–

'কিছুদিন থেকে বিভিন্ন রকম যন্ত্রণা ভোগ করছি। কষ্টের কাঁটাগুলো বুকে এসে বিঁধছে, আর তা থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে।'

এখানে কল্পরূপটি খুব সুন্দর, তাই না! প্রতিটি কষ্ট যেন একটি কাঁটা। সেই কাঁটাগুলো বুকে এসে বিঁধছে, আর ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে। কষ্ট পেয়ে অশ্রু ঝরা, আর কাঁটা বিঁধে রক্ত ঝরা, দু'টি দৃশ্যের মাঝে আশ্চর্য সুন্দর মিল রয়েছে। কষ্ট-পাওয়া মানুষের এ কল্পরূপ পাঠককে অবশ্যই মুগ্ধ করবে। তো এখানে কল্পরূপটি ঠিক আছে, কিন্তু প্রকাশের ভাষায় ত্রুটি রয়ে গেছে। চিন্তা করলে তুমিও বুঝতে পারবে যে, 'তা থেকে' অংশটা এখানে অপ্রয়োজনীয়। কেননা কাঁটা যখন বুকে বিঁধছে তখন বুক থেকেই তো রক্ত ঝরবে; আলাদা করে তা বলার দরকার কী? তাছাড়া তাতে বাক্যের সুরছন্দও ব্যহত হয়েছে। অর্থাৎ শব্দও বেশী

খরচ হলো, আবার বাক্যের সৌন্দর্যও নষ্ট হলো। এবার তুমি বাক্যটি দু'ভাবে পড়ো এবং বাক্যের সুরছন্দটি কানে বাজিয়ে দেখো–

*(ক) কষ্টের কাঁটাগুলো/ বুকে এসে বিঁধছে/ আর তা থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে।*

*(খ) কষ্টের কাঁটাগুলো/ বুকে এসে বিঁধছে/ আর ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে।*

আরো দেখো–

প্রথম বাক্যতিনটি শেষ হয়েছে যথাক্রমে করছি, বিঁধছে ও ঝরছে ক্রিয়া দিয়ে। এরপর চতুর্থ বাক্যের ক্রিয়াকে আগে নিয়ে আসায় পুরো বক্তব্যে আলাদা একটা আবেদন ও জোরালোতা সৃষ্টি হয়েছে। লেখকের আহত হৃদয়ের সঙ্গে পুরো পরিপার্শ্ব যেন আর্তনাদ করে উঠেছে। চতুর্থ বাক্যটিও যদি ক্রিয়া দিয়ে শেষ হতো এবং বলা হতো, *'আমি আমার আহত হৃদয়ের আর্তনাদ শুনতে পাই'* তাহলে বক্তব্যের আবেদন যথেষ্ট ক্ষুণ্ন হতো। আগে এমনই ছিলো, তবে ত্রুটিটা তখন ধরা পড়ায় সংশোধন করে নেয়া হয়েছে। বাক্যগুলো দু'ভাবে পড়ে দেখো।

সম্পাদনার আগে–

*(ক) কিছুদিন থেকে বিভিন্ন রকম কষ্ট ভোগ করছি।*

*(খ) কষ্টের কাঁটাগুলো বুকে এসে বিঁধছে।*

*(গ) আর তা থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে।*

*(ঘ) আমি আমার আহত হৃদয়ের আর্তনাদ শুনতে পাই।*

সম্পাদনার পরে–

*'কিছুদিন থেকে বিভিন্ন যন্ত্রণায় জ্বলছি/কষ্টের কাঁটাগুলো বুকে এসে বিঁধছে/আর ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে/আমি শুনতে পাই আমার আহত হৃদয়ের আর্তনাদ।'*

শেষ মুহূর্তে প্রথম বাক্যটি পরিবর্তন করলাম পর্ববিভক্তিতে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য। কারণ বাক্যটি বেশ দীর্ঘ ছিলো। তাছাড়া 'জ্বলছি' কথাটি অন্যরকম একটি আবহ দান করে। আরেকটি বিষয় হলো, *'ভোগ করছি, বিঁধছে, ঝরছে'* একরকম নয়, পক্ষান্তরে *'জ্বলছি, বিঁধছে ও ঝরছে'*, একরকম।

আরেকটি ত্রুটি এই মাত্র ধরা পড়লো। দেখো, চতুর্থ বাক্যটিতে 'শুধু' যোগ করে যদি বলি, *'আমি শুধু শুনতে পাই/ আমার আহত হৃদয়ের আর্তনাদ'* তাহলে কেমন হয়! কোথাও কোন মানুষ নেই; কোথাও কোন শব্দ নেই। গভীর এক নিঃসঙ্গতা যেন কষ্টের দহন-যন্ত্রণা আরো বাড়িয়ে দেয়– বাক্যটিতে এখন এরকম একটি নিঃসঙ্গতাবোধের আবহ তৈরী হয়েছে, না! তাছাড়া 'শুধু-এর সংযোজনে পর্ববিভক্তি আরো সুষম হয়েছে।

চতুর্থ বাক্যটি এমনও হতে পারে, *'আমি শুধু শুনতে পাই কাঁটা বেঁধার খচখচ শব্দ, আর ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের আর্তনাদ।'*

এখানে 'খচখচ'-এর কারণে 'আহত'-এর পরিবর্তে 'ক্ষতবিক্ষত' লিখতে হয়েছে।

তবে আমার বিচারে আগের বাক্যটিই ভালো। এর পক্ষে যুক্তিও তুলে ধরতে পারি, তবে থাক সেটা। এখানে শুধু বলবো, একটু বুঝতে চেষ্টা করো, লেখা তার লেখকের কাছে কতটা সযত্ন পরিচর্যা দাবী করে! মূল লেখাটি তৈরী করার সময় এত কিছু ভাবিনি, ভাবার সুযোগও ছিলো না, বরং এত কিছু ভাবলে লেখাটাই হয়ত আসতো না।৬ তাই আগে লেখাটিকে আসতে দিতে হয়। তারপর পরিচর্যা ও পরিমার্জনের জন্য আছে দীর্ঘ সময়, এমনকি সারাটা জীবন! যখনই সুযোগ হবে, তুমি তোমার পিছনের লেখাগুলোর সঙ্গে যদি এভাবে সময় যাপন করো তাহলে মুক্তার ঔজ্জ্বল্যের মত তোমার লেখারও ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পাবে।

শেষ অংশটি সম্পর্কেও দু'টি কথা বলি–

প্রথমত *'আমার চারপাশে এত জহর ...'* এর তুলনায় *'চারপাশে আমার এত জহর'* কথাটি অধিক ছন্দপূর্ণ এবং আবেগধর্মী। কথায় এই ছন্দময়তার প্রয়োজন রয়েছে।

দ্বিতীয়ত সাপ আগে ছোবল মারে, তারপর বিষক্রিয়া শুরু হয়। সে হিসাবে *'এত ছোবল, এত বিষ'* হওয়ার কথা, কিন্তু জহর ও কহর শব্দদু'টি তিন অক্ষরের, সেহেতু দু'অক্ষরের 'বিষ'কে আগে এনে তিন অক্ষরের 'ছোবল' পরে আনা হয়েছে। তাতে বাক্যের ছন্দময়তা রক্ষা পেয়েছে। বাক্যটি দু'ভাবে কানে বাজিয়ে পড়ে দেখো, পার্থক্যটা তুমিও বুঝতে পারবে–

*(ক) চারপাশে আমার এত জহর, এত কহর, এত বিষ, এত ছোবল!*

*(খ) আমার চারপাশে এত জহর, এত কহর, এত ছোবল, এত বিষ!*

তৃতীয়ত এখানে প্রশ্নের শৈলী গ্রহণ করে বলা যায়, *'চারপাশে আমার কেন এত জহর, এত কহর, এত বিষ, এত ছোবল?!'* তবে প্রশ্নের উদ্দেশ্য প্রশ্ন করা নয়, বরং ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা প্রকাশ করা।

### *লেখাটির প্রথম খসড়া*

বর্তমান সম্পাদনার সময় সৌভাগ্যক্রমে আলোচ্য লেখাটির একেবারে প্রথম খসড়াটি পুরোনো কাগজের মধ্যে হঠাৎ করেই পাওয়া গেছে। মনে হলো, তা এখানে তুলে দেয়া উপকারী হবে।

*'আমার মনে অনেক যন্ত্রণা, অনেক কষ্ট। আর সেগুলো কাঁটা হয়ে বুকের ভিতরে বিদ্ধ হচ্ছে। হৃদয়ের ক্ষতস্থান থেকে তাজা রক্ত ঝরছে। কিন্তু সব যন্ত্রণা আমি নীরবেই সয়ে যাই। কাউকে বুঝতে দেই না। মাঝে মাঝে যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায় তখন আমি আর্তনাদ করে ওঠি। কিন্তু আমার আহত হৃদয়ের আর্তনাদ আমি ছাড়া আর কেউ শুনতে পায় না।*

*আমি তো কারো কোন ক্ষতি করিনি। তবু কেন আমার চারপাশে এত ঈর্ষা ও বিদ্বেষ এবং এত হিংসা ও প্রতিহিংসা! এমন একজন মানুষও কি নেই যে আমাকে একটু সমবেদনা জানাতে পারে এবং পারে কিছু সান্ত্বনা দিতে। আমার যে খুব প্রয়োজন একটু সমবেদনার, সামান্য কিছু সান্ত্বনার! ......*

### লালকালির কাটাচেরা

খসড়া লেখাটিকে লালকালির আঁচড়ে যে কাটাচেরা করেছিলাম তা এরকম ছিলো– *'কিছুদিন ধরে আমার মনে বিভিন্ন রকম যন্ত্রণা। কষ্টের কাঁটাগুলো বুকের ভিতরে বিদ্ধ হচ্ছে, আর তা থেকে তাজা রক্ত ঝরছে। এই রক্তমাখা যন্ত্রণা আমি নীরবেই সয়ে যাই এবং মাঝে মধ্যে আর্তনাদ করে ওঠি। তুমি কি শুনেছো কখনো কারো আহত হৃদয়ের আর্তনাদ!*

*হে আল্লাহ! আমার চারপাশে কেন এত ঈর্ষা, এত বিদ্বেষ, এত হিংসা, এত প্রতিহিংসা! আমি কোথায় পাবো একটু সান্ত্বনা? একটু সমবেদনা? হে আল্লাহ, মানুষের জন্য মানুষের কাছে না আছে কোন সান্ত্বনা, না আছে সামান্য সমবেদনা। হে আল্লাহ, তুমি, তুমি আমাকে দান করো তোমার সঙ্গ এবং তোমার সান্ত্বনা। হে আল্লাহ, তোমার দয়া ও দান কি শুধু নেক বান্দাদের জন্য। গোনাহগার বান্দারা তাহলে যাবে কোথায় হে আল্লাহ!*

এখানে যদি লালকালির কাটাচেরাগুলোর ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা তুলে ধরতাম এবং তুলে ধরতাম যে, একের পর এক পরিবর্তনের ধাপগুলো অতিক্রম করে কীভাবে তা বর্তমান রূপ লাভ করেছে, তাহলে খুব ভালো হতো। এখন সম্ভব হলো না, তবে সুযোগ হলে সামনে এবিষয়ে বিশদ আলোচনা করার ইচ্ছে আছে, যাতে হাতে কলমে তোমাদের দেখাতে পারি যে, একটি লেখা জন্ম লাভ করার পর যত্ন ও পরিচর্যার বিভিন্ন স্তর পার হয়ে কীভাবে চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হয় এবং একজন লেখককে এজন্য কত পরিশ্রম করতে হয়।

---

১। ভালো-এর প্রতিবেশীরূপে নির্মম-এর চেয়ে নিরপেক্ষ শব্দটি বেশী ভালো নয়? নির্মম শব্দটির স্থান শেষে হওয়াই কি ভালো নয়? অর্থাৎ তিনি যদি লিখতেন, 'একজন লেখক যদি বড় হতে চান, তাকে হতেই হবে তার লেখারই সবচে' ভালো, সবচে' নিরপেক্ষ এবং সবচে' নির্মম সমালোচক। আত্মসমালোচনার পথেই ঘটে আরো উত্তরণ, হয় ভালো লেখা থেকে আরো ভালো লেখা।' তাহলে মনে হয় আরো ভালো হতো।

২। এখানে বক্তব্যটির দু'টি অংশ; ভালো লেখকের কাছ থেকে শেখা এবং খারাপ লেখকের কাছ থেকে শেখা। কিন্তু দু'টি অংশে আয়তনগত ভারসাম্য রক্ষিত হয়নি। আরেকটি বাক্যে তিনি যদি বলে দিতেন, ভালো লেখকের লেখা পড়ে কী শেখা যায়, তাহলে বক্তব্যটির শরীর কাঠামো সুন্দর হতো। দ্বিতীয় অংশে তিনটি শেখা-এর একত্রসমাবেশ কিছুটা শ্রুতিকটু। বক্তব্যটি এরকম হলে হয়ত আরো ভালো হতো, 'লেখা শিখতে হয় ভালো লেখকের লেখা পড়ে; তার লেখার সৌন্দর্যগুলো আত্মস্থ করে। খারাপ লেখকের কাছেও শেখার আছে। সবচেয়ে বড় শিক্ষা এই যে, ওই রকম লিখতে নেই।'

৩। আগে ছিলো, 'ছাপা হওয়ার পরও সময়-সুযোগমত বারবার দেখি।' তারপর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে লিখলাম 'ছাপা হওয়ার পরও সময়-সুযোগে দেখি, দেখতে থাকি।' এ পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য ছিলো 'বারবার' শব্দটির পুনরুক্তি দূর করা। তারপর মনে হলো,

'দেখি' শব্দটিও দু'বার ভালো হয় না। তাছাড়া 'সময়-সুযোগে দেখি' কথাটাতে ছন্দপতন আছে। তার চেয়ে ভালো হয় প্রথম বারে 'দেখি' এবং দ্বিতীয় বারে শুধু 'দেখতে থাকি' হলে।

৪। প্রথমে ছিলো, 'তাতে ছাপা লেখায়ও এমন এমন ত্রুটি ধরা পড়ে যে, দস্তুরমত অবাক হই এবং লজ্জা অনুভব করি যে, ...।' এ বক্তব্যে 'ছাপা' শব্দটি তিনবার এসেছে। তাই পরিবর্তন করে লিখলাম, 'তাতে প্রকাশিত লেখায়ও ...। তারপর মনে হলো, প্রকাশিত লেখায় ত্রুটি ধরা পড়ার চেয়ে প্রকাশ পাওয়া ভালো।

'দস্তুরমত অবাক হই' সুন্দর নয়; সঠিক ব্যবহার হলো, 'রীতিমত অবাক হই/দস্তুরমত তাজ্জব হই'। তাতে শব্দের সমশ্রেণিতা রক্ষিত হয়। 'লজ্জা অনুভব করি'-এর চেয়ে মনে হলো, 'লজ্জাবোধ করি' ভালো, তারপর মনে হলো, এখানে সবচে' ভালো হবে, 'লজ্জায় পড়ে যাই'।

৫। তবু শব্দটি এখানে ছিলো না, সান্ত্বনা শব্দটি ভেঙ্গে অর্ধেক নীচে চলে গিয়েছিলো, সেটাকে পুরোপুরো নীচে নেয়ার জন্য তবু শব্দটি যোগ করেছি। তাতে কিন্তু বাক্যটিও আরো সুন্দর হয়েছে!

৬। আগে ছিলো হয়ত লেখাটাই তৈরী হতো না। এখন 'তৈরী'-এর পুনরুক্তি এবং 'ত'-এর আধিক্য দূর হয়েছে। তাছাড়া 'আসতো না'য় এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, লেখা হৃদয়ের জিনিস এবং তা হৃদয় থেকে আসে।

# কোন লেখা সমালোচনার দৃষ্টিতে পড়ার নমুনা

কয়েকদিন আগে দৈনিক ইনকিলাব ধর্ম ও দর্শন বিভাগে একটি লেখা পড়েছিলাম। ভালো লেগেছে। বিষয়বস্তু এবং লেখকের আন্তরিকতা হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। আমার যেমন অভ্যাস, লেখাটি কয়েকবার পড়লাম। প্রথমে বিষয়বস্তুর পাঠক হিসাবে, পরে সাহিত্যের সমালোচক হিসাবে, তারপর কলমের কারিগর হিসাবে। তো এখানে তোমাদের সামনে আমার সেই সমালোচনা ও বিচার-পর্যালোচনাটুকু সংক্ষেপে তুলে ধরছি–

লেখাটির শিরোনাম হলো, *'কালি-কলম দিয়ে নয়, শহীদের তপ্ত খুনে রচিত হয় জীবন্ত জাতির ইতিহাস'*। বেশ আবেদনপূর্ণ শিরোনাম, তবে পরিমার্জনের মাধ্যমে তা আরো সুন্দর, আরো হৃদয়স্পর্শী হতে পারে। যেমন–

(ক) 'কালি-কলম' ও 'শহীদের খুন' অংশদু'টির সুরছন্দ রক্ষিত হয়নি। 'কলমের কালি ও শহীদের খুন' হলে সুন্দর একটি সুরছন্দ সৃষ্টি হয়।

(খ) 'দিয়ে' বাদ দিয়ে যদি বলি, *'কলমের কালিতে নয়, শহীদের তপ্ত খুনে রচিত হয় জীবন্ত জাতির ইতিহাস'* তাহলে সুরছন্দটি আরো মধুর হয়।

(গ) 'খুন'-এর বিশেষণরূপে 'তপ্ত'-এর চেয়ে 'তাজা' শব্দটি অধিকতর উপযোগী বলে মনে হয়। তাছাড়া 'কলম, কালি, শহীদ ও খুন'-এই শব্দগুলোতে কোন যুক্ত বর্ণ নেই। সুতরাং 'তপ্ত'-এর পরিবর্তে 'তাজা' হলে শব্দগুলোর সমশ্রেণিতা অধিকতর রক্ষিত হয়।

(ঘ) খুন দিয়ে রচনা করা হয় না, লেখা হয়। রচনা করতে হলে খুনের পরিবর্তে রক্তের প্রয়োজন।

এবার বাক্যদু'টি পরপর কানে বাজিয়ে পড়ো এবং পার্থক্য অনুভব করো–

০ *কলম-কালি দিয়ে নয়, শহীদের তপ্ত খুনে রচিত হয় জীবন্ত জাতির ইতিহাস*

০০ *কলমের কালিতে নয়, শহীদের তাজা খুনে লেখা হয় জীবন্ত জাতির ইতিহাস*

এখন 'এসো কলম মেরামত করি'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ উপলক্ষে সম্পাদনা করার

আসে এবং পাঠক লেখার ভিতরে প্রবেশ করতে বাড়তি আগ্রহ বোধ করে। যেমন– *'কলমের কালিতে নয়, শহীদের তাজা খুনে'*।

এবার প্রবন্ধটির একটি উদ্ধৃতি দেখো–

*'ইসলামী সমাজ রক্ষায় কোরআন-সুন্নাহবর্ণিত জিহাদী কার্যক্রমের* **বিকল্প নেই।** *দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে মুসলমানদের মানমর্যাদা, স্থিতি ও নিরাপত্তা ইত্যাদি কিছুই জিহাদী কার্যক্রম ছাড়া সংহত হয়নি।*

*জাতির উত্থানের সময়টি থাকে উত্থানের জন্য কঠোর সাধনা তথা জিহাদী সাধনায় মণ্ডিত, আর পতনের বেলা দেখা যায় নৃত্য-গীত, বিলাসিতা ও ভোগের ঘটনায় আকীর্ণ।*

*ইকবালের ভাষায়– 'পৃথিবীর জীবন্ত জাতিসমূহের উত্থান ও পতনের ইতিহাস বলি শোনো, 'শুরুতে দেখবে এর তীর-তরবারি, আর শেষে দেখবে তবলা-সেতার'*

***পর্যালোচনা–***

(ক) এখানে 'বর্ণিত'-এর পরিবর্তে 'নির্দেশিত' শব্দটি ভালো হয়। তদ্রূপ 'জিহাদী কার্যক্রম'-এর পরিবর্তে শুধু 'জিহাদ' যথেষ্ট ছিলো।

(খ) 'মান-মর্যাদা' একসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে: সুতরাং 'স্থিতি-নিরাপত্তা'কেও একত্রে ব্যবহার করলে অধিকতর শ্রুতিমধুর হতো।

(গ) 'ইত্যাদি কিছুই' শব্দদু'টি অপ্রয়োজনীয়। আর 'জিহাদী কার্যক্রম'-এর পরিবর্তে 'জিহাদ ও শাহাদাত' বেশী আবেদনপূর্ণ। এবার পুরো বাক্যটি দেখো–

*'ইসলামী সমাজ রক্ষায় কোরআন-সুন্নাহনির্দেশিত জিহাদের কোন বিকল্প নেই। দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে মুসলমানদের মান-মর্যাদা ও স্থিতি-নিরাপত্তা জিহাদ ও শাহাদাত ছাড়া কখনো সংহত হয়নি।'*

(ঘ) এবার পরবর্তী অংশটি দেখো–

একই বাক্যে দু'বার উত্থান ও সাধনা শব্দদু'টির ব্যবহার শ্রুতিকটু। আর 'সাধনায় মণ্ডিত' এরকম ব্যবহার দেখা যায় না। 'সাধনায় উজ্জীবিত' হতে পারে। আর 'আকীর্ণ' না হয়ে 'কলঙ্কিত' হলে বাক্যের উভয় অংশে কাংক্ষিত সুরছন্দ সৃষ্টি হয়। উত্থানের সময়টিকে বলা হয়েছে সাধনায় মণ্ডিত, কিন্তু পতনের বেলা কোন জিনিসটিকে ভোগের ঘটনায় আকীর্ণ দেখা যায় তা বোঝা গেলো না। তাই বলতে হয়, বাক্যটি সুশৃঙ্খল হয়নি। তার চেয়ে এভাবে বলা যায়–

*'জাতির উত্থানের সময়টি থাকে জিহাদী সাধনায় মণ্ডিত, আর পতনের সময়টি ভোগের ঘটনায় কলঙ্কিত।'*

আরেকটি কথা, নৃত্য-গীত-এর মাঝে যেহেতু 'ও' অব্যয়টি নেই সেহেতু পরবর্তী অংশেও 'ও' অব্যয়টি বাদ দিয়ে 'ভোগ-বিলাসের ঘটনায়' বললে সুন্দর হয়। যেমন–

*'জাতির উত্থানের সময়টি থাকে জিহাদের সাধনায় উজ্জীবিত, আর পতনের সময়টি থাকে নৃত্য-গীত ও ভোগ-বিলাসের ঘটনায় কলঙ্কিত।'*

(ঙ) যেহেতু ইকবালের কবিতাটি উদ্ধৃত হয়নি সেহেতু 'ইকবালের ভাষায়' না বলে বলা ভালো 'ইকবাল বলেছেন'। পক্ষান্তরে 'ইকবালের ভাষায়' লিখলে উদ্ধৃতিসহ তরজমা বাঞ্ছনীয়। মূল কবিতাটি হলো–

'ম্যায়ঁ তুম কো বাতাতা হুঁ তাকদীরে উমাম কেয়া হায়/শামশেরো সিনাঁ আওয়াল, তাঊসো রাবাব আখের।'

মূল কবিতার শব্দসংখ্যা সতেরটি, কিন্তু তরজমায় অপ্রয়োজনে শব্দসংখ্যা স্ফীত হয়েছে, যা দোষের। এখানে শব্দস্ফীতি সহজেই সংযত রাখা যায়। যেমন–

*'আমার কাছে শোনো জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস; শুরুতে তীর-তলোয়ার, শেষে তার তবলা-সেতার।'*

তবলা-সেতার-এর সঙ্গে মিল রক্ষার জন্য 'তীর-তলোয়ার' ভালো, 'তরবারি' নয়। 'জীবন্ত' শব্দটি বাদ যাওয়ার কারণ, জীবন্ত জাতির উত্থান হয়, পতন হয় না; পতনকালে তো জাতি জীবন্ত থাকে না।

'আমার কাছে শোনো'-এর পরিবর্তে বলা যেতে পারে, 'আমি বলছি তোমাকে'; তাতে তরজমাটি অধিকতর মূলানুগ হয়। এখানে মূল থেকে সরে যাওয়ার তেমন প্রয়োজন নেই।০

এবার পুরো সংশোধিত বক্তব্যটিকে মূল লেখাটার সঙ্গে তুলনা করে পড়ো–

*'ইসলামী সমাজ গড়তে হলে এবং তা রক্ষা করতে হলে কোরআন-সুন্নাহনির্দেশিত জিহাদ ছাড়া কোন বিকল্প নেই। সুদীর্ঘ দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে মুসলিম উম্মাহর মান-মর্যাদা ও স্থিতি-নিরাপত্তা জিহাদ ও শাহাদাত ছাড়া কখনো সংহত হয়নি। আল্লামা ইকবালের ভাষায় (তরজমা)–*

*'আমি বলছি তোমাকে জাতির উত্থান-পতনের কাহিনী/ শুরুতে তীর-তলোয়ার, শেষে তার তবলা-সেতার।'*

*মূল লেখায় ছিলো, 'জাতির উত্থানের সময়টি থাকে কঠোর সাধনা তথা জিহাদী সাধনায় মণ্ডিত, আর পতনের বেলা দেখা যায়, নৃত্য-গীত, বিলাসিতা ও ভোগের ঘটনায় আকীর্ণ।'*

মূল লেখার কাছাকাছি থেকে সম্পাদনা করার পর যে রূপটি দাঁড়িয়েছে তা হলো–

*'জাতির উত্থানের সময়টি থাকে জিহাদের সাধনায় উজ্জীবিত, আর পতনের সময়টি থাকে নৃত্য-গীত ও ভোগ-বিলাসের ঘটনায় কলঙ্কিত।'*

পূর্ণাঙ্গ সম্পাদনার পর যে রূপটি দাঁড়িয়েছে তা হলো–

*'এটি স্বীকৃত সত্য যে, জাতির উত্থানকাল হয় কঠিন সংগ্রাম-সাধনা ও জিহাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত, আর পতনকাল হয় নৃত্য-গীত ও ভোগ-বিলাসের কলঙ্কে কলঙ্কিত (কলঙ্ককালিমায় লিপ্ত)।*

এখানে পূর্ণাঙ্গ সম্পাদিত রূপটি সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরছি।

(ক) উত্থানকাল ও পতনকাল হচ্ছে ইতিহাসের পারিভাষিক শব্দ। এখানে পারিভাষিক আভিজাত্য ও ভাবগাম্ভীর্য রক্ষিত হয়েছে। আর বক্তব্যের 'উদ্বোধনিকা' হিসাবে 'এটি স্বীকৃত সত্য যে,' অংশটি যুক্ত হয়েছে।

(খ) 'সংগ্রাম-সাধনা ও জিহাদী প্রেরণা'-এখানে সুন্দর সুরছন্দ সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনা দ্বারা কলঙ্কিত হওয়া, বিষয়টি স্পষ্ট নয়; তাই *'ভোগবিলাসের কলঙ্কে কলঙ্কিত' লেখা হয়েছে।*

আলোচ্য প্রবন্ধের আরেকটি উদাহরণ দেখো–

*'মুসলমানদের উপর যখন ভিনদেশী, ভিনধর্মী উপনিবেশবাদের আগ্রাসনের রাহু বিস্তৃত হয় তখন এর মোকাবেলায় যারা এগিয়ে আসেন তাদের উপর দখলদারদের পক্ষ থেকে দেয়া হয় সন্ত্রাসী, ডাকাত, বিশৃঙ্খলাবাদী, সমাজবিরোধী, আর বিদ্রোহী নামের অপবাদ। অথচ পবিত্র ইসলামের সনাতন রীতি-ঐতিহ্যে যে কোন অন্যায়, অবিচার ও খোদাদ্রোহিতার প্রতিবিধানে সর্বাত্মক জিহাদই হচ্ছে সর্বোত্তম ধন্বন্তরি। মুসলিম জাতির উপর অর্পিত সকল বিপদ ও অত্যাচার মুসলমানদের নিষ্ক্রিয়তারই ফসল। ইসলামী দাওয়াত ও জিহাদের আদর্শ ত্যাগই একটি জাতির ইতিহাস থেকে ইসলাম বিলুপ্তির মূল কারণ।*

*জিহাদী যুবকদের রক্ত সিঞ্চনেই জীবন্ত হয় জাতির পুষ্পকানন, যার ফলে[১] অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে তাদের খতম করা হয়, নির্মূল করা হয়, উৎখাত করা হয়। কিন্তু মুনাফিকরা বুঝলো না,[২] সামান্য রুটি-রুজির লোভে তারা মুসলিম উম্মাহর কত বড় সর্বনাশ রচনা করছে।'*

উপরের উদ্ধৃতি সম্পর্কে আমার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা এই–

(ক) ভিনদেশী-এর ব্যবহার আছে, ভিনধর্মী-এর ব্যবহার নেই। ভিনদেশী ও বিধর্মী হতে পারে। ভিনধর্মী মানে অন্যধর্মের মানুষ, পক্ষান্তরে বিধর্মী শব্দটিতে নিন্দা ও অসন্তোষ রয়েছে, যা এখানে উদ্দেশ্য।

আগ্রাসনের রাহু হয় না, থাবা হয়; তদ্রূপ রাহুর বিস্তার হয় না, রাহুর গ্রাস হয়। শত্রুরা আমাদের সন্ত্রাসী বলে, ডাকাত বলে না এবং বিশৃঙ্খলাবাদী-এর মত হালকা শব্দও বলে না। তাছাড়া আমাদের বিরুদ্ধে তাদের অতি 'পেয়ারের' শব্দ হলো মৌলবাদী ও জঙ্গিবাদী। সুতরাং ডাকাত ও বিশৃঙ্খলাবাদী-এর পরিবর্তে এ শব্দদু'টি আসা উচিত ছিলো। আর বিদ্রোহী শব্দটি অপবাদমূলক নয়, তাই বিদ্রোহী কবি বলা হয়। সুতরাং এ শব্দটি থাকার প্রয়োজন নেই। এখন পুরো বাক্যটি আমার মতে এরূপ হলে ভালো হতো–

*'মুসলমানদের উপর ভিনদেশী ও বিধর্মী উপনিবেশবাদ যখন আগ্রাসনের থাবা বিস্তার করে তখন তার মোকাবেলায় যারা রুখে দাঁড়ান তাদের তারা সন্ত্রাসী, মৌলবাদী ও রাষ্ট্রদ্রোহী বলে অপবাদ দেয়।'*

(খ) এখানে ইসলামের পূর্বে 'পবিত্র' বিশেষণ অপ্রয়োজনীয়, আর 'সনাতন' হচ্ছে হিন্দুশাস্ত্রের শব্দ, সুতরাং ইসলামের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার না হওয়াই ভালো।

জিহাদ ইসলামের রীতি-ঐতিহ্য নয়, অবশ্যপালনীয় বিধান। সর্বোপরি 'ধন্বন্তরি' শব্দটির ব্যবহার এখানে অসুন্দর ও অসঙ্গত। কারণ এটি 'হিন্দুশব্দ'। ধন্বন্তরি অর্থ দেবচিকিৎসক, যিনি সমুদ্র মন্থনে সুধাহস্তে সমুদ্র হতে উত্থিত হন। ধন্বন্তরি-এর পরিবর্তে এখানে চিকিৎসা, প্রতিকার, সমাধান ইত্যাদি যে কোন শব্দ হতে পারে।

(গ) নিষ্ক্রিয়তার ফসল বলে না, ফল বলে। কারণ ফসল হয় কোন কর্মের, কর্মহীনতার নয়। আর 'বিপদ-অত্যাচার', এই সংযুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়; 'বিপদ-মুছিবত' এবং 'যুলুম-অত্যাচার' হতে পারে।

দায়িত্ব বা কর্তব্য অর্পিত হয়, বিপদ-এর ক্ষেত্রে অর্পিত-এর ব্যবহার নেই, আপততি, বা আরোপিত-এর ব্যবহার রয়েছে।

(ঘ) 'ইসলামবিলুপ্তি' কথাটা কেমন? বরং বলা যায়, *'জিহাদের আদর্শ ত্যাগ করাই জাতির জীবনে মহাবিপর্যয় নেমে আসার মূল কারণ।'*

(ঙ) *'জিহাদী যুবকদের রক্তসিঞ্চনেই জীবন্ত হয় জাতির পুষ্পকানন।'* বাক্যটি সুন্দর, কিন্তু শব্দপ্রয়োগে ত্রুটি রয়েছে। যেমন, বাগান, উদ্যান, বা কানন জীবন্ত হয় না, সজীব হয়। আর জিহাদ তো শুধু যুবকেরাই করে না, প্রবীণ ও বৃদ্ধরাও করে। তাই এভাবে বলা ভালো, *'মুজাহিদীনের রক্তসিঞ্চনেই সজীব হয় জাতির পুষ্পকানন।*

(চ) অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে নয়, অতি নিষ্ঠুরভাবে। আর 'খতম করা হয়, নির্মূল করা হয়, উৎখাত করা হয়'– পরপর তিনটি বাক্যের পরিবর্তে যে কোন একটি বাক্যই যথেষ্ট। কিংবা বলা যায়, 'খতম ও নির্মূল করা হয়'।

(ছ) রচনা শব্দটি সাধারণত ভালো ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তাই সর্বনাশ রচনা করা হয় না, বরং সর্বনাশ করা হয়, বা ডেকে আনা হয়। সর্বনাশ সাধন করাও বলা হয়। কল্যাণ ও সর্বনাশ, উভয় ক্ষেত্রেই সাধন করা-এর ব্যবহার রয়েছে।

রুটি-রুজির চেষ্টা তো ভালো কাজ; সুতরাং রুটি-রুজির লোভ হয় না, হালুয়া-রুটির লোভ হয়।

মোটকথা, একটি লেখার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সঠিক ও বিশুদ্ধ শব্দপ্রয়োগের বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট যত্নবান হতে হবে; বাক্যগঠন সম্পর্কেও সচেতনতা ও সতর্কতা অবলম্ব করতে হবে। এবার পুরো সংশোধিত বাক্যগুলো মূলের সঙ্গে তুলনা করে পড়ো–

'কোন মুসলিম জনপদের উপর৩ ভিনদেশী ও বিধর্মী উপনিবেশবাদ যখন আগ্রাসনের থাবা বিস্তার করে, তার মোকাবেলায় যারা রুখে দাঁড়ান তাদের তারা সন্ত্রাসবাদী, মৌলবাদী ও রাষ্ট্রদ্রোহী বলে অপবাদ দেয়। অথচ ইসলামের শাশ্বত বিধানে যে কোন অন্যায়, অবিচার ও খোদাদ্রোহিতার মোকাবেলায় সর্বাত্মক

জিহাদই হচ্ছে সত্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ। মুসলিম জাতির উপর আপতিত সকল বিপদ-মুছিবত এবং যুলুম-অত্যাচার, তাদের কর্মবিমুখতারই ফল। এবং জিহাদের আদেশ ত্যাগ করাই হচ্ছে জাতির জীবনে মহাবিপর্যয় নেমে আসার মূল কারণ। মুজাহিদীনের রক্তসিঞ্চনেই সজীব হয় জাতির পুষ্পকানন। শত্রুরা এটা জানে, তাই পৃথিবীর সব দেশেই মুজাহিদীনকে খতম করার জন্য নিষ্ঠুরতম হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। আর একদল মুনাফিক সবসময় শত্রুর সাথে যোগ দেয়। তারা বুঝতে পারে না, হালুয়া-রুটির লোভে তারা উম্মাহর কত বড় সর্বনাশ ডেকে আনে।'

মূল লেখার কাছাকাছি রেখে উপরের প্রাথমিক সম্পাদনাটি করা হয়েছে। এবার নীচের পূর্ণাঙ্গ সম্পাদনাটি দেখো–

*'মুসলিম জাতির জীবনে যত বিপদ, দুর্যোগ ও বিপর্যয়, তা জিহাদ থেকে তাদের দূরে সরে যাওয়ারই ফল। সুতরাং জিহাদের পথে ফিরে আসাই হলো তাদের মুক্তির একমাত্র উপায়। আর একারণেই উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ যখন কোন মুসলিম দেশের উপর আগ্রাসনের থাবা বিস্তার করে তখন তারা জিহাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করে এবং যারা জানবায মুজাহিদীন তাদের দমন করার জন্য সন্ত্রাসবাদ, মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদের অপবাদ আরোপ করে। কারণ তারা জানে, একমাত্র জিহাদই পারে বিপর্যস্ত উম্মাহর জীবনে প্রাণের স্পন্দন ফিরিয়ে আনতে। দুশমন যখন পাশবিক উল্লাসে মুজাহিদদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন একদল মুনাফিক যোগ দেয় তাদের সঙ্গে। বস্তুত উম্মাহর ইতিহাসে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত মুনাফিকের অভাব হয়নি কখনো। নিছক হালুয়া-রুটির লোভে জেনেশুনেই তারা উম্মাহর জীবনে চরম সর্বনাশ ডেকে আনে; যদিও শেষ পর্যন্ত তারা নিজেরাও সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা পায় না।'*

এখানে পূর্ণাঙ্গ সম্পাদিত রূপটি সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা তুলে ধরছি–

(ক) মুসলিম উম্মাহর বিপর্যয়ের কারণ ও প্রতিকার নির্দেশ করে বক্তব্যটি শুরু হয়েছে, যাতে শত্রুর জিহাদভীতির রহস্য বোঝা যায়। মূল লেখায় এটি এসেছে মধ্যবর্তী অংশে। আশা করি, তুমি বুঝতে পারছো যে, বর্তমান বিন্যাসটি অধিকতর উপযোগী।

বিপদ-মুছিবত ও যুলুম-নির্যাতন, এগুলো স্থানীয় শাসকদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দ। বিশ্বপর্যায়ের জন্য বিপদ, দুর্যোগ ও বিপর্যয় হচ্ছে উপযোগী শব্দ।

(খ) উপনিবেশবাদের মত সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে আলোচ্যক্ষেত্রের পারিভাষিক শব্দ। তাই ভিনদেশী ও বিধর্মী-এর পরিবর্তে পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ যে বিদেশী ও বিধর্মী হবে তা তো বলাই বাহুল্য। সুতরাং এজন্য আলাদা শব্দ ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই; বিদেশিতা ও বিধর্মিতার গন্ধ সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ থেকে এমনিতেই পাওয়া যাবে।

(গ) মূল লেখায় এবং প্রাথমিক সম্পাদনায় যে বাক্যগুলো বড় ছিলো, পূর্ণাঙ্গ সম্পাদনায় সেগুলোকে একাধিক ছোট বাক্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

(ঘ) 'সজীব হয় জাতির পুষ্পকানন' এটি কাব্যিক উপমা, জিহাদী ক্ষেত্রের উপমা নয়। তাই উপমা পরিবর্তন করা হয়েছে।

(ঙ) 'উম্মাহর ইতিহাসে ... মুনাফিকদের অভাব হয়নি' সংযোজন করে প্রকৃতপক্ষে উম্মাহর ইতিহাসের মর্মান্তিক সারসংক্ষেপ যেন তুলে আনা হয়েছে।

'মুনাফিকরা বুঝতে পারে না' বললে তাদের অপরাধ অনেকটা লাঘব হয়ে যায়। অথচ তা বাস্তবতারও বিপরীত। তাই সম্পাদনায় বলা হয়েছে, মুনাফিকরা যা করে জেনেশুনেই করে।

শেষ অংশে মুনাফিকদের পরিণতির কথাও তুলে ধরা হয়েছে, যাতে মুনাফিকরা সাবধান হয় এবং মুমিনদের মনোবল দুর্বল না হয়।

আমাদের এ দীর্ঘ আলোচনা ও সমালোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমার মধ্যে এমন যোগ্যতার স্ফুরণ ঘটানো, যাতে কোন একটি লেখা, সেটা নিজের হোক, বা অন্যের, তুমি সমালোচকের এবং বিচারকের দৃষ্টিতে পড়তে পারো। সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এখন তুমি যে কোন একটি লেখা নাও এবং আলোচ্য সমালোচনাটির অনুকরণে ঐ লেখাটির, বা তার অংশবিশেষের উপর একটি সমালোচনা লেখো। আল্লাহ তোমাকে তাওফীক দান করুন, আমীন।

---

১। 'যার ফলে' দ্বারা প্রথমেই এ ধারণা আসতে পারে যে, জিহাদী যুবকদের রক্তসিঞ্চনে জাতির পুষ্পকানন জীবন্ত হওয়ার ফলে; অথচ লেখক বলতে চাচ্ছেন, জিহাদের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কে শত্রুরা অবগত হওয়ার ফলে। এ ভুল ধারণার সুযোগ রহিত করার জন্য সামনে আমার সম্পাদনাটি দেখো।

২। 'কিন্তু মুনাফিকরা বুঝলো না' কথাটা অসংলগ্ন ও খাপছাড়া মনে হচ্ছে। কারণ মুনাফিকদের কোন ভূমিকার কথা আগে উল্লেখ করা হয়নি। এ ত্রুটিটা দূর করার জন্য আমার সম্পাদনাটুকু দেখো।

৩। আগে ছিলো, 'মুসলমানদের উপর'। যখন দেখলাম, বিস্তার শব্দটি ভেঙ্গে আছে। তখন ভাবতে শুরু করলাম, কোথায় কী করা যায়? তখন মুসলমানদের উপর-এর স্থানে লিখলাম, 'মুসলিম জনপদের উপর'। বিস্তার শব্দটি ভেঙ্গে না গেলে হয়ত এই সম্পাদনার কথা মনে আসতো না। কিন্তু চিন্তা করে বলো তো, সম্পাদনাটির প্রয়োজন ছিলো কি না!

বারবার একথাটি বলে আমি আসলে তোমাদের বোঝাতে চাচ্ছি যে, লেখা সম্পাদনার এটাও একটা কার্যকর কৌশল। (এসম্পর্কে অন্যত্র টীকায় আলোচনা রয়েছে।)

০ আগে ছিলো প্রয়োজনীয়তা নেই। আমার এক সঙ্গী পরোক্ষভাবে পরামর্শ দিলেন 'প্রয়োজন' লেখার জন্য। তাকে সম্মান জানিয়ে তাই করেছি। এমনিতে আরবীতে একটি নিয়ম আছে, বর্ণাধিক্য অর্থাধিক্য প্রমাণ করে, (সব ভাষায় এটা হয়)। সে হিসাবে এখানে অস্বীকৃতির জোরালোতা বুঝাতে চাওয়া হয়েছিলো। তাছাড়া পূর্ববর্তী তেমন-এর পরে প্রয়োজন-এর উচ্চারণ কিছুটা কঠিন।

# একটি সম্পাদকীয়ঃ কিছু সম্পাদনা

*'আগুনের হরফে লিখে দিতে চাই'* শিরোনামে পুষ্পের একটি সম্পাদকীয়-এর প্রথম থেকে কিছু অংশ নীচে তুলে দেয়া হলো–

*'আমি অক্ষম, আমি ভীরু, বুযদিল। আমার দিলে নেই মুমিনের হিম্মত, আমার বাযুতে নেই মুজাহিদের কুওয়ত। তাই আমি গোলাবারুদের অস্ত্র তুলে নিতে পারিনি, যা আমাকে পৌঁছে দেবে শাহাদাতের দুয়ারে এবং জান্নাতের বাগানে। আমি হাযির হতে পারিনি আফগানিস্তানে জিহাদের ময়দানে, যেখানে ছালীব-হেলালের লড়াই শুরু হয়েছে; রক্তের কালিতে তাকদীর যেখানে নতুন শতাব্দীর ফায়ছালা লিখে দিয়েছে এবং ইয্যতের মওত যেখানে যিন্দেগির পায়গাম নিয়ে হাযির হয়েছে।*

*আমি ভীরু, বুযদিল। তলোয়ারের ছায়ায় বাঁচে যারা, তলোয়ারের আগায় মরে যারা এবং তীরের ফলায় মানচিত্র আঁকে যারা, সেই উম্মাহর আমি এক জীবন্ত কলঙ্ক। তাই তো উম্মাহর ইয্যত-আযাদির জন্য হাসিমুখে যারা জান কোরবান করছে, মাথায় কাফন বেঁধে মৃত্যুর পিছনে ধাওয়া করছে, সেই কাফেলায় আমি নেই; আমার হাতে জিহাদের ঝাণ্ডা নেই।'*

উদ্ধৃতিটি মনোযোগসহ কয়েকবার পড়ো। বুঝে বুঝে পড়ো তারপর নীচের আলোচনার সাথে মিলিয়ে দেখো।

(ক) এখানে প্রথম বাক্যটি দু'শব্দের, আর পরবর্তী বাক্যটি তিন শব্দের। একাধিক বাক্যের বিন্যাসের ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক নিয়ম, অর্থাৎ আগে ছোট বাক্য, পরে বড় বাক্য। এখানে বিপরীত বিন্যাস হলে, অর্থাৎ আগে ছোট বাক্য, পরে বড় বাক্য হলে অসুন্দর হতো। যেমন, *'আমি ভীরু, বুযদিল, আমি অক্ষম।'*

একই কথা *'ভীরু ও বুযদিল'* শব্দদু'টির ক্ষেত্রে। ছোট ও সহজ উচ্চারণের শব্দটি আগে এবং বড় ও অপেক্ষাকৃত কঠিন উচ্চারণের শব্দটি পরে এসেছে। যদি বলা হতো, *'আমি বুযদিল, ভীরু'* তাহলে অসুন্দর হতো। তাছাড়া প্রথম শব্দের 'রু' এবং দ্বিতীয় শব্দের 'বু'-এর সম্মিলিত 'রুবু' উচ্চারণে যে মসৃণতা রয়েছে তা 'ল্' ও 'ভী'-এর যুক্ত উচ্চারণে নেই। বাক্যস্থ শব্দগুলোর চয়ন ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে এসব বিষয়ও গভীরভাবে চিন্তা করতে হয়।

(খ) *'আমার দিলে নেই মুমিনের হিম্মত, আমার বাযুতে নেই মুজাহিদের কুওয়ত।'* এখানে উভয় বাক্যের শব্দসংখ্যা সমান। এবং বাক্যদু'টির শব্দে শব্দেও রয়েছে নিজস্ব একটি সুরছন্দ। যেমন–

০ আমার দিলে নেই ০০ আমার বাযুতে নেই।

০ মুমিনের হিম্মত ০০ মুজাহিদের কুওয়ত।

বাক্যদু'টিকে অন্যভাবে লিখলে সুরছন্দ ক্ষুণ্ন হতো। তুমি বিভিন্নভাবে নাড়াচাড়া করে দেখো।১

(গ) *'তাই আমি গোলাবারুদের অস্ত্র তুলে নিতে পারিনি।'* প্রথমে লিখেছিলাম, 'তাই আমি হাতে অস্ত্র তুলে নিতে পারিনি।' হাতে অস্ত্র তুলে নেয়া, এটাই হলো স্বাভাবিক ব্যবহার, কিন্তু পরে ভাবলাম, কলমের অস্ত্র তো আমার হাতে আছে! তো সেদিকে ইঙ্গিত করার জন্য *'গোলাবারুদের'* কথাটা যোগ করলাম। অর্থাৎ কলমের অস্ত্র হাতে নিলেও গোলাবারুদের অস্ত্র হাতে নিতে পারিনি, অথচ এখন গোলা-বারুদের অস্ত্র নেয়ারই প্রয়োজন ছিলো। তাছাড়া *'গোলাবারুদের অস্ত্র'* কথাটিতে নতুনত্ব আছে এবং ভিন্ন একটি জাযবার প্রকাশ আছে। এখন আর *'হাতে'* কথাটির বিশেষ প্রয়োজন নেই বিবেচনা করে তা বাদ দেয়া হয়েছে।

(ঘ) *'যা আমাকে পৌঁছে দেবে শাহাদাতের দুয়ারে এবং জান্নাতের বাগানে।'* এখানে এবং-এর আগে ও পরে শব্দসংখ্যার সমতা যেমন রক্ষিত হয়েছে তেমনি তারকীবের অভিন্নতাও রক্ষা করা হয়েছে। অর্থাৎ উভয়টি হচ্ছে ইযাফাতের তারকীব। এ ধরনের শব্দসাম্য ও অভিন্ন তারকীব দ্বারা শব্দগত সৌন্দর্য অর্জিত হয়। যদি লেখা হতো, *'চিরস্থায়ী জান্নাতের দুয়ারে'* তাহলে উভয় পার্শ্বের শব্দসাম্য ক্ষুণ্ন হতো। জান্নাত যে চিরস্থায়ী তা তো জানা কথা, সুতরাং চিরস্থায়ী শব্দটির উল্লেখ এখানে অপরিহার্য নয়। অবশ্য কখনো কখনো বিশেষণ উল্লেখ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন–

'যদি বুকের তাজা খুন ঢেলে দিতে পারো আল্লাহর রাহে,/ তাহলে তুমি সোজা পৌঁছে যাবে চিরস্থায়ী জান্নাতের গুলশানে।'

বাক্যটি বড় বড় দু'টি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে নয়টি শব্দ। দ্বিতীয় পর্বে 'চিরস্থায়ী' না থাকলে শব্দসংখ্যা হয় সাতটি। তাতে আবৃত্তির সৌন্দর্য ক্ষুণ্ন হয়। পক্ষান্তরে 'চিরস্থায়ী' শব্দটিসহ পর্ববিভক্তিটি সুন্দর হয়। দ্বিতীয় পর্বে একটি শব্দ কম হলেও 'চিরস্থায়ী' শব্দটি একটু বড় হওয়ার কারণে আবৃত্তিতে সমতা এসে যায়।

আগের বাক্যটিতে ফিরে যাই–

*'যা আমাকে পৌঁছে দেবে শাহাদাতের দুয়ারে এবং জান্নাতের বাগানে।'* এখানে একটি জ্যামিতিক মাপ আছে। *'যা আমাকে পৌঁছে দেবে'* এটা হলো মূল কাণ্ড। এখান থেকে সমান দু'টি শাখা গিয়েছে দু'দিকে একটি হলো *'শাহাদাতের দুয়ারে'*, অন্যটি *'জান্নাতের বাগানে'*। এধরনের বিভিন্ন জ্যামিতিক মাপ বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। কখনো সুযোগ হলে বাক্যের জ্যামিতিক মাপ ও পর্ববিভক্তি সম্পর্কে আলাদা আলোচনা করার ইচ্ছে আছে।

আরেকটি কথা, *'শাহাদাতের, জান্নাতের, দুয়ারে, বাগানে*– এ শব্দগুলোর মধ্যে একটি সুরছন্দ আছে। *'জান্নাতের বাগিচায়'* লিখলে কোন অসুবিধা নেই, তবে সুরছন্দ ক্ষুণ্ন হয়।

*'জান্নাতের উদ্যানে'* লিখলে সুরছন্দ কিছুটা বহাল থাকে, কিন্তু শব্দের সমশ্রেণিতা নষ্ট হয়। কেননা জান্নাত ও উদ্যান এবং স্বর্গ ও বাগিচা বা বাগান একশ্রেণির শব্দ নয়, অথচ বাক্যস্থ শব্দগুলোর সমশ্রেণিতা রক্ষা করা সমীচীন। এভাবে অনেক সময় ধরে চিন্তা-ভাবনা করে শব্দচয়ন করা হয়েছে এবার পুরো বাক্যটি পড়ো–

*'তাই আমি তুলে নিতে পারিনি গোলাবারুদের অস্ত্র, যা আমাকে পৌঁছে দেবে শাহাদাতের দুয়ারে এবং জান্নাতের বাগানে।'*

*তুলে নিতে পারিনি* এবং *পৌঁছে দেবে*– এ অংশদু'টি আগে আনার দ্বারা যে গতিময়তা সৃষ্টি হয়েছে তা আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছো। আবেগের প্রকাশের জন্য এই গতিময়তার প্রয়োজন ছিলো। এ অংশটি পরে এনে একবার পড়ে দেখো,

*'তাই আমি গোলাবারুদের অস্ত্র তুলে নিতে পারিনি, যা আমাকে শাহাদাতের দুয়ারে এবং জান্নাতের বাগানে পৌঁছে দেবে।'*

(ঙ) *'আমি হাযির হতে পারিনি আফগানিস্তানের জিহাদের ময়দানে, যেখানে ছালীব-হিলালের লড়াই শুরু হয়েছে।'*

প্রথমে লিখেছিলাম, *'আমি হাযির হতে পারিনি আফগানিস্তানের জিহাদে।'* এটি ছিলো একপর্বের বাক্য। পক্ষান্তরে বর্তমান বাক্যটি হচ্ছে দু'পর্বের এবং তা বেশী সুন্দর। বাক্যটি এমনও হতে পারে, 'আমি হাযির হতে পারিনি আফগানে জিহাদের ময়দানে'। এতে বাক্যের শেষ তিনটি শব্দের আকৃতি কাছাকাছি হয়, কিন্তু সমস্যা

'ছালীব' খৃস্টানদের এবং 'হিলাল' হচ্ছে মুসলমানদের জাতীয় প্রতীক। দুই জাতির লড়াই বোঝানোর জন্য উভয়ের প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে। এতে রয়েছে নতুনত্ব ও ভিন্ন আবেদন। যেমন, লোকেরা নৌকা ও ধানের শীষের লড়াই বলে। (এ উদাহরণ শুধু বিষয়টি বোঝার জন্য।)

ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় কিছু পত্রিকা লিখতো 'ইরান-ইরাক যুদ্ধ', অর্থাৎ তারা যুদ্ধের জন্য ইরানকে দায়ী করতো, আর যারা ইরাককে দায়ী মনে করতো তারা লিখতো 'ইরাক-ইরান যুদ্ধ। এটি খুব সূক্ষ্ম বিষয়। এখানে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই *'হিলাল–ছালীব'* না লিখে লেখা হয়েছে *'ছালীব-হেলালের লড়াই'*। আর যুদ্ধের পরিবর্তে লড়াই ব্যবহার করা হয়েছে শব্দের সমশ্রেণিতার রক্ষা করার জন্য।

(চ) *'রক্তের কালিতে তাকদীর যেখানে নতুন শতাব্দীর ফায়ছালা লিখে দিয়েছে এবং ইয্‌যতের মওত যেখানে যিন্দেগির পায়গাম নিয়ে হাযির হয়েছে।'*

আশা করি, বাক্যটির ছন্দময়তা তুমি অনুভব করছো। *'নতুন শতাব্দীর'* কথাটা অনেক চিন্তা করেই লেখা হয়েছিলো, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, শতাব্দী শব্দটা *তাকদীর, ফায়ছালা, ইয্‌যতের মওত, যিন্দেগির পায়গাম*– এগুলোর সমশ্রেণীর নয়।

তাছাড়া *'যেখানে নতুন শতাব্দীর'* এবং *'যেখানে যিন্দেগির'*– এদুয়ের মধ্যে শব্দসংখ্যা কমবেশী হয়েছে। তাই সবদিক বিবেচনা করে এখন মনে হচ্ছে, 'নতুন' শব্দটি বাদ দেয়া হলে এবং 'শতাব্দীর'-এর পরিবর্তে 'আযাদীর' লেখা হলে ভালো হতো। এবার পুরো বাক্যটি পড়ে দেখো–

*'রক্তের কালিতে তাকদীর যেখানে আযাদীর ফায়ছালা লিখে দিয়েছে এবং ইয্‌যতের মওত যেখানে যিন্দেগির পায়গাম নিয়ে হাযির হয়েছে।'*

রক্ত শব্দটি যদিও তাকদীর, আযাদী, যিন্দেগি ইত্যাদির সমশ্রেণীর নয়, কিন্তু কালির সঙ্গে তার গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, তাই 'খুনের কালি' লেখার প্রয়োজন হয়নি।

(ছ) পরবর্তীতে দেখো, উম্মাহর তিনটি গুণ বলা হয়েছে; ০ তলোয়ারের ছায়ায় বাঁচে যারা ০০ তলোয়ারের আগায় মরে যারা ০০০ তীরের ফলায় মানচিত্র আঁকে যারা

এখানে তলোয়ার-এর পুনরুক্তি শ্রুতিকটু, কিন্তু উপযুক্ত কোন তৃতীয় অস্ত্র খুঁজে না পেয়ে এই শ্রুতিকটুতা মেনে নিয়েছিলাম। তাছাড়া 'ছায়ায়, আগায়, ফলায়, এ শব্দগুলোর মধ্যে তখন সুরছন্দের মধুরতা অনুভব করেছিলাম, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে–

০ 'তলোয়ারের ছায়া' কথাটি যত সুন্দর, 'তলোয়ারের আগা' কথাটা তেমন নয়।

০০ 'বাঁচে' গ্রহণযোগ্য হলেও 'মরে' শব্দটার শরীরে যেন তুচ্ছতার গন্ধ রয়েছে।

০০০ বাঁচে ও মরে-এর সঙ্গে 'মানচিত্র আঁকে' কথাটা সুরছন্দ ও ভাবগত দিক থেকে মানানসই হচ্ছে না।

অনেক চিন্তা-ভাবনার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, এই ক্রটিগুলো দূর হতে পারে যদি তিনটির পরিবর্তে দু'টি গুণ এভাবে উল্লেখ করা হয়-

০ তলোয়ারের ছায়ায় জীবন কাটায় যারা এবং তীরের ফলায় মানচিত্র আঁকে যারা (সেই উম্মাহর আমি এক জীবন্ত কলঙ্ক।)

সামনেও রয়েছে এরকম দু'টি যুগলবাক্য। যেমন-

০ হাসিমুখে যারা জান কোরবান করছে

০০ মাথায় কাফন বেঁধে মৃত্যুর পিছনে ধাওয়া করছে

০ আমি সেই কাফেলায় নেই

০০ আমার হাতে জিহাদের ঝাণ্ডা নেই।২

এভাবে এখন পুরো বক্তব্যটি তিনটি যুগল বাক্যের কাঠামোতে উপস্থাপিত হয়েছে, অথচ পুষ্পে যেভাবে ছাপা হয়েছে তাতে প্রথম অংশে রয়েছে তিনটি বাক্য।

মাথায় কাফন বেঁধে মৃত্যুর পিছনে ধাওয়া করা-এর কল্পরূপটি আশা করি, তোমার মনে রেখাপাত করবে। এবাক্যটি কিন্তু প্রথম চিন্তায় কলমের ডগায় আসেনি, তৃতীয় দফা কাটাচেরা ও সম্পাদনার সময় এসেছে। এধরনের বাক্য হয়ত কোথাও পড়েছি। দেমাগে তা সঞ্চিত ছিলো। যথাসময়ে দেমাগ তা সরবরাহ করেছে। এপ্রসঙ্গে আমি একটি কথা বলে থাকি, 'উন্নত লেখার জন্য প্রধান শর্ত হলো সঞ্চয় ও সরবরাহ। অর্থাৎ নিয়মিত পঠন ও অধ্যয়নের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত সঞ্চয় গড়ে তোলবে, যেন প্রয়োজনের সময় মস্তিষ্ক তোমার কলমকে ভাব ও ভাষা সরবরাহ করতে পারে। লেখার অনুশীলন যত বেশী হবে, মস্তিষ্ক থেকে ভাব ও ভাষার সরবরাহ তত সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত হবে।

দেখো, যে খুঁতগুলোর কথা এখানে আলোচনা করলাম, অনেক কাটাচেরা ও সম্পাদনার পরও সেগুলো কিন্তু আগে আমার নযরে আসেনি। ছাপা হয়ে আসার পর আবার যখন পড়লাম, তখন নযরে পড়লো।৩

এভাবে কঠোর সমালোচকের দৃষ্টিতে নিজের বর্তমান ও বিগত লেখাগুলোর যতই পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার-পর্যালোচনা করি ততই নতুন নতুন খুঁত বের হয় এবং নতুন নতুন সৌন্দর্য সৃষ্ট হয়।

বারবার যে কথাটি বলি সেটি এখানে আবার বলছি, লেখা যখন জন্মগ্রহণ করে তখন যা মনে আসে এবং কলম থেকে যেভাবে বের হয়ে আসে সেটাই লিখে ফেলতে হয়। তখন শব্দসৌন্দর্য ও ভাষাসৌকর্য সম্পর্কে এত কিছু ভাবার সুযোগ নেই, ভাবা উচিতও নয়। প্রথমে শুধু 'লেখাশিশু'র জন্ম হতে দাও; তারপর তোমার সময় ও চিন্তার সবটুকু সামর্থ্য নিযুক্ত করো শিশুটির যত্ন ও পরিচর্যার পিছনে,

যেমন করে একজন মমতাময়ী মা; এবং যত পারো কাটাচেরা করো, যেমন করে একজন দরদী চিকিৎসক। তাতে ধীরে ধীরে লেখাটি পরিপুষ্ট ও সুসমৃদ্ধ হতে থাকবে এবং দেহকাঠামো ও ভাষাসৌন্দর্য উভয় দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠবে, ইনশাআল্লাহ।

হয়ত একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার বলা হচ্ছে, কিন্তু কী করবো বলো, তোমরা যে শুনতে চাও না, বুঝতে চেষ্টা করো না! অন্তত তোমাদের লেখায় তো চিন্তা, বা উপলব্ধির ছাপ দেখতে পাই না। তাই আমার অন্তর্জ্বালা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

---

১। নাড়াচাড়া শব্দটি মূলে ছিলো নড়াচড়া, যা নড়া ও চড়া-এর যুক্তরূপ। নড়া মানে আন্দোলিত হওয়া (জল পড়ে, পাতা নড়ে) সরে যাওয়া, অন্যত্র যাওয়া (মুহূর্তের জন্য আমি এখান থেকে নড়ছি না) শিথিল হওয়া (এখন পর্যন্ত বুড়োর একটি দাঁতও নড়ে না।) অন্যথা হওয়া (হাকীম নড়ে তো হুকুম নড়ে না) এখানে হাকীম নড়ে মানে হাকিম পরিবর্তন বা বদল হয়।

চড়া মানে আরোহণ করা (ঘোড়ায় চড়া, গাছে চড়া, পাহাড়ে চড়া) বেড়ে যাওয়া (জিনিসপত্রের দাম চড়েছে) ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা (মাথায় চড়েছে/চড়ে বসেছে)। নড়া ও চড়া মিলে নতুন অর্থ গ্রহণ করে নতুন শব্দরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, যার অর্থ হলো স্পন্দন, কম্পন, সঞ্চালন, চলাফেরা ইত্যাদি (শিরার নড়াচড়া থেকেই আমাদের বৈদ্যরা রোগ ধরে ফেলতো, এখন একটা রোগ ধরতে লাগে হাজারটা পরীক্ষা। রোগীর নড়াচড়া নেই। বয়সের কারণে আগের মত নড়াচড়া করতে পারি না) সক্রিয় হওয়া অর্থেও শব্দটির ব্যবহার রয়েছে, যেমন, কথাটা শোনামাত্র তিনি নড়েচড়ে বসলেন/তাদের মধ্যে নড়াচড়া দেখা দিলো।

নড়াচড়া শব্দটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সুন্দর একটি মন্তব্য করেছেন, 'যার নড়া নেই তার চড়া থাকবে না সে তো জানা কথা, তা আবার অত ঘটা করে বলার কী হলো!' কথাটি তিনি কৌতুক করে বলেছেন, আসলে চড়া শব্দটির কোন অর্থ নেই। এটি হচ্ছে সহচর শব্দ। তাই অকর্মক থেকে সকর্মকে রূপান্তরিত করতে গিয়ে বলা হয়, 'নাড়াচাড়া'

নড়াচড়া অর্থে নড়নচড়ন শব্দটিও ব্যবহৃত হয়। নড়চড় মানে ব্যতিক্রম, অন্যথা (ভদ্রলোকের এককথা, কোন নড়চড় পাবে না)।

২। উভয় যুগলেই ছোট বাক্য থেকে বড় বাক্যে যাওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়টি সমান, বা কিঞ্চিৎ বড় হতে পারে, কিন্তু ছোট হলে সৌন্দর্য ক্ষুণ্ন হয়।

৩। আগে ছিলো, 'আবার যখন পড়তে গেলাম তখন নযরে এসেছে', বর্তমান বাক্যটিতে পড়লাম ও পড়লো-এর মধ্যে যে শব্দগত সাদৃশ্য ও অর্থগত ভিন্নতা রয়েছে তা উপভোগ করার মত।

## ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ লেখার শরীরকাঠামো

কোন লেখার প্রথম যে চিন্তাটি মাথায় আসে সেটা হলো লেখার বীজ বা মূল। তারপর আমাদের মাথায় আসে, লেখাটি কীভাবে শুরু হবে, কীভাবে শেষ হবে এবং মাঝখানে কী কী বক্তব্য থাকবে, এগুলো। তো আমাদের মস্তিষ্কের ভিতরে লেখাটির এই যে আগগোড়া একটি অস্তিত্ব, এটাই হলো লেখার শরীরকাঠামো। এই কাঠামোটাকে আমরা অন্যের সামনে তুলে ধরি ভাষার মাধ্যমে। লেখার শরীর কাঠামো তাহলে ভাষার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান অধ্যায়ে লেখার শরীরকাঠামো সম্পর্কেই আলোচনা হবে।

# লেখার ভাষা ও শরীর

বারবার আমরা বলি, নিজের লেখা এবং অন্যের লেখা সমালোচকের দৃষ্টিতে পড়তে হবে, কিন্তু যদি জানতে না পারি, সমালোচনা করবো কীভাবে এবং কোন্ কোন্ সূত্র ধরে তাহলে উপদেশটা অবশ্যই অর্থহীন হয়ে পড়ে। এজন্য পিছনের অধ্যায়গুলোতে আমরা লেখার সমালোচনা ও পর্যালোচনার কিছু কিছু সূত্র তুলে ধরেছি। আশা করি, তাতে তোমরা সমালোচনার বিষয়ে কিছুটা হলেও দিক-নির্দেশনা লাভ করেছো। আজকের মজলিসে একই বিষয়ে আরো বিশদ আলোচনা করতে চাই।

যে কোন লেখার দু'টি দিক রয়েছে। একটি লেখার শরীর, বা দেহকাঠামো। আরেকটি হলো লেখার ভাষা। একটি লেখায় যে বিষয়গুলো সাজিয়ে বিন্যস্তরূপে উপস্থাপন করা হয় বিষয়বস্তুগুলোর সেই বিন্যাস ও সাজানো রূপই হলো লেখার শরীর বা কাঠামো। আর বিষয়বস্তুকে পরিবেশন করার জন্য যে সকল শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করা হয় সেটা হলো লেখার ভাষা।

লেখার ভাষা ও শরীরকাঠামো দু'টোই গুরুত্বপূর্ণ এবং দু'টোই সুন্দর ও নিখুত হওয়া দরকার। এখানে প্রথমে আমরা কোন লেখার ভাষাগত সমালোচনার কিছু সূত্র আলোচনা করছি।

**(ক) শব্দপ্রয়োগ ঃ**

শব্দের নিজস্ব প্রয়োগক্ষেত্র রয়েছে। শব্দকে তার সঠিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে বলা হয় শব্দের সুপ্রয়োগ, আর ভুল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে বলা হয় শব্দের অপপ্রয়োগ। শব্দের ভুল ব্যবহার বা অপপ্রয়োগ খুবই দোষণীয়, যা নতুন প্রজন্মের লেখকদের লেখায় প্রচুর দেখা যায়। কারণ লেখার পর্যাপ্ত মশক ও অনুশীলনের দিকে কারো এখন নযর নেই। মান নয়, পরিমাণই যেন মুখ্য। তুমি যদি বরণীয় লেখক-সাহিত্যিকদের মানোত্তীর্ণ লেখা গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ো তাহলে কোন্ শব্দ কোথায় কীভাবে প্রয়োগ করা উচিত তা বুঝতে পারবে এবং তা থেকে

তোমার শব্দের সুপ্রয়োগ শেখা হবে। তা না করে তুমি যদি বাজারের সস্তা বইগুলো পড়তে থাকো তাহলে কখনো বুঝতে পারবে না, কোথায় কোন্ শব্দ ব্যবহার করা উচিত, বা উচিত নয়। অর্থাৎ ঐ সমস্ত বই থেকে শব্দের অপপ্রয়োগ শেখাই শুধু সার হবে।

আমার এক ছাত্র, সেদিন দেখি বেশ নিমগ্ন চিত্তে একটা 'ইসলামী উপন্যাস' পড়ছে। আমি সাধারণত কোন ছাত্রের হাত থেকে বই নেই না, সেদিন নিলাম। নযরে পড়লো প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম বাক্যটির উপর, *'বিচিত্র বর্ণের পাখীরা কিচির মিচির রবে প্রতিপালকের যিকিরে মত্ত।'*

জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাক্যটা তোমার কাছে কেমন লেগেছে?' সে বললো, 'খুব ভালো'। বললাম, 'আমার কাছে কেমন লেগেছে বলতে পারো?' বললো, জ্বি না। বললাম, 'তুমি যদি লক্ষ্য করতে যে, আমি 'বাক্যটি' না বলে 'বাক্যটা' বলেছি তাহলেই তুমি এ সম্পর্কে আমার মনোভাব বুঝতে পারতে।

তারপর বললাম–

এখানে 'মত্ত' শব্দটির মারাত্মক অপপ্রয়োগ ঘটেছে। কেননা প্রথমত পাখীরা অতি কোমল প্রাণী, তারা কোন কিছুতে মত্ত হয় না। মগ্ন ও বিভোর হয়; খুব বেশী হলে মেতে ওঠে। হাতির মত অতিকায় প্রাণী অবশ্য মত্ত হয়। তাই মত্ত পাখী বলা যায় না, মত্ত হাতি বলা যায় এবং বলা হয়।

ছেলেটি তখন লজ্জিত কণ্ঠে বললো, 'এভাবে তো চিন্তা করে পড়িনি!' আমি বললাম, 'এজন্যই তো বলি, এখন যে কারো যে কোন বই পড়ো না।

আমার এক ছাত্র, এখন তিনি শিক্ষক এবং লেখক, ছোটদের জন্য লেখা তার এক বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন–

*'ঈমান রক্ষার এ সংকটকালে জাতি খালিদের তামান্নায় বিলাপ করবে।'*

এখানে *'বিলাপ'* শব্দটির অপপ্রয়োগ হয়েছে। কেননা মানুষ বিলাপ করে কোন কিছু হারানোর শোকে, কোন কিছু পাওয়ার তামান্নায়, বা আকাঙ্ক্ষায় বিলাপ করে না। তাছাড়া মহাবীর খালিদ বিন ওয়ালীদকে আমাদের মনে পড়ে জিহাদে বীরত্ব ও রণকুশলতার সংকটকালে, ঈমানের সংকটকালে নয়। ঈমানের সংকটকালে সাধারণত মনে পড়ে হযরত সিদ্দীকে আকবরকে।

এক সীরাত লেখক আমাদের জানিয়েছেন, *'হিজরতের সময় মদীনার আনছারগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখামাত্র উল্লাসে ফেটে পড়েছিলেন।'* আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না যে, তাঁরা 'ফেটে' পড়েছিলেন। তাছাড়া উল্লাস হয় কোন পক্ষের বিপক্ষে। উল্লাস, আর আনন্দ এক নয়।

**(খ) শব্দের স্থান-কাল-পাত্রের উপযোগিতা ঃ**

শব্দ যতই সুন্দর ও শক্তিমধুর হোক, যদি তা স্থান কাল পাত্রের উপযোগী না হয়

সাহিত্যের বিচারে গ্রহণযোগ্য হবে না। উদাহরণ দেখো–

*'মক্কার সবুজ শ্যামলিমায় নবীজী হারিয়ে যেতেন।'* তোমাকে বুঝতে হবে যে, *'সবুজ শ্যামলিমা'* শুনতে যত সুন্দর ও শ্রুতিমধুর হোক, মক্কার ক্ষেত্রে তা স্থানোপযোগী নয়। কেননা মক্কায় সবুজ নেই, আছে শুধু পাহাড় ও মরুভূমি। তাই বলা উচিত ছিলো, *'পাহাড়-পর্বতের নির্জনতায়, মরুভূমির সীমাহীন শূন্যতায় হারিয়ে যেতেন।'* তাছাড়া *'হারিয়ে যেতেন'* কথাটা নবীজীর শান-উপযোগী নয়; বলা যায়, *'আত্মনিমগ্ন হতেন'*।

এ বাক্য কিন্তু লিখেছেন এমন এক তরুণ লেখক, এখনই যিনি নিজেকে পরিচয় দিতে ভালোবাসেন 'কলম সৈনিক' বলে।

সৈনিক হওয়া ভালো, আর দ্বীনের জন্য যুদ্ধ, বা লড়াই করা খুবই মর্যাদাপূর্ণ কাজ; তবে যুদ্ধের মাঠে নামার আগে পর্যাপ্ত অনুশীলন এবং কঠিন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা অপরিহার্য। প্রশিক্ষণ ছাড়া কোন সৈনিক যদি যুদ্ধের ময়দানে যায়, বেঘোরে প্রাণ হারানোর আশঙ্কা তার প্রবল।

আরেকটি উদাহরণ–

হযরত ওমর (রা) হযরত খালিদ (রা)-কে সেনাপতির পদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের তদন্ত করেছিলেন। সে প্রসঙ্গে একই লেখক লিখেছেন–

'হযরত খালিদ (রা)-এর বিচারের জন্য কমিটি গঠন করা হলো। হযরত আলী (রা) হলেন ঐ কমিটির সভাপতি।

এ বাক্যটি তিনি যদি আমাদের সময়ের কোন ঘটনা সম্পর্কে লিখতেন, দোষের হতো না। কারণ 'কমিটি ও সভাপতি' হচ্ছে এ যুগের শব্দ। সে যুগের জন্য 'মজলিস ও প্রধান' শব্দদু'টি চলতে পারতো। তবে আমি খুব শোকরগোযার যে, তিনি 'কমিটির প্রেসিডেন্ট' লেখেননি।

তাছাড়া উক্ত 'কমিটি' বিচার করার জন্য ছিলো না, ছিলো উত্থাপিত অভিযোগ তদন্ত করে দেখার জন্য। এটা অবশ্য ভাষাগত সমস্যা নয়, তথ্যবিকৃতির সমস্যা। আসল কথা, এ লেখক যে মাদরাসায় 'চাকুরী' করেন সেখানে কমিটি ও সভাপতি রয়েছে, আর তিনি তার পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। শব্দপ্রয়োগের ক্ষেত্রে আপন পরিবেশের প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে বিষয়বস্তুর পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। এ কথা আগেও কোন এক আলোচনায় বলা হয়েছে।

একই লেখক হযরত খালিদ (রা) সম্পর্কে লিখেছেন–

'সর্বক্ষেত্রে হযরত খালিদ (রা.) ছিলেন সমকালের সবার চেয়ে সেরা ও শ্রেষ্ঠ। অত্যন্ত স্ফূর্তিবাজ, নির্ভীক ও কৌশলী।'

ভেবে দেখো, স্ফূর্তিবাজ শব্দটি কার শানে ব্যবহার করা হয়েছে! এমন অসচেতন কলম চালনা সম্পর্কে কী বলা যেতে পারে শুধু আফসোস করা ছাড়া!

আরেকটি কথা, তুমি যখন কোন উপযুক্ত ক্ষেত্রে স্ফূর্তিবাজ, বা ফুর্তিবাজ শব্দটি লিখবে তখন তার শুরুতে 'অত্যন্ত' লিখবে না, লিখবে 'অতি' বা 'খুব'। আর কৌশলী ও কুশলী কিন্তু এক নয়। লেখক সম্ভবত কুশলী অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এটা হলো ভুল অর্থে শব্দপ্রয়োগের নমুনা।

## (গ) শব্দের সমশ্রেণিতা ঃ

আগের কোন এক আলোচনায় বলা হয়েছে যে, বাংলাভাষার শব্দগুলো প্রধানত তিন প্রকার। তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ, তদ্‌ভব বা সংস্কৃত থেকে পরিবর্তিত হয়ে আসা শব্দ, যেমন অগ্নি থেকে আগুন এবং অদ্য থেকে আজ। তৃতীয়ত আরবী, ফারসী, ইংরেজী ইত্যাদি অন্য যে কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ, বা এককথায় বিদেশী শব্দ। তো শব্দচয়নের ক্ষেত্রে শব্দের সমশ্রেণিতা রক্ষা করা দরকার। এটা কখনো হয় বাঞ্ছনীয়, কখনো অপরিহার্য। তুমি যদি শব্দের সমশ্রেণিতা রক্ষা না করো তাহলে তোমার লেখার সাহিত্যমান ক্ষুণ্ন হবে। উদাহরণ দেখো–

হযরত খালিদের নাম স্মরণে ঐশী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে তারা আল্লাহর রাহে জান কোরবান করেছেন।'

বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, নিজের অজান্তেই লেখক এখানে তার লেখার 'খুবসূরতি' কোরবান করে ফেলেছেন, (অর্থাৎ লেখার সৌন্দর্য বিসর্জন দিয়েছেন।) কারণ একটু চিন্তা করলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে, ঐশী চেতনা, উজ্জীবিত এবং রাহ, জান, কোরবান ইত্যাদি শব্দগুলো সমশ্রেণীর নয়। যদি বলা হতো, 'ঐশী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে তারা আল্লাহর পথে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন', কিংবা 'আসমানি জোশ ও জযবায় উদ্দীপ্ত হয়ে তারা আল্লাহর রাহে/রাস্তায়/পথে জান কোরবান করেছেন' তাহলে বাক্যটি সুন্দর হতো।

আরেকটি কথা, 'হযরত খালিদের নাম স্মরণে' মানে তাঁর নাম স্মরণ করার উদ্দেশ্যে। এখানে হবে, 'তাঁর নাম স্মরণ করে'।

তদ্রূপ, 'বিজয়মাল্য গলায় নিয়ে হযরত খালিদের জন্ম।' গলা ও বিজয়মাল্য একশ্রেণীর শব্দ নয়। বিজয়মাল্যের সমশ্রেণীর শব্দ হলো 'কণ্ঠ'। আমরা বলি, 'তার কণ্ঠে বিজয়মাল্য শোভা পাচ্ছে', কিংবা তার গলায় বিজয়ের মালা শোভা পাচ্ছে।

তাছাড়া কথাটা অবাস্তব; বিজয়ের মালা বলো, বা বিজয়মাল্য, সেটা গলায় নিয়ে কেউ জন্মগ্রহণ করে না। 'বিজয়ের ভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করা' বলা যায়। বিজয়ের মালা গলায় নিয়ে জন্মগ্রহণ করা অবাস্তব, আর তলোয়ার হাতে নিয়ে জন্মগ্রহণ করা তো রীতিমত বাঁকিপূর্ণ! এক্ষেত্রে বলা যায়, 'সাহস ও বীরত্বের স্বভাব নিয়ে'।

সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ করা যদিও অবাস্তব, তবে এর ব্যবহার আছে এবং তাতে কোন সমস্যা নেই।
বিজয়ের মালা মানুষ গলায় নেয় না, বরং গলায় পরে, এটাও মনে রাখতে হবে।

আরেকটি উদাহরণ দেখো–

'সবার চোখে মুখে একটিই পণ, একটিই প্রতিজ্ঞা; জীবন দেবো, তবু মক্কায় ঢুকতে দেবো না। প্রতিহিংসার আগুন সবার চোখে-মুখে, ওষ্ঠাধরে'
এখানেও শব্দের সমশ্রেণিতা রক্ষিত হয়নি। বলা ভালো ছিলো, 'চোখে-মুখে এবং দুই ঠোঁটে (বা দুই ঠোঁটের ফাঁকে/মাঝে)।
তবে মনে রাখা দরকার, প্রতিহিংসার আগুন চোখে হতে পারে, মুখে হতে পারে না, আর ওষ্ঠাধরে তো হতেই পারে না।
একই ভাবে পণ বা প্রতিজ্ঞা চোখে-মুখে হয় না, চোখে-মুখে হয় কোন অভিব্যক্তি। পণ বা প্রতিজ্ঞা হয় মনে, বা কণ্ঠে।

একটি প্রশ্ন, তুমি কি তাদের কাজটা সমর্থন করছো? যদি না করো তাহলে তার বর্ণনায় 'পণ বা শপথ' ব্যবহার করো না, শুধু 'প্রতিজ্ঞা বা কসম' ব্যবহার করো। এটি অবশ্য খুব সূক্ষ্ম বিষয়, তবে মনে রাখতে পারলে ভালো।

একজন লিখেছেন–

'ওমর খাপমুক্ত তরবারি হাতে দৃপ্ত পদক্ষেপে ছুটে চললেন দারুল আরকামের উদ্দেশ্যে যেখানে আল্লাহর রাসূল ছাহাবাদের সঙ্গে গোপনে অবস্থান করছিলেন।'১
দেখো, হযরত ওমর (রা) দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাবেন, তাতে আর আপত্তি কী? কিন্তু এটি হলো তাঁর ইসলামপূর্ব জীবনের ঘটনা, যখন তিনি আল্লাহর রাসূলের প্রাণহরণের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। একাজের প্রতি লেখকের যে সমর্থন নেই তা তো বলাই বাহুল্য। সুতরাং তিনি 'দৃপ্ত পদক্ষেপে' বলতে পারেন না। তাকে বলতে হবে, খোলা তলোয়ার হাতে দ্রুত পদক্ষেপে ছুটে চললেন...। অথবা, 'ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে খোলা তলোয়ার হাতে ছুটে চললেন।'

হাঁ, হযরত হামযা যখন শুনলেন, মূর্খের পিতা২ আবুজেহেল নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদুবি করেছে, আর ক্রোধান্বিত হয়ে মূর্খটার উদ্দেশ্যে ছুটে গেলেন, সেক্ষেত্রে তুমি 'দৃপ্ত পদক্ষেপে' বলতে পারো, কারণ তাতে তোমার সমর্থন রয়েছে। শব্দপ্রয়োগে এরূপ অসচেতনতা ভালো ভালো মানুষের লেখায় দেখা যায়। এরকম লেখা যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি তা পড়ার জন্য হাতে নেয়াও কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়।৩

'স্বপ্নের বাগিচায় প্রস্ফুটিত পুষ্প' লিখতে হয়ত লেখকের ভালো লেগেছে। তা

কেন, বাগান নয় কেন? তাছাড়া প্রস্ফুটি পুষ্পের সমশ্রেণীর সঠিক শব্দটি হলো 'উদ্যান'। সুতরাং তোমাকে লিখতে হবে, 'স্বপ্নের বাগিচায়/বাগানে ফোটা ফুল' কিংবা 'স্বপ্নের উদ্যানে প্রস্ফুটিত পুষ্প'। একই ভাবে স্বপ্নের জগৎ হবে, স্বপ্নের দুনিয়া হবে না। কিন্তু লেখক অবলীলায় তা লিখেছেন। এগুলো ব্যাকরণের ভুল নয়, তবু ভুল।

**(ঘ) শব্দের অপচয়ঃ**

যে শব্দ ব্যবহার না করেও বক্তব্যের প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায় সে শব্দ ব্যবহার করলে বলা হবে এখানে শব্দের অপচয় করা হয়েছে। এটা বড় ধরনের দোষ বা দুর্বলতা। যেমন আগের কোন লেখায় উদাহরণরূপে বলা হয়েছে, 'কষ্টের কাঁটাগুলো বুকে এসে বিঁধছে, আর (তা থেকে) ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে। 'তা থেকে' অংশটা এখানে অপ্রয়োজনীয়। কেননা রক্ত যে কাঁটাবিদ্ধ বুক থেকে ঝরবে তা তো বলাই বাহুল্য। সুতরাং এখানে 'তা থেকে' যোগ করার অর্থ হলো শব্দের অপচয়।

তবে তুমি যদি বলো, 'কষ্টের কাঁটাগুলো বুকে এসে বিঁধছে, আর বুক থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে' তাহলে কিন্তু গ্রহণযোগ্য হবে, এটাকে আর শব্দের অপচয় বলা হবে না। কারণ 'বুক থেকে' কথাটির আলাদা একটি আবেদন রয়েছে। অবশ্য তখন বাক্যের আবৃত্তির ধরন বদলে যাবে। আগে বাক্যটির আবৃত্তি ছিলো এরূপ, কষ্টের কাঁটাগুলো/ বুকে এসে বিঁধছে/ আর ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে। এখন হবে, কষ্টের কাঁটাগুলো বুকে এসে বিঁধছে/আর বুক থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে। অর্থাৎ আগে তিন শ্বাসে পড়া হয়েছিলো, এখন পড়া হবে দুই শ্বাসে।

অনেক সময় অতিরিক্ত শব্দ, বা শব্দসমূহ যোগ করতে হয় প্রাসঙ্গিক কোন প্রয়োজনে। তখন সেটাকে শব্দের অপচয় বলা হবে না। উদাহরণরূপে এখানেই দেখো, '(কষ্টের কাঁটাগুলো) বুকে বিঁধছে' না বলে বলা হয়েছে, 'বুকে এসে বিঁধছে। কারণ 'এসে' শব্দটি না হলে 'ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে'-এর সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা হয় না।

আরেকটি উদাহরণ দেখো, 'খালিদ ও ওমরের মাঝে কুস্তি প্রতিযোগিতা হবে। দর্শকদের আগ্রহের শেষ নেই। লড়াই শুরু হলো। ভীষণ ধস্তাধস্তি চলছে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই।'

তুমি হয়ত ভাবছো, তোমার সমবয়সী এযুগের খালেদ-ওমর নামের কোন দুই বালকের কথা হচ্ছে। ভাষা ও ভঙ্গি অবশ্য তেমনই। আসলে এটি হযরত খালিদ ও হযরত ওমর (রা)-এর তরুণ বয়সের ঘটনা।

দেখো, মাঝখানের 'ভীষণ ধস্তাধস্তি চলছে' বাক্যটা শব্দের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ 'লড়াই শুরু হলো'-এর পরে স্বাভাবিকভাবেই 'হাড্ডাহাড্ডি লড়াই'

ঘটেছে। কেননা সুসাহিত্যিকদের কলমে 'ধস্তাধস্তি'র ব্যবহার হয় সাধারণত মারামারির ক্ষেত্রে, প্রীতিমূলক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সাধারণত এটি ব্যবহৃত হয় না।

আরেকটি বিষয়; উপরের প্রতিটি বাক্য হাঁ-বাচক, মাঝখানের একটি বাক্য শুধু না-বাচক। এটা সুন্দর হয়নি। পুরো বক্তব্যটি তুমি এভাবে পড়ে দেখো, 'ওমর ও খালিদের মধ্যে কুস্তিপ্রতিযোগিতা হবে। দর্শকদের আগ্রহ যেন উপচে পড়ছে।৪ শুরু হলো লড়াই, হাড্ডাহাড্ডি/মরণপণ/জানকবুল লড়াই।

আরেকটি উদাহরণ দেখো–

*'এবার তারা রণাঙ্গন থেকে পালাতে লাগলো; দিকবিদিক জ্ঞানশূন্যের ন্যায় দৌড়ে পালাচ্ছে তারা।'*

এখানে বারটা শব্দের বক্তব্য সহজেই আটটি শব্দে প্রকাশ করা যায় এভাবে, 'এবার তারা দিশেহারা হয়ে রণাঙ্গন ছেড়ে পালাতে লাগলো।' সুতরাং প্রথম বক্তব্যে চারটি শব্দের অপচয় হয়েছে। শব্দের এধরনের অপচয় অবশ্যই দোষণীয় ও বর্জনীয়। তাছাড়া 'রণাঙ্গন থেকে পালানো'-এর চেয়ে ভালো হচ্ছে 'রণাঙ্গন ছেড়ে পালানো'। তবে সবচে' ভালো হয়, 'রণাঙ্গণ ত্যাগ করে পলায়ন করতে লাগলো'। আর 'দিকবিদিক জ্ঞানশূন্যের ন্যায়'-এর ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ব্যবহার হলো 'দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালানো'। একই ভাবে 'দিক্‌বিদিক'-এর চেয়ে ভালো হচ্ছে 'দিগ্বিদিক'।

'দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যের ন্যায় দৌড়ে পালাচ্ছে' বাক্যটি যদি কোথাও তুমি লেখো, তাতেও 'দৌড়ে' শব্দটির অপচয় হবে। কারণ এটি আসছে পালানোর রূপটি তুলে ধরার জন্য, অথচ তার আগেই 'দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যের ন্যায়' দ্বারা পালানোর চরম রূপটি তুমি তুলে ধরেছো, এরপর দৌড় শব্দটির আর অর্থবহতা থাকে না।

একজন লিখেছেন–

'আমার আব্বা আমাকে ঈদের মেলা দেখাতে নিজের সঙ্গে মেলায় নিয়ে গেলেন।' বাক্যটি যদি এভাবে লেখা হয় তাহলে শব্দের অপচয় রোধ করা যায়, 'আব্বা আমাকে ঈদের মেলা দেখাতে নিয়ে গেলেন'। 'সঙ্গে নিয়ে গেলেন' চলতে পারে, কিন্তু 'নিজের সঙ্গে' বলার দরকার নেই। অবশ্য যদি এমন হয় যে, তিনি তোমাকে অন্য কারো সঙ্গে না পাঠিয়ে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন বলে তুমি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে চাও তাহলে এটা ঠিক আছে।

**(ঙ) শব্দসংখ্যার ভারসাম্যঃ**

একই বক্তব্যের একাধিক বাক্যের মধ্যে, বা একই বাক্যের বিভিন্ন পর্বের মধ্যে শব্দসংখ্যার ভারসাম্য রক্ষিত না হলে ভাষার সৌন্দর্য ক্ষুণ্ন হয়। এটি অবশ্য ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষার বিষয় এবং এ জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত ভাষাজ্ঞান ও সাহিত্যরুচির।

নীচে একটি উদাহরণ দেখো–

*'কোনদিকে আশার আলো নেই। সামনে আমার শুধু হতাশার অন্ধকার। আমি যেন অকূল দরিয়ার মাঝি।'*

উপরের প্রতিটি বাক্যের শব্দসংখ্যা পাঁচ। প্রথমে লিখেছিলাম–

*'কোনদিকে আশার কোন আলো দেখতে পাই না। সামনে আমার শুধু হতাশার গভীর অন্ধকার। আমি যেন কূলকিনারাহীন দরিয়ার দিকহারা এক মাঝি।'*

যখন সমালোচনার দৃষ্টিতে বারবার চিন্তা করলাম তখন দু'টি ত্রুটি ধরা পড়লো। প্রথমত বাক্যতিনটির শব্দগত ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। দ্বিতীয়ত একই বক্তব্যের তিনটি বাক্যের প্রথমটি হচ্ছে ক্রিয়াবিশিষ্ট, কিন্তু শেষদু'টি তা নয়। এতে বাক্যগুলোর সদৃশতা ক্ষুণ্ন হয়েছে। তাই লিখলাম, 'কোনদিকে আশার কোন আলো নেই।' তারপর 'কোন' শব্দটির পুনরুক্তি দূর করার জন্য দ্বিতীয় 'কোন' বাদ দিলাম। তাছাড়া শব্দটি ছন্দপতনও ঘটাচ্ছে। তুমি 'কোনদিকে আশার আলো নেই' এবং 'কোনদিকে আশার কোন আলো নেই' এ দু'টিকে কানে বাজিয়ে পড়ে দেখো।

'গভীর অন্ধকার' এবং 'ঘোর অন্ধকার'- দু'টির মধ্যে দ্বিতীয়টি ভালো মনে হলো। তারপর মনে হলো, এখানে কোন বিশেষণের তেমন প্রয়োজন নেই।

'অকূল দরিয়া' কথাটি বহুল পরিচিত, তাসত্ত্বেও এত লম্বা করে কেন লিখেছিলাম ভেবে এখন অবাক হই। এটা তো আমার সঞ্চয়ে ছিলো, কিন্তু সরবরাহে আসেনি।৫ সঞ্চয় যেমন দরকার, তেমনি দরকার যথাসময়ে শব্দের সরবরাহ। এটা সবার হয় না এবং সবসময় একরকম হয় না।

'দিকহারা এক মাঝি' কথাটা ঠিক আছে, কিন্তু তাতে শব্দের সমতা ক্ষুণ্ন হয়, অথচ 'দিকহারা এক' অংশটি না থাকলেও চলে, তাই তা বাদ দিলাম। এভাবে তিনটি বাক্যের মধ্যে শব্দসংখ্যার ভারসাম্য তৈরী হলো।

দুই বা তদোধিক বাক্যের মধ্যে শব্দগত ভারসাম্য রক্ষার বিভিন্ন উপায় আছে। প্রথমত প্রতিটি বাক্যের শব্দসংখ্যা সমান হওয়া; যেমন উপরে দেখতে পেলে। দ্বিতীয়ত একই বক্তব্যের বাক্যগুলোতে ক্রমান্বয়ে সুসঙ্গতভাবে শব্দসংখ্যা বৃদ্ধি করা। উদাহরণ–

০ কী আমল করেছো তুমি? ০০ বন্দেগির কী হক আদায় করেছো তুমি? ০০০ আমার কোন নেয়ামতের কী শোকর আদায় করেছো তুমি?

বামপন্থী লেখক সৈয়দ শামসুল হক বলেছেন, 'একই বক্তব্যের বাক্যগুলোর মাঝে একটা জ্যামিতিক মাপ অনুসরণ করতে হবে।' কথাটা মনে রাখার মত। যদি সুযোগ হয় তাহলে সামনের কোন সংখ্যায় শুধু শব্দসংখ্যার ভারসাম্য এবং বক্তব্যের বাক্যসমূহের জ্যামিতিক মাপ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করবো

**(চ) ছন্দ ও সুরছন্দঃ**

আবারো সৈয়দ শামসুল হকের কথা বলতে হয়। তিনি লিখেছেন–

*'পদ্যের যেমন ছন্দ আছে, গানের যেমন সুর আছে তেমনি গদ্যেরও আলাদা একটা ছন্দ আছে, সুরের ব্যঞ্জনা আছে। সেই ছন্দ ও সুর শ্রোতাকে মোহিত করে। এমনকি ছন্দ ও সুরের আকর্ষণে লেখক ও পাঠক একসময় একাত্ম হয়ে যায় এবং লেখার আবেদন পৌঁছে যায় পাঠকের হৃদয়ের গভীরে।'*

আমি শুধু অসহায়ের মত ভাবি, হায় কবে আমাদের মাঝে আত্মপ্রকাশ ঘটবে এমন কলমের, যা পাঠকচিত্তে ভাষা ও সাহিত্যের জাদুবিস্তার করবে! কবে হবে আমাদের এমন লেখা, যার 'ছন্দ ও সুরের আকর্ষণে' লেখক ও পাঠক একসময় একাত্ম হয়ে যাবে! আমার এ স্বপ্ন কি কখনো পূর্ণ হবে, না স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে চিরকাল?! জানি, একথার কোন উত্তর নেই। তাই চলো, আগের কথায় ফিরে যাই। সৃষ্টির প্রসববেদনা নামক সম্পাদকীয় থেকে একটি উদ্ধৃতি দেখো–

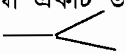
*'কিন্তু কেন? কী আমার অপরাধ? আমি স্বপ্ন দেখেছি কোন সবুজ দ্বীপের, নিরাপদ সাগর-তীরের, কিংবা আলোঝলমল বন্দরের, এ-ই কি আমার অপরাধ?*
*আমার ছেঁড়া পাল উড়ে গেলে ঝড়তুফানের কী লাভ! আমার ভাঙ্গা কিশতি ডুবে গেলে ঢেউদানবের কী এমন প্রাপ্তি! শুধু হিংসা! শুধু ঈর্ষা!! সাগরের বুকে এক ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্রতম এক স্বপ্ন-প্রয়াস সাগর-মহাসাগর কি পারে না শান্ত বুকে গ্রহণ করে নিতে!*
*কিংবা হে আল্লাহ, তুমি কি পারো না ঝড়ের গতি ফেরাতে, ঢেউয়ের মত্ততা থামাতে, যাতে ভাঙ্গা কিশতি, আর ছেঁড়া পাল নিয়ে আমি পৌঁছে যেতে পারি আমার স্বপ্নের সবুজ দ্বীপে! আমার আশা-প্রত্যাশার আলোঝলমল বন্দরে!*
*কেন তুমি তা করো না! কেন তুমি কিছু বলো না!!*

*এমন সময় মনে হলো, গায়বি আওয়ায যেন ভেসে এলো– বান্দা, বড় অবুঝ তুমি; আমার হিকমত না বুঝে তাই এত উতলা তুমি!*
*আমি জানি, তুমি অজ্ঞ, তুমি অযোগ্য, তুমি অক্ষম, তুমি অধম। তবু আমি চাই, তোমার অজ্ঞতা থেকে উৎসারিত হোক জ্ঞানের ঝরণাধারা; তোমার অক্ষমতা সৃষ্টি করুক কীর্তি ও কর্মের সম্ভাবনা। তাতে আমার কুদরতের হবে প্রকাশ এবং আমার করুণা রহমতের ঘটবে উদ্ভাস।'*

উপরের উদ্ধৃতিটি কয়েকবার পড়ো, বিশেষ করে রেখাটানা অংশটুকু– (কিন্তু কেন? কী আমার অপরাধ? আমি স্বপ্ন দেখেছি কোন সবুজ দ্বীপের, নিরাপদ সাগর-তীরের, কিংবা আলোঝলমল বন্দরের, এ-ই কি আমার অপরাধ?)

দু'টি প্রশ্ন, প্রথমটি দু'শব্দের, দ্বিতীয়টি তিনশব্দের। তারপর তিনটি স্বপ্নের কথা বলা হয়েছে, প্রতিটি তিনশব্দের। আবার দ্বীপ, সাগর, বন্দর– এই তিনের মধ্যে রয়েছে একটা নিকট আত্মীয়তা। আবার প্রতিটির রয়েছে একটি করে বিশেষণ। সবশেষে 'দ্বীপের, তীরের, বন্দরের'-এই তিনের মধ্যে, তদ্রূপ 'উড়ে গেলে, ডুবে গেলে, তারপর 'ঝড়-তুফানের, ঢেউ-দানবের'-এগুলোর মধ্যে রয়েছে একটি ছন্দগত সম্পর্ক। এভাবে পুরো বক্তব্যে সৃষ্টি হয়েছে এমন একটি সুরমূর্ছনা, যা পাঠকচিত্তকে অবশ্যই পুলকিত করবে। এবার নীচের বাক্যটি দেখো–

*'কিংবা হে আল্লাহ, তুমি কি পারো না/ঝড়ের গতি ফেরাতে,/ঢেউয়ের মত্ততা থামাতে!'*

উপরের বাক্যে সুন্দর একটি জ্যামিতিক মাপ রয়েছে। স্থূল উপমা দিলে বলা যায়, যেন লম্বা একটি ডাল, যার মাথা থেকে সমান দু'টি শাখা বের হয়েছে, ঠিক এরকম 

তুমি যদি লেখো, 'কিংবা হে আল্লাহ, তুমি কি পারো না/ ঝড়ের গতি অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে,/ ঢেউয়ের মত্ততা থামিয়ে দিতে!' যদি এভাবে লেখো তাহলে শব্দসংখ্যায় ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হবে এবং জ্যামিতিক মাপটি নষ্ট হয়ে যাবে।৬

আবার দেখো–

'আমার স্বপ্নের সবুজ দ্বীপে,/ আমার আশা-প্রত্যাশার আলোঝলমল বন্দরে', এখানে প্রথম অংশটি এক শব্দের ছোট, দ্বিতীয় অংশটি এক শব্দের বড়। এভাবে ছোট থেকে সামান্য বড় হয়ে শব্দসংখ্যার ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে।

তদ্রূপ 'বন্দা, বড় অবুঝ তুমি, আমার ইঙ্গিত না বুঝে তাই এত উতলা তুমি!'– এখানে দ্বিতীয় বাক্যটি যথেষ্ট লম্বা হলেও 'তুমি'-এর সুরছন্দের কারণে তা গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

নীচের ছোট ছোট বাক্যগুলো দেখো–

'আমি জানি, তুমি অজ্ঞ, তুমি অযোগ্য, তুমি অক্ষম, তুমি অধম।' এখানে সুরের সুন্দর একটি তরঙ্গ আছে। 'আমি জানি' এটি যেন ফুলের বোঁটা, বাকি বাক্যগুলো যেন ফুলের পাপড়ি।

এবার আরেকটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করি–

'আমার বাগানে আজ সকালে এই যে লাল গোলাপটি ফুটেছে, তার জীবন মাত্র দু'দিনের। কিন্তু ছোট্ট কলি থেকে পূর্ণ বিকশিত ফুল হতে তাকে অনেক সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। গাছ থেকে রস সঞ্চয় করে করে তিলে তিলে নিজেকে গড়ে তুলতে হয়েছে। এখন সে আমার বাগানের সৌন্দর্য ও সৌরভ, আমার উদ্যানের গর্ব ও গৌরব। অথচ আমার কাছে তার কোন দাবী নেই। কারো সঙ্গে তার চাওয়া-পাওয়ার হিসাব নেই। শুধু সম্ভবত একটি নীরব মিনতি আছে

মানুষের কাছে তার। সৌন্দর্যের ভাষায় এবং সুবাসের ইশারায় আমাকে তোমাকে হয়ত সে বলে–

'দেখো, দু'দিনেই ঝরে যাওয়া কত সামান্য আমার জীবন! কিন্তু সবাইকে ভালোবেসে, সবার মাঝে সুবাস ছড়িয়ে আমি লাভ করেছি অমর জীবন।

হে মানুষ, তুমি তো আল্লাহর প্রিয়তম সৃষ্টি! তুমিও আমার মত হও। জ্ঞানের আলোতে চারদিক আলোকিত করো, গুণের সুবাসে জগৎ সুরভিত করো, তাহলে৭ তুমিও লাভ করবে অমর জীবন।'

উপরের লেখাটি আবার পড়ো, কয়েকবার পড়ো। লেখাটির মূল বক্তব্য এই যে, ফুল মানুষকে তার মত সুন্দর হওয়ার উপদেশ দিতে চায়। কিন্তু ফুল তো কথা বলতে পারে না! তাহলে কীভাবে সে মানুষকে উপদেশ দেবে? কীভাবে মানুষকে সে মিনতি জানাবে?

লেখকের কল্পনা এখানে পথ তৈরী করে নিয়েছে। অর্থাৎ ফুলের সৌন্দর্য ও সুবাসকেই তিনি ফুলের ভাষা বলে কল্পনা করেছেন। এটা কল্পনাশক্তির উদ্ভাবন। লেখক বলতে চাচ্ছেন, ফুলের সৌন্দর্য ও সুবাসই যেন ভাষা হয়ে মানুষকে মিনতি জানাচ্ছে। এই ভাবটি তিনি এভাবে প্রকাশ করেছেন, 'সৌন্দর্যের ভাষায় এবং সুবাসের ইশারায় আমাকে তোমাকে হয়ত সে বলে ...। যদি বলা হতো, 'সৌন্দর্যের ভাষায় এবং সুবাসের ইঙ্গিতে' তাহলে ছন্দপতন ঘটতো। এখানে 'ইশারায়' শব্দটি হচ্ছে বিকল্পহীন শব্দ।

লঘুতা ও গুরুতার দিক থেকে স্বাভাবিক নিয়মে সুবাস শব্দটি আগে এবং সৌন্দর্য শব্দটি পরে হলে, তদ্রূপ হরফের কমবেশীর দিক থেকে 'ভাষায়' আগে এবং 'ইশারায়' পরে হলে ভালো হতো। কিন্তু অর্থগত দিক থেকে সৌন্দর্য ও ভাষা আগে এবং সুবাস ও ইশারা পরে হওয়াই দাবী করে, তাই সে দাবী রক্ষা করা হয়েছে। কারণ ভাষাগত সৌন্দর্যের চেয়ে অর্থগত সৌন্দর্য বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

আবার দেখো, নীচের বাক্যটি যদি পর্ববিভক্তির মাধ্যমে এভাবে আবৃত্তি করো, 'আমার বাগানে/ আজ সকালে/ এই যে লাল গোলাবটি ফুটেছে/ তার জীবন মাত্র দু'দিনের।' তাহলে তোমার কান এখানে একটি সুরছন্দ অবশ্যই অনুভব করবে। এটাই হলো গদ্যের ছন্দ। যদি বলা হতো, 'আমার ছোট্ট বাগানে, কিংবা আমার গোলাব-বাগানে/ আজ সকালে' তাহলে একটি শব্দ বেড়ে যাওয়ার কারণে উভয় পর্বে ছন্দপতন ঘটতো। তখন দ্বিতীয় পর্বে উপযুক্ত কোন শব্দ যোগ করে ছন্দ রক্ষা করা জরুরি হতো। যেমন, 'আমার গোলব-বাগানে/ আজ শিশিরভেজা সকালে'।

নীচের বাক্যদু'টি দেখো–

'এখন সে আমার বাগানের সৌন্দর্য ও সৌরভ, আমার উদ্যানের গর্ব ও গৌরব।'

এখানে একটি সুরছন্দ নিশ্চয় আছে এবং বাক্যটি পছন্দও হয়েছিলো, কিন্তু এখন

'এখন সে আমার বাগানের গর্ব ও গৌরব, আমার উদ্যানের সৌন্দর্য ও সৌরভ।'

এখন সম্ভবত বাক্যটির সুরছন্দ অধিকতর সুন্দর হয়েছে। কারণ কোমল শব্দের পাশে কোমল শব্দের উচ্চারণ হয় সাবলীল। তাছাড়া আগে কোমল শব্দ, তারপর কঠিন শব্দ, এটাই হলো স্বাভাবিক বিন্যাস এবং সাবলীল আবৃত্তির দাবী। তাছাড়া 'বাগান, গর্ব, গৌরব– তিনটি শব্দেই 'গ' রয়েছে এবং সৌন্দর্য ও সৌরভ শব্দদু'টি 'স' দিয়ে শুরু হয়েছে, এটিও একটি অতিরিক্ত সৌন্দর্য।

আরেকটি বিষয়, ফুলের বক্তব্যটি এসেছে এভাবে–

'দেখো, দু'দিনে ঝরে যাওয়া কত সামান্য আমার জীবন! কিন্তু সবাইকে ভালোবেসে, সবার মাঝে সুবাস ছড়িয়ে আমি লাভ করেছি অমর জীবন।'

এখানে 'দেখো' শব্দটি না থাকলেই বোধ হয় ভালো হয়, আর দু'দিনে'-এর সঙ্গে 'ই' থাকা দরকার।

প্রথম বাক্যটি দুই পর্বে বিভক্ত। যেমন, 'দুদিনেই ঝরে যাওয়া/ কত সামান্য আমার জীবন!' দ্বিতীয় বাক্যটি তিনপর্বে বিভক্ত এবং প্রথম পর্বদু'টিতে রয়েছে সুন্দর সুরছন্দ। যেমন, 'সবাইকে ভালোবেসে/ সবার মাঝে সুবাস ছড়িয়ে/ আমি লাভ করেছি অমর জীবন।'

ফুলের বক্তব্যে পরবর্তী অংশটি হলো–

'হে মানুষ, তুমি তো আল্লাহর প্রিয়তম সৃষ্টি! তুমিও আমার মত হও। জ্ঞানের আলোতে চারদিক আলোকিত করো, গুণের সুবাসে জগৎ সুরভিত করো। তুমিও লাভ করবে অমর জীবন।'

এখন মনে হচ্ছে আশরাফুল মাখলূকাত মানুষকে 'তুমিও আমার মত হও' বলাটা ফুলের পক্ষে সম্ভবত শোভনীয় নয়। এছাড়াও রয়েছে আরো কিছু ত্রুটি। দেখো তো, এমন হলে কেমন হয়–

হে মানুষ, তুমি তো আল্লাহর প্রিয়তম সৃষ্টি! তুমি জ্ঞানের আলোতে সবাইকে আলোকিত করো, গুণের সুবাসে জগতকে সুবাসিত করো, তুমিও লাভ করবে অমর জীবন।

আরেকটি উদাহরণ দেখো–

'কত কান্না জমেছিলো তাঁর বুকে! কত অশ্রু ঝরেছিলো তাঁর চোখে! এখানে স্বাভাবিক নিয়মে বলা দরকার, 'কত অশ্রু ঝরেছিলো তাঁর চোখ থেকে', কিন্তু তাতে পূর্ববর্তী বাক্যের সঙ্গে তার শব্দগত ভারসাম্য ক্ষুণ্ন হতো এবং যাকে বলি গদ্যের ছন্দ, তা ব্যাহত হতো।

***

এ পর্যন্ত আমরা লেখার ভাষাগত সমালোচনার কিছু সূত্র আলোচনা করলাম।

**(ক) অপ্রাসঙ্গিকতাঃ**

পাঁচটি আঙ্গুলের সঙ্গে অতিরিক্ত আঙ্গুল যেমন হাতের সৌন্দর্য ক্ষুণ্ন করে তেমনি মূল বক্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা লেখার কাঠামো-সৌন্দর্য নষ্ট করে। উদাহরণস্বরূপ পুষ্পসমগ্রে অন্তর্ভুক্ত 'গল্পে আঁকা ইতিহাস' লেখাটি পড়ো। লেখক মূল বক্তব্যের ফাঁকে আব্বাসী সালতানাতের ইতিহাস এবং তার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ তুলে ধরেছিলেন, যা ছিলো আলোচ্য লেখার মূল ধারার সঙ্গে সম্পর্কহীন। কেননা এখানে ইতিহাস উদ্দেশ্য নয়, ইতিহাসের গল্পটাই উদ্দেশ্য। তাই আলোচ্য অংশটুকু অনুবাদে ছাঁটাই করে দেয়া হয়েছে।

আরেকটি উদাহরণ। হজ্বের একটি সফরনামায় আছে, লেখক নবীজীর রওযা যিয়ারাত করলেন। সালাম আরয করার সময় তার মনে পড়লো, 'ইনি সেই নবী যিনি ... তারপর আবুবকর (রা) এবং ওমর (রা)-কে সালাম পেশ করার সময় মনে পড়লো, ইনি সেই খলিফা যিনি.... এভাবে তুলে আনা হয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। বালাবাহুল্য যে, বিষয়বস্তু যত উত্তমই হোক এখানে তা প্রসঙ্গহীন, কিংবা প্রসঙ্গটি কষ্টার্জিত, বিশেষত সেখানে লেখকের অবস্থান যেহেতু খুব সংক্ষিপ্ত।

তারপর তিনি মসজিদের বাইরে এসে সবুজ গম্বুজের দিকে তাকালেন, আর তার মনে পড়ে গেলো, সেই দুই ইহুদির ঘটনা, যারা রওযা শরীফ থেকে 'জাসাদে আতহার' বা পবিত্র দেহ সরিয়ে নেয়ার জঘন্য পরিকল্পনা করেছিলো। কিন্তু লেখক বুঝতে পারেননি যে, ঘটনার দীর্ঘ বর্ণনা এখানে খুবই অপ্রাসঙ্গিক। এতে লেখার শরীর স্ফীত হলেও তা অপ্রাসঙ্গিকতার দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে। তবে সুন্দর প্রসঙ্গ তৈরী করে মূল বিষয়ের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের অবতারণা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। তাতে বরং লেখায় বহুমাত্রিকতা সৃষ্টি হয়, যা লেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত সৌন্দর্য।

**(খ) পাঠকের অংশগ্রহণঃ**

গল্পের আরেকটি সৌন্দর্য হলো সবকথা স্পষ্ট করে না বলে পাঠকের অনুমানের উপর ছেড়ে দেয়া। তাতে লেখার মধ্যে নাটকীয়তা আসে এবং পাঠক অকথিত অংশটুকু নিজে কল্পনা করে বোঝার স্বাদ লাভ করে। অর্থাৎ তুমি যেন পাঠককে পরবর্তী অংশটুকু রচনার কাজে শরীক করে নিলে। পাঠক যেন এখানে লেখক হয়ে গেলো। উদাহরণস্বরূপ 'গল্পে আঁকা ইতিহাস'-এর শেষাংশ দেখো–

'খলীফাতুল মু'মিনীন আমাকে একা দেখে অবাক হলেন। ভ্রূ কুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা করলেন, বন্দী কোথায়?

আমাকে নত মুখে নীরব দেখে তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন,'যদি বলো, পালিয়ে

আলহামদু লিল্লাহ প্রাণের হুমকির মুখেও আমার কোন **ভাবান্তর হলো** না। আমি শান্ত কণ্ঠে বললাম, 'আমীরুল মু'মিনীন, বন্দী আপনার পালায়নি, তবে অনুমতি হলে সব বৃত্তান্ত খুলে বলতে চাই।'

**ইশারায় অনুমতি পেয়ে** পুরো ঘটনা খলীফার খিদমতে আরয করলাম, তারপর আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললাম, 'আমীরুল মু'মিনীন, ওয়াফাদারি ও কৃতজ্ঞতা এবং ইনছাফ ও ন্যায়পরতা আমরা আপনার কাছ থেকেই শিখেছি। আমি আমার বিবেকের নির্দেশ পালন করেছি। আমার মেযবান যদি নির্দোষ হয় তাহলে সৎ সাহসের পুরস্কার আমার প্রাপ্য, আর অপরাধী **হলে আমার** গর্দান হাযির। এই দেখুন কাফনের কাপড়! আমি মওতের জন্য **তৈয়ার হয়েই** এসেছি।'

কথা শেষ করে অবনত দৃষ্টি তুলে আমীরুল **মু'মিনীনের দিকে** তাকালাম এবং কিছুমাত্র অবাক না হয়ে দেখলাম, তার দু'চোখ **থেকে অশ্রুর** ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, **'তাকে আমার** কাছে এনেও তো সব কথা বলতে পারতে! তুমি কি মনে করো, সব **জেনেও তাকে** হত্যা করবো, আমি এমনই যালিম!'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় **দ্বাররক্ষী এসে** আরয করলো, 'আমীরুল মু'মিনীন, অভিজাত এক লোক বলছে, 'দামেস্কের বন্দী' আপনার অনুমতি প্রার্থী।' কথা শুনে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। খলীফা আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'আমি ভাবছিলাম, তোমার কথা যদি সত্য হয় তাহলে অবশ্যই সে এখানে ছুটে আসবে।'

দ্বাররক্ষী 'দামেস্কের বন্দী'কে হাযির করলো, আর তিনি অনুমতির অপেক্ষা না করেই বলতে লাগলেন, 'আমীরুল মু'মিনীন, অপরাধ যা কিছু আমার এবং শাস্তি গ্রহণের জন্য আমি প্রস্তুত। আমার কারণে এই বে-কছূর শরীফ ইনসানের যেন কোন ক্ষতি না হয়।'

খলীফা মৃদু হেসে বললেন, 'আচ্ছা, ক্ষতি যা হওয়ার আমারই হোক। তোমাকে দশহাজার দীনার পুরস্কার দেয়া হলো। যদি পছন্দ করো তাহলে কিছু দিন আমার মেহমান থাকো, কিংবা শাহী ব্যবস্থাপনায় দামেস্কে রওয়ানা হয়ে যাও। তবে আব্বাসের যদি কোন বক্তব্য থাকে তাহলে তাই হোক।'

'দামেস্কের মেযবান' কিছুক্ষণ স্বপ্নাবিষ্টের মত দাঁড়িয়ে থাকলেন, তারপর আলহামদু লিল্লাহ বলে সেখানেই সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। আমার স্ত্রীর, বিদায় মুহূর্তের কথাটি মনে পড়লো, 'আমার মন বলছে, আল্লাহ চাহে তো আবার দেখা হবে আমাদের।'

এটি হলো 'গল্পে আঁকা ইতিহাস' লেখাটির সম্পাদিত অংশ। তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য লেখাটির সমাপ্তি অংশের দীর্ঘ উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরা হলো। উদ্ধৃতিটি কয়েকবার পড়ো।

লেখক লেখাটা এভাবে শেষ করেছিলেন, 'খলীফা দামেস্কী লোকটিকে নিজের মেহমান বানাতে চাইলেন, কিন্তু পুলিশপ্রধান তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং তাকে নতুন কাপড়চোপড় দিলেন এবং দু'দিন পর তাকে ইয্যত-সম্মানের সঙ্গে দামেস্কের কাফেলার সাথে রওয়ানা করিয়ে দিলেন। আর পুলিশপ্রধানের স্ত্রী স্বামীকে ফিরে পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হলেন।'

অর্থাৎ লেখক পাঠকের কল্পনার জন্য কিছুই বাদ রাখেননি, সব নিজেই বলে দিয়েছেন। তাতে লেখাটির নাটকীয় সমাপ্তির সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। পরবর্তী ঘটনাটি পাঠক নিজে কল্পনা করে স্বাদ লাভ করবে সে সুযোগ নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো।

পক্ষান্তরে সম্পাদনার পর প্রকাশিত লেখাটি দেখো, কী সুন্দর নাটকীয় পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং পরবর্তী ঘটনা পাঠকের কল্পনার জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

উপরের দীর্ঘ উদ্ধৃতিকে কেন্দ্র করে লেখার অন্যান্য বিষয়সম্পর্কেও আলোচনা করা যায়, কিন্তু স্থানাভাবের কারণে তা থেকে বিরত থাকছি। তবে দু'একটি কথা বলতেই হয়–

০০ 'যদি বলো, পালিয়ে গেছে তাহলে নিশ্চিত জেনো, তোমারও আয়ু ফুরিয়ে গেছে।' এখানে 'নিশ্চিত জেনো' কথাটি না বললেও চলে, কারণ আমীরুল মু'মিনীনের কথা চূড়ান্ত হবে, এটাই স্বাভাবিক, তাছাড়া কম শব্দে সংলাপের গাঁথুনি দৃঢ় হয়। সংলাপটি এরকম হতে পারে, '... তাহলে তোমারও আয়ু ফুরিয়ে গেছে।' অথবা '... তাহলে জেনে রেখো, তোমারও আয়ু ফুরিয়ে গেছে।' আমার মনে হয়, শেষেরটি সর্বোত্তম, তারপর দ্বিতীয়টি, তারপর প্রথমটি।

০০ 'আমার মেযবান যদি নির্দোষ হয় তাহলে.... আর অপরাধী হলে....' 'যদি হয় তাহলে' এ শৈলী বক্তব্যকে জোরালো করে, তাতে বোঝা গেলো যে, মেযবানের নির্দোষ হওয়ার বিষয়ে তিনি আস্থাবান। 'আর অপরাধী হলে' এর দ্বারা বোঝা যায়, তার দৃষ্টিতে মেযবান নিরপরাধ। সুতরাং যদি বলা হতো, 'মেযবান নির্দোষ হলে... তাহলে উপরোক্ত মনোভাবটি প্রকাশ পেতো না, যা এখানে প্রকাশ পাওয়া জরুরি।

০০ '... তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রুর ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে।' আমীরুল মু'মিনীনের মত মহান ব্যক্তি আবেগ প্রকাশে সংযত হবেন, এটাই স্বাভাবিক, তাই অতিশয়তাটুকু বাদ দিয়ে এভাবে বলাই যথেষ্ট, '... দেখলাম, তাঁর দু'চোখ অশ্রুসিক্ত।'

'তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন' খলীফার সান্ত্বনা তার কথা থেকেই যেহেতু প্রকাশ পাবে সেহেতু এতটুকু বলাই যথেষ্ট, 'তিনি বললেন'।

০০ 'কথা শুনে আমি হতবাক হয়ে গেলাম', এখানে শব্দের অপচয় ঘটেছে; বলা

০০ 'ভাবছিলাম, তোমার কথা যদি সত্য হয় তাহলে অবশ্যই সে এখানে ছুটে আসবে।' (তোমার কথা) যদি (সত্য হয়) তাহলে (অবশ্যই সে এখানে ছুটে আসবে) (তোমার কথা সত্য) হলে (অবশ্যই সে...) উভয় শৈলীরই রয়েছে স্ব স্ব প্রয়োগক্ষেত্র। এটা আত্মস্থ করা দরকার।
০০ 'তোমাকে দশ হাজার দীনার পুরস্কার দেয়া হলো' আরো সংক্ষেপে বলা যায়, 'তোমার পুরস্কার দশ হাজার দীনার'।
০০ 'তবে আব্বাসের যদি কোন বক্তব্য থাকে তাহলে তাই হোক।' এখানে কিন্তু দ্বিতীয় শৈলীটি অধিকতর উপযোগী, অর্থাৎ 'তবে আব্বাসের কোন বক্তব্য থাকলে তাই হোক।'

**(গ) রহস্যময়তা ঃ**

গল্পের আরেকটি সৌন্দর্য হলো রহস্যময়তা ও প্রচ্ছন্নতার আশ্রয় গ্রহণ করা, যাতে পাঠকের মনে কৌতূহল সৃষ্টি হয় এবং রহস্যটি উদ্ঘাটনের জন্য সে অধীর আগ্রহে শেষ পর্যন্ত লেখাটি পড়ে যায়। উদাহরণ হিসাবে নীচের লেখাটি পড়ো—

***শান্ত এখন শান্ত***

পিতা-মাতা বোধ হয় বড় আশা করিয়াছিলেন, তাহাদের কোল আলো করা পুত্র-সন্তান বেশ শান্তশিষ্ট হইবে, তাই বিরাট আয়োজন করিয়া তাহার নাম রাখা হইল শান্ত। কিন্তু এ বয়সেই তাহার মেজাজ যে মূর্তি ধারণ করিয়াছে তাহাতে শান্ত বলিয়া ডাকিলে পরিচিত সকলেই হাসিয়া ওঠে। নাম রাখিবার কালে যদি তাহার বর্তমান অবস্থা কিঞ্চিৎমাত্র অনুমান করা যাইত তবে তাহার নাম শান্ত বা 'ঠাণ্ডা' হইবার উপায় ছিলো না, বরং অশান্ত বা 'বিশান্ত' জাতীয় কিছু একটা হইতে পারিত।
ঢিল ছুঁড়িয়া জানালার কাঁচ ভাঙ্গিল কে? শান্ত। ছোট বোনটিকে কিল মারিয়া কাঁদাইল কে? শান্ত। মাঠে খেলিতে গিয়া ঝগড়া বাঁধাইল কে? শান্ত। সৈয়দ বাড়ীর বাগান হইতে আম পাড়িয়া আনিল কে? শান্ত। মোটকথা, সংসারে অশান্তির জ্ঞাত-অজ্ঞাত, ক্ষুদ্র-বৃহৎ যতগুলি কর্ম আছে শান্ত তাহাতে সিদ্ধহস্ত।
অবশ্য এতখানি নিন্দা সম্পূর্ণ নির্বিবাদে আমাদের শান্তর প্রাপ্য নহে। কেননা মাছের মাথাটি যদি তাহার পাতে তুলিয়া দাও, দুধের সরটা যদি তাহার ভাগে রাখিয়া দাও এবং যদি ঘুড়ি উড়াইতে, কিংবা শালুক তুলিতে বাধা না দাও তবে 'শান্ত'র মত শান্ত ছেলে পাঁচগ্রামে দ্বিতীয়টি পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ!
এমন যে 'অশান্ত' আমাদের এই 'শান্ত', হঠাৎ একদিন তাহার জীবনে বিরাট বিপ্লব আসিল। শান্ত শুধু শান্তই হইল না, একেবারে প্রশান্ত হইয়া গেল। শান্তকে এখন কেহ চিৎকার করিতে শোনে না, হাসিতে দেখে না, এমনকি কাঁদিতেও দেখে না। সকালে বলো, সন্ধ্যায় বলো, সকলে তাহাকে দেখে, মসজিদের উত্তর পার্শ্বে নতুন যে

কবরটি হইয়াছে, উহার শিয়রে সে নীরবে দাঁড়াইয়া আছে; আর তাহার ডাগর ডাগর চোখ দু'টি হইতে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরিতেছে। ইহা শান্তর মায়ের কবর!'

লেখাটি আরেকবার পড়ো। মূল লেখাটিতে শান্ত-এর জীবনে পরিবর্তন আসার বিষয়টি এরকম ছিলো–

*'হঠাৎ একদিন শান্তর আম্মা মারা গেলেন। শান্ত তার মাকে খুব ভালোবাসতো। তাই মায়ের মৃত্যুতে ..... ।*

'শান্ত'র জীবনে পরিবর্তন আসার কারণটি আগেভাগে জেনে ফেলার কারণে পাঠক এখন কৌতূহলহীন হয়ে পড়বে। তাই সম্পাদনার সময় 'কারণ'-এর বিবরণ বাদ দিয়ে পরিবর্তনের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এখন পাঠক প্রচণ্ড কৌতূহলী হবে এমন আশ্চর্য পরিবর্তনের কারণটি জানার জন্য। পরবর্তী পর্যায়ে 'নতুন কবর' শব্দটিতে ইঙ্গিত পাওয়া যাবে যে, এই পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে কোন আপনজনের মৃত্যু। এখন পাঠকচিত্তের কৌতূহল চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হবে এবং কার কবর সেটা জানার জন্য সে রুদ্ধশ্বাসে লেখাটির শেষ পর্যন্ত পড়ে যাবে। লেখাটির শেষে একটি বাক্য যোগ করা হয়েছে, *'ইহা শান্তর মায়ের কবর।'* হৃদয় আছে এমন প্রতিটি পাঠকের হৃদয়ে এই শেষ বাক্যটি যেন তীরের মত গিয়ে বিঁধবে এবং স্তব্ধ হয়ে সে শান্তর অন্তর্বেদনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবে। এই যে গল্পটির নাটকীয় পরিসমাপ্তি, এটা সহজে ভোলা যায় না। বলাবাহুল্য যে, আলোচ্য গল্পটির অবয়বে এই প্রচ্ছন্নতা ও রহস্যময়তা না থাকলে এটা সম্ভব হতো না।

**(ঘ) বহুমুখিতাঃ**

শরীর কাঠামোর দিক থেকে কোন লেখার সমালোচনার আরেকটি দিক হলো বক্তব্যের বহুমুখিতা। অর্থাৎ মূল বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে একদু'টি শব্দে বা বাক্যে বিভিন্ন বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে যাওয়া। তাতে লেখার আবেদন ও সারগর্ভতা বৃদ্ধি পায় এবং একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত লেখা বহুমুখী ও বহুমাত্রিক হয়ে ওঠে।

বিষয়টিকে স্পষ্ট করে বোঝার জন্য আমরা পথচারী ও পর্যটকের উপমা তুলে ধরতে পারি। যে লেখক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু মূল বক্তব্যটি বলে যান, অন্য কোন বিষয়ের দিকে ফিরেও তাকান না, তিনি সেই সাধারণ পথচারীর মত যে ডানে বাঁয়ে কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা লক্ষ্যস্থলের দিকে হেঁটে চলে যায়। পক্ষান্তরে যিনি মূল বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে উপযুক্ত উপলক্ষ অবলম্বন করে বিভিন্ন বিষয় ও প্রসঙ্গের অবতারণা করেন তিনি যেন সেই পর্যটক যিনি লক্ষ্যের পথে হাঁটতে থাকেন, তবে ডানে-বাঁয়ে যেসব সুন্দর দৃশ্য আছে, যেমন উদ্যান, গাছ, ফুল, ঝর্ণা, পাখী ইত্যাদি অবলোকন করেন। তো লেখকের লেখা যখন হবে পর্যটকের পথ চলা ও দৃশ্য অবলোকন করার অনুরূপ তখন সে লেখা হবে সুখপাঠ্য

বেশ আগে একটি গল্প পড়েছিলাম। লেখক গ্রামের বাড়ী যাচ্ছেন। তিনি লিখেছেন, 'রিকশায় উঠলাম এবং চারদিকে সবুজের দৃশ্য দেখতে দেখতে চললাম। রিকশার চালক একেবারে কঙ্কালসার, যেন গ্রামবাংলার অর্থনীতির বাস্তবচিত্র।'
দেখো, লেখক তার গ্রামের বাড়ী যাওয়ার গল্প শোনাচ্ছেন। এর সাথে দেশের অর্থনীতির তো কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু রিকশাওয়ালার কঙ্কালসার দেহকে উপলক্ষ করে তিনচার শব্দের একটি মাত্র উপমা দ্বারা গ্রামবাংলার অর্থনীতির দৈন্য ও কঙ্কালসারতার দিকে কত মর্মস্পর্শী ভাবে ইঙ্গিত করলেন। তাতে একটি লেখা কত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে গেলো!
একই লেখায় রয়েছে, রিকশাচালক যখন 'জ্বিসাব আপনের দয়া' বলে বিগলিত সম্বোধন করলো তখন লেখক মনে মনে ভাবলেন, 'দয়া! হায়, তুমি যদি জানতে, তোমার জাতভাইয়েরা শহরের সাবদের হাতে পথে ঘাটে কী দয়াটা ভোগ করে!'
দেখো, সামান্য একটি উপলক্ষকে অবলম্বন করে লেখক তার লেখায় আরেকটি মাত্রা যোগ করলেন এবং শহরের ভদ্রবেশী সাহেবদের হৃদয়হীনতা এবং রিকশা-চালকদের অসহায়ত্বের কী বাস্তব চিত্র আঁকলেন!
অবশ্য ভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণার উপলক্ষটি হতে হবে মানানসই ও যুক্তিসঙ্গত। যেমন রিকশাওয়ালার কঙ্কালসার দেহকে উপলক্ষ করে বাংলাদেশের কঙ্কালসার অর্থনীতির কথা মনে পড়া খুবই স্বাভাবিক ও মানানসই।
বিভিন্ন লেখা পড়ার সময় আশা করি, এ বিষয়টির প্রতি তুমি লক্ষ্য রাখবে। তাহলে তোমার কলমেও লেখার বহুমাত্রিকতার সৌন্দর্য ফুটে ওঠবে, ইনশাআল্লাহ।

---

১। আগে 'ছাহাবাদের সঙ্গে' কথাটা ছিলো না। শুধু একটা-দু'টো শব্দ নীচে নিয়ে ফাঁক সৃষ্টি করার চিন্তা থেকে এই সম্পাদনা, কিন্তু ভেবে দেখো সম্পদনাটুকুর প্রয়োজন ছিলো কি না!

২। 'মুর্খের পিতা' এ অংশটি আগে ছিলো না। লাইনের শব্দগুলো মাঝে অতিরিক্ত ফাঁক ভরাট করার চিন্তা থেকে এটা যোগ করা হয়েছে। ভেবে দেখো, তাতে অঙ্গসৌন্দর্যের সঙ্গে অর্থগত সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে কি না!

৩। আগে 'সমর্থনযোগ্য নয়' কথাটি উভয় স্থানে ছিলো।

৪। অথবা 'দর্শকদের উপচে পড়া আগ্রহ' অথবা 'যেমন উপচে পড়া দর্শক তেমনি তাদের উপচে পড়া আগ্রহ'

৫। আগে ছিলো, 'কিন্তু সরবরাহটা আসেনি'। আসেনি শব্দটি নীচের লাইনে থাকার কারণে উপরের লাইনে শব্দগুলোর মাঝে দৃষ্টিকটু পর্যায়ের ফাঁক ছিলো। তাই ভাবলাম, আসেনি শব্দটিকে দাঁড়িসহ উপরে আনতে হবে, কিন্তু কীভাবে? প্রথমে ভাবলাম 'তো'টা বাদ দেই, কিন্তু মনে হলো, তাতে অর্থসৌন্দর্য ক্ষুণ্ন হবে। তখন নযর গেলো 'সরবরাহটা' এর দিকে। একটি হরফ কমিয়ে দিয়ে লিখলাম 'সরবরাহে আসেনি', তাতেই আসেনি

লেখার দৃশ্যগত ও সজ্জাগত প্রয়োজনে এই যে সম্পাদনা করা হলো, তাতে চিন্তা করে দেখো তো, ভাষার সৌন্দর্য বেড়েছে না কমেছে?

৬। আগে ছিলো, 'ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে' এতে 'নষ্ট হয়ে যাবে'-এর পুনরুক্তির কারণে অসৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে। তাই প্রথমে 'নষ্ট'-এর স্থানে 'ক্ষুণ্ন' ব্যবহার করা হয়েছে। আর 'হয়ে যাবে, হয়ে যাবে'-এর চেয়ে 'হবে, হয়ে যাবে' বেশী ভালো। এই সম্পাদনাটি চিন্তা করে দেখো।

৭। তাহলে শব্দটি এখানে অপ্রয়োজনীয়, এটা বাদ দিয়ে দেখো। আশ্চর্য, এ খুঁতটা এত দিন নযরে আসেনি!

# লেখার ভাষা ও শরীরকাঠামো

('জেগে ওঠো অলসতার নিদ্রা থেকে' শিরোনামে পুষ্পের এক বন্ধুর নীচের লেখাটি পড়ো। সামনে আমরা এই লেখাটি ভাষা ও শরীরকাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।)

'বন্ধু, তুমি তো 'বিস্তির্ণ' জমিনের মাঝে গাছ দেখো, গাছে ফুল হতে, ফল হতে দেখো। কিন্তু এই বৃক্ষ, ফল ও ফুল নিয়ে কি কখনো ভেবেছো? জানো কি, কোথ থেকে তার সৃষ্টি? যখন মাটির বুকে একটি বীজ বপন করা হয় তখন সে মাটির বু চিরে অঙ্কুরিত হয় একটি ছোট্ট চারা। আস্তে আস্তে তা বড় হয়ে একটি বৃক্ষের রূপ ধারণ করে। কিছু দিন পরে তা থেকে শাখা-প্রশাখা বের হয়ে আসে। তারপর তা থেকে ফুল ও ফল হয়। ধীরে ধীরে সেটি অনেক বড় আকার ধারণ করে। তখন উত্তপ্ত রোদে মানুষ তার ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

গাছ যদি এই প্রখর রোদে মানুষকে তার শীতল ছায়াতলে আশ্রয় দিতে পারে তুমি কেন পারবে না এই দুর্যোগপূর্ণ পৃথিবীতে তোমার কলমের ছায়াতলে মানুষকে আশ্রয় দিতে! স্রষ্টার একটি ন্যূনতম সৃষ্টি দ্বারা মানুষ যদি এতটুকু উপকৃত হতে পারে তুমি তো সৃষ্টির সেরা! গাছ যদি এই যমিনের মাঝে তার শাখা-প্রশাখাকে বিস্তার করতে পারে তুমি কেন পারবে না তোমার কলম দ্বারা সত্যের আলোকে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিতে! তুমি তো সৃষ্টির সেরা! গাছ যদি তার ফুলের সুবাসে মানুষকে সুবাসিত করতে পারে তুমি কেন পারবে না তোমার ভাষার মাধুর্য দ্বারা মানুষকে মুগ্ধ করতে। হে বন্ধু! গাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। তোমার স্কন্ধে যে গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা বাস্ত-বায়নে 'আত্মনিয়োগ' করো। ঘাবড়িয়ে যাওয়ার কিছু নেই। প্রথমাবস্থায় হয়ত বা 'হোচট' খেতেও পারো। কিন্তু সে জন্য ভেঙ্গে পড়া আদৌ জ্ঞানী লোকের কাজ নয়। কেননা কষ্ট ব্যতীত কিছুই অর্জিত হয় না। ছোট্ট শিশু, সে প্রথমেই হাঁটতে শিখে না। পা উচিয়ে 'দাড়ানোর' গন্তব্যে পৌছানোর জন্য তাকেও চালিয়ে যেতে হয় অবিশ্রান্ত মেহনত। তাই এ সত্যকে 'উপলব্দি' করতে সচেষ্ট হও। জীবনের কাঙ্খিত গন্তব্যে পৌছানোর জন্য অবিরাম পরিশ্রম চালিয়ে যাও ইনশাআল্লাহ সফলতা তোমার পদচুম্বন করবেই।

*পর্যালোচনা*

প্রিয় মাহবুব! গত সংখ্যায় *‘জেগে ওঠো অলসতার নিদ্রা থেকে’* শিরোনামে তোমার লেখাটি হুবহু ছাপা হয়েছে, এখানে আমরা লেখাটি পর্যালোচনা করবো; প্রথমে শুধু ভাষাগত দিক থেকে, তারপর বিষয় ও কাঠামোর দিক থেকে। পর্যালোচনাটি পড়ার আগে গত সংখ্যায় মুদ্রিত তোমার লেখাটি কয়েকবার পড়ে নাও, যাতে আলোচনাটি বোঝা সহজ হয়।

তোমার লেখার শিরোনাম ‘জেগে ওঠো অলসতার ঘুম থেকে’ কিংবা ‘জাগ্রত হও অলসতার নিদ্রা হতে’ হলে ভালো হয়। নিদ্রার ক্ষেত্রে জাগ্রত হওয়া এবং ঘুমের ক্ষেত্রে জেগে ওঠা-এর ব্যবহার উত্তম।

০ তুমি লিখেছো– *‘বন্ধু, তুমি তো বিস্তির্ণ যমিনের মাঝে গাছ দেখো, গাছে ফুল হতে, ফল হতে দেখো। কিন্তু এই বৃক্ষ, ফুল ও ফল নিয়ে কি কখনো ভেবেছো?’ ‘জানো কি কোথা থেকে তার সৃষ্টি?’*

০০ আমার কথা হলো, বন্ধুদেরকে দেয়া অলসতা ত্যাগ করার উপদেশটি তুমি নিজে যদি অনুসরণ করতে এবং লোগাত থেকে ‘বিস্তির্ণ’, ‘আত্বনিয়োগ’, ‘উপলব্দি’ ‘কাঙ্খিত’ ইত্যাদি বানানগুলো দেখে নিতে, ভালো হতো।

০০ ‘ঘাবড়িয়ে যাওয়ার কিছু নেই, প্রথমে হয়ত হোচট খেতে পারো।’ হোচটের বানানে তুমি নিজেই কিন্তু ‘হোঁচট’ খেয়েছো। আরো কয়েকটি শব্দের চন্দ্রবিন্দু ছুটে গেছে। বানানে কেন এত অবহেলা, লোগাত দেখতে কেন এত অলসতা!

০০ ‘ঘাবড়িয়ে’ যাওয়া নয়, ঘাবড়ে যাওয়া’ অদ্রূপ আটকিয়ে যাওয়া এবং লটকিয়ে থাকা নয়, আটকে যাওয়া এবং লটকে থাকা। এমন ভুল আমরা করি, করা উচিত নয়।

০০ ‘মাঝে’ মানে মাঝখানে বা মধ্যে, শব্দটিকে তুমি সম্ভবত দ্বিতীয় অর্থে গ্রহণ করেছো। কিন্তু শব্দটি এখানে অপ্রয়োজনীয়। আর যমিন-এর পরিবর্তে ভূমি হলে ভালো হয়। বাক্যটি তুমি এভাবে লিখতে পারো, ‘বন্ধু, তুমি তো বিস্তীর্ণ ভূমিতে বৃক্ষ দেখেছো। বৃক্ষে ফুল ও ফল হতে দেখেছো, কিন্তু কখনো কি বৃক্ষ এবং তার ফুল ও ফল সম্পর্কে ভেবেছো?’

০০ একই বক্তব্যে বৃক্ষ বা গাছ– যে কোন একটি হওয়াই ভালো। তুমি গাছ ও বৃক্ষ দু'টোই লিখেছো।

০০ ‘দেখো’-এর বিপরীতে ‘ভাবো’ এবং ‘ভেবেছো’-এর বিপরীতে ‘দেখেছো’ হলে ভালো হয়, তুমি কিন্তু ‘দেখো’-এর পরে ‘ভেবেছো’ লিখেছো।

০০ এখানে বৃক্ষ দেখার বিষয়টি মুখ্য, দেখার স্থানটি নয়। তাই *‘বিস্তীর্ণ* ভূমিতে’ না বললেও চলে।

০০ *‘জানো কি কোথা থেকে তার সৃষ্টি?’* এটি মূলত প্রথম প্রশ্নের পুনরুক্তি, তাই

অপ্রয়োজনীয়, এটি বাদ দিলেই ভালো। যদি রাখতেই হয়, তাহলে অন্তত 'জানো কি'- অংশটুকু বাদ দাও। এবার পুরো বক্তব্যটি দেখো–

'বন্ধু, তুমি তো বৃক্ষ দেখেছো এবং দেখেছো বৃক্ষের ফুল ও ফল, কিন্তু কখনো কি ভেবেছো, কীভাবে হয় বৃক্ষ এবং ফুল ও ফল? (কোত্থেকে/ কীভাবে এগুলোর সৃষ্টি?)'

০ তুমি লিখেছো, *'যখন মাটির বুকে একটি বীজ বপন করা হয় তখন সে মাটির বুক চিরে বের হয় একটি ছোট্ট চারা। আস্তে আস্তে তা বড় হয়ে একটি বৃক্ষের রূপ ধারণ করে।'*

০০ আমরা কি মাটির বুকে বীজ বপন করি, না মাটিতে?

০০ 'যখন ও তখন' শৈলীটি এখানে ঠিক নয়; এর বিকল্প হতে পারে, 'মাটিতে বীজ বপন করলে মাটির বুক চিরে ...।'

০০ 'সে মাটির'- এখানে 'সে' শব্দটি অতিরিক্ত। কারণ জানা কথা যে, যে মাটিতে বপন করা হবে সে মাটির বুক চিরেই চারা বের হবে, অন্য মাটির বুক চিরে নয়।

০০ বীজ থেকে প্রথমে যা বের হয় তা চারা নয়, অঙ্কুর; অঙ্কুরের পরবর্তী স্তর হলো চারা।

০০ *'বৃক্ষের রূপ ধারণ করে, বা বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়'*, এ জাতীয় পোশাকি শব্দের চেয়ে এখানে সহজ শব্দই উত্তম। যেমন, 'একটি পূর্ণ বৃক্ষ হয়, বা একটি পূর্ণ বৃক্ষে পরিণত হয়।'

০০ বাক্যটি বড় হওয়ায় ভেঙ্গে দু'টি বাক্য করে নিলে ভালো হতো। পুরো বক্তব্যটি এমন হতে পারে–

*'আমরা মাটিতে বীজ বপন করি; বীজ থেকে অঙ্কুর হয়, অঙ্কুর থেকে হয় চারা। চারাটি ধীরে ধীরে বড় হয় এবং একটি পূর্ণ বৃক্ষ হয়।'*

০০ *'বীজ থেকে অঙ্কুর হয়'*-এর বদলে হতে পারে, *'আমরা মাটিতে বীজ বপন করি; কিছুদিন পর মাটির বুক চিরে একটি সবুজ অঙ্কুর বের হয়।'*

০ তুমি লিখেছো, *'কিছুদিন পর তা থেকে শাখা-প্রশাখা বের হয়ে আসে। তারপর তা থেকে ফুল ও ফল হয়। ধীরে ধীরে সেটি অনেক বড় আকার ধারণ করে। তখন উত্তপ্ত রোদে মানুষ তার ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।'*

০০ বৃক্ষ তো শাখা-প্রশাখা ছাড়া হয় না। সুতরাং 'বৃক্ষের রূপ ধারণ করার' কিছুদিন পর শাখা-প্রশাখা বের হবে কেন?

০০ *'তারপর তা থেকে ফুল ও ফল হয়'*, এখানে *'তারপর'* সম্পর্কে একই কথা। অর্থাৎ যখন *'বৃক্ষের রূপ ধারণ করে'* তখনই ফুল ও ফল আসে। সুতরাং *'তারপর'* বলার প্রয়োজন নেই।

০০ 'তা থেকে' শাখা-প্রশাখা বের হয়, কথাটি চলে, কিন্তু 'তা থেকে' ফুল ও ফল

০০ সাধারণ বৃক্ষই ছায়া দিতে পারে সুতরাং *'ধীরে ধীরে অনেক বড় আকার ধারণ করার'* দরকার নেই।

০০ *'মানুষ তার ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে'*, এখানে যেহেতু বৃক্ষের অবদান আলোচনা করা উদ্দেশ্য; তাই মানুষ কী করে-এর পরিবর্তে বলা উচিত বৃক্ষ কী করে, যেমন– *'তখন উত্তপ্ত রোদে মানুষকে সে ছায়া দান করে।'*

০০ কথাটি এভাবে লিখতে পারো– 'ধীরে ধীরে তা বড় হয় এবং পূর্ণ বৃক্ষ হয়। তখন তাতে ফুল ধরে, ফল ধরে এবং মানুষকে তা ছায়া দান করে।'

তোমার বক্তব্যে যে অপ্রয়োজনীয় স্ফীতি ছিলো, দেখো, পরিমার্জনের পর তা কত সুসংক্ষিপ্ত হয়েছে! যেন বক্তব্যের শরীর থেকে ভাষার অপ্রয়োজনীয় মেদগুলো ঝরে গেছে।

০ তুমি লিখেছো, *'গাছ যদি এই প্রখর রোদে মানুষকে তার শীতল ছায়াতলে আশ্রয় দিতে পারে, তুমি কেন পারবে না এই দুর্যোগপূর্ণ পৃথিবীতে তোমার কলমের ছায়াতলে মানুষকে আশ্রয় দিতে? একটি ন্যূনতম সৃষ্টি দ্বারা যদি মানুষ এতটুকু উপকৃত হতে পারে, তুমি তো সৃষ্টির সেরা!*

০ *'এই প্রখর রোদে'*, এই দ্বারা এখানে কোন্ প্রখর রোদের দিকে ইশারা করছো? এর কী দরকার?

০০ শীতল ছায়ায়, কিংবা শুধু 'ছায়াতলে', বলা ভালো, 'শীতল ছায়াতলে'-এর প্রচলন নেই।

০০ ন্যূনতম শব্দটি পরিমাণগত স্বল্পতা বোঝায়, তুমি সম্ভবত বলতে চেয়েছো 'ক্ষুদ্রতম'। গাছ ন্যূনতম বা ক্ষুদ্রতম সৃষ্টি নয়, ক্ষুদ্র হতে পারে।

০০ 'এতটুকু' মানে খুব সামান্য, যেমন– 'আমি তোমার জন্য এত করলাম, আর তুমি আমার জন্য এতটুকু করবে না!' সুতরাং তোমাকে লিখতে হবে, *'একটি ক্ষুদ্র সৃষ্টি দ্বারা যদি মানুষ এত উপকৃত হতে পারে।'*

০০০ মানুষ যদি এতটুকু উপকৃত হতে পারে– এখানেও মানুষ প্রধান, গাছ পরোক্ষ, অথচ হওয়া উচিত উল্টো। যেমন, 'ক্ষুদ্র সৃষ্টি হয়ে গাছ যদি মানুষের এত উপকার করতে পারে ...।

তবে চিন্তা করলে তুমিও বুঝবে যে, এ বক্তব্যে শেষ বাক্যটি না হলেও চলে, যেমন–

'প্রখর রোদে গাছ যদি মানুষকে তার ছায়াতলে/ শীতল ছায়ায় আশ্রয় দিতে পারে তাহলে তুমি কেন পারবে না ফেতনা ফাসাদের রোদ থেকে মানুষকে তোমার কলমের ছায়ায় আশ্রয় দিতে!

০ তুমি লিখেছো, *'গাছ যদি যমিনের মাঝে তার শাখা-প্রশাখাকে বিস্তার করতে পারে তাহলে তুমি কেন পারবে না তোমার কলম দ্বারা সত্যের আলোকে পৃথিবীর*

০০ 'যমিনে' অর্থ পৃথিবী হোক বা মাটি, কথা হলো, গাছ পৃথিবীতে বা মাটিতে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে না, বরং শূন্যে বিস্তার করে; সুতরাং তুমি বলতে পারো, *'গাছ যদি তার শাখা-প্রশাখা এতদূর বিস্তার করতে পারে, তাহলে ...'*

০০ 'কলম দ্বারা'- অংশটি এখানে অপ্রয়োজনীয়, কারণ প্রথমত গাছের ক্ষেত্রে 'কিছু দ্বারা' বিস্তার করার কথা নেই, সুতরাং দ্বিতীয় অংশেও 'কিছু দ্বারা' না থাকাই সঙ্গত। দ্বিতীয়ত সত্যের প্রচার শুধু কলম দ্বারা হয় না, অন্য কিছু দ্বারাও হয়! তাই তোমার লেখা উচিত– 'তাহলে তুমি কেন পারবে না পৃথিবীতে সত্যের আলো ছড়িয়ে দিতে!

০ তুমি লিখেছো, 'গাছ যদি মানুষকে তার ফুলের সুবাস দ্বারা সুবাসিত করতে পারে, তুমি কেন পারবে না তোমার ভাষার মাধুর্য দ্বারা মানুষকে মুগ্ধ করতে।

০ এখানে গাছের ক্ষেত্রে 'কিছু দ্বারা' রয়েছে, তাই দ্বিতীয় অংশেও 'কিছু দ্বারা' থাকা সঙ্গত। কিন্তু কথা হলো, সাধারণভাবে ফুলের সুবাস হচ্ছে উত্তম চরিত্রের উপমা, ভাষা-মাধুর্যের নয়, অবশ্য জ্ঞানের ক্ষেত্রেও এ উপমা গ্রহণযোগ্য। সুতরাং তুমি এভাবে লিখতে পারো– 'গাছ যদি ফুলের সুবাস দ্বারা মানুষকে সুবাসিত করতে পারে, তুমি কেন পারবে না তোমার চরিত্রের/ জ্ঞানের সুবাস দ্বারা মানুষকে সুবাসিত করতে?'

০ তুমি লিখেছো, *'তোমার স্কন্ধে যে গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে ...'*

০০ অপ্রয়োজনে কঠিন শব্দ ব্যবহার করা ঠিক নয়, এখানে তুমি সহজ শব্দ ব্যবহার করে বলতে পারো, 'তোমার কাঁধে যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে ...'
তদ্রূপ কষ্ট ব্যতীত-এর পবিবর্তে বলতে পারো, 'কষ্ট ছাড়া'।

০ তুমি লিখেছো, ছোট্ট শিশু, প্রথমেই সে হাঁটতে শিখে না; পা উঁচিয়ে দাঁড়ানোর গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য তাকেও চালিয়ে যেতে হয় অবিশ্রান্ত মেহনত।

০০ কথাটি এত না পেঁচিয়ে সহজ করে বলতে পারো–
'ছোট্ট শিশু প্রথমেই তো হাঁটতে পারে না! নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য/ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শেখার জন্য তাকেও তো ...।'

০০ 'চালিয়ে যেতে হয় অবিশ্রান্ত মেহনত'- এটি বড়দের উপযোগী কথা। শিশুরা হাঁটতে শেখার জন্য বারবার চেষ্টা করে। বড়রা কিছুর জন্য অবিশ্রান্ত/অবিরাম মেহনত /পরিশ্রম/ চেষ্টা চালিয়ে যায়।

০০ এবার নীচের সম্পাদনাটুকু তোমার মূল লেখাটির সঙ্গে মিলিয়ে তুলনামূলকভাবে পড়ো–

### জেগে ওঠো অলসতার ঘুম থেকে

'বন্ধু, তুমি তো বিস্তীর্ণ ভূমিতে বৃক্ষ দেখেছো। বৃক্ষে ফুল ও ফল হতে দেখেছো, কিন্তু কখনো কি বৃক্ষ এবং তার ফুল ও ফল সম্পর্কে ভেবেছো?
আমরা মাটিতে বীজ বপন করি; বীজ থেকে অঙ্কুর হয়, অঙ্কুর থেকে হয় চারা।

চারাটি ধীরে ধীরে বড় হয় এবং একটি পূর্ণ বৃক্ষ হয়। তখন তাতে ফুল ধরে, ফল ধরে এবং মানুষকে তা ছায়া দান করে।

প্রখর রোদে গাছ যদি মানুষকে তার ছায়াতলে/ শীতল ছায়ায় আশ্রয় দিতে পারে তাহলে তুমি কেন পারবে না ফেতনা ফাসাদের রোদ থেকে মানুষকে তোমার কলমের ছায়ায় আশ্রয় দিতে!

গাছ যদি তার শাখা-প্রশাখা এতদূর বিস্তার করতে পারে, তাহলে তুমি কেন পৃথিবীতে সত্যের আলো ছড়িয়ে দিতে পারবে না!

গাছ যদি ফুলের সুবাস দ্বারা মানুষকে সুবাসিত করতে পারে, তুমি কেন পারবে না তোমার চরিত্রের/জ্ঞানের সুবাস দ্বারা মানুষকে সুবাসিত করতে?

হে বন্ধু, গাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো এবং তোমার কাঁধে যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা বাস্তবায়নের সাধনায় আত্মনিয়োগ করো। ভয় পাওয়ার বা হতাশায় ভেঙ্গে পড়ার কোন কারণ নেই। জীবনের শুরুতে কিছু ভুলত্রুটি, কিছু ব্যর্থতা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু চেষ্টা ও সাধনা অব্যাহত রাখতে হবে। ছোট্ট শিশু প্রথমেই তো হাঁটতে পারে না! নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য/ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শেখার জন্য তাকেও তো বারবার চেষ্টা করতে হয়! সুতরাং জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য তুমিও নিরন্তর সাধনা ও পরিশ্রম করে যাও। একদিন অবশ্যই সফলতা অর্জিত হবে।

***

প্রিয় মাহবুব! এতক্ষণ তোমার লেখাটির বিষয়কাঠামো অক্ষুণ্ন রেখে শুধু ভাষাগতত্রুটিগুলো আলোচনা করা হয়েছে। এখন আমরা লেখাটির বিষয় ও কাঠামো সম্পর্কে কিছু বলবো।

তোমার লেখাটির মূল বিষয় হলো গাছের জীবন ও তার অবদান উল্লেখ করে মানুষকে জীবন গড়ে তোলার এবং মানবসমাজের জন্য অবদান রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। তাহলে এটি একটি উপমাভিত্তিক লেখা এবং এর বিষয়বস্তুর দু'টি বাহু রয়েছে। প্রথমটি হলো গাছ (যা এখানে উপমান) দ্বিতীয়টি হলো মানুষ (যা এখানে উপমেয়)

বিষয়বস্তুটিকে তুমি যে কাঠামোতে সাজিয়েছো তা এই-

(ক) গাছ যেমন অঙ্কুর থেকে ধীরে ধীরে পূর্ণ বৃক্ষরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, তেমনি মানুষকেও চেষ্টা করতে হবে তার যোগ্যতাকে ধীরে ধীরে পূর্ণরূপে বিকশিত করার।

(খ) গাছের একটি সাধনা ও তিনটি অবদান। সাধনা হচ্ছে বীজ থেকে ধীরে ধীরে বড় হওয়া, আর অবদান তিনটি হচ্ছে ছায়া, ফুল ও ফল দান করা। এর বিপরীতে মানুষের একটি সাধনা ও তিনটি অবদান থাকা উচিত। অর্থাৎ (ক) তার ভিতরে

ছায়া দান করা। (গ) ফুলের সুবাসের মত চরিত্রের/জ্ঞানের সুবাস দান করা। (ঘ) গাছের সুস্বাদু ফলের মত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং ন্যায় ও সত্যের সুমিষ্ট ফল দান করা।
(গ) উদ্বোধনী ও সমাপ্তি বক্তব্য (ঘ) শিরোনাম

এবার আমরা উপরোক্ত বিষয় ও কাঠামোর বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে আলোচনা করছি।

(ক) যে কোন লেখার শিরোনাম খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিরোনাম সঙ্গতিপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক হওয়া জরুরী। সে হিসাবে তোমার লেখার শিরোনাম যদি হতো 'গাছ থেকে শিক্ষা' কিংবা 'তুমি হও বৃক্ষের মত' তাহলে তা বিষয়বস্তুর সঙ্গে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ হতো।

(খ) উদ্বোধনী অংশে তুমি পাঠককে বন্ধু বলে সম্বোধন করেছো এবং বৃক্ষের সাথে তার পরিচয়ের সূত্র উল্লেখ করে গাছের অবস্থা সম্পর্কে কখনো সে চিন্তা করেছে কি না তা জানতে চেয়েছো। এখানে প্রশ্নের উদ্দেশ্য দু'টি, পাঠককে বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মাধ্যমে আলোচনাকে সামনে এগিয়ে নেয়া।

এদিক থেকে বলা যায়, তোমার উদ্বোধনী অংশটি সার্থক। কোন লেখা মানোত্তীর্ণ হওয়ার জন্য উদ্বোধনী অংশটি সুন্দর ও আকর্ষণীয় হওয়া জরুরী।

(গ) বৃক্ষের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে তুমি আলোচনা করেছো এভাবে–
*'আমরা মাটিতে বীজ বপন করি; বীজ থেকে অঙ্কুর হয়, অঙ্কুর থেকে হয় চারা। চারাটি ধীরে ধীরে বড় হয় এবং একটি পূর্ণ বৃক্ষ হয়।'* এটি হলো গাছের সাধনার অংশ।

তো উপমানের এ অংশটির বিপরীতে তুমি উপমেয়-এর সংশ্লিষ্ট অংশটি উল্লেখ করোনি।১ না করেই তুমি উপমানের দ্বিতীয় বিষয় ছায়াদান প্রসঙ্গে চলে গিয়েছো। তাই তোমার লেখার দেহকাঠামোটি ক্ষুণ্ন হয়েছে। এখানে তুমি গাছের সাধনার বিপরীতের মানুষের সাধনারূপে নীচের অংশটি যোগ করতে পারতে–
'বন্ধু, তোমারও মাঝে নিহিত রয়েছে বিরাট যোগ্যতার বীজ। আজ থেকে তোমাকে এক নিরন্তর সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে, ধীরে ধীরে তোমার যোগ্যতা যেন শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত একটি পূর্ণ বৃক্ষরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, যার শীতল ছায়া থাকবে, ফুল থাকবে এবং ফল থাকবে। তাহলেই বৃক্ষ যেমন মানবের জন্য বহু কল্যাণের আধার, তুমিও তেমনি হতে পারবে মানবজাতির জন্য বহুমুখী কল্যাণের উৎস।

*(পরবর্তী প্রসঙ্গে যাওয়ার জন্য যোগসূত্ররূপে তুমি সামনের কথাটি যোগ করতে পারো–)*

'***এবং তোমাকে তা পারতেই হবে।*** বৃক্ষ যদি পারে তুমি কেন পারবে না? প্রখর রোদে গাছ যদি মানুষকে তার ছায়াতলে/শীতল ছায়ায় আশ্রয় দিতে পারে, তুমি কেন পারবে না ফেতনা ফাসাদের রোদ থেকে মানুষকে তোমার কলমের ছায়ায় আশ্রয় দিতে!'

০ তুমি তোমার লেখাটির যে দেহকাঠামো নির্মাণ করেছো তার দ্বিতীয় ত্রুটিটি পরবর্তী অংশে। দেখো–

*'গাছ যদি তার শাখা-প্রশাখা এতদূর বিস্তার করতে পারে, তাহলে তুমি কেন পৃথিবীতে সত্যের আলো ছড়িয়ে দিতে পারবে না!'*

০ আগে তুমি বলে এসেছো, গাছ যদি তার শীতল ছায়ায় মানুষকে আশ্রয় দিতে পারে....' তো গাছ ছায়া দান করে কী দ্বারা? নিজের শাখা-প্রশাখা দ্বারা, তাই না? তার মানে শাখা-প্রশাখা দ্বারা ছায়া দান করার কথা একবার বলা হয়ে গেছে, এখন তাহলে দ্বিতীয়বার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করার প্রসঙ্গ আসছে কীভাবে? তাহলে এটা হচ্ছে অতিরিক্ত এবং অপ্রয়োজনীয় অংশ।

তাছাড়া বৃক্ষের শাখা বিস্তার এবং পৃথিবীতে সত্যের আলো ছড়িয়ে দেয়া– এ দুইয়ের মধ্যে পূর্ণ সাদৃশ্য কোথায়?

সর্বোপরি উপমার শুরুতে তুমি ছায়া, ফুল ও ফল এই তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছো, কিন্তু পরে ছায়া ও ফুলের কথা এলেও ফলের কথা বাদ পড়েছে এবং উপমার অঙ্গহানি ঘটেছে। (যেমন, 'প্রখর রোদে গাছ যদি মানুষকে তার ছায়াতলে/ শীতল ছায়ায় আশ্রয় দিতে পারে তাহলে তুমি কেন পারবে না ফেতনা ফাসাদের রোদ থেকে মানুষকে তোমার কলমের ছায়ায় আশ্রয় দিতে!' এটা হলো ছায়ার ক্ষেত্রে উপমা, তারপর 'গাছ যদি ফুলের সুবাস দ্বারা মানুষকে সুবাসিত করতে পারে, তুমি কেন পারবে না তোমার চরিত্রের/জ্ঞানের সুবাস দ্বারা মানুষকে সুবাসিত করতে?' এটা হলো ফুলের ক্ষেত্রে উপমা। কিন্তু উপমানের 'ফল' অংশটির বিপরীতে উপমেয় কোন বিষয় নেই।) তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, এদিকে উপমানে একটি অতিরিক্ত অংশ আছে, (আর তা হলো, 'গাছ যদি তার শাখা-প্রশাখা এতদূর বিস্তার করতে পারে ....) ওদিকে উপমেয়-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাদ পড়েছে। (অর্থাৎ ফলের বিপরীত অংশটি।)

সুতরাং তুমি এক কাজ করো। অতিরিক্ত অংশটি কেটে দাও এবং ছায়াপ্রসঙ্গ ও ফুলপ্রসঙ্গের পর ফলের অংশটি এভাবে যোগ করো–

'গাছে গাছে দেখো কত সুস্বাদু ফল ধরে। একটি গাছ যদি মানুষকে এত সুস্বাদু ফল উপহার দিতে পারে, তুমি কেন পারবে না তোমার জাতি ও সমাজকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এবং ন্যায় ও সত্যের সুমিষ্ট ফল উপহার দিতে?

(ঘ) এরপর সমাপ্তি অংশ। সেটি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হয়েছে। এখানে তুমি তোমার বন্ধুকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছো, যাতে সাধনার পথে প্রতিকূলতা বা কষ্ট

দেখে সে পিছিয়ে না আসে। উদাহরণ হিসাবে শিশুর হাঁটতে শেখার বিষয়টি যথেষ্ট উপযোগী। যদি হাঁটার চন্দ্রবিন্দুটি ছুটে না যেতো তাহলে এ উদাহরণটির জন্য একটি ধন্যবাদ তোমার প্রাপ্য হতো।

যাই হোক, আমি আশা করি, উপরের পর্যালোচনাটি তুমি গভীর মনোযোগের সাথে পড়বে, তারপর আগামী পত্রে এসম্পর্কে তোমার মন্তব্য ও মতামত জানাবে এবং আমার আশংকা – আল্লাহ না করুন – তুমি তা করবে না। অন্তত আমার পিছনের অভিজ্ঞতা তাই বলে। তবে আল্লাহর রহমতে আমার তো কিছু শেখা হলো! এইটুকু সান্ত্বনা নিয়ে এখনো কলম ধরে বসে আছি। 'হিম্মত শিক্ন' পরিবেশে যারা কাজ করতে চায়, তাদের আমি সবসময় বলি, কাজ করে যাও, কারণ কাজ থেকে তুমি যা শিখবে, তা কেউ নিতে পারবে না।

যাক, কথা শেষ করার আগে শেষ কথাটি বলছি, তুমি লিখেছো– 'শুরুতেই ঘাবড়ে যাওয়ার কারণ নেই। প্রথমাবস্থায় হয়ত বা 'হোচট' খেতে পারো।'

ঠিক, তাছাড়া তোমাদের বয়সে আমরা যেমন লিখতাম তোমরা তো তার চেয়ে ভালো লিখছো। তোমাদের লেখায় আমাদের চেয়ে অনেক বেশী সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেন নয়! আমাদের সময় কি পুষ্প ছিলো! বাংলাভাষা চর্চার এবং লেখা শেখার এত আনুকূল্য ছিলো?

সুতরাং তুমি যেমন বলেছো, 'জীবনের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছার জন্য অবিরাম পরিশ্রম চালিয়ে যেতে।' সেটা যদি অন্তত তুমি নিজে করো তাহলে সাফল্য তোমার 'পদচুম্বন' না করুক, ললাটচুম্বন তো অবশ্যই করার কথা! *(একটি 'মধ্য লাইনের' কথা শোনো, এখানে তুমি সফলতাকে একজন ব্যক্তিরূপে কল্পনা করেছো, যে কিনা উপুড় হয়ে তোমার পায়ে চুমু খাবে। সফলতা তো তোমার কাঙ্ক্ষিত ও প্রিয় বিষয়, তার জন্য কি এমন হীনতার চিত্র শোভনীয়? পক্ষান্তরে ললাটচুম্বনে অন্তরঙ্গতা ও আপনত্বের যে সুন্দর চিত্রটি ফুটে ওঠে সেটাই কি সফলতার জন্য শোভনীয় নয়? 'তুমি যদি দুনিয়াকে পদাঘাত করো, তাহলে দুনিয়া তোমার পদচুম্বন করবে', যলিল ও লাঞ্ছিত দুনিয়ার ক্ষেত্রে অবশ্য এ কল্পচিত্রটি ঠিক আছে)*

০ তোমার লেখার এই যে কঠিন 'ময়নাতদন্ত' করা হলো, এর অর্থ কিন্তু এ নয় যে, তোমার লেখা আশাব্যঞ্জক হয়নি, বরং আমাদের সময়ের চেয়ে ভালো হয়েছে। কিন্তু আমার দুঃখ কোথায় জানো! তুমি যে গুরুগম্ভীর উপদেশ দিলে তোমার বন্ধুদেরকে, তোমার লেখা থেকে আমার মনে হয়নি যে, সে উপদেশ তুমি নিজে মেনে চলছো। অন্যসব থাক, তুমি কি অভিধান খোলার সামান্য কষ্টটুকু স্বীকার করেছো? তাহলে কি এতগুলো বানান ভুল থাকতো! আরেকটি কথা, এই লেখাটি তৈরী হওয়ার পর তার পরিমার্জনে কী পরিমাণ পরিশ্রম তুমি করেছো? আমি তো অযত্নের প্রচুর ছাপ দেখতে পেয়েছি; এমনকি সম্ভবত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার পর

ইকার-উকার বাদ যাওয়ার মত কাণ্ড ঘটতে পারতো না। যেমন তুমি লিখেছো, 'গাছ যদি ... দিতে পারে, তুমি কেন পারবে?' অর্থাৎ 'না' ছুটে গেছে। তা যেতেই পারে, কিন্তু দ্বিতীয়বার দেখলে কি এ ত্রুটি বহাল থাকতে পারে!

এটাই আমার দুঃখ ও দুশ্চিন্তার কারণ। অবস্থা বলে, আমরা লেখার প্রতি আন্তরিক নই; আমরা কলমের প্রতি বিশ্বস্ত নই। আবারও বলছি, তোমার লেখা মোটামুটি ভালো, কিন্তু তুমি এবং তোমরা লেখার যত্ন ও পরিচর্যার প্রতি যথেষ্ট, যথেষ্ট এবং যথেষ্ট উদাসীন ও অলস। সুতরাং যদি পারো, 'জেগে ওঠো অলসতার নিদ্রা থেকে'! আর শোনো, পাঠককে সম্বোধন করে উপদেশমূলক কিছু লেখাটা তাদের কাজ, যারা বয়সে ও লেখালেখিতে প্রবীণ, নবীন ও ছোটদের কাজ নয়। তোমার লেখাটি আত্মসম্বোধনমূলক হলে বেশী ভালো হতো।

জানি, বাংলাসাহিত্যে আমি নিজেই এত পিছিয়ে আছি যে, অন্যকে আমার কিছু বলার অধিকার নেই। কিন্তু পথচলতে সাহায্য করার জন্য কিছু বলা ছাড়া উপায়ও যে নেই! আর বলতে গিয়ে আমারও ভুল হতে পারে, অবশ্যই হতে পারে। কারণ এ লেখার মাধ্যমে 'আমিও তো শিখছি, কীভাবে একজন 'শিশু'কে হাত ধরে হাঁটা শেখাতে হয়।' সুতরাং আমার ভুলের দিকে তাকিও না, আন্তরিকতার দিকে তাকাও এবং নতুন উদ্যমে নিরন্তর সাধনায় আত্মনিয়োগ করো। আল্লাহ আমাদের এবং তোমাদের সকলের সহায় হোন, আমীন।

---

১। সেটি হচ্ছে মানুষের ভিতরের যোগ্যতা ও প্রতিভার বীজ, যা একসময় ফলে ফুলে সুশোভিত ও ছায়াময় হতে পারে।

# লেখার শরীরকাঠামো

আজকের মজলিসে আমাদের আলোচনা হবে শুধু 'লেখার শরীর' সম্পর্কে। মানুষের যেমন শরীর ও দেহ রয়েছে তেমনি আমরা যেসব গল্প-প্রবন্ধ লিখি সেগুলোরও একটা শরীর ও দেহ রয়েছে। মানবদেহ সুঠাম ও মেদহীন হলে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিকঠাক থাকলে তা হয় সুন্দর ও সুদর্শন। পক্ষান্তরে মোটা বা কঙ্কালসার হলে, মেদ বা ভুঁড়ি দেখা দিলে, কিংবা কোন অঙ্গহানি ঘটলে তা হয় অসুন্দর ও কুদর্শন। আমাদের যে কোন লেখার শরীরকাঠামো সম্পর্কে একই কথা।

লেখার যে অংশ যেমন হওয়ার, তেমন না হলে সে লেখা হবে অসুন্দর। যেমন মূল বিষয়ের চেয়ে প্রাসঙ্গিক ও গৌণ বিষয়টি বেশী দীর্ঘ হলো, অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় কোন বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটলো, প্রয়োজনীয় কোন অংশ বাদ গিয়ে লেখার অঙ্গহানি হলো, আগের বিষয় পরে এবং পরের বিষয় আগে এসে গেলো ইত্যাদি। এমন হলে তোমার লেখার সৌন্দর্য ও গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং গল্প বা প্রবন্ধের এবং যে কোন লেখার শরীরকাঠামো যেন যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ হয়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

অবশ্য প্রথমবার যখন লেখাটা দাঁড় করানো হয় তখন এসব দিক ভেবে দেখার খুব একটা সুযোগ থাকে না। এক্ষেত্রে সঠিক পন্থা এই যে, লেখার শরীরকাঠামো ও ভাষা সম্পর্কে বিশেষ চিন্তা-ভাবনা না করে যেমনই হোক প্রথমে লেখাটা তৈরী করে ফেলো। তারপর পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন, সংক্ষেপন বা বিশদায়নের মাধ্যমে লেখাটির শরীরকাঠামোর সংস্কার সাধন করো। এ ক্ষেত্রে তোমাকে লেখার প্রতিটি অংশ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা ও চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে।

শরীরকাঠামোর পর আসে ভাষাসৌন্দর্যের প্রশ্ন। সুঠাম-সুন্দর দেহের জন্য যেমন সুন্দর পোশাক চাই তেমনি তোমার লেখার যে শরীরকাঠামো সেটার জন্য চাই সুন্দর ভাষার সুন্দর একটি পোশাক। সুন্দর পোশাক যেমন সুঠাম দেহকে আরো

সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলে তেমনি সুন্দর শরীরকাঠামোসম্পন্ন লেখাও ভাষার ভূষণ এবং শব্দের অলঙ্কারে হয়ে ওঠে আরো সৌন্দর্যমণ্ডিত ও আবেদনপূর্ণ। তবে বারবার বলা সেই কথাটি এখানে আবার বলতে হবে। আর তা এই যে, লেখার শরীর বলো, পোশাক বলো, সেটার পরিচর্যার কাজটা তোমাকে করতে হবে মূল লেখাটি তৈরী হয়ে যাওয়ার পর। সেটা হতে পারে একবার, দু'বার, তিনবার এবং বারবার; একদিন, দু'দিন, তিনদিন এবং বহু দিন।

লেখার পোশাক তথা ভাষার ভূষণ ও শব্দের অলঙ্কার, এটা অবশ্য আমাদের আজকের আলোচ্যবিষয় নয়। এখানে আজ আমরা শুধু লেখার শরীরকাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

হতে পারে যে, মূল লেখাটির চেয়ে তার শরীরকাঠামোর সংস্কার এবং ভাষাসৌন্দর্য সৃষ্টির কাজে কয়েকগুণ বেশী সময় লেগে যাবে। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় এমনও হয়েছে যে, একদিন হঠাৎ করে আকাশে ভাসমান মেঘের আল্পনা দেখে হৃদয়ে একটি ভাবের উদয় হলো এবং অদ্ভুত এক তরঙ্গদোলা অনুভূত হলো। কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেলাম, আর দশ মিনিটের মধ্যে একটি লেখা তৈরী হয়ে গেলো। বলা ভালো যে, কলমের মুখ দিয়ে কাগজের বুকে লেখাটি নেমে এলো। চল্লিশ পঞ্চাশ শব্দের ছোট্ট একটি লেখা। এর পর কয়েক দিন পার হয়ে গেলো। লেখাটি যেমন ছিলো তেমনি পড়ে থাকলো। একসময় মনে হলো, লেখাটি দেখি একবার! সারাটা দিন চলে গেলো লেখাটির যত্ন ও পরিচর্যায়। তাতে শরীর-কাঠামো বৃদ্ধি পেলো কিছুটা। যেন একদিনের শিশু হলো একমাসের শিশু। ভাষাও সুন্দর হলো কিছুটা। এভাবে প্রায় বিশ/পঁচিশ দিনের লাগাতার পরিশ্রমের পর লেখাটি ভাষা ও শরীরকাঠামো উভয় দিক থেকে মনের মত হলো। লেখাটি তখন যেন পঁচিশ বছরের সুঠাম-সুদর্শন এক যুবক। স্বভাবতই আগের সেই ছোট্ট পোশাকটি নেই। ভাষায় শব্দে অনেক পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন হলো। তাতে নতুন নতুন সৌন্দর্য সৃষ্টি হলো। সবাই লেখাটির ভূয়সী প্রশংসা করলো। আমি তখন তাদেরকে একদিনের সেই ছোট্ট 'শিশু লেখাটি' দেখালাম। তারা অবাক হয়ে গেলো যে, এই লেখাটি শেষ পর্যন্ত ঐরূপ ধারণ করেছে!
চার সাড়ে চারশ শব্দের লেখাটি পড়তে তাদের কতক্ষণ লেগেছে! বড় জোর পাঁচ মিনিট। আমার লিখতে লেগেছে দশমিনিট, আর 'তৈরী' করতে লেগেছে পঁচিশ দিন! এভাবেই হয়েছে, এভাবেই হয়, এছাড়া কখনো হয়নি, কখনো হয় না, কখনো হবেও না।

এসব কথা বলার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো তোমাকে একথা বোঝানো যে, লেখার জন্য তোমাকে সাধনা করতে হবে এবং লেখার সংস্কার ও পরিমার্জনের পিছনে তোমাকে লাগাতার পরিশ্রম করতে হবে। তাহলেই তুমি হতে পারবে সফল ও

আদর্শ একজন লেখক এবং তোমার লেখা তার দেহসৌষ্ঠবে এবং পোশাকসৌন্দর্যে, তথা ভাষার ভূষণ ও শব্দের অলঙ্কারে পাঠকচিত্ত জয় করবে, যদিও তোমার উদ্দেশ্য হবে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা, মানুষের সন্তুষ্টি ও প্রশংসা নয়। যাক, এবার আমি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আরো স্পষ্টরূপে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

পুষ্পের বন্ধু ফাহীম সিদ্দীকী পুষ্পের পাতায় প্রকাশের জন্য 'আমার প্রিয় পুষ্প' নামে একটি লেখা পাঠিয়েছে। বয়সের বিচারে তার লেখাটি মোটামুটি ভালোই হয়েছে এবং পুষ্পের পাতায় প্রকাশিতও হয়েছে। তবে লেখাটি সম্পর্কে আলোচনার আগে আমি তোমাদের একটি জরুরি কথা বলতে চাই। তা এই যে, পুষ্পের পাতায় তোমাদের লেখাগুলো প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের নীতি হলো, 'লেখক-পাঠক উভয়ের কল্যাণ'। এজন্য তোমাদের লেখাগুলো আমরা আগাগোড়া সম্পাদনা করে একেবারে সম্পূর্ণ নতুন কাঠামোতে, নতুন ভাষায় ঢেলে সাজিয়ে তারপর পুষ্পে প্রকাশ করি।

চিন্তা করে দেখো, লেখাটি তৈরী করার পিছনে তুমি যে চেষ্টা-সাধনা এবং মেহনত ও পরিশ্রম করেছো তার ফল তো তুমি ইনশাআল্লাহ পাবেই. ছাপার অক্ষরে তা প্রকাশিত হোক, বা না হোক।

এখন যদি তোমার কাঁচা হাতের কাঁচা লেখাটিকে আমরা ভাষা ও শরীরকাঠামো উভয় দিক থেকে আমূল সম্পাদনা করে আগাগোড়া ঢেলে সাজিয়ে পুষ্পের পাতায় প্রকাশ করি, তাহলে লেখক হিসাবে তুমি এবং পাঠক হিসাবে পুষ্পের বন্ধুরা তা দ্বারা উপকৃত হতে পারবে। পাঠক উপকৃত হবে একটি ভালো লেখা পড়ে, আর তুমি উপকৃত হবে তোমার মূল লেখাটির সঙ্গে সম্পাদিত ও প্রকাশিত লেখাটির তুলনামূলক বিচার-পর্যালোচনার মাধ্যমে। তুমি বুঝতে পারবে যে, লেখাটির ভাষা ও শরীর কাঠামো কেমন হওয়া দরকার ছিলো? কোথায় কী কী ত্রুটি ছিলো এবং তা কীভাবে সংশোধন করা হয়েছে। তাতে আশা করা যায়, তোমার পরবর্তী লেখায় এর ছাপ পড়বে এবং ধীরে ধীরে তোমার লেখা উন্নত থেকে উন্নততর হবে।

পক্ষান্তরে তোমার লেখাটি যদি হুবহু বা প্রায় হুবহু প্রকাশিত হয়, তাহলে নিজের লেখাটিকে পরিচিতরূপে দেখতে পেয়ে হয়ত তোমার সাময়িক আনন্দ হবে, কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে লেখক-পাঠক কেউ তা থেকে সাহিত্যচর্চার সুফল পাবে না। উপরে যে নীতি ও মূলনীতির কথা বলা হলো তার আলোকে অন্যান্য লেখার মত ফাহীম সিদ্দীকীর লেখাটিও আগাগোড়া সম্পাদনার পর পুষ্পের পাতায় প্রকাশিত হয়েছে। লেখাটি সবাই মনোযোগের সঙ্গে কয়েকবার পড়ো, তারপর নীচের

## *ফুলের কথা, পুষ্পের কথা*

*ফাহীম সিদ্দীকী*

জগতে সুন্দর যা কিছু দেখো তার মাঝে সুন্দরতম হলো ফুল। সংসারে প্রিয় যা কিছু দেখো তার মাঝে প্রিয়তম হলো ফুল। এবং পৃথিবীতে কোমল যা কিছু দেখো তার মাঝে কোমলতম হলো ফুল।

ধনী-গরীব, ছোট-বড়, এমনকি ভালো মন্দ সবার কাছেই ফুল প্রিয়। ফুল সবাই ভালোবাসে, ভালোবেসে ফুলের সুবাস গ্রহণ করে। ফুলের সৌন্দর্যে, ফুলের কোমলতায় এবং ফুলের সুবাসে সবাই মুগ্ধ হয়।

ফুলের বড় গুণ এই যে, সবাইকে সে নিজের সৌন্দর্য ও সুবাস বিলায়। আমি যে গাছের ফুলকে তার জীবন ও সজীবতা রক্ষা করে গাছেই রেখে দিলাম, আমাকে সে তার সৌন্দর্যে ও সুবাসে মোহিত করলো, আবার এই যে হৃদয়হীন লোকটা ফুলকে গাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে গেলো, তাকেও সে সৌন্দর্য ও সুবাস বিলাতে কার্পণ্য করলো না।

বাগানের সদ্যফোটা লাল গোলাবটির দিকে তাকিয়ে আমি এসব কথা ভাবছিলাম। হঠাৎ আমার চিন্তার দিক পরিবর্তন হলো। বৃক্ষ-উদ্যানের পুষ্প আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলো জ্ঞান-উদ্যানের 'পুষ্প'-এর কথা, প্রতিমাসে যার জ্ঞান-সুবাসে আমি এবং আমার মত সহস্র শিশু-কিশোর-নবীন মোহিত হই, যার প্রতিটি পাতা ও পাপড়ি থেকে আমরা জ্ঞানের গভীরতা, চিত্তের উদারতা, হৃদয়ের কোমলতা এবং চিন্তার পবিত্রতা অর্জন করি। তাই তো বাগানের ফুলকে আমি যেমন ভালোবাসি, আমার প্রাণের পুষ্পকে তেমনি ভালোবাসি। বাগানের ফুল যদি অভিমান না করে তাহলে বলবো, পুষ্পকে আমি আরো বেশী ভালোবাসি। ফুলের প্রতি হলো আমার হৃদয়ের ভালোবাসা, আর পুষ্পের প্রতি আমার আত্মার ভালোবাসা। (আমার আত্মার প্রেম/আকুতি)

আমরা যারা আজকের শিশু-কিশোর-নবীন তারাই তো আগামীদিনের পূর্ণ মানুষ। কিন্তু এ দেশে, এই সমাজে আমাদের নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার যেন কেউ ছিলো না। আমাদেরকে চিন্তার খোরাক যোগাবে, ভাষা ও সাহিত্যচর্চার পথ দেখাবে এবং আমাদেরকে আমাদের মত করে পড়াবে, লেখাবে এবং উপদেশ দেবে, এমন দরদী কোন বন্ধু যেন ছিলো না।

এমন সময় একজন মানুষ বড়দের দল ছেড়ে, বড় বড় চিন্তা ত্যাগ করে আমাদের কথা ভাবলেন, আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং আমাদের হাতে তুলে দিলেন 'পুষ্পের সওগাত'।

**পুষ্প** আমাদের দেখালো বাংলাভাষা ও সাহিত্যচর্চার নির্ভুল পথ। পুষ্প আমাদের দেখালো চিন্তা ও চেতনার আলোক-দিগন্ত এবং পুষ্প আমাদের যোগালো চরিত্র ও নৈতিকতার এবং আত্মশুদ্ধি ও পবিত্রতার মজবুত পাথেয়।

তাই তো পুষ্পকে এত ভালোবাসি এবং পুষ্পের যিনি শিল্পী তাকে এত শ্রদ্ধা করি। শুনেছি, গাছের ফুল দু'দিনেই ঝরে যায়, দু'দিনেই শুকিয়ে যায়, কিন্তু জ্ঞান-বৃক্ষের পুষ্প থাকে চিরসজীব, কখনো ঝরে না, কখনো শুকায় না। কিন্তু যুগের ও পরিবেশের নির্মমতায় বড় উৎকণ্ঠা হয়। তাই দু'আ করি, আমার প্রাণের পুষ্পকে আল্লাহ যেন রক্ষা করেন এবং পুষ্পের যিনি প্রাণ তাকে দীর্ঘজীবী করেন, আমীন।'

***আলোচনা***

ফাহীম সিদ্দীকীর লেখার মূল বিষয় হলো তার প্রিয় পত্রিকা 'পুষ্প'-এর প্রতি ভালোবাসা নিবেদন করা। আমার যত দূর মনে হয়, তার মনে প্রথমে এ আবেগ সৃষ্টি হয়েছে যে, পুষ্প দ্বারা আমি ও আমরা যখন এত উপকৃত হচ্ছি তখন পুষ্পের প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে কিছু লেখা দরকার। অন্তরে এধরনের আবেগ সৃষ্টি হওয়াটাই হলো লেখার মূল প্রেরণা। অন্তরের আবেগ থেকেই লেখা তৈরী হয় এবং লেখা বের হয়ে আসে।

ধরো, উপরের এই আবেগ পুষ্পের পাঁচজন বন্ধুর অন্তরে সৃষ্টি হলো এবং পাঁচজনই পুষ্পের প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে কিছু লিখলো। তো স্বাভাবিক-ভাবেই দেখা যাবে যে, পাঁচটি লেখা বিষয়বস্তুতে অভিন্ন হয়েও আকারে আকৃতিতে, প্রকাশ ভঙ্গিতে এবং ভাষায় ও শব্দে ভিন্ন হবে। বিষয়বস্তু যেহেতু অভিন্ন সেহেতু কোথাও কোথাও হয়ত কিছু মিল থাকবে, কিন্তু ভিন্নতাও থাকবে অনেক। এটাই স্বাভাবিক। কারণ পাঁচটি হৃদয় এবং হৃদয়ের স্পন্দন ভিন্ন, তদ্রূপ পাঁচটি মস্তিষ্ক এবং মস্তিষ্কের চিন্তা ভিন্ন। তাই দেখা যাবে, পাঁচজন পাঁচ রকম করে লেখাটি শুরু করেছে এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপে লেখাটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং আলাদা আলাদা ধরনে লেখাটির পরিসমাপ্তি টেনেছে। এটা হতে পারে, তবে শর্ত হলো, শুরু, মধ্যবর্তী অংশ ও পরিসমাপ্তি, অর্থাৎ লেখার পুরো শরীরকাঠামোটা যেন সুন্দর হয়, ভাষা ও শব্দ যেন সুন্দর হয়।

ফাহীম সিদ্দীকী তার লেখাটি শুরু করেছে বাগানের ফুল সম্পর্কে অনুভব অনুভূতি প্রকাশ করার মাধ্যমে। এটি একটি সুন্দর শুরু, যা পাঠককে অবশ্যই মুগ্ধ করবে। ঘটনা হলো, একদিন সে তার বাগানের গোলাব গাছে একটি গোলাব ফুল দেখতে পায়, আর তখনই তার ভিতরে একটি চিন্তার আলো ঝিলিক দিয়ে ওঠে। সে ভাবে, তাই তো! আগে কখনো ভাবিনি তো! বাগানের ফুলের সঙ্গে আমার প্রিয় পত্রিকা 'পুষ্প'-এর তো বেশ মিল রয়েছে, যেমন নামে তেমনি গুণে! তাহলে তো পুষ্পের প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের লেখাটিকে বাগানের ফুলের সঙ্গে উপমা দিয়ে তৈরী করা যায়!

দেখো, ফাহীম সিদ্দীকী আগেও হয়ত বাগানে গিয়েছে এবং গাছে ফুল ফুটে থাকতে দেখেছে, কিন্তু ফুলের সঙ্গে পুষ্পের সাদৃশ্যের কথা তার মনে পড়েনি এবং

কারিশমা! চোখ দিয়ে তুমি শুধু দেখো, কিন্তু আবেগের তরঙ্গ ও ভাবের উচ্ছ্বাস তোমার হৃদয়কে, তোমার চোখের দৃষ্টিকে দান করে অবলোকন করার যোগ্যতা। তখন তুমি প্রতিদিনের দেখা ফুলের মাঝে নতুন কিছু 'অবলোকন' করতে সক্ষম হও। হৃদয় একজন লেখকের অনেক বড় সম্পদ এবং অনেক বড় সম্পদ হৃদয়ের গভীরে ভাবের তরঙ্গ ও আবেগের আন্দোলন। হৃদয়ের ভাবতরঙ্গ থেকেই সৃষ্টি হয় লেখার জন্ম-তরঙ্গ। আর ভাব ও আবেগের তরঙ্গ সৃষ্টি হয় স্বচ্ছ ও পবিত্র হৃদয়ে, কলুষিত ও কদর্য হৃদয়ে নয়।

তো আমি ধারণা করছি এবং আশা করি, আমার ধারণা ঠিক যে, হৃদয়ের ভাব ও আবেগই ফাহীম সিদ্দীকীর দৃষ্টির সামনে ফুলের সঙ্গে পুষ্পের সাদৃশ্যটি হঠাৎ উদ্ভাসিত করেছিলো, আর তখন থেকেই আলোচ্য লেখাটি তার চিন্তার অঙ্গনে ধীরে ধীরে শরীর লাভ করতে শুরু করেছিলো। সবার সমস্ত লেখার ক্ষেত্রেই এটা হয়। তো ফাহীম তার লেখাটির শরীরকাঠামো তৈরী করেছে এভাবে-

- গাছের ফুল ও তার গুণগান দ্বারা লেখার উদ্বোধন।
- ফুল থেকে পুষ্পে প্রবেশ (অর্থাৎ উদ্বোধনী অংশ থেকে মূল বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করা।)
- পুষ্পের অবদান আলোচনা করা এবং পুষ্পের প্রতি ভালোবাসা নিবেদন করা।
- প্রসঙ্গক্রমে পুষ্পসম্পাদকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা ( এটা ছাড়াও লেখার মূল কাঠামোটি হয়ে যেতে পারতো, তবে তা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতো না। তাছাড়া লেখার অবয়ব তখন অপেক্ষাকৃত ছোট হয়ে আসতো।)
- পুষ্প ও পুষ্পসম্পাদকের কল্যাণ কামনার মাধ্যমে লেখাটির সমাপ্তি টানা।
  মোটামুটি এই হলো আলোচ্য লেখাটির সূচনাপর্ব, মধ্যপর্ব (বা মূলপর্ব), শেষ পর্ব এবং সমাপ্তিপর্ব।

যে কোন লেখা মোটামুটি এ ক'টি পর্বেই বিভক্ত হয়ে থাকে। এভাবে পর্ব থেকে পর্বান্তরে, বা প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে গমন করেই লেখা সমাপ্তি লাভ করে। আর পর্ব থেকে পর্বান্তরে, বা প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় একটি যোগসূত্র বা সেতুবন্ধনের।

তোমার কি মনে হচ্ছে, এ তো বিশাল ব্যাপার! এত বড় লেখা চিন্তা করে তৈরী করা আমার পক্ষে কীভাবে সম্ভব? এভাবে চিন্তা করলে কঠিন মনে হতে পারে। কিন্তু এই যে এত বড় লেখা, প্রথমে কিন্তু এটাকে খুব সহজেই একেবারে ছোট্ট করে লিখে ফেলা যায়। তখন আর কঠিন মনে হবে না, বরং মনে হবে, তাহলে তো আমিও পারবো বোধহয়! যেমন দেখো-

'বাগানের ফুল দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি তা আমাদের মাঝে সুবাস ছড়ায়। আর আমাদের প্রিয় পত্রিকা পুষ্পও আমাদের মাঝে জ্ঞানের সুবাস ছড়ায়। ফুলের

সঙ্গে তার নামেও যেমন মিল তেমনি গুণেও মিল। তাই প্রিয় পুষ্পকে আমি ফুলের মতই ভালোবাসি। আল্লাহ যেন পুষ্পকে সকল প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করেন।' ব্যস, লেখাটি তৈরী হয়ে গেলো। এটি যেন একটি 'শিশু লেখা'। এখন তুমি একদিন, দু'দিন, তিনদিন এবং বহু দিন ধরে লেখাটির পরিচর্যা করতে থাকো। ধীরে ধীরে চিন্তা-ভাবনা করে করে ফুলের আলোচনাকে একটু দীর্ঘ এবং পুষ্পের আলোচনাকে একটু সম্প্রসারিত করলেই একটি পরিপূর্ণ 'যুবকলেখা' তৈরী হয়ে যাবে; যেমন আমাদের ফাহীম সিদ্দীকী করেছে। দেখো, ফুলের আলোচনা দিয়ে কীভাবে সে লেখাটির সূচনা করেছে এবং আলোচনাটিকে সম্প্রসারিত করেছে—

*'পুষ্প আমাদের সবার প্রিয়, ছোট-বড় সবার একান্ত আপন। সে তার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে কৃপণতা করে না। উদারভাবে সে তার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে। তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মানুষ তার সৌরভ নেয়।'*

('পুষ্প আমাদের সবার প্রিয়' এটাই হলো মূল কথা। বাকি কথাগুলো দ্বারা আলোচনাকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। তারপর ফাহীম চিন্তা করেছে যে, আর কী কথা যোগ করে আলেচনাটি আরেকটু সম্প্রসারিত করা যায়? চিন্তার ফলে সে সামনের কথাগুলো পেয়েছে।)

*'অনেকেই পুষ্পকে ছিনিয়ে নেয় তার বোঁটা থেকে, তবু তার কোন প্রতিবাদ নেই। একের পর এক পুষ্পকলি প্রস্ফুটিত হতে থাকে।'*

(প্রশ্ন হতে পারে, ফুল নিয়ে এই চিন্তাভাবনা হঠাৎ করে তার মাথায় আসছে কীভাবে? কোন সূত্রে? তাই সে পাঠককে নিজে থেকেই জানিয়ে দিলো যে,)

*'বাগানে সদ্যফোটা রক্তিম গোলাবটিকে দেখে এসব ভাবছিলাম'।*

(এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, সে এতক্ষণ বাগানে ছিলো। কথাটা সে এভাবে স্পষ্ট করে বলতে পারতো, 'মনটা ভালো লাগছিলো না, তাই বাগানে গিয়ে পায়চারি করছিলাম। একটি রক্তিম গোলাব দেখে ভাবলাম, ....। কিন্তু স্পষ্ট করে না বলার মধ্যেও রয়েছে আলাদা একটি সৌন্দর্য। আরেকটি বিষয় দেখো। শেষের অংশটি দ্বারা লেখার সূচনা হতো পারতো। হয়ত আরেকজন লিখলে তাই করতো এবং সেটাও খারাপ হতো না।)

*'ভালো লাগছে না, তাই ঘরে এসে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলাম। ভাবছি, মানুষ কেন ফুলের মত হয় না? মানুষও তো শিক্ষা নিতে পারে ফুল থেকে!'*

(এখানে নতুন একটি বিষয় দিয়ে আলোচনাকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে এবং লেখাটি নতুন একটি মাত্রা লাভ করেছে। এভাবে লেখাটি বহুমাত্রিক হলো। ভালো হয়েছে কি না, সেটা ভিন্ন কথা। আমি বলতে চাই, লেখাটিকে সুন্দর করার জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, আর এটাই হলো প্রশংসার কথা।)

*'তখন হঠাৎ চিন্তা হলো, এ পুষ্প তো বাগানের পুষ্পের চেয়ে কম নয়!'*

(এটা হলো বাগানের ফুল থেকে পুষ্প পত্রিকার আলোচনায় প্রবেশের যোগসূত্র। যোগসূত্রতা কেমন হয়েছে, কেমন হলে সুন্দর হতো, সেটা আলাদা বিষয়। কিন্তু তার লেখার শরীর কাঠামোটি ঠিক মতই তৈরী হচ্ছে, এটাই হলো আশার কথা।)

*'কারণ পুষ্পের লেখাগুলো আমাদেরকে মুগ্ধ করে এবং আমরা তার কাছ থেকে জ্ঞানের সুবাস লাভ করি'*

(এভাবে উপরের যোগসূত্রটির মাধ্যমে সে মূল আলোচনায় প্রবেশ করেছে। সুন্দর। হয়ত আরো সুন্দর হতে পারতো, কিন্তু সেটা একদিনে হয় না। চেষ্টা অব্যাহত থাকলে ধীরে ধীরে হয়।)

*'বর্তমানে আমাদের শিশু-কিশোরদের নিয়ে চিন্তা করার কেউ নেই। সবাই বড়দের জন্য লেখে। শিশুদের জন্য দু'একটা লেখা যাও বা আছে সেগুলো সাহিত্যপূর্ণ নয়, যা থেকে শিশু-কিশোররা কিছু শিখতে পারে।'*

(এটা হলো প্রসঙ্গক্রমে পুষ্প থেকে পুষ্পসম্পাদক সম্পর্কে আলোচনায় প্রবেশ করার যোগসূত্র। আবারও বলছি যোগসূত্র ও তার ভাষা যেমনই হোক মূল কথা হচ্ছে, লেখাটি সঠিক কাঠামোতেই এগিয়ে চলেছে।)

*'পুষ্পের সম্পাদক ভাইয়া শিশু-কিশোরদের কথা চিন্তা করেছেন এবং আমাদের জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্যচর্চার উপযোগী পত্রিকা প্রকাশ করেছেন।*

(এরপর রয়েছে দীর্ঘ সম্পাদকপ্রশস্তি, এ সম্পর্কে পরে মন্তব্য করছি।)

*'পুষ্পের বন্ধুরা, এসো সবাই মিলে দু'আ করি, সকল প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করে পুষ্প যেন টিকে থাকে চিরদিন।*

(এটা হলো লেখাটির সমাপ্তি অংশ)

***পর্যালোচনা***

মূলত আমরা এখানে আলোচ্য লেখাটির শরীরকাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করবো, তবে সংক্ষেপে ভাষা ও শব্দ সম্পর্কেও দু'একটি কথা আগে বলে নিতে চাই।

০ *'মানুষ তার সৌরভ নেয়'*, এর চেয়ে ভালো হতো, *'মানুষ তার সুবাস গ্রহণ করে'।*

০ *'অনেকেই পুষ্পকে ছিনিয়ে নেয় তার বোঁটা থেকে'*, আসলে ফুলকে মানুষ বোঁটাসহই গাছের ডাল থেকে ছিঁড়ে নেয়, বা ছিনিয়ে নেয়। সুতরাং বলতে হবে, *'মানুষ গাছের ডাল থেকে ফুলকে ছিনিয়ে নেয়/ ছিঁড়ে নেয়।'*

০ রক্তিম গোলাব, না বলে বলা উচিত লাল গোলাব।

এবার আমরা লেখাটির শরীরকাঠামো সম্পর্কে আলোচনা শুরু করছি। এবিষয়ে চিন্তাভাবনা করে বড় ও ছোট যে ক'টি ত্রুটি পাওয়া গেছে তা এখানে তুলে ধরছি

প্রথমত ফাহীম সিদ্দীকীর জন্য, তারপর পুষ্পের বন্ধুদের জন্য, যাতে সবাই লেখার শরীরকাঠামো সম্পর্কে ভালো কিছু শিখতে পারে।

(ক) *'মানুষ কেন ফুলের মত হয় না? মানুষও তো ফুল থেকে শিক্ষা নিতে পারে!'* খুব সুন্দর চিন্তা এবং সুন্দর ভাষা।১ প্রথমে একটি প্রশ্ন, তারপর একটি বিস্ময়। সুতরাং শৈলীগত দিক থেকেও রয়েছে আলাদা একটি সৌন্দর্য। লেখক সাহিত্যিকগণ ফুলকে, ফুলের সৌন্দর্যকে এবং ফুলের সুবাসকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করে মানুষকে ফুলের মত সুন্দর, পবিত্র ও সুবাসিত হতে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন। মানবহৃদয়ে এর যথেষ্ট আবেদনও রয়েছে। কিন্তু এটা তো ভিন্ন বিষয়বস্তু! এখানে তো উদ্দেশ্য হলো ফুলের সঙ্গে 'পুষ্প'-এর উপমা ও সাদৃশ্য এবং সেই সূত্রে পুষ্পের প্রতি ভালোবাসা নিবেদন! এখানে 'ফুল' এসেছে শুধু পুষ্পসম্পর্কিত আলোচনার উদ্বোধনী অংশরূপে। সুতরাং মানুষের শরীরে, যত সুন্দরই হোক, অতিরিক্ত অঙ্গ যেমন বেমানান, এখানে মানুষকে ফুলের মত সুন্দর হওয়ার উপদেশ, যত মূল্যবানই হোক, তেমনি বেমানান। এখানে ফুল থেকে সরাসরি পুষ্পপ্রসঙ্গে চলে যাওয়াই ছিলো সঙ্গত। তাই সম্পাদনার করে এ অংশটা মুছে দেয়া হয়েছে। এতে লেখাটির শরীর কাঠামো আগের চেয়ে নিখুঁত হয়েছে।

(খ) মন খারাপ হলে (অর্থাৎ মন বিষণ্ন হলে) আমরা ঘরের বদ্ধ আবহাওয়া থেকে বের হয়ে বাগানের মুক্ত ও স্নিগ্ধ পরিবেশে ফুলের সান্নিধ্যে যাই, তাতে মনটা প্রফুল্ল হয়, হৃদয়ে স্নিগ্ধতা আসে। কিন্তু ফাহীম সিদ্দীকী করেছে উল্‌টো কাজ। ভালো লাগছে না দেখে সে বাগান থেকে এবং সবুজ গাছ ও লাল গোলাবের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে গেছে তার কামরায় এবং বসেছে চেয়ার টেনে টেবিলের সামনে। পাঠকের মনে প্রশ্ন আসতেই পারে, বাগানের ফুলের সংস্পর্শে মন খারাপ হওয়ার কী হলো? লেখকের কাছে হয়ত এ প্রশ্নের কোন না কোন উত্তর আছে, তবে সেটা সদুত্তর নয়। সুতরাং আমি বলবো, এখানে লেখাটির শরীরকাঠামো নিখুঁত ও স্বাভাবিক হয়নি।

আসলে আমার যা মনে হয়, ফাহীম পুষ্প পত্রিকাটা হাতের নাগালে পাওয়ার জন্য বাগান ছেড়ে কামরায় গিয়েছে, যাতে পুষ্পের উপর নযর পড়ে, আর ফুল প্রসঙ্গ থেকে পুষ্পপ্রসঙ্গে যাওয়া যায়। অর্থাৎ উদ্বোধনীপর্ব থেকে মূলপর্বে প্রবেশ করার জন্য এবং প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার জন্য যে যোগসূত্র ও সেতুবন্ধন দরকার তা তৈরী করার জন্যই সে বাগান থেকে কামরায় যাওয়ার কথা লিখেছে। কিন্তু তাতে তো ফুল থেকে অযথা একটা দূরত্ব সৃষ্টি হলো এবং ফুলের কথা ও পুষ্পের কথা-এর মাঝখানে সময়ের ব্যবধান সৃষ্টি হলো! সুতরাং এখানে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার যোগসূত্রটা সুন্দর হয়নি। ফলে লেখাটির শরীরকাঠামোতে ত্রুটি দেখা দিয়েছে।

সম্পাদক হিসাবে এখানে আমি কী করলাম? ফাহীমকে বাগানে বসিয়ে রেখেই ফুল ও পুষ্প-এর শব্দগত অভিন্নতাকে যোগসূত্র ধরে চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দিলাম। এখন দেখো, প্রসঙ্গান্তরে যাওয়াটা কত স্বাভাবিক ও সাবলীল হয়েছে–

'বাগানে সদ্যফোটা লাল গোলাবটি দেখে আমি এসব কথা ভাবছিলাম, হঠাৎ আমার চিন্তার দিকপরিবর্তন হলো। বৃক্ষ-উদ্যানের পুষ্প আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলো জ্ঞান-উদ্যানের পুষ্পের কথা।'

(আরেকটি কথা, কামরায় গিয়েই কিন্তু টেবিলে রাখা পুষ্পের উপর নযর পড়তে পারতো; চেয়ার টেনে টেবিলের সামনে বসার কোন প্রয়োজন ছিলো না। চেয়ার টেনে নিয়ে টেবিলের সামনে বসার কথা সাধারণত বলা হয় কোন লেখা শুরু করার ক্ষেত্রে। যেমন, 'হঠাৎ আমার চিন্তায় একটি সুন্দর লেখা উদিত হলো। আমি কামরায় গিয়ে চেয়ারটা টেনে নিয়ে টেবিলের সামনে বসে পড়লাম এবং লেখাটা লিখে ফেললাম।)

(গ) ফুল থেকে পুষ্প, তারপর পুষ্পের সূত্র ধরে পুষ্প-সম্পাদকের প্রসঙ্গ আসতে পারে, যাতে লেখাটির শরীর আরো সম্প্রসারিত হয়, কিন্তু সম্পাদকের প্রশংসা-কীর্তন যদি হয়ে যায় দীর্ঘ তাহলে তা হবে দৃষ্টিকটু ও শ্রুতিকটু। এবং তাতে লেখার অঙ্গসৌষ্ঠব ও কাঠামোগত ভারসাম্য নষ্ট হবে। কেননা এটা তো মূল প্রসঙ্গ নয়, বরং 'উপপ্রসঙ্গ'। মানুষের শরীরে বিরাট ভুঁড়ির মত এটা যেন লেখার শরীরের ভুঁড়ি, যা অসুন্দর ও বেমানান। তাই সম্পাদকের কাঁচি চালিয়ে 'সম্পাদক-তোষণ' সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

তাছাড়া 'সাহিত্যচর্চার পথ দেখানো, চিন্তা ও চেতনার আলোকিত দিগন্তে নিয়ে যাওয়া এবং আত্মশুদ্ধি ও পবিত্রতার মূল্যবান পাথেয় যোগানো' ইত্যাদিকে ফাহীম সিদ্দীকী সম্পাদকের কীর্তিরূপে উল্লেখ করেছে, যার কারণে সম্পাদক-প্রশস্তি দীর্ঘ হয়ে গেছে। আমি সেগুলোকে একেবারে ছাঁটাই না করে পুষ্পের কীর্তিরূপে তুলে ধরেছি। তাতে পুষ্প-সম্পাদকের পরোক্ষ প্রশস্তিও হলো, আবার দৃষ্টিকটুতাও দূর হলো এবং এই সুন্দর বক্তব্যটি বাদ না গিয়ে লেখার ভিতরে স্থান পেয়ে গেলো।

এবার শরীরকাঠামোর ছোটখাটো দু'একটি ত্রুটি দেখো–

ফুলপ্রসঙ্গ থেকে পুষ্পপ্রসঙ্গের অবতারণা এমনভাবে হয়েছে যাতে ফুলের প্রতি প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা প্রকাশ পায়, যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ অংশটি সম্পাদনার আগে ও পরে লক্ষ্য করো।

***সম্পাদনার আগে–***

*'বাগানে সদ্যফোটা রক্তিম গোলাবটিকে দেখে এসব ভাবছিলাম। ভালো লাগছে না, তাই ঘরে এসে চেয়ারটা টেনে নিয়ে টেবিলের সামনে বসলাম। ভাবছি, মানুষ কেন ফুলের মত হয় না? মানুষও তো শিক্ষা নিতে পারে ফুল থেকে! সেই মুহূর্তে*

*তো বাগানের পুষ্পের চেয়ে কম নয়! কারণ পুষ্পের লেখাগুলো আমাদেরকে মুগ্ধ করে এবং আমরা তার কাছ থেকে জ্ঞানের সুবাস লাভ করি।'*

***সম্পাদনার পর–***

'বাগানে সদ্যফোটা লাল গোলাবটির দিকে তাকিয়ে আমি এসব ভাবছিলাম। হঠাৎ আমার চিন্তার দিকপরিবর্তন হলো। বৃক্ষ-উদ্যানের পুষ্প আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলো জ্ঞান-উদ্যানের 'পুষ্প'-এর কথা। প্রতিমাসে যার 'জ্ঞানসুবাসে' আমি এবং আমার মত সহস্র শিশু-কিশোর-নবীন মোহিত হই, যার প্রতিটি পাতা ও পাপড়ি থেকে আমরা জ্ঞানের গভীরতা, চিত্তের উদারতা, হৃদয়ের কোমলতা এবং চিন্তার পবিত্রতা অর্জন করি। তাই তো বাগানের ফুলকে আমি যেমন ভালোবাসি তেমনি ভালোবাসি আমার প্রাণের পুষ্পকে। বাগানের ফুল যদি অভিমান না করে তাহলে তো বলবো, পুষ্পকে আমি আরো বেশী ভালোবাসি।'

(খ) ফুলপ্রসঙ্গের তুলনায় পুষ্পপ্রসঙ্গ সংক্ষিপ্ত ও সাদামাটা হয়েছে, অথচ মুখ্যবিষয় হিসাবে পুষ্পের আলোচনা হওয়া উচিত তুলনামূলক দীর্ঘ ও জোরালো। সুতরাং এখানে লেখাটির শরীরকাঠামোগত স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ন হয়েছে। তাই সম্পাদনা করে পুষ্প-এর আলোচনাকে দীর্ঘ ও জোরালো করা হয়েছে। উপরে সংশ্লিষ্ট অংশটি সম্পাদনার আগে ও পরে আবার পড়ে দেখো।

(গ) এটা হলো উপমানির্ভর শৈল্পিক লেখা। সুতরাং এখানে 'সম্পাদক ভাইয়া' নামে সম্পাদকের উপস্থিতি বেমানান। তাই সম্পাদনার সময় প্রচ্ছন্ন ভাষা ব্যবহার করে বলা হয়েছে, 'এমন সময় একজন মানুষ বড়দের দল ছেড়ে বড় বড় চিন্তা ত্যাগ করে আমাদের কথা ভাবলেন, আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং আমাদের হাতে তুলে দিলেন 'পুষ্পের সওগাত'।

তদ্রূপ 'সম্পাদক ভাইয়া'কে ভালোবাসি'-এর স্থানে লেখা হয়েছে, 'তাই পুষ্পের যিনি শিল্পী তাকে এত শ্রদ্ধা করি।'

(ঘ) ফাহীম সিদ্দীকী তার লেখার সমাপ্তিপর্বে যদি ফুল ও পুষ্প উভয়ের উল্লেখ করতো তাহলে লেখাটির অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি পেতো। কেননা আলোচনার সূচনা হয়েছে ফুল দিয়ে। সুতরাং পরিসমাপ্তিতে পুষ্প-এর সঙ্গে ফুলেরও উপস্থিতি শোভনীয়। সম্পাদনার আগে ও পরে পার্থক্য লক্ষ্য করো–

***সম্পাদনার আগে–***

*.... পুষ্পের বন্ধুরা! এসো সবাই মিলে দু'আ করি, সকল প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করে পুষ্প যেন টিকে থাকে চিরদিন।*

***সম্পাদনার পর–***

'শুনেছি, গাছের ফুল দু'দিনেই ঝরে যায়, দু'দিনেই শুকিয়ে যায়, কিন্তু জ্ঞান-বৃক্ষের পুষ্প থাকে চিরসজীব, কখনো ঝরে না, কখনো শুকায় না। কিন্তু যুগের ও

পরিবেশের নির্মমতায় বড় উৎকণ্ঠা হয়। তাই দু'আ করি, আমার প্রাণের পুষ্পকে আল্লাহ যেন রক্ষা করেন এবং পুষ্পের যিনি প্রাণ, তাকে দীর্ঘজীবী করেন, আমীন।

(ঙ) মানুষের মুখমণ্ডল যেমন, একটি লেখার শিরোনামও তেমন। আর কথায় বলে, 'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র'। লেখার ক্ষেত্রেও একই কথা। শিরোনাম যদি আকর্ষণীয় ও সুন্দর হয় এবং তা থেকে বক্তব্যের চিত্র প্রচ্ছন্নরূপে ফুটে ওঠে তাহলে অতি সহজেই তা পাঠকচিত্ত জয় করে নেয়, এমনকি সুন্দর একটি নামের কারণে সাধারণ লেখাও অনেক সময় অসাধারণ সমাদর পেয়ে যায়। বাতিলের পক্ষে যারা কলম চালায়, এ বিষয়টি তারা খুব বোঝে বলে মনে হয়। তাদের একেকটি লেখার শিরোনাম দেখে মুগ্ধ হতেই হয়। দুঃখের বিষয়, নিজেদের যারা পরিচয় দেয় 'কলমসৈনিক' বলে, লেখার শিরোনাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের দুর্বলতা খুবই প্রকট। শিরোনাম তাদের লেখার প্রতি পাঠককে আকৃষ্ট করে না। অবশ্য কিছু কিছু ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়।

ফিরে আসি মূল প্রসঙ্গে। 'আমার প্রিয় পুষ্প' নামটায় মূল বক্তব্যের চিত্র অবশ্যই ফুটে উঠেছে। কিন্তু এটা গতানুগতিক ও সাদামাটা একটা নাম, তাতে কোন অভিনবত্ব নেই।

পক্ষান্তরে 'ফুলের কথা, পুষ্পের কথা' নামটি যেমন অভিনব তেমনি তাতে বক্তব্যের পূর্ণ চিত্র পরিস্ফুট। তদুপরি সমার্থক দু'টি শব্দ ভিন্ন দুই অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় আলঙ্কারিক সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে।

*সম্পাদনার সম্পাদনা*

এখন কিন্তু মনে হচ্ছে, আমার সম্পাদনায়ও যথেষ্ট ত্রুটি রয়েছে। সুতরাং আমার সম্পাদনারও হওয়া উচিত পুনঃসম্পাদনা।

০ শিরোনামটির কথাই ধরো। 'ফুলের কথা, পুষ্পের কথা', কত সুন্দর! তবে একটি ত্রুটি এই যে, শিরোনাম থেকে মনে হয়, ভিতরে দুটো বিষয় সমান গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হবে, অথচ ফুলের কথা এসেছে শুধু উপলক্ষরূপে। সতরাং ভাষাগত দিকটি যত সুন্দরই হোক, ঠিক ততটা বিষয়োপযোগী নয়। তার চেয়ে *'ফুল থেকে পুষ্প'* শিরোনামটি আরো ভালো মনে হয়।

তাহলে ভেবে দেখো, একটি লেখাকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করার জন্য কেমন লাগাতার চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টা-মেহনত করা দরকার!

০ 'তাই পুষ্পের যিনি শিল্পী তাকে এত শ্রদ্ধা করি।' আগে তো বাক্যটা ভালোই লেগেছিলো, এখন মনে হচ্ছে শিল্পী শব্দটি পুষ্পের সঙ্গে তেমন মানানসই নয়। যদি বলি, *'পুষ্পের যিনি মালকর'* তাহলে বেশ উপযোগী হয়। তোমার কী মনে হয়?

০ 'বৃক্ষ-উদ্যানের পুষ্প আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলো জ্ঞান-উদ্যানের পুষ্প-এর

'স্মরণ করিয়ে দিলো'-এর পরিবর্তে যদি বলি 'বৃক্ষ-উদ্যানের পুষ্প আমাকে নিয়ে গেলো জ্ঞান-বৃক্ষের পুষ্পের কাছে' তাহলে বেশী ভালো হয় কি না, ভেবে দেখা যায়, তবে 'প্রতিমাসে' কথাটি ফুল ও পুষ্পের উপমাপ্রসঙ্গে অবশ্যই বেমানান। বলা উচিত ছিলো, 'বৃক্ষ-উদ্যানের পুষ্প আমাকে নিয়ে গেলো জ্ঞান-উদ্যানের পুষ্পের কাছে, যার সুবাসে মোহিত হই আমি এবং....

আসলে 'প্রতিমাসে' এবং 'জ্ঞানসুবাসে'-এর ছন্দসৌন্দর্যের কথাটাই শুধু তখন মনে ছিলো।

০০ 'আমি এবং আমার মত সহস্র শিশু-কিশোর....'এখানে হওয়া দরকার 'আমি এবং আমার মত অসংখ্য'।

---

১। আগে ছিলো, 'খুব সুন্দর চিন্তা এবং খুব সুন্দর ভাষা', আসলে চিন্তাটি যত সুন্দর, ভাষাটা তত সুন্দর হয়নি, আরো অনেক সুন্দর হতে পারতো। তাই 'খুব' কেটে দিয়ে লিখেছি, 'সুন্দর ভাষা'।

২। এখানে লিখেছিলাম, 'তুমি কী মনে করো? তাতে কথাটি উপরের লাইনের শেষ মাথায় এসে শেষ হয়ে গিয়েছিলো। মনে হলো নীচে যদি একটি দু'টি শব্দ চলে আসে তাহলে অঙ্গসজ্জাটি সুন্দর হয়, তাই লিখলাম, 'তোমার কী মনে হয়?' এখন একটি শব্দ নীচে চলে এসেছে এবং অঙ্গসজ্জা সুন্দর হয়েছে। কম্পোজের কাজ যেহেতু আমি নিজেই করি সেহেতু এ ধরণের সম্পাদনা প্রচুর হয় এবং আমি অবাক হয়ে দেখতে পাই, তাতে অঙ্গসজ্জার সঙ্গে সঙ্গে লেখার সৌন্দর্যও অনেক বৃদ্ধি পায়। এখানে অবশ্য শুধু অঙ্গসজ্জাই সুন্দর হয়েছে। ভাষাসৌন্দর্যের দিক থেকে দু'টি প্রশ্নই সমমানের। এ বই থেকেই একটি উদাহরণ দিলে তুমি বুঝতে পারবে এধরনের সম্পাদনায় অঙ্গসজ্জাগত সৌন্দর্যের পাশাপাশি ভাষাসৌন্দর্যও কত বৃদ্ধি পায়! দেখো ৪৫ নং পৃষ্ঠায় আছে–

'কুল যদি দু'বার লিখি তাহলে তা নদীর কূল দিয়ে নেমে সোজা চলে যাবে নদীর পানিতে এবং তা একসঙ্গে লিখতে হবে। (হৃদয়-নদীর জলধারা কুলকুল বয়ে যায়।)

বন্ধনীতে উদাহরণটি প্রথমে ছিলো এই– 'নদীর পানি কুলকুল বয়ে যায়।' তাতে বাক্যটি লাইনের মাথায় শেষ হয়ে গিয়েছিলো। অথচ নীচে অন্তত একটি শব্দ চলে এলে সজ্জাটি সুন্দর হয়। কীভাবে কী করা যায়? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যেন ভিতর থেকে ঝিলিক দিলো, 'হৃদয়-নদীর পানি কুলকুল বয়ে যায়।' তারপর মনে হলো, হৃদয়-নদীর পানি না হয়ে জলধারা হওয়া উচিত। এবার দেখো তো উদাহরণটি কত নতুন এবং অভিনব হলো! অথচ সম্পাদনার তাগাদা এসেছে শুধু সজ্জার সৌন্দর্যের প্রয়োজনে।

# লেখার শরীরকাঠামো

শরীরকাঠামো সম্পর্কে সমালোচনার দ্বিতীয় উদাহরণরূপে নীচের লেখাটি পড়ো।

## লালবাগের কেল্লা

*রফীকুল আলম*

ছোট্টকালে পাঠ্যবইয়ে পড়েছি লালবাগের কেল্লার কথা। সেই কেল্লা দেখতে আমরা তিন সহপাঠী হাযির হলাম এবং টিকেট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। ফুলবাগান করে কেল্লার ভেতরে বেশ মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। সোজা সামনে এগুতেই দেখতে পেলাম শায়েস্তাখাঁর কন্যা পরিবিবির মাযার। তাজমহলের আদলে তৈরী করা হয়েছে। দেখতে অপূর্ব। দুধের সাধ ঘোলে মেটানোর মত ধরে নিলাম, তাজমহলই দেখা হয়ে গেলো।

পরিবিবির মাযার থেকে দক্ষিণে কিছু দূরে ভূগর্ভস্থ গোপন অস্ত্রাগার। এর সঙ্গে যুক্ত সুউচ্চ বুরুজ (পর্যবেক্ষণ টাওয়ার) থেকে নাকি সান্ত্রীরা দুর্গ পাহারা দিতো। এখান থেকে সোজা পূর্বদিকে এগুলে দুর্গের প্রধান ফটক, যার ছবি ছাপা হয়েছে এখন একশ' টাকার নোটে। সেখান থেকে উত্তরে সে আমলের বিরাট দীঘি। এখন অবশ্য আধুনিকায়ন করা হয়েছে। তার পাশে একটু দূরে রয়েছে দোতালা প্রাসাদ, এখন তা জাদুঘর। সে যুগের বিভিন্ন অস্ত্র, মুদ্রা ও অন্যান্য স্মারকদ্রব্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। একটা চিত্রে সে যুগের শাসকদের নির্যাতনের কাল্পনিক দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে।১ জানি না, এটা ইতিহাস, না মুসলিম শাসনকালের চরিত্রহননের অপপ্রয়াস।

সবকিছু দেখতে দেখতে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। আমি ভাবলাম, একদিন যারা কত বিচিত্র আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে বেঁচে ছিলো, ঐ মাযারে শায়িতা বিবি, যে পরীর মত সুন্দরী ছিলো, আজ তারা কোথায়!? তারা কি মৃত্যুর কথা স্মরণ রেখেছিলো? আমরা কি মৃত্যুর কথা চিন্তা করছি?!

আছরের আযান হলো, পাশেই সে আমলের শাহী মসজিদ। সেখানে আছরের

নামায আদায় করলাম। তারপর দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্বের শিক্ষা বুকে ধারণ করে মাদরাসায় ফিরে এলাম। তখন সূর্য ডোবার আর বেশী বাকি নেই।

*আলোচনা*

এটি ভ্রমণবিষয়ক লেখা। বিগত যুগের একটি ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ বা পরিদর্শনের মাধ্যমে পুষ্পের বন্ধু রফীকুল আলমের অন্তরে একটি ভাব ও আবেগ সৃষ্টি হয়েছে এবং তা থেকেই সে এই লেখাটি লেখার প্রেরণা লাভ করেছে। এই ভাব ও আবেগ সবার মনে আসে না এবং সবসময় আসে না। ফলে সবার দৃষ্টিও উন্মিলিত হয় না এবং সবসময় হয় না। তাই যখন তখন এবং যে কোন পর্যটকের কাছ থেকে আমরা ভ্রমণের লেখা উপহার পাই না।

এখানে আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা তা হলো, সবার মন ও মানস, চিন্তা ও চেতনা, ভাব ও ভাবনা এবং দেখার দৃষ্টিও একরকম হয় না। যেমন দেখো, একজন তালিবে ইলম লালবাগের কেল্লা দেখেছে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্বের দৃষ্টি থেকে, কিন্তু একজন ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি এখানে আখেরাত-চিন্তার কিছুই দেখতে পাবে না। তার চিন্তা হয়ত সীমাবদ্ধ থাকবে কেল্লার স্থাপত্যশৈলী ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের মধ্যে। ফলে একই স্থানের দুই পর্যটকের ভ্রমণকাহিনী হয়ে যায় দু'রকমের। তবে যে দৃষ্টিকোণ থেকেই লেখা হোক, লেখার সাহিত্যমান হতে হবে উৎকর্ষপূর্ণ।

এবার আমরা আলোচনার মূল অংশে প্রবেশ করছি। আমরা প্রথমে চিন্তা করে দেখবো, রফীকুল আলম তার ভ্রমণকাহিনীটির শরীরকাঠামো কীভাবে তৈরী করেছে। লেখাটি কয়েকবার পড়ে যা পেলাম তা এই–

শৈশব থেকে লালবাগের কেল্লা দেখার ইচ্ছের কথা জানান দিয়ে লেখাটির শুরু বা সূচনা। বিভিন্ন দর্শনীয় জিনিসের বিবরণ। অবশেষে ঐতিহাসিক বস্তুর পরিদর্শন থেকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব ও মৃত্যুর স্মরণের শিক্ষা নিয়ে প্রত্যাবর্তন– এই হলো লেখাটির শরীরকাঠামো।

এখানে লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে সম্পাদনার পরে। মূল লেখাটির শরীরকাঠামোতে যে সমস্ত ত্রুটি ছিলো তা এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরছি–

(ক) রফীকুল আলম তার কেল্লাভ্রমণের বিবরণে ফুলবাগানের কথা লেখেনি। অথচ লালবাগের কেল্লায় প্রবেশ করামাত্র ফুলবাগানের সৌন্দর্য সবাইকে মুগ্ধ করে। সুতরাং এটা উল্লেখ না করার অর্থ হবে গল্পের শরীরের গুরুতর অঙ্গহানি। যেন একটা হাত-কাটা মানুষ! তাই সম্পাদকের পক্ষ হতে এই অঙ্গসংযোজনটুকু করা হয়েছে।

(খ) পরিবিবির মাযার তাজমহলের প্রতিকৃতি অনুসরণ করে তৈরী করা হয়েছে। এই সূত্র ধরে তাজমহলের উল্লেখ করা হলে লেখাটির হৃদয়গ্রাহিতা অনেক বেড়ে যায়। কারণ তাতে লেখায় বহুমাত্রিকতা সৃষ্টি হয়। লেখক রফীকুল আলম সেই

সুযোগটি গ্রহণ করেনি। হতে পারে তথ্যটি তার অজানা। তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জানাশোনার পরিধি যত বিস্তৃত হবে লেখাটি তত বেশী তথ্যপূর্ণ হবে এবং তার গুণগত মান তত বৃদ্ধি পাবে। যেমন ‘একশ’ টাকার নোটে কেল্লার প্রধান ফটকের ছবি ছাপা হয়েছে’- এ তথ্যটি তার জানা ছিলো বলে সে তা তার লেখায় সংযোজন করতে পেরেছে। সুতরাং তুমি যে পরিমাণ লিখবে তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ তোমাকে পড়তে হবে। কোন বিষয়ে আমাদের লিখতে না পারার একটা বড় কারণ হলো ঐ বিষয়ে কিছু জানা না থাকা। যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান ও জানাশোনা রয়েছে সে বিষয়ে তুমি অবশ্যই লিখতে পারবে। এজন্যই আমি বলি, যারা লেখার মশক করতে চাও, তারা গুরুগম্ভীর কোন বিষয়ে লেখার চেষ্টা না করে, হালকা বিষয়ে এবং তোমার জীবনের চারপাশের বিষয়গুলো নিয়ে লিখতে চেষ্টা করো, তাতে সহজে লেখা আসবে। আর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে পড়া-শোনা করো, যাতে লেখা শেখার পর ঐ সব বিষয়ে কলম ধরতে পারো। এখানে রফীকুল আলম যদি লালবাগের কেল্লা সম্পর্কে কিছু লেখাপড়া করে নিতো তাহলে অবশ্যই তার লেখাটি আরো তথ্যসমৃদ্ধ হতো!

(গ) লেখক রফীকুল আলম জাদুঘরে সংরক্ষিত অন্যান্য বস্তুর উল্লেখ না করে শুধু সে যুগের শাসকদের নির্যাতনের চিত্রপ্রসঙ্গে বিশদ বিবরণ দিয়েছে। তারপর শাসকদের কঠোর সমালোচনা করে লিখেছে, ‘এরা কি মানুষ, না মানুষরূপী পশু?!’ এখানে মনে রাখা দরকার ছিলো যে, হিন্দু লেখকরা সবসময় মুসলিম শাসকদের চরিত্রহননের চেষ্টা করে থাকে, এমনকি তারা তো দরবেশ বাদশাহ আওরঙ্গযেব (রহ)-কে পর্যন্ত ছাড়েনি। লেখক রফীকুল আলম এখানে নিজের অজ্ঞাতসারে মুসলিমবিদ্বেষীদের প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়েছে। লেখকের কী করা উচিত ছিলো, সেটাই সম্পাদক হিসাবে এখানে আমি তাকে দেখাতে চেয়েছি। অর্থাৎ প্রথমে আমি জাদুঘরে সংরক্ষিত অন্যান্য বস্তুর উল্লেখ করেছি। তারপর কথিত চিত্রটির বিশদ বিবরণ বাদ দিয়ে সেটার প্রতি শুধু ইঙ্গিত করেছি। সেই সঙ্গে চিত্রটির প্রামাণ্যতা ও বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছি, যাতে পাঠক মুসলিম শাসকদের সম্পর্কে বিরূপ ধারণার শিকার না হয়।

মোটকথা, তোমার লেখাটির শরীর কাঠামো সম্পর্কে তোমাকে পূর্ণ সচেতন হতে হবে, যাতে লেখাটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের নবীন লেখকরা তো বটেই, এমনকি দীর্ঘ দিন ধরে যারা ইসলামী সাহিত্যচর্চা করে আসছেন তারাও লেখার শরীর ও শরীরকাঠামো সম্পর্কে মোটেই সচেতন নন। পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করে লেখার কাটাচেরা ও

দিকেই যেন সবার লক্ষ্য। ফলে ধর্মহীন সাহিত্যের মোকাবেলায় ইসলামী সাহিত্য মোটেই মানোত্তীর্ণ হচ্ছে না। হচ্ছে না যে, সে অনুভূতিও আমাদের নেই।

জনৈক হিন্দু লেখকের লেখা একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের কথাই ধরা যাক। মোঘল বাদশাহ আকবরের চরিত্রহনন করে লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাস 'আরাবল্লী থেকে আগরা' সেই কবে পড়েছি! ত্রিশ বছরের কম নয়, কিন্তু সাহিত্যমানের কারণে বইটি এখনো আমার মনে দাগ কেটে আছে। পক্ষান্তরে ইসলামী ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলো অধিকাংশই স্মৃতিযোগ্য তো দূরে, পাঠযোগ্যই হয়ে উঠেনি। বলাবাহুল্য, অন্যান্য দোষের পাশাপাশি উপন্যাসগুলোর শরীর ও শরীরকাঠামোগত দুর্বলতাই এর প্রধান কারণ। এসম্পর্কে পরবর্তী কোন সুযোগে তুলনামূলক কিছু আলোচনা করার ইচ্ছে আছে।

তদ্রূপ মাসুদ রানাজাতীয় গোয়েন্দা উপন্যাসের মোকাবেলায় 'ইসলামী গোয়েন্দা উপন্যাস' নামক বেশ কিছু 'পদার্থ' বাজারে এসেছে, যা আসলে 'অপদার্থ' ছাড়া আর কিছু নয়। মাসুদ রানার গল্পগুলোর ভাষা ও শরীরকাঠামোগত সৌন্দর্যের ধারে কাছেও সেগুলো যেতে পারেনি। অবশ্য রানার আগের বইগুলোর তুলনায় বর্তমান বইগুলোরও যাচ্ছে তাই অবস্থা। কারণ বিত্ত ও খ্যাতি অর্জন করার পর লেখক সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক হয়ে পড়েছেন। (বলতে ইচ্ছে করে, আগে তিনি লিখে বাণিজ্য করেছেন, এখন বাণিজ্য করে লিখছেন।)

(যাই হোক, কেউ যেন আবার মনে না করে যে, এজাতীয় চরিত্রবিধ্বংসী বই পড়া আমি কোনভাবে অনুমোদন করছি। একটা কথা সবসময় মনে রাখতে হবে, সাহিত্যের চেয়ে ঈমান ও চরিত্র অনেক বেশী মূল্যবান। ওসব বই চুলোয় যাক, সেই সঙ্গে যাক সেগুলোর সাহিত্য, তবু আমার ঈমান ও চরিত্র যেন রক্ষা পায়।)

সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে নবীন তরুণ ও কিশোর লেখকদের জন্য সবচে' কার্যকর ও ফলদায়ক কাজ হলো কোন মুরুব্বির নেগরানিতে এবং কোন মাননীয় সাহিত্যিকের সংস্পর্শে সাহিত্যচর্চা ও লেখানবিসি করা। আমাদের ছাত্রজীবনে এমন সুযোগ পাওয়া ছিলো অকল্পনীয়। স্ব-উদ্যোগে যদ্দুর সম্ভব এগুতে চেষ্টা করেছি।

এখানে একটি কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করলে অন্যায় হবে। মরহুম জনাব আখতার ফারূক সাহেব, আমি তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট নই। তবে তিনি 'তাঁর বিষয়ে' ভালো সাহিত্যিক। একবার তাঁর কাছে দু'একদিন দু'এক ঘণ্টা নবিসি করার সুযোগ পেয়েছিলাম, এখনো যা আমার জন্য মূল্যবান পুঁজি হয়ে আছে।

মনে পড়ে, 'আরকানে আরবা'আ' কিতাবটি তরজমা করার সময় আমি লিখেছিলাম, 'আল্লাহর সৃষ্টিনৈপুণ্য'। তিনি সংশোধন করে দিয়ে বললেন, 'আল্লাহর সৃষ্টিকুশলতা লেখা দরকার। কেননা নৈপুণ্যের চেয়ে কুশলতা উচ্চস্তরের। সুতরাং

কুশলতার মত শব্দ থাকতে আল্লাহর শানে নৈপুণ্য-এর ব্যবহার অসঙ্গত।

একজন রুচিশীল সাহিত্যসমালোচকের সামনে বসে যদি এভাবে নিয়মিত চর্চা করতে পারো, কিংবা বিকল্প হিসাবে পুষ্প পত্রিকাটিকে যদি বন্ধুরূপে সঙ্গে রাখতে পারো এবং পুষ্পসংকলনের ভূমিকায় যে 'পাঠপদ্ধতি'-এর কথা বলা হয়েছে তা অনুসরণ করো তাহলে তোমার মধ্যেও অতি অল্প সময়ে সাহিত্যরুচি সৃষ্টি হতে পারে, ইনশাআল্লাহ।

---

১। আগে ছিলো, 'নির্যাতনের কাল্পনিক দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে'। এটা আমারই সম্পাদনা। কিন্তু এখন দেখছি, বড় ধরনের ত্রুটি! ভালো, সুন্দর ও প্রিয় কোন দৃশ্যের ক্ষেত্রে বলা যায়, দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অথচ আমার দৃষ্টিতে তো এই দৃশ্যটি আপত্তিকর। তাহলে আমি 'ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বলি কীভাবে? তাই এখন পরিবর্তন করে লিখলাম, 'দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে'। আসলে লেখার যত্ন ও পরিচর্যার কোন শেষ নেই।

# গল্পের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

পুষ্পের অদেখা এক বন্ধু, আব্দুল জলীল, ঢাকা, উত্তরা, বাইতুস-সালাম মাদরাসার ছাত্র। তার সঙ্গে আমার দেখা হতে পারতো, কিন্তু হয়নি। জীবনে একবারই সে একটি গল্প পাঠিয়েছিলো। তার পর থেকে নিখোঁজ[১]! জানি না, কোথায় এখন সেই লেখক এবং তার কলম! একটা কথাই শুধু জানি, বাগানে কত ফুল ফোটে, কত ফুল ঝরে, মালির চোখ থেকে শুধু অশ্রু ঝরে!

পুষ্পের সেই বন্ধুদের এখন বড় বেশী মনে পড়ছে,[২] যারা জীবনে প্রথম ও শেষ একটিমাত্র লেখা পাঠিয়েছিলো আমাকে কলম মেরামতের একটি করে লেখা উপহার দেয়ার জন্য। কীভাবে যে, তাদের শোকর আদায় করবো! কামনা করি, যেখানেই তারা আছে, যেন কাফেলায় থাকে এবং কাফেলার সঙ্গে পথ চলে।[৩]

আব্দুল জলীলের পাঠানো গল্পটিকে অবলম্বন করে গল্পের শরীরকাঠামো সম্পর্কে পুষ্পের পাতায় যে আলোচনা করেছিলাম, প্রয়োজনীয় সম্পাদনাসহ এখন সেটাই তোমাদের সামনে তুলে ধরছি।

***

ভাই আব্দুল জলীল!

পিছনের বিভিন্ন লেখায় এ পর্যন্ত আমরা লেখার ভাষাগত ও শব্দগত বিভিন্ন দিকের সংশোধন সম্পর্কে আলোচনা করেছি। লেখার শরীরকাঠামো সম্পর্কেও কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে। তোমার লেখাটি পড়ে মনে হলো, লেখার শরীরকাঠামো সম্পর্কে আরো কিছু আলোচনা হওয়া দরকার। তোমার লেখাটির জন্য তাই তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

একটি লেখাকে তুমি একটি মানবদেহের সঙ্গে তুলনা করতে পারো। মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে। দেহের যে অঙ্গ যেমন হওয়া দরকার তেমন না হলে অসুন্দর হয়। তদ্রূপ যদি কোন অঙ্গচ্ছেদ ঘটে, একটি হাত, একটি পা না থাকে তাহলে সেটাকে দেহের গুরুতর খুঁত বলে গণ্য করা হয়। আবার দেহ যদি সুঠাম না হয়, বরং মেদবহুল হয় তাহলে সেটাও বেশ দোষের হয়।

মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত লেখার দেহেও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে ভারসাম্য থাকতে হবে। যে অংশটা ছোট হওয়া দরকার সেটা বড় হলে, যেটা বড় হওয়ার কথা সেটা ছোট হলে, যেটা আগে বা পরে হওয়া সঙ্গত সেটা পরে বা আগে হয়ে গেলে, কিংবা লেখার কোন অঙ্গহানি ঘটলে লেখাটা গুরুতরভাবে অসুন্দর হয়ে যাবে। লেখাতে যদি কোন অপ্রয়োজনীয় অংশ এসে যায় তাহলে সেটা হবে দেহের অপ্রয়োজনীয় মেদের মত। অপ্রয়োজনীয় মেদ অবশ্যই দেহ থেকে ঝেড়ে ফেলতে হয়। দেহ সুঠাম ও সুন্দর হলে তবেই না আসে অলঙ্কারসজ্জা এবং পোশাকপরিচর্যার প্রশ্ন। কঙ্কালসার বা মেদসর্বস্ব দেহে যত অলঙ্কারই চড়াও এবং যত সুন্দর পোশাকই পরাও তা কারো মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না। যদি হাত না থাকে তাহলে চুড়ি এবং যদি পা না থাকে তাহলে ঝুমুর পরার তো প্রশ্নই আসে না।

তদ্রূপ একটি লেখার শরীর ও দেহকাঠামো যখন সুঠাম ও সুন্দর হবে, সব অঙ্গ যখন ঠিক থাকবে তখন সুন্দর অলঙ্কারসজ্জা ও পোশাকপরিচর্যার, অর্থাৎ সুন্দর ভাষা ব্যবহার করার প্রশ্ন আসবে। এছাড়া তো সুন্দর ভাষারও কোন মূল্য থাকে না।

তো ভাই আব্দুল জলীল, তুমি যে গল্পটি পাঠিয়েছো তার শরীর ও দেহকাঠামো সম্পর্কে এখানে কিছুটা আলোচনা করা হলো, যাতে তুমি ও পুষ্পের বন্ধুরা এ বিষয়ে আরো অধিক জ্ঞান অর্জন করতে পারো।

তোমার নাতিদীর্ঘ লেখাটির শিরোনাম হলো *'আমার চোখে তার মৃত লাশটি এখনো ভাসে'*। তোমার লেখার ভঙ্গি ও শব্দচয়ন মোটামুটি ভালো, যদিও বানানত্রুটি আছে প্রচুর। নিয়মনীতি মেনে নিয়মিত অনুশীলন করলে আশা করি, তোমার লেখার যথেষ্ট উন্নতি ঘটবে, ইনশাআল্লাহ। তো এখানে কয়েকটি বিষয় দেখ–

যাদের বানানে দুর্বলতা আছে তাদের তো লেখা শেষ করার পর অবশ্য কর্তব্য হলো লোগাত ও অভিধান খুলে সন্দেহজনক শব্দগুলোর বানান দেখে নিয়ে বানান-ভুলগুলো সংশোধন করা। বানানের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে কোন লেখা কারো কাছে কখনো পাঠানো উচিত নয়। 'হুযূরদের শান, অশুদ্ধ বানান- এই বদনাম থেকে আমাদের মুক্ত হতেই হবে।

(খ) লেখার শিরোনাম সংক্ষিপ্ত ও আকর্ষণীয় হওয়া উচিত। যেমন, 'এখনো চোখে ভাসে সেই লাশ'। তুমি 'মৃত লাশ' লিখেছো। লাশ তো মৃতই হবে, তাই মৃত শব্দটি অপ্রয়োজনীয়। অবশ্য মৃতদেহ হতে পারে।

(গ) বিষয়বস্তু বা ঘটনা শুরু থেকে শেষ এমনভাবে সাজাতে হবে যেন তাতে কোন অসঙ্গতি বা অস্বাভাবিকতা না থাকে। সুস্থ-সুঠাম দেহের মত একটি সুন্দর, সুঠাম

'আব্দুস-সালাম ছেলেটি ফজরের পর ঘরে বসে সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করছে, এমনসময় তার ছোট বোন রাস্তার একটি হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তাকে খবর দিলো। সে গিয়ে দেখলো, নিহত মহিলা তাদের প্রতিবেশিনী ষাট বছরের বৃদ্ধা .....। তার ছেলে ইউনুস শিকারপুর থেকে ফেরার সময় পথেই মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলো, আর লোকেরা তাকে ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে গেলো। ঘটনার বিবরণে জানা গেলো, রাতে ছেলে ফিরে আসছে না দেখে বৃদ্ধা 'শতবার' প্রার্থনা করছিলো। এশার পরো যখন ছেলে এলো না তখন বৃদ্ধা কুপি হাতে বের হলো পার্শ্ববর্তী বাড়ীর ফযলু মিয়ার কাছে ছেলের সংবাদ নিতে। কেননা ছেলে তার সাথে ভ্যান চালায়।
ফযলু মিয়া জানালো যে, ইউনুস ভ্যানের খেপ নিয়ে শিকারপুর গেছে। রাতে ফিরবে না। বৃদ্ধা বাড়ীতে ফেরার পথে এক ঝোপের আড়ালে এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটে।'

তো এই হলো মোটামুটি তোমর গল্পের শরীরকাঠামো এবং তাতে বেশ গুরুতর কয়েটি ত্রুটি রয়েছে, যা আমরা এখানে তুলে ধরবো, যাতে ভবিষ্যতে কোন গল্প লেখার সময় সেগুলো পরিহার করতে পারো। অবশ্য এখনই তোমার এবং তোমাদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই। শুরুতে এরকম হওয়াই স্বাভাবিক। আমার লেখার অবস্থা তো ছিলো আরো 'রসনীয়'। শৈশবে একবার একটি গল্প লিখেছিলাম। আমি নিজেই ছিলাম গল্পের নায়ক। গভীর বনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। মনে কোন ভয়-ডর নেই, না হাতি-গণ্ডারের, না বাঘ-ভল্লুকের! কারণ এতটুকু তো জানা ছিলো যে, যারা নায়ক হয় তাদের মনে ভয়-ভীতি থাকতে নেই। তবে ক্ষুধা-পিপাসা লাগতে পারে। তাতে দোষের কিছু নেই। তো গভীর বনের ভিতর দিয়ে 'নির্ভয়ে' চলতে চলতে একসময় ক্ষুধা ও পিপাসা দু'টোই আমাকে ভীষণভাবে কাতর করে ফেললো। এমন সময় দেখি কী! রাস্তার ঠিক মধ্যখানে অর্ধেক পানিভরা একটা বালতি! সেই পানিতে আবার ভাসছে একটা আপেল! মানে কারিশমার উপর কারিশমা! তো আমি বন-অভিযাত্রার নায়ক সাহেব সেই আপেল ও পানি খেয়ে ক্ষুধা ও পিপাসা দূর করলাম।
পাঠকের মনে প্রশ্ন হতে পারে, গভীর বনে এমন 'সাজানো দস্তরখান' এলো কীভাবে? কিন্তু তখন আমার সে কথা ভেবে দেখার না ছিলো সাধ্য, না ছিলো দায়িত্ব! পেটে ক্ষুধা, গলায় পিপাসা, আর হাতে কলম, সুতরাং দেরী কেন? বালতিভরা পানি এবং রঙধরা আপেলের ব্যবস্থা করে ফেললাম! অথচ দেখো, বনের যে কোন একটা গাছে, চকবাজারের আপেলের পরিবর্তে একটা বন্য ফল ঝুলিয়ে দিতে পারতাম, আর তারই পাশ দিয়ে স্বচ্ছ পানির ঝরণা বইয়ে দেয়া যেতো। তাতে আমার ক্ষুধা-পিপাসাও দূর হতো, পাঠকও গল্পটা হযম করতে

পারতো। কিন্তু অত সব চিন্তা করার কি আর তখন ফুরসত ছিলো!

যাই হোক, বলছিলাম যে, শুরুর দিকে এরকম কাঁচা কাজ হতেই পারে। কিন্তু আমদের সময় ত্রুটি ধরিয়ে দেয়ার কেউ ছিলো না, এমনকি একটু সামান্য উৎসাহ দেয়ারও না। তাহলে তো আরো অনেক আগে আমাদের লেখা আরো অনেক উপরে উঠতে পারতো। অবশ্য এখন আর সে আফসোস করে লাভ নেই। আমাদের সময় তো প্রায় শেষ হয়ে এলো। ঐ যে বলে 'আমাদের হলো সারা, তোমাদের হলো শুরু!' সুতরাং তোমরা এখন থেকে কলমের প্রতি মনোযোগী ও যত্নবান হও।

ভাই আব্দুল জলীল! এবার তোমার লেখার শারীরিক ত্রুটিগুলো দেখো—

(ক) আব্দুস-সালামের প্রতিবেশিনী বৃদ্ধা মাত্র এশার সময় ছেলের খোঁজ নিতে পার্শ্ববর্তী ফযলু মিয়ার বাড়ী গেলেন, ফেরার পথে খুনীদের দেখে দৌড় দিলেন, আর খুনীরা তাকে ধরে জবাই করলো, অথচ পাড়াপড়শী কেউ টের পেলো না, পাঠকের কাছে এটা কি বিশ্বাসযোগ্য হবে? তোমাকে তো এ প্রশ্নেরও সম্মুখীন হতে হবে যে, এধরণের হত্যাকাণ্ড তো ঘটে গভীর রাতে। এসময় খুনীরা কিসের আশায় ওখানে ওত পেতে ছিলো? তারা কি জানতো যে, বুড়ী তখন ফযলু মিয়ার বাড়ী যাবে?

(খ) তাছাড়া ষাটবছরের 'বুড়ী'কে এভাবে খুন করার কারণ সম্পর্কে তুমি কিছুই বলোনি, পাঠক কি তা মেনে নেবে?

(গ) যে ছেলে ভ্যানগাড়ী চালিয়ে সংসার চালায় তার জন্য সন্ধ্যা না হতেই অস্থির হয়ে 'শতবার' আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা কি খুব স্বাভাবিক? (হাঁ, তুমি যদি লিখতে যে, আর কোনদিন এমন হয়নি, কিন্তু সেদিন কেন যেন বৃদ্ধা মায়ের মনে ডাক দিলো যে, তার ছেলের কোন বিপদ ঘটেছে! মনের ডাকে অস্থির হয়ে বৃদ্ধা মা ছেলের খোঁজ নিতে বের হয়েছিলো! তাহলে সেটা কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য হবে।)

(ঘ) ফজরের পর আব্দুস-সালাম ছোট বোনের কাছে খুনের ঘটনা জানবে কেন? সে কি নামাযের জন্য মসজিদে যায়নি? যাওয়ার কিংবা ফেরার পথে সে নিজেই তো ঘটনা জানতে পারতো! সেটাই তো ছিলো স্বাভাবিক!

দেখো, কাহিনীটা তুমি এভাবে সাজাতে পারতে—

(ক) আব্দুস-সালাম মসজিদে ফজরের নামায পড়ে হাঁটতে বের হবে, সূরা ইয়াসীন পড়তে পড়তে ....

(খ) দু'চারজন মানুষের জটলা দেখে সেখানে যাবে.... সেখানেই ফযলু মিয়ার কাছে ঘটনা শোনবে। (ফযলু মিয়ার বাড়ী হবে বৃদ্ধার বাড়ী থেকে দূরে এবং হত্যাকাণ্ডটি হবে নির্জন স্থানে।)

(গ) একটু পর বৃদ্ধার পুত্র ভ্যানগাড়ী নিয়ে সেই পথ দিয়ে আসতে থাকবে এবং

মায়ের লাশ দেখে স্তব্ধ হয়ে যাবে। তারপর চিৎকার করে মায়ের মৃতদেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। (তুমি যে দৃশ্য অঙ্কন করেছো তা ঠিক নয়, পুরুষ মানুষের কেঁদে বুক ভাসানো এবং অজ্ঞান হওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে একটি বিষয়, যে লোকগুলো অকুস্থলে জমা হয়েছিলো তাদের কোন একজন যদি ছেলেটিকে সান্ত্বনা দিতো তাহলে সেটা স্থানোপযোগী হতো। কারণ সে তো এলাকার ছেলে এবং সাবাই তার পরিচিত)

(ঘ) একটা কানাকানি চলবে যে, এটা এলাকার প্রতাপশালী চেয়ারম্যানের কাজ। কেননা অনেক দিন থেকে বৃদ্ধার ভিটেটার প্রতি তার লোভ ছিলো। হয়ত সেখানে তার বাগান বাড়ী করার ইচ্ছে। কিন্তু বৃদ্ধা ভিটে বিক্রি করতে রাজী হচ্ছিলো না। তো এই কানাকানি চলবে, কিন্তু চেয়ারম্যানের ভয়ে কেউ কথাটা বলতে সাহস পাবে না।

(ঙ) ঘটনা বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে তুমি তোমার বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা তুলে ধরতে পারো। যেমন, পুত্রের খোঁজে বের হওয়া প্রসঙ্গে বুড়ী মায়ের মাতৃমমতা সম্পর্কে কিছু কথা; ভ্যানগাড়ী চালিয়ে মায়ের সেবাকারী পুত্রের প্রসঙ্গে কিছু কথা; চেয়ারম্যানের প্রসঙ্গে সমাজে ধনী-গরীব ও আইনের বৈষম্য ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু কথা। এতে তোমার লেখাটি সাধারণ একটি খুনের ঘটনাকেন্দ্রিক হয়েও বহুমাত্রিক হবে।

এবার তুমি উপরের পরামর্শের আলোকে ঘটনাটি নতুনভাবে লেখো। আশা করি, যত্ন করে লিখলে লেখাটি আরো সুন্দর ও নিখুঁত হবে ইনশাআল্লাহ। আমি কিন্তু তোমার কাছে পাকা হাতের উচ্চাঙ্গের গল্প দাবী করছি না। তোমার বর্তমান যোগ্যতার সর্বোচ্চ ব্যবহারের পর যে লেখাটি বের হয়ে আসবে সেটাই আমি চাচ্ছি। সাধ্যের বাইরে নয়, সাধ্যের ভিতরে, তবে সাধ্যের অপচয় যেন না ঘটে, লেখার গায়ে যেন দায়সারা ছাপ না থাকে।

***

এবার তোমার লেখার কিছু শব্দ ও বাক্য সম্পর্কে আলোচনা করছি। তুমি লিখেছো– 'পুত্রের গগনবিদারী আর্তচিৎকারে পরিবেশ থমথমে হয়ে গেলো।' এখানে স্ববিরোধিতা রয়েছে। কারণ থমথমে মানে ভীতিজনক নিস্তব্ধতা। তাছাড়া আর্তচিৎকার হয় করুণ, তা গগনবিদারী হয় না।

তুমি লিখেছো, 'এ দৃশ্য দেখে আব্দুস-সালামের চোখে যেন শ্রাবণের বর্ষণ শুরু হলো।' এখানে প্রবল অশ্রুপাতকে শ্রাবণের বর্ষণের সঙ্গে উপমা দেয়া হয়েছে। উপমাটা তোমার পছন্দ হয়েছে নিশ্চয়! কিন্তু এ উপমা হৃদয় ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে মানাবে, খুনখারাবির ঘটনায় মানাবে না। এখানে শুধু চোখের পানি বা অশ্রুবর্ষণ যথেষ্ট ছিলো। তাছাড়া শ্রাবণের বর্ষণ চোখে হয় না, চোখ থেকে হয়।

তুমি লিখেছো, 'দু'টি ছেলে নিয়ে বৃদ্ধার পরিবার।' বিধবা বৃদ্ধার পরিবার না লিখে সংসার লেখা ভালো ছিলো। তাছাড়া আরেকটি ছেলে সম্পর্কেও কিছু কথা থাকা দরকার ছিলো। অথবা তুমি ভ্যান গাড়ীর চালক ছেলেটিকেই শুধু রাখো, অন্য ছেলেটির যেহেতু গল্পে কোন ভূমিকা নেই সেহেতু তাকে গল্প থেকে সরিয়ে দাও। তাহলেই খুঁতটা দূর হয়ে যাবে।

সুযোগ থাকলে তোমার লেখাটির ভাষা ও শরীরকাঠামো সম্পর্কে আরো কিছু আলোচনা করা যেতো, তবে আশা করি, এতেই তুমি এবং অন্যরা চিন্তার যথেষ্ট খোরাক পাবে, ইনশাআল্লাহ

---

১। প্রথমে ছিলো, 'তারপর তার আর কোন লেখার দেখা পাইনি।' এখন চূড়ান্ত সম্পাদনার সময় মনে হলো, খুব সাধারণ একটি বাক্য, যাতে লেখকের মনের ব্যথা যেমন প্রকাশ পায়নি, তেমনি শব্দসৌন্দর্যেরও উদ্ভাস ঘটেনি। হঠাৎ মনে হলো, লেখা যেমন পাইনি তেমনি দেখাও তো পাইনি। তো লেখা ও দেখা– এদু'টি শব্দ দিয়ে কিছু তৈরী হতে পারে না? তখন লিখলাম, 'তারপর কখনো না পেলাম তার চেহারার দেখা, না পেলাম তার কোন লেখার দেখা' তেমন পছন্দ হলো না, শব্দ বেশী, মর্ম কম। তদুপরি 'চেহারার দেখা' কথাটা সুশীল নয়। পরিবর্তন করে লিখলাম, 'তারপর না পেলাম লেখকের দেখা, না পেলাম লেখার দর্শন।' মনে হলো কিছুটা ভালো, কিন্তু সে নয়, যার প্রতীক্ষা করছি। অনেক চিন্তার পর লিখলাম 'তারপর না পেলাম তার দেখা, না পেলাম তার লেখা!' মনে হলো, বেশ সুন্দর! একটি জ্যামিতিক মাপ আছে, 'তারপর' হলো মূল কাণ্ড। তা থেকে বেরিয়েছে সমান দু'টি শাখা। পর্ববিভক্তিটা এরকম, 'তারপর/ না পেলাম তার দেখা/না পেলাম তার লেখা।' হঠাৎ মনে হলো, আচ্ছা, ফুলের কাছে যাই না কেন! ফুলের চেয়ে আপন কি আছে মনের সুখ এবং দুঃখ প্রকাশ করার জন্য! এবং তখন হৃদয়ের অঙ্গনে হঠাৎ যেন শুনতে পেলাম একটি 'নুপুরধ্বনি' কলম থেকে যেন বের হয়ে গেলো ফুলের পাপড়ি দিয়ে তৈরী একটি বাক্য১। 'বাগানে কত ফুল ফোটে, কত ফুল ঝরে,২ মালীর চোখ থেকে শুধু অশ্রু ঝরে।' শেষ শব্দটি যখন লিখলাম, মাগরিবের আযান হলো, পাশে বসে থাকা ছেলে মুহম্মদকে বললাম, চলো বাবা, যার দানে ধন্য হলাম তাঁকে সিজদা করে আসি। তোমরা যারা দূরে থেকেও আমার কাছে আছো, আমার কলম থেকে ঝরা 'শিশির' তোমাদেরও সিক্ত করুক, আমীন।)

২। আগে ছিলো, 'এখন বড় বেশী মনে পড়ছে পুষ্পের সেই বন্ধুদের যারা...। বাহ্যত কোন সমস্যা নেই। কিন্তু ভেবে দেখো, 'চোখ থেকে অশ্রু ঝরে'-এর পর আমি যে শব্দটায় 'নেমে আসবো' সেটা উপরের বক্তব্যের কাছাকাছি শব্দ হলে সুন্দর হয় না! এ চিন্তা থেকে বাক্যটির দুই অংশের স্থানবদল করে দিলাম। এখন দেখো, কত সুন্দর হয়েছে! আমি যদি আমার কলমকে প্রেম নিবেদন না করি, আমি যদি আমার কলমকে 'সময়' উৎসর্গ না করি, কলম আমাকে কেন শব্দের 'ফুলমালা' উপহার দেবে!

৩। বাগানে কত ফুল ফোটে, কত ফুল ঝরে.... বাক্যটি যখন লেখা হলো, তখন আমার

ও সুন্দর হতে হবে, নচেৎ বাক্যটির সৌন্দর্যের উদ্ভাস ঘটে না। এখানে পূর্বাপর পরিবেশটা কী ছিলো দেখো–

পুষ্পের অদেখা এক বন্ধু, নাম আব্দুল জলীল। জীবনে একবারই সে একটি গল্প পাঠিয়েছিলো; তারপর তার আর কোন লেখার দেখা পাইনি। বাগানে কত ফুল ফোটে, কত ফুল ঝরে, মালীর বুক থেকে শুধু অশ্রু ঝরে।

'আব্দুল জলীল পুষ্পের এমন বন্ধুদের একজন, যারা জীবনে প্রথম ও শেষ একটিমাত্র লেখা পাঠিয়েছিলো আমাকে কলম মেরামতের বিষয়ে একটি লেখা উপহার দেয়ার জন্য। কীভাবে যে, তাদের শোকর আদায় করবো, ভেবে পাই না।'

ঐ সুন্দর বাক্যটির জন্য সুন্দর পূর্বাপর পরিবেশ তৈরীর তাগিদ থেকেই মূলত বর্তমান সম্পাদনাটুকু করা হয়েছে। বাক্যটিকে পরিবেশন করার জন্য 'জানি না' শব্দটিকে অবলম্বনরূপে গ্রহণ করা হয়েছে, দেখো– জানি না, কোথায় সেই লেখক.... শুধু জানি, বাগানে ফুল ফোটে....)

---

১। প্রথমে ছিলো, ফুলের পাপড়ি দিয়ে তৈরী একটি বাক্য, প্রথমে খুব মুগ্ধ হয়েছিলাম, পরে মনে হলো, যত সুন্দরই হোক, ফুলের পাপড়ি দিয়ে তৈরী বাক্য কলমের নিব দিয়ে বের হয়ে আসার দৃশ্যটা বাস্তবানুগ নয়, তখন অন্তরে উদিত হলো, 'ফুলের রেণুমাখা একটি বাক্য' দেখো, মূল লেখার সম্পাদনা সম্পর্কে যে পর্যালোচনা সেটারও কত সম্পাদনা করতে হচ্ছে!

২। প্রথমে ছিলো, 'বাগানে কত কলি আসে, কত কলি ঝরে'। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর এটা পেয়েছিলাম, কিন্তু আবৃত্তি করতে গিয়ে দেখি, শ্রুতি মসৃণ নয়। তখন কলির পরিবর্তে ফুলের কথা মনে হলো।

৩। প্রথমে ছিলো 'মালীর বুক থেকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে'। পরে মনে হলো, কোমল কোমল শব্দের পাশে 'দীর্ঘ নিঃশ্বাস' ঠিক যেন খাপ খাচ্ছে না! ভাবতে ভাবতে যেন আসমানের ইশারায় মনের পর্দায় ভেসে উঠলো, 'মালীর চোখ থেকে শুধু অশ্রু ঝরে'! আলহামদু লিল্লাহ!

# লেখার জন্ম এবং পরবর্তী পরিচর্যা

পিছনে একাধিকবার এ আলোচনা এসেছে, এখানে আবার বলছি, আমরা যখন কোন কিছু লিখি তখন প্রথমবার লেখাটির শুধু জন্ম হয়। কোন লেখা তার জন্মের সময় নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না, হতে পারে না। না ভাষাগত দিক থেকে, না শরীরকাঠামোগত দিক থেকে।

লেখার জন্মপর্বে এসব বিষয় নিয়ে ভাবার অবকাশও নেই। তখন তো শুধু একটাই চিন্তা, 'লেখাটা কোনক্রমে জন্মলাভ করুক'। তখন কলমকে চলতে দিতে হয় স্বাভাবিক চিন্তায় নিজের গতিতে। লেখাটি যখন জন্মলাভ করে ফেলে তখন লেখক চিন্তামুক্ত হয়ে যায় একারণে যে, এই লেখাটি আর হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা নেই। এবং লেখাটি এর চেয়ে খারাপ হওয়ারও আশঙ্কা নেই। এখন আমি লেখাটির পিছনে যত চেষ্টা-মেহনত ও যত্ন-পরিচর্যা করবো সেটা সুন্দর থেকে সুন্দরতর এবং উন্নত থেকে উন্নততরই হতে থাকবে।

হাঁ, কোন লেখা জন্মলাভ করার পরই শুধু শুরু হয় তার পরিচর্যা। আগে জন্মপর্ব, তারপর পরিচর্যাপর্ব। দিনের পর দিন এভাবে সেভাবে, বিভিন্নভাবে চলতে থাকে পরিমার্জন ও সংস্কারপ্রক্রিয়া। পরিমার্জন হলো ভাষা ও শব্দের, আর সংস্কার হলো শরীর ও শরীরকাঠামোর। এ ক্ষেত্রে যে লেখক যত ধৈর্য ও কুশলতার পরিচয় দিতে পারে তার লেখা হয় তত সুন্দর। আফসোস, এখন শুধু লেখার অঙ্গনেই নয়, জ্ঞানসাধনার সকল অঙ্গনেই যা খুব দ্রুত কমে আসছে এবং প্রায় বিলুপ্তির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে সেটা হলো ধৈর্য ও কষ্টসহিষ্ণুতা এবং নিরন্তর চেষ্টা ও সাধনার মানসিকতা।

জন্মপর্বের পর ব্যাপক ও দীর্ঘ পরিচর্যাই হলো লেখার উন্নতি ও উৎকর্ষের একমাত্র উপায়। অবশ্য সুদীর্ঘ চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে একসময় কলম এমন গতি ও শক্তি অর্জন করে যে, লেখাটি জন্মই লাভ করে অনেকটা নিখুঁত ও সুন্দর হয়ে। তখন পরবর্তী পর্যায়ে তেমন পরিমার্জন ও সংস্কারের প্রয়োজন পড়ে না। তবে সেটা অনেক পরের কথা, আরো পরের কথা হলো, লেখক যত বড় হতে থাকেন

তার পরিমার্জন ও পরিচর্যাও তত সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ আশি বছর বয়সেও তার কবিতার যে আশ্চর্যরকম পরিমার্জন ও সংস্কার করেছেন, তার কিছু নমুনা তুলে ধরেছেন তার 'পূজারিণী' মৈত্রেয়ী দেবী। মাঝে মধ্যে অবাক হয়ে ভাবি, কিসের জোরে লোকটা বাংলাসাহিত্যের অঙ্গনে এমন 'প্রায় মানবাতীত' সাধনার জীবন যাপন করতে পেরেছে! কোন্ তৃপ্তি ও প্রাপ্তির আশা ছিলো তার সামনে! শেষ পর্যন্ত আমরা কি পারবো তাকে পরাস্ত করে বাংলাসাহিত্যের স্বর্ণাসনটি দখল করতে! ভরসা শুধু এই যে, মানুষের চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই এবং আল্লাহর খাযানায় দানের কমতি নেই। তুমি দুয়ারে দাঁড়াবে আঁচল পেতে, তিনি দেবেন তোমার আঁচল পূর্ণ করে।

অভ্যাসমত আবার প্রসঙ্গ থেকে সরে পড়ছি। যাক, নীচের লেখাটি পড়ো। প্রথম কথা শিরোনামে এই ছোট্ট লেখাটি পুষ্পের কোন এক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে–

*'মানবজাতির সবচে' মূল্যবান সম্পদ হলো তার অতীতের অভিজ্ঞতা। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত এবং দুর্যোগ-দুর্বিপাকের মধ্য দিয়ে জীবনের দুর্গম পথ চলতে গিয়ে মানুষ যে অভিজ্ঞতা লাভ করে সেটাই তার আগামী দিনের চলার পথের পাথেয়। শিশু যেমন হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়, কিন্তু হাল ছেড়ে দেয় না, বরং উঠে দাঁড়ায়, আবার হাঁটতে চেষ্টা করে; এভাবে তার অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বাড়ে এবং একসময় সে হাঁটা শিখে ফেলে, তেমনি জীবনের চলার পথে বারবার আমরা বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হই, ব্যর্থতার মুখোমুখি হই। কিন্তু এ প্রতিকূলতা ও ব্যর্থতা অর্থহীন নয়।'*

লেখাটি জন্মের সময় ছিলো আরো ছোট, অনেকটা এরকম, 'পিছনের অভিজ্ঞতাই আমাদের সামনে চলার পাথেয়। আমরা ভুল করি এবং ক্ষতিগ্রস্ত হই; বিভিন্ন প্রতিকূলতা ও ব্যর্থতায় আমরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু যদি আমরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি তাহলে চূড়ান্ত বিচারে সেগুলো আমাদের জন্য ক্ষতিকর নয়। কারণ পিছনের অভিজ্ঞতাই আগামী জীবনের সফলতার ভিত্তি।'

এ লেখাটি আমার কলমে একটানেই এসে গিয়েছিলো। তবে আমি বুঝতে পারছিলাম যে, লেখাটির ভাষা যেমন খুব সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়নি তেমনি তার শরীরকাঠামোও নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ হয়নি। তবে এই ভেবে আমি তৃপ্তি লাভ করলাম যে, লেখাটির অস্তিত্ব তো হয়ে গেছে! এখন আমি প্রয়োজনে কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ ব্যয় করে দীর্ঘ পরিচর্যা ও পরিমার্জনের মাধ্যমে লেখাটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে পারি।

হঠাৎ আমার মনে হলো, অভিজ্ঞতা অর্জন করাকে শিশুর হাঁটতে শেখার সাথে তুলনা করা যায়। তখন লেখাটির পুরো শরীরকাঠামো আমার চিন্তায় এভাবে উদ্ভাসিত হলো যে, প্রথম অংশে থাকবে অভিজ্ঞতার বিবরণ, তারপর আসবে শিশুর

হাঁটতে শেখার উপমা। তারপর উপসংহার।

লেখার সূচনা-অংশটি, অর্থাৎ 'পিছনের অভিজ্ঞতাই আমাদের সামনে চলার পাথেয়।' সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে মনে হলো, বাক্যটা খুব সাদামাটা। আরেকটু উজ্জ্বল ও সারগর্ভ হলে ভালো হয়, চিন্তা করতে করতে লিখলাম, 'সারা জীবন আমরা যা অভিজ্ঞতা অর্জন করি সেটাই আমাদের চলার পথের পাথেয়।' মনে হলো কিছু উন্নত হয়েছে, তবে সর্বোচ্চ সুন্দর হয়নি। আরো গভীর চিন্তাদর্শনপূর্ণ ও মর্মসমৃদ্ধ একটি বাক্য হওয়ার দরকার, আরো সংক্ষিপ্ত, কিন্তু হৃদয়গ্রাহী, যা নীতিবাক্যের মর্যাদা লাভ করতে পারে। ভাবতে ভাবতে মনে হলে, পাথেয়-এর একটি বিশেষণ দরকার; যেমন, 'মূল্যবান পাথেয়'। মূল্যবান শব্দটি থেকেই আমার ভিতরে একটা আলোড়ন এলো এবং আমার কলম থেকে এ বাক্যটি বেরিয়ে এলো, 'জীবনের অভিজ্ঞতাই হলো জীবনের সবচে' মূল্যবান সম্পদ।'

বাক্যটি প্রথমে খুব পছন্দ হলো, কিন্তু পরে মনে হলো, নীতিবাক্য হিসাবে এটি সুন্দর হলেও একটি লেখার সূচনা-বাক্য হিসাবে ততটা উপযোগী নয়। কথাটি আরো সহজ করে লেখা দরকার। ভাবতে ভাবতে এবং লিখিত বাক্যটি আওড়াতে আওড়াতে হঠাৎ লিখে ফেললাম–

'মানুষের জীবনের সবচে' মূল্যবান সম্পদ হলো তার অতীতের অভিজ্ঞতা।'

তারপর 'চলার পথের পাথেয়' কথাটা নাড়াচাড়া করতে গিয়ে হঠাৎ কলমে এসে গেলো, 'জীবনের দুর্গম পথে চলতে গিয়ে মানুষ যে অভিজ্ঞতা লাভ করে সেটাই তার চলার পথের পাথেয়।' তারপর মনে হলো, ' ... সেটা তার আগামী দিনের চলার পথের পাথেয়।' এতে কথাটা যেমন ওজনদার হয়েছে তেমনি বাক্যের উভয় পর্বে ভারসাম্য এসেছে, যেমন, 'জীবনের দুর্গম পথে চলতে গিয়ে/ মানুষ যে অভিজ্ঞতা লাভ করে/ সেটাই তার আগামী দিনের চলার পথের পাথেয়।' তাছাড়া, 'আগামী দিনের' এবং 'চলার পথের'– এদু'য়ের মধ্যে রয়েছে একটা সুরছন্দ।

একটি বই পড়তে গিয়ে 'ঘাত-প্রতিঘাত' শব্দটি পেলাম। আমার সমালোচক কান বললো, লেখক যদি 'ঘাত-প্রতিঘাত'-এর পরে 'এবং দুর্যোগ-দুর্বিপাক' লিখতেন তাহলে সুন্দর একটি সুরছন্দ তৈরী হতো। ভাবছিলাম লেখকের লেখার সৌন্দর্য-অসৌন্দর্য নিয়ে, হঠাৎ ভিতরে একটি সম্ভাবনা উঁকি দিলো যে, আমার লেখায় এটিকে ব্যবহার করা যায় কি না? তাতে জীবনের দুর্গম পথের বাস্তব চিত্রটি ফুটে ওঠবে এবং বাক্যটি অধিকতর সারগর্ভ হবে! এভাবে পর্যায়ক্রমে তৈরী হলো নীচের বাক্যটি–

'বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত এবং দুর্যোগ-দুর্বিপাকের মধ্য দিয়ে জীবনের দুর্গম পথে চলতে গিয়ে মানুষ যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে সেটাই তার আগামী দিনের চলার পথের পাথেয়।'

এ বাক্যটি যেন পূর্ববর্তী বাক্যের সম্প্রসারিত ব্যাখ্যা।

এ পর্যন্ত ছিলো সূচনাপর্ব সম্পর্কে আমার চিন্তাভাবনা। এরপর লেখাটির দ্বিতীয় ভাগে এসে শিশুর হাঁটা শেখার উপমাকে প্রথমে এভাবে সাজিয়েছিলাম, 'শিশু যেমন হাঁটার সময় বারবার পড়ে যায়, তবু উঠে দাঁড়ায় এবং হাঁটতে চেষ্টা করে এবং একসময় হাঁটা শিখে ফেলে তেমনি...।

এ পর্যায়ে মনে হলো, যেহেতু লেখার মূল বিষয়বস্তু হলো অভিজ্ঞতার মূল্য এবং অভিজ্ঞতার মূল্য বোঝানোর জন্যই এ উপমা, সেহেতু শিশুর হাঁটতে শেখাকেও ক্রমাগত অভিজ্ঞতার ফল বলে আখ্যায়িত করা উচিত; এটা ভেবেই লিখলাম, 'এভাবেই তার অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বাড়ে।'

লেখার দ্বিতীয় অংশটি বারবার পড়ে মনে হলো, বাক্যকাঠামো এবং বাক্যগুলোর বিন্যাস ঠিক যেমন হওয়া দরকার তেমন হয়নি। আবার শুরু হলো চিন্তাভাবনা এবং কাটাচেরা। অবশেষে বাক্যগুলো বর্তমান কাঠামো ও বিন্যাস লাভ করলো। মোটামুটি এভাবে লাগাতার চিন্তা-ভাবনা ও সযত্ন পরিমার্জনের পর এই ছোট্ট লেখাটি বর্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু আজ এত দিন পর এই সংকলন তৈরী করার সময় যখন লেখাটির প্রতি নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃষ্টিতে তাকালাম তখন তার ভাষা ও শরীরকাঠামোতে অনেক ত্রুটি ধরা পড়লো এবং নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হলাম। তুমিও দেখো আমার লেখার দৈন্য; দেখে দেখে শিখতে চেষ্টা করো।

(ক) 'বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত এবং দুর্যোগ-দুর্বিপাকের মধ্য দিয়ে জীবনের দুর্গম পথে চলতে গিয়ে মানুষ যে অভিজ্ঞতা লাভ করে সেটাই তার আগামী দিনের চলার পথের পাথেয়।' বাক্যটি কয়েকবার পড়ো। বাক্যটি এত বড় যে, আবৃত্তি করতে গিয়ে পাঠকের দম ফুরিয়ে আসতে পারে। যদি এটিকে কয়েক টুকরো করি তাহলে কেমন হয় দেখো–

'জীবনের দুর্গম পথে চলতে গিয়ে মানুষ বহু ঘাত-প্রতিঘাত ও দুর্যোগ-দুর্বিপাকের সম্মুখীন হয় এবং বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা অর্জন করে। অতীতের এসব অভিজ্ঞতাই হলো তার আগামী দিনের চলার পথের পাথেয়।' অথবা–

'জীবনের দুর্গম পথে চলতে গিয়ে কত ঘাত-প্রতিঘাত আসে, আসে কত দুর্যোগ-দুর্বিপাক। তাতে অর্জিত হয় বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা। অতীতের এসব অভিজ্ঞাতাই হলো আমাদের আগামী দিনের চলার পথের পাথেয়।'

(খ) 'শিশু যেমন হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়, কিন্তু হাল ছেড়ে দেয় না, বরং আবার উঠে দাঁড়ায় এবং হাঁটতে চেষ্টা করে ...।'

এখন মনে হচ্ছে, শিশুর বারবার হাঁটতে চেষ্টা করা এবং পড়ে যাওয়া, এ দৃশ্যটি যদি ছোট ছোট বাক্যে উপস্থাপন করা হয় তাহলে আরো সুন্দর হয়, যেমন–

'শিশু হাঁটতে চায়, কিন্তু হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়, তবু সে হাল ছাড়ে না, বরং উঠে দাঁড়ায়, আবার হাঁটে, আবার পড়ে, আবার উঠে দাঁড়ায় এবং চেষ্টা করে যায়। এভাবে তার অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বাড়ে এবং একসময় সে হাঁটা শিখে ফেলে।'

এখানে পুরো লেখাটি আবার সাজাই

(ক) জীবনের সবচে' মূল্যবান সম্পদ হলো অতীতের অভিজ্ঞতা। জীবনের চলার পথে বহু ঘাত-প্রতিঘাত আসে, আসে বিভিন্ন দুর্যোগ-দুর্বিপাক। তা থেকে অর্জিত হয় বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা। এ অভিজ্ঞতাই হলো আমাদের আগামী দিনের চলার পথের পাথেয়।

(খ) শিশু হাঁটতে চায়, কিন্তু হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়, তবু সে হাল ছাড়ে না। বারবার পড়ে যায়, বারবার উঠে দাঁড়ায় এবং চেষ্টা করে যায়। এভাবে তার অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বাড়ে এবং একসময় সে হাঁটতে শুরু করে ...।[১]

(গ) জীবনের চলার পথে আমরাও বারবার বিভিন্ন প্রতিকূলতা ও ব্যর্থতার সম্মুখীন হই,[২] তবে তা অর্থহীন নয়।[৩] কারণ জীবনের ব্যর্থতাই হলো জীবনের অভিজ্ঞতা এবং অতীতের অভিজ্ঞতাই হলো ভবিষ্যতের পাথেয়।[৪]

এখানে (ক) হচ্ছে লেখাটির সূচনাপর্ব এবং (খ) হচ্ছে মধ্যপর্ব, বা মূলপর্ব। (এখানে জীবনের অভিজ্ঞতাকে শিশুর হাঁটা শেখার সঙ্গে উপমা দিয়ে লেখাটিকে আরো সম্প্রসারিত করা হয়েছে। লেখার মূল বিষয়টি কিন্তু উপরোক্ত উপমা ছাড়াও পূর্ণতা লাভ করতে পারে, তবে পরিপূর্ণতা লাভ করবে উপমাটির মাধ্যমে। এর মাধ্যমে লেখাটির শরীরবৃদ্ধি যেমন ঘটেছে তেমনি ঘটেছে তার সমৃদ্ধি।) সবশেষে (গ) হচ্ছে সমাপ্তিপর্ব।

তুমি চিন্তা করলে অবশ্যই বুঝতে পারবে যে, প্রতিটি পর্ব এখানে ভাষা ও কাঠামো উভয় দিক থেকে আগের চেয়ে সুন্দর হয়েছে। বিশেষ করে সমাপ্তিপর্বটি অনেক ভালো হয়েছে। ঐ যে একেবারে শুরুতে লিখেছিলাম, 'জীবনের অভিজ্ঞতাই হলো জীবনের সবচে' মূল্যবান সম্পদ' সেটাকেই আরো পরিমার্জনের পর সমাপ্তিপর্বে ব্যবহার করেছি।

তাহলে তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো যে, নিরন্তর চিন্তা-ভাবনা, সমালোচনা-পর্যালোচনা ও পরিমার্জন-পরিচর্যা একটি লেখাকে কীভাবে ধারাবাহিক উৎকর্ষ দান করে!

---

১। মূলে ছিলো 'এবং একসময় সে হাঁটা শিখে ফেলে।' পরে মনে হলো, তাতে ছন্দপতন ঘটেছে, তাই লিখলাম, 'এবং একসময় সে হাঁটতে শুরু করে।' এখন 'সঞ্চয় বাড়ে এবং শুরু করে'-এর মধ্যে একটি সুরছন্দ সৃষ্টি হয়েছে।)

২। প্রথমে লিখেছিলাম, 'বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হই এবং ব্যর্থতার মুখোমুখি হই।' পরে ভাবলাম, ব্যর্থতার একটি বিশেষণ যোগ না করলে উভয় অংশে ভারসাম্য রক্ষিত হয়

না। তাই লিখলাম, 'ননারকম ব্যর্থতার মুখোমুখি হই'। আবার ভাবলাম, মুখোমুখি-এর তুলনায় সম্মুখীন শব্দটির উচ্চারণ কিছুটা কঠিন। সুতরাং অগ্রপশ্চাত করে লিখলাম, 'বিভিন্ন প্রতিকূলতার মুখোমুখি হই এবং নানারকম ব্যর্থতার সম্মুখীন হই'। অবশেষে মনে হলো, এখানে অনাবশ্যক শব্দস্ফীতি এবং শব্দের অপচয় ঘটেছে, তখন লিখলাম, 'বিভিন্ন প্রতিকূলতা ও ব্যর্থতার সম্মুখীন হই)

৩। প্রথমে ছিলো, 'তবে এ প্রতিকূলতা ও ব্যর্থতা অর্থহীন নয়', পরে মনে হলো, ব্যর্থ ও অর্থ-এর নিকট অবস্থান এবং ত ও থ-এর আধিক্য উচ্চারণের 'তানাফুর' সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া তাতে পুনরুক্তিদোষও রয়েছে। এসব চিন্তা করেই বর্তমান বাক্যটি লিখেছি।

৪। প্রথমে লিখেছিলাম, 'আগামী দিনের/জীবনের/আগামীর পাথেয়। কিন্তু দেখো, 'অতীত'-এর পরে 'ভবিষ্যত'-এর চেয়ে উপযুক্ত শব্দ আর কী হতে পারে!

# সপ্তম অধ্যায়ঃ লেখা শেখার সহজ উপায়

আমরা আপনজন ও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ঘরোয়া পরিবেশে দীর্ঘ সময় কথা বলতেও কোন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। বন্ধুর সঙ্গে মুখের কথার মত কাগজের সঙ্গে কলমের কথার ক্ষেত্রেও যদি আমরা এটা করতে পরি তাহলেই কোন কিছু লেখা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। আলোচ্য অধ্যায়ে মূলত এই দৃষ্টিকোণ থেকেই কোন বিষয় সহজে লেখা যায় কীভাবে তা আলোচনা করা হবে।

# একটি চিঠির উত্তর

পুষ্পের অনেক বন্ধু বারবার একটা কথা বলে, ভাষাশিক্ষা ও সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব আমরা বুঝতে পেরেছি এবং এ চেতনাও আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছে যে, বাতিলের বিরুদ্ধে কলমযুদ্ধে আমাদের অবশ্যই জয়ী হতে হবে। সুতরাং লেখা শিখতে হবে এবং শক্তিশালী লেখক হতে হবে। কিন্তু যখন কলম নিয়ে বসি তখন কলম থেকে কোন লেখা আসে না। কী লিখবো, কীভাবে লিখবো বুঝেই আসে না। শেষে হতাশ হয়ে কলম বন্ধ করে উঠে পড়ি যে, আমার দ্বারা আর যাই হোক লেখালেখি করা সম্ভব নয়।

পুষ্পের এরকমই একজন বন্ধু হলো শামছুল আরেফীন। সে তার এক দীর্ঘ চিঠিতে যে হতাশার কথা লিখেছিলো তারই উত্তরে মুদ্রিত আমাদের লেখাটি।

## *কীভাবে লেখক হবো?*

প্রিয় আরেফীন!

তোমার চিঠি পেয়েছি। কয়েকবার পড়েছি। পড়ার পর হাসবো, না কাঁদবো বুঝে উঠতে পারিনি। শেষে হাসি ও কান্নার মাঝামাঝি একটি অবস্থায় অনেকক্ষণ বসে থেকে ভাবলাম, তোমাকে কিছু বলা দরকার। যদি বলা না হয়? তাহলে তোমার 'কর্ণলতিকায়' ছোট্ট একটি চিমটি কেটে আলোচনা শুরু করতে চাই। চিমটি কাটার ইচ্ছে কেন হলো, পরে বলছি

তোমার বক্তব্য এই যে, তুমি খুব জোরদার লেখা লিখতে চাও এবং একজন জবরদস্ত লেখক হতে চাও, কিন্তু কী লিখবে, কীভাবে লিখবে বুঝতে পারো না। অনেকক্ষণ ধরে কলম নিয়ে বসে থাকো, লেখার বিষয়বস্তু নিয়ে বিভিন্নভাবে মাথা ঘামাও এবং মাথাটাও যথারীতি ঘেমে ওঠে, কিন্তু ঘর্মাক্ত মাথার মগজ থেকে তৈলাক্ত কোন লেখা বের হয় না। এরপর দুয়ে দুয়ে চার- একেবারে একটি সহজ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে তুমি লিখেছো, আমার দ্বারা আর যাই হোক লেখক হওয়া

হবে না এবং লেখক হওয়া আর যারই কর্ম হোক, আমার কর্ম নয়।

ভাই আরেফীন! ২ এবং ২ মিলে ৪ না হয়ে ২২ও তো হতে পারে! তদ্রূপ তোমার হতাশার সিদ্ধান্ত ভুলও তো হতে পারে! জীবনের সব হিসাব দুয়ে দুয়ে চার হয় না, বাইশও হয়। আত্মতুষ্টির ক্ষেত্রে যেমন এটা সত্য তেমনি সত্য হতাশার ক্ষেত্রেও। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুল চিন্তা ও ভ্রান্ত ধারণার গর্ভ থেকেই জন্মলাভ করে হতাশা ও আত্মতুষ্টি। হতাশাকে বলা হয় আত্মবিশ্বাসের ঘুণ, আর আত্মতুষ্টিকে বলা হয় প্রত্যাশার উইপোকা।১

চিঠিটি পড়ে আমার তো বরং মনে হয়েছে লিখতে তুমি ভালোই পারবে। একটি চিঠিতে মনের পুঞ্জীভূত হতাশার কথা এমন সুন্দর করে যে ফুটিয়ে তুলতে পারে তার অন্তত লেখক হওয়ার বিষয়ে তো হতাশ হওয়া উচিত নয়।

তুমি লিখেছো, 'আপনার কথাই ঠিক, আমরা আসলে বোল হয়ে ঝরে যাওয়ার জন্যই এসেছি। পাকা ফল হওয়া আমাদের নছীবে নেই।

সুন্দর লিখেছো!২ অন্যের কথা নিজের লেখায় এমনভাবে যে তুলে আনতে পারে সে কেন লেখক হতে পারবে না! আমি তো মনে করি, ইচ্ছে করলে এবং চেষ্টা করলে তুমি 'কাতিবুন এবং আবু কাতিবিন' দু'টোই হতে পারো। প্রশ্ন শুধু এই যে, ইচ্ছে কাহাকে বলে এবং উহা কত প্রকার ও কী কী? এবং তোমার ইচ্ছেটা কোন প্রকারের?

তাছাড়া আমার লেখা ঐ বোলবিষয়ক সম্পাদকীয়তে কোথায় আছে যে, 'শ্রীযুক্ত' আরেফীন বোল হয়ে ঝরে পড়ার জন্যই দুনিয়াতে তশরীফ এনেছেন? পাকা ফল হয়ে গাছ থেকে নেমে আসা এবং উম্মতের দস্তরখানে পরিবেশিত হওয়া তার কিসমতে নেই?

এবার বুঝতে পেরেছো, কেন তোমার কানে চিমটি কেটে লেখাটা শুরু করেছি! আসল কথা হলো, তোমাকে অবিরাম সাধনা করে যেতে হবে। পৃথিবীতে যারা বড় হয়েছেন তাদের ইতিহাস পড়ো এবং সেই রকম সাধনায় আত্মনিয়োগ করো। এখনকার ছেলেদের আসল সমস্যা এই যে, 'কেষ্ট তারা পেতে চায়, তবে কষ্ট ছাড়া। উর্দূতে প্রবাদ আছে– 'দু'রাকাত পড়েই অহীর ইন্তিযারে বসে যাওয়া'। শাফেয়ী মাযহাবে অবশ্য একরাকাতী নামাযেরও ব্যবস্থা আছে। সেই সূত্রে বলতে ইচ্ছে করে, আমাদের সোনার ছেলেরা এখন দুই রাকাতের কষ্টেও রাজী নয়, একরাকাত পড়েই আসমানে তাকায়, কত দেরী আর, নুযূলে ফিরেশতার!৩

অথচ কী দুনিয়া, কী আখেরাত, নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ও মেহনত ছাড়া সংসারে কোন কাজে সফলতার নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। আর সব বাদ দাও; শুধু চামড়ার তৈরী, হাওয়ায় ভর্তি গোলগাল বলটিতে লাথি মেরে যারা আজ বিখ্যাত খেলোয়াড় তাদের কঠিন সাধনা ও কঠোর অনুশীলনের খবর রাখো!৪

রেয়ায করতে হয়, জানো তা! রিয়ায শব্দটি কিন্তু আরবী এবং তার অর্থও সাধনা। তো যে কণ্ঠ শিল্পী গানের সুরে ভুবন৫ মাতিয়ে তোলে তাকেও শেষ রাতের সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হয়, আর তুমি কিনা আগামী দিনের কলম-জিহাদের মুজাহিদ হতে চাও শুধু খোশবু মেখে, আর সকাল-বিকাল হাওয়া খেয়ে এবং বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করে! কানে চিমটি কাটবো না তো কী করবো বলো!

যাই হোক, প্রথম কথা হলো, তোমাকে নিরন্তর সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। দ্বিতীয়ত সঠিক নিয়মে পর্যায়ক্রমে পরিশ্রম করে যেতে হবে। তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে গাছ, গাছ থেকে কুঁড়ি, কুঁড়ি থেকে পূর্ণ বিকশিত ফুল– এটাই হলো প্রকৃতির পর্যায়ক্রমবিধান।

শুরু তোমাকে গোড়া থেকেই করতে হবে। আগা থেকে শুরু করার কোন উপায় নেই। লেখা শেখার জন্য প্রথমে তোমাকে গুরুগম্ভীর, জটিল ও চিন্তামূলক বিষয়ের পরিবর্তে হালকা ঘটনা ও বিবরণমূলক বিষয় নির্বাচন করতে হবে। আমি, তুমি– আমরা সবাই কত গল্প করি, কত ঘটনা বলি! মনের চিন্তা ও অনুভূতি আপনজন-দের কাছে কত সময় কতভাবে প্রকাশ করি! বলতে বলতে কখনো হাসিতে গড়িয়ে পড়ি, কখনো কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি, এমনকি অন্যকেও কাঁদিয়ে ছাড়ি, এই আমি, তুমি– আমরা!

তো যে কাজটা আমরা মুখের ভাষায় পারি সেটা কলমের ভাষায় কেন পারবো না! মুখের ভাষায় বন্ধুদের, আপনজনদের যেভাবে বলো, সেভাবেই সহজ সরল ভাষায় কাগজের পাতায় তুমি তা লিখতে পারো। এক্ষেত্রে রোযনামচা হতে পারে তোমার উত্তম সঙ্গী।

একটি ঘটনা শোনো। সেদিন সন্ধ্যারাতে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ছিলো। চাঁদটা একসময় চলে গেলো একখণ্ড মেঘের আড়ালে। চঁদটা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু মেঘখণ্ডটির চারপাশ দিয়ে আলো বের হচ্ছে। তিনবছরের আরওয়া এই দৃশ্য দেখে বলে উঠলো, 'চাঁদটা মনে হয় গলে গিয়েছে। এখন বেয়ে বেয়ে পড়ে যাচ্ছে।' পরে যখন মেঘের আড়াল থেকে চাঁদটা বের হলো তখন আরওয়ার অবাক হওয়ার পালা! সে বলে উঠলো, 'ওম্মা! চাঁদটা দেখি গলেনি!'

আমার ঘটনা বলা শেষ, কিন্তু তোমার ঘটনা এখান থেকেই শুরু। তুমি বলো দেখি, তিনবছরের আরওয়া যদি এভাবে বলতে পারে তাহলে দশবছরের আরওয়া এভাবে কেন লিখতে পারে না?! আসল কথা হলো, কথা বলা ও গল্প করার সময় আমরা স্বাভাবিক থাকি এবং স্বতঃস্ফূর্ত থাকি। আমাদের মনেই থাকে না যে, আমরা কথা বলছি, গল্প করছি। লিখতে বসলেই সব উলট-পালট হয়ে যায়, আমরা অস্বাভাবিক হয়ে যাই এবং ভাবনায় পড়ে যাই, আমরা শব্দ তালাশ করতে শুরু করি। কথা বলার সময়ের যে স্বাভাবিকতা, সেটা যদি লেখার সময় ধরে রাখা সম্ভব হয় তাহলেই আমরা সহজভাবে সরল ভাষায় সবকিছু লিখতে পারবো।

তো এখন থেকে রোযনামচা লিখতে শুরু করো, যেন বন্ধুর কাছে কোন ঘটনা বলছো, মনের কোন কষ্ট, বা আনন্দের কথা প্রকাশ করছো, বা কোন কল্পনা ও পরিকল্পনার কথা তুলে ধরছো।

দ্বিতীয় পর্যায়ে যে কোন হালকা বিষয়ের উপর কলম চালাতে পারো। উদাহরণ-স্বরূপ ঘড়ি সম্পর্কে একটি রচনা লেখো। হাঁ, যেমন তোমার কাণ্ড, হয়ত বলে বসবে, কী লিখবো?

আমি জানতে চাই, 'ঘড়ি আমাদের জন্য খুব দরকারি একটি জিনিস' এতটুকুও কি তুমি লিখতে পারো না? এটাও তো এক বাক্যের[৬] ছোট্ট একটি রচনা হলো! ব্যস, ঘড়ি সম্পর্কে তোমার লেখাটির জন্ম হয়ে গেলো, এখন তুমি চিন্তা করে করে এটিকে সম্প্রসারিত করতে থাকো। যেমন, 'আগের যুগে মানুষ সূর্য দেখে সময় জেনে নিতো,[৭] এখন আমরা ঘড়ির সাহায্যে খুব সহজেই সময় জেনে নিতে পারি। হলো তো এবার তিনবাক্যের বিশাল এক রচনা! ইচ্ছে করলে আরো যোগ করতে পারো, 'ঘড়ি থাকলে সময়ের হেফাযত করা যায় এবং সব কাজ সময়মত করা যায়, বিশেষ করে নামাযের সঠিক সময় জেনে ওয়াক্তমত নামায পড়া যায়।' এভাবে চিন্তা করে করে একটি করে বাক্য বাড়াতে থাকো, তোমার লেখার শরীর বাড়তে থাকবে এবং একসময় তা হয়ে যাবে পরিপুষ্ট একটি লেখা। কিন্তু মূল লেখাটি তো একটিমাত্র বাক্য দ্বারাও খুব সহজেই জন্মলাভ করতে পারে! সুতরাং বন্ধু আমার, পারিবো না পারিবো না একথাটি বলিও না আর। তাহলে তোমার কানে চিমটি কাটিবো শতবার![৮]

তৃতীয়ত চিন্তামূলক কোন প্রবন্ধ লিখতে হলে ঐ বিষয়ের উপর এক বা একাধিক লেখা সংগ্রহ করো এবং সেগুলো মনোযোগের সঙ্গে পড়ো। কে কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে লিখেছেন? কে কীভাবে প্রারম্ভ করেছেন এবং মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এবং উপসংহার টেনেছেন, সেগুলো চিন্তা করো। এরপর তুমি কীভাবে লিখবে, চিন্তা করে লেখা শুরু করে দাও এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে লিখে যাও। বন্ধুদের সঙ্গে গল্পের আসরে যেভাবে অনর্গল গল্প করো সেভাবে অনর্গল লিখে যাও। বানান, ভাষা, বিষয়বস্তুর পূর্ণাঙ্গতা ইত্যাদি কোন বিষয়ে অতিরিক্ত নযর দিয়ো না; আগে নিরাপদে লেখাটির জন্ম হতে দাও। তারপর একটানা লেগে থাকো লেখাটির পরিচর্যার কাজে। বারবার পড়ে দেখো, লেখাটির শরীরকাঠামো থেকে কী বাদ দেয়া যায়? কী যোগ করা যায়? লেখাটির ভাষাসৌন্দর্য কীভাবে বাড়ানো যায়?

তোমার সামনে যে লেখাগুলো ছিলো তা থেকে সুন্দর সুন্দর শব্দ ও বাক্য আলাদা করে খাতায় টুকে নাও। এরপর তোমার লেখায় সেগুলো সুন্দরভাবে ব্যবহার করো। একটি লেখার উপর দিনের পর দিন এভাবে পরিশ্রম করো, যতক্ষণ না তোমার মন আশ্বস্ত হয় এবং বিশ্বাস হয় যে, তোমার সাধ্যের ভিতরে লেখাটি পূর্ণতা লাভ করেছে। আবার বলছি, 'তোমার সাধ্যের ভিতরে, সাধ্যের বাইরে

এভাবে অন্তত দশবছর চেষ্টা-সাধনা করে যাও এবং চর্চা ও অনুশীলন চালিয়ে যাও। তারপর দেখো, লেখার জগতে তোমার সফলতা আসে কি না! আহলে হক তোমার কলমকে শ্রদ্ধা করে কি না এবং আহলে বাতিল তোমার কলমের ভয়ে কম্পমান হয় কি না!

জীবনের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম বা দশম লেখাটাকেই ছাপার হরফে দেখার লোভ করো না, বরং নিরন্তর সাধনা ও অনুশীলনের মাধ্যমে আগে একটা পর্যায় অতিক্রম করো, একটা নির্ধারিত স্তরে উত্তীর্ণ হও। অন্তত দশবছর শুধু নিজের জন্য লেখো, তারপর পাঠকের জন্য লেখার চিন্তা করো। আমি এখন তোমাদের জন্য লিখছি, কিন্তু বিশ্বাস করো, বহু বছর শুধু নিজের জন্য লিখেছি।

প্রিয় আরেফীন! আরেকটি জরুরি কথা, নিজের লেখার ভাষা ও সাহিত্যের মান যদি উন্নত করতে চাও তাহলে তোমাকে বাংলাভাষার শীর্ষস্থানীয় লেখক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের লেখা পড়তে হবে। গড়গড় করে পড়ে যাওয়া নয়, চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনার সঙ্গে পড়া। শব্দচয়ন, বাক্যকাঠামো, উপমা ও রূপকের প্রয়োগ, ভাষাশৈলী ইত্যাদি চিন্তা করে পড়বে এবং নিজের লেখায় সেগুলোর প্রয়োগ করতে চেষ্টা করবে। অবশ্য এই 'অধ্যয়ন-অভিযান' যেহেতু আকীদা-বিশ্বাস ও আমল-আখলাকের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ সেহেতু একজন অভিজ্ঞ রাহবারের নেগরানিতেই তা করতে হবে।

সাধারণ লেখকদের কাঁচা হাতের বাজে লেখা একদম পড়বে না। তাহলে তাদের লেখার দোষত্রুটি তোমার লেখায়ও অনুপ্রবেশ করবে।

উদাহরণ দেখো–

একজন লিখেছেন, 'মদীনায় ছিলো গগনচুম্বী খেজুর গাছ'। বাক্যটি তোমার চোখে পড়লো, ভালো লাগলো, আর তুমিও হয়ত তা টুকে নিলে তোমার কোন লেখায়। এইটুকু বিচার করে দেখা তোমার পক্ষে সম্ভব হলো না যে, খেজুরগাছ কখনো এত উঁচু হয় না, যাতে সে 'গগনকে চুম্বন' করতে পারে; তালগাছ হলে না হয় কথা ছিলো।

আরেকজন লিখেছেন, 'ফুলের সুবাসে আকাশ বাতাস সুরভিত হয়েছে।' বাক্যটা হয়ত তোমারও পছন্দ হয়ে যাবে এবং তোমার কলমের ডগায়ও এসে যাবে, অথচ তুমি বুঝতে পারলে না যে, ফুলের সুবাসে বাতাস সুরভিত হলেও আকাশ সুরভিত হওয়ার কথা কোন সাহিত্যিক লেখেননি।

আরেকজন লিখেছেন, 'মা আয়েশা (রা) নবীজীর অতিশয় প্রেমাসক্ত ছিলেন।' আস্‌তাগফিরুল্লাহ! ভদ্রলোক হয়ত নেকনিয়তের সঙ্গেই লিখেছেন, কিন্তু বুঝতে পারেননি যে, আসক্তি জিনিসটা ভালো নয়। যেমন মদাসক্তি, নেশাসক্তি, বিষয়াসক্তি ইত্যাদি। তুমিও হয়ত না বুঝে কথাটি হুবহু তুলে নেবে

তাদেরকে অনেক বুঝালেন, কিন্তু তাঁর জমার খাতায় বিরাট একটা শূন্য। একজনও মুসলমান হলো না।'

আচ্ছা বাবা, তুমিই বলো, দুনিয়ার একটা আদমের বাচ্চাও মুসলমান না হোক, তাতে নবীজীর জমার খাতায় বিরাট শূন্য হতে যাবে কেন? জমার খাতায় শূন্য কথাটা সুন্দর, ঠিক আছে, হয়ত কোন চটুল উপন্যাসে পড়েছো, তাও ঠিক আছে, তোমার লোভ হয়েছে ব্যবহার করার, তাও ঠিক আছে, কিন্তু তাই বলে এখানে, নবীজীর শানে! এটা ঠিক নেই।

তাছাড়া 'বিরাট শূন্য' কথাটা বলা হয় পরিহাসের ক্ষেত্রে। যেমন, 'পরীক্ষার খাতায় পেয়েছে বিরাট এক শূন্য!'

আরো অনেক উদাহরণ দেয়া যায়। সুন্দর সুন্দর মলাটের ভেতরে হাটে-বাজারে আজকাল এধরনের 'সাহিত্য-রসগোল্লা' দেদারসে বিক্রি হচ্ছে। তুমি যদি এগুলো গলাধঃকরণ করতে থাকো তাহলে একটা কথা বলি, রাগ করো না– তোমার সাহিত্যচর্চার পাক্কা সাড়ে বারোটা বেজে যাবে। তাই বিষ যেমন পরিহার করে চলো, এমন লেখকের লেখাও তেমনি পরিহার করে চলতে হবে।

অবশ্য তোমার মধ্যে যখন সাহিত্যসমালোচনার যোগ্যতা এসে যাবে তখন তুমি সমালোচনার দৃষ্টিতে যে কোন লেখা পড়তে পারো। যেমন সৈয়দ শামসুল হক লিখেছেন, ভালো ও মন্দ দু'রকমের লেখা থেকেই তিনি শিখে থাকেন। ভালো লেখা থেকে শেখেন, এরকম করে আমাকে লিখতে হবে, আর মন্দ লেখা থেকে শেখেন যে, ওরকম লিখতে নেই। কিন্তু এরকম শেখা চলে লেখক হওয়ার পরে, আগে নয়, সাহিত্যরুচি অর্জিত হওয়ার পরে, আগে নয়।

প্রিয় আরেফীন! আশা করি তোমার হতাশা দূর করার মত কিছুটা হলেও দিক-নির্দেশনা আজকের আলোচনায় তুমি পাবে। বাকি থাকলো তোমার চেষ্টা-সাধনা, আর থাকলো তোমার কপালের অগ্রভাগ। সেই কপালটাকে যদি তোমার অনুকূলে আনতে চাও তাহলে চেষ্টা-সাধনার সাথে সাথে আল্লাহর মদদ ও নুছরতও তোমাকে হাছিল করতে হবে। কেননা এছাড়া সমস্ত 'সাধনা' ব্যর্থ হতে বাধ্য। আল্লাহ তাওফীক দান করুন, আমীন।

---

১। লেখাটি পুষ্পে এবং বইয়ের প্রথম সংস্করণে শুধু এতটুকু ছিলো, 'জীবনে সব হিসাব দুয়ে দুয়ে চার হয় না, বাইশও হয়।' অর্থাৎ জীবনের সহজ হিসাবটা, যেটা সবার মাথায় থাকে, সেটা সবসময় ঠিক হয় না। দ্বিতীয় সংস্করণের সময় হঠাৎ মনে হলো, হিসাবের ভুল শুধু হতাশার ক্ষেত্রেই নয়, আত্মতুষ্টির ক্ষেত্রেও হয়। এবং দু'টোই সর্বনাশ ডেকে আনে। সুতরাং বক্তব্যটি অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। তাই লিখলাম, 'আত্মতুষ্টির ক্ষেত্রে যেমন এটা সত্য তেমনি সত্য হতাশার ক্ষেত্রে। তারপর মনে হলো, আত্মতুষ্টি ও হতাশার মহাসর্বনাশতার দিকটি অন্তরে বদ্ধমূল হওয়া দরকার। হঠাৎ করেই ঘুণের কথা মনে পড়লো, আর ঘুণ থেকে মনে পড়লো উইপোকার কথা। এভাবে একটি উপমা চিন্তায়

মূর্ত হলো এবং পর্যায়ক্রমে বক্তব্যটি পূর্ণতা লাভ করলো।

২। আগে ছিলো, 'দারুণ লিখেছো!' এখন মনে হচ্ছে দারুণ শব্দটির প্রয়োগে এখানে অতিশয়তা রয়েছে, তাই এ পরিবর্তনটুকু করা হয়েছে। আবেগ, উচ্ছ্বাস, সন্তোষ, অসন্তোষ ইত্যাদি যেখানে যতটুকু প্রকাশ করা সঙ্গত সেখানে তার বেশী প্রকাশ করাকে বলে অতিশয়তা। নিন্দা-প্রশংসার ক্ষেত্রেও একই কথা। তবে অতিশয়তার শৈল্পিক প্রকাশ দোষের নয়, বরং তা লেখার আলাদা একটি সৌন্দর্য। তবে বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে বোধ ও রুচির উপর।

৩। আগে ছিলো, আসমানের দিকে তাকায়, ফিরেশতা নেমে আসছে কি না!

৪। প্রথমে ছিলো 'লাথি মেরে জগৎ-জোড়া খ্যাতি লাভ করেছে যেসব খেলোয়াড়' মনে হলো শেষের দিকে এসে বাক্যটির গাঁথুনি শিথিল হয়ে গেছে। এখন শব্দ কমে আসাতে গাঁথুনি সুদৃঢ় হয়েছে। তারপর আগে ছিলো 'কঠিন সাধনা ও সুদীর্ঘ অনুশীলন', এখন 'কঠিন ও কঠোর-এর পাশাপাশি অবস্থানগত সৌন্দর্যটি লক্ষ্য করো। আরো লক্ষ্য করো যে, এই পরিবর্তনটি কত দিন পরে হলো!

৫। ভুবন হ্রস্বউকার, অনেকে দীর্ঘউকার দেয় ভুল করে, ভূমিকা দীর্ঘউকার, অনেকে হ্রস্বউকার দেয় ভুল করে।

৬। আলাদা হবে, কারণ এখানে অর্থ হচ্ছে একটি বাক্য, দু'টি নয়। পক্ষান্তরে 'সবাই একবাক্যে বলে উঠলো', একসঙ্গে হবে, কারণ একবাক্যে মানে কোন দ্বিমত না করে, বা একই সময়ে, সময়ের আগপিছ না ঘটিয়ে।

৭। এখানে একটি কথা, দ্বিতীয় বাক্যটি তুমি লিখতে পারবে, যদি তোমার এ তথ্য জানা থাকে যে, আগে মানুষ কীভাবে সময় জানতো! তার মানে, লিখতে হলেই তথ্য দরকার। আর তথ্য আসে পড়াশোনা ও চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে।

৮।এ বাক্যটি আমি লিখতে পেরেছি, কারণ 'পারিবো না, পারিবো না একথাটি বলিও না আর, একবার না পরিলে দেখো শতবার'– এই প্রবচনটি আমার জানা ছিলো। অর্থাৎ সেই একই কথা, লিখতে হলে আমাকে পড়তে হবে।

# লেখা কেন আসে না!?

বন্ধুরা! মনের অবস্থা আজ আমার বড়ই খোশহাল! তাই আজকের কলামে কলমকে আমি শাসন করবো না। কলম আজ নিজের গতিতে চলুক, যেভাবে ইচ্ছে সেভাবেই লিখুক, বাধা দেবো না।

অনেকে মৌখিকভাবে, অনেকে পত্রযোগে আমাকে প্রশ্ন করে,'আমরা লিখতে চাই এবং লেখক হওয়ার 'আগ্রহও প্রচুর', কিন্তু সমস্যা হলো, কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসি, লেখা আসে না। কী লিখবো, কীভাবে লিখবো, বুঝতে পারি না। কী দিয়ে শুরু করবো, কী দিয়ে শেষ করবো কিছুই মাথায় আসে না। কোথাও কারো কাছে এ সমস্যার সমাধানও পাই না। সবাই এত গুরুগম্ভীর উপদেশ দেয় যে, মাথাটা আরো গুলিয়ে যায়। এ সম্পর্কে আপনি যদি আমাদের সঠিক পথ বলে দিতেন, আমরা উপকৃত হতাম। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদের সঠিক দিকনির্দেশনা দান করুন, চিরজীবন আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।'

মাশাআল্লাহ! লিখতে না পারার উপর বড় সুন্দর একটি লেখা! ভাষা ও শরীর-কাঠামো সবই সুন্দর! ছোট্ট একটি লেখা, তারও সূচনাপর্ব, মধ্যপর্ব ও সমাপ্তিপর্ব সব ঠিক আছে। নাহ, এমন লেখা ও লেখকের তারিফ না করার অর্থ হবে প্রতিভার স্বীকৃতি না দেয়া! তাই শুরুতেই হে অদেখা বন্ধু; আমি অকুণ্ঠচিত্তে তোমাকে প্রশংসা নিবেদন করলাম।

এবার এসো তোমার সমস্যার সঙ্গে পরিচয় করি। গুরুতর সমস্যা সন্দেহ নেই। তবে কিনা সমাধানটা সমস্যার চেয়ে অনেক সহজ! এর দু'টো সমাধান, প্রথমটি তো একেবারে জলের মত সহজ। অর্থাৎ কলমটা আমাকে দান করো, তারপর গরমকাল হলে লেপমুড়ি দিয়ে, আর শীতকাল হলে খালি গায়ে ঘুমিয়ে থাকো। তবে মশারি টানাতে ভুল করো না। মশারা আজকাল জ্বালায় বড্ড! হাঁ ঘুমিয়ে থাকো, তোমাকে লিখতে হবে না। শুধু শুধু কেন এত কষ্ট করা!

আগেই বলেছি, আজ আমি বড়ই খোশমেজাজে আছি। তাই কথা তরল তরল হচ্ছে। যাক, প্রথম সমাধানটা যদি তোমাদের পছন্দ না হয়, বাদ দাও। আমার

চিন্তায় এ সমস্যার দ্বিতীয় যে সমাধানটি আছে সেটা শোনো, হয়ত কিছুটা হলেও তোমাদের কাজে লাগবে। একসময় আমিও এ সমস্যার ভুক্তভোগী ছিলাম। আল্লাহ মেহেরবান আমার মাথায় একটা সমাধান দিয়েছিলেন। সেটা অনুসরণ করে আমি খুব উপকৃত হয়েছি। তার আগে এই ঘরোয়া মজলিসে তোমাদের সঙ্গে খোলামেলা দু'একটা কথা বলতে চাই। আমি কলমের সৈনিক টৈনিক নই, তোমাদেরই পরিবারভুক্ত সামান্য এক কলমসেবী, মানে কলমের খাদেম। তাই আশা করি, আমার কথাগুলোর সে অর্থই তোমরা গ্রহণ করবে যে অর্থটা আমি বোঝাতে চাই। কোন কথার 'হিন্দী কা চিন্দী' মতলব বের করতে যেয়ো না যেন। হিন্দী কা চিন্দী মানে বোঝো না না! তোমরা তো আবার এযুগের তালিবানে ইলম। যাক গে, সে তোমাদের বুঝে কাজ নেই। এবার আসল কথা শোনো এবং মন দিয়ে শোনো।

প্রথমত 'আমরা লিখতে চাই' কথাটা গ্রহণযোগ্য নয়। বলা উচিত, আমরা লেখা শিখতে চাই। হাঁ মিয়াঁ ভাই, আগে তোমাকে লেখা শেখার সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। তোমাকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে যে, আমি শিখবো, যত দিন লেখা আয়ত্তে না আসে তত দিন আমি শিখেই যাবো।

এ মনোভাব নিয়েই তোমাকে কলম ধরতে হবে। শেখার পর্ব শেষ করার আগে 'লেখার' জন্য বসে যেয়ো না। আর 'লেখালেখি', সে চিন্তা তো একটা দু'টো দাড়ি সাদা হওয়ার আগে কখনোই করো না। আমি নিজেও এখনো শুধু লিখি, লেখালেখি করি না। আমার কথাটা 'বাতকিবাত' মনে করো না। ফলাফলের ক্ষেত্রে শব্দের আলাদা আছর আছে।

তো তুমি যদি লেখা শেখার আগেই লেখার জন্য বসে যাও, বা আরো আগে বেড়ে লেখালেখিতে লেগে যাও তাহলে বিশ্বাস করো, কোনদিনই তুমি লিখতে পারবে না। শেখার পর্বে যা তুমি লিখবে সেগুলো ছাপার হরফে দেখার চিন্তা ভুলেও মাথায় এনো না, এমনকি ছাপানোর সুযোগ পেলেও ধৈর্য ও সংযমের সঙ্গে তা এড়িয়ে যাবে। কেননা শেখার পর্বে তুমি যদি প্রকাশের পর্বে চলে যাও এবং তোমার কাঁচা হাতের ভুল-শুদ্ধ লেখা যদি 'দুর্ভাগ্যক্রমে' ছাপার হরফে চলে আসে তাহলে হয়ত তুমি সাময়িক 'পুলক' অনুভব করবে, কিন্তু তোমার লেখকসত্তার মাঝে যে অপার সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে তার অপমৃত্যু ঘটবে। এ ভুল কতজন যে করেছে, করছে এবং হারিয়ে গেছে ও যাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই।

আগে নিরন্তর চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে তোমার লেখকসত্তাকে পুষ্টি যোগাও, পরিপক্ব করো এবং উৎকর্ষের একটা স্তরে উপনীত করো, তারপর লেখা 'শুরু' করো। সে লেখা ছাপা হোক আপত্তি নেই, তখন তুমি লিখতে থাকবে, ছাপা হতে থাকবে এবং অশেষ উন্নতির পথে তোমার অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে। এটা হলো

উন্নতির একটা স্তরে উপনীত হওয়ার পরের কথা। তার আগেই আমরা যে বলি, 'লিখতে লিখতেই মানুষ লেখক হয়' এটা ভুল, এটা আত্মপ্রতারণা। সঠিক কথা হলো, 'লেখা শিখতে শিখতে মানুষ লেখক হয়।

'লিখতে বসা' এবং 'লেখা শিখতে বসা'-এর মধ্যে যে মৌলিক ও গুণগত পার্থক্য তা তোমাকে অনুধাবন করতে হবে। কথা দীর্ঘ হয়ে গেলো, তবে মনে হয় জরুরি কথা।

দ্বিতীয়ত 'আমাদের আগ্রহও প্রচুর' এ দাবীর যথার্থতার বিষয়েও আমার 'কিঞ্চিৎ' সন্দেহ রয়েছে। হয়ত তোমার আগ্রহ আছে, কিন্তু সেটা যে পরিমাণে প্রচুর তা তুমি কীভাবে নির্ধারণ করলে? সফল লেখক হওয়ার জন্য তোমার মধ্যে কী পরিমাণ আগ্রহ থাকা দরকার তা কি তুমি জানো? এক ব্যবসায়ীকে জানি, শুক্রবারে জুমার জামাতে শরীক হওয়ার প্রচুর আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অসুস্থতার ওযরে তিনি মসজিদে যেতে পারেননি; বাসায় যোহর পড়ে নিয়েছেন। এটা দোষের কিছু নয়। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেদিনই তিনি টেলিফোনে লাখটাকার একটা ফরমায়েশ পেলেন। ফরমায়েশটা ধরতে হলে তাকে বন্ধের দিনে দোকান খুলে মাল সরবরাহ করতে হবে। তিনি কারো বাধা না শুনে ছেলের কাঁধে ভর করে দোকানে গেলেন, মাল সরবরাহ করলেন এবং গুণে গুণে লাখটাকা সিন্ধুকে রাখলেন, আর বাসায় ফিরে দিব্বি সুস্থ হয়ে গেলেন। (বলা যায়, টাকার তাপ শরীরের তাপকে শুষে নিলো।)

আগ্রহের তারতম্যের এই জীবন্ত উদাহরণ থেকে আমি আমার জীবনে অনেক বড় শিক্ষা লাভ করেছি। তোমারও নিশ্চয় অনেক কিছুর প্রতি আগ্রহ রয়েছে এবং আগ্রহ রয়েছে লেখক হওয়ার প্রতিও! আমি তোমাকে ছোট্ট একটি কাজ করতে বলবো, এই আগ্রহগুলোর মধ্যে একটু তুলনামূলক বিচার করো। লেখক হওয়ার আগ্রহটা যদি পরিমাণে সর্বোচ্চ না হয় তাহলে তোমাকে আগ্রহের পরিমাণ বাড়াতে হবে। আমার চারপাশে আমি লেখক হওয়ার বহু আগ্রহীকে দেখতে পাই এবং তাদের প্রতি আমার করুণা হয়।

শেখ সা'দী (রাহ)-এর গল্প মনে পড়লো। পথে এক রূপসীকে দেখে এক যুবকের তার প্রতি 'আগ্রহ' হলো। যুবক রূপসীকে তার আগ্রহ নিবেদন করলো। রূপসী মৃদু হেসে বললো, 'আমাকে দেখেই! পিছনে আসছে আমার বোরকাওয়ালী বোন। আমি যদি হই তারা আসমানের, সে হবে সেতারা।'

সে যুগেও ছিলো এ যুগের যুবক। সে ছুটলো পিছনে। বোরকার ঘোমটা তুলে দেখে, দাঁত পড়া এক বুড়ী! ফিরে এসে ধরলো রূপসীকে, কেন মিথ্যা বললে? রূপসীর সহাস্য জবাব, তোমার আগ্রহের পরিমাণটা পরীক্ষা করলাম।[১]

বন্ধু! মনে রেখো, সফলতার জন্য শুধু আগ্রহ যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন হলো একাগ্রতা ও গভীর প্রেম, যা তোমাকে পথের সকল প্রতিকূলতা জয় করে এগিয়ে যেতে শক্তি

যোগাবে এবং অসম্ভব থেকে অসম্ভব কোরবানি দিতে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করবে। দু'একজন বামপন্থী লেখকের কথা জানি, যারা কলমের 'জাদুকর' হওয়ার জন্য অসম্ভব 'সাধনা' করেছেন। তাদের একজন একটি বাক্যের পরিমার্জনে পুরো একটি দিন ব্যয় করেও নাকি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। রাতে স্বপ্নে তিনি বাক্যটির সুন্দর পরিমার্জন করতে সক্ষম হয়েছেন এবং ঘুম থেকে জেগে তা কাগজে টুকে নিয়েছেন। এটাকে বলে আগ্রহ! অথচ তাদের লেখা শুধুই লেখা, আর আমাদের লেখা হলো ইবাদত (ইনশাআল্লাহ)!

আমার তিন বোনকে 'এসো আরবী শিখি' পড়াতাম। ঘুমের মধ্যে তারা শব্দ করে সবক পড়তো। একদিন প্রায় মধ্যরাতে পড়ার আওয়ায পেয়ে আম্মাকে বললাম, এত রাতে পড়ছে, ঘোমাবে কখন! আম্মা মৃদু হেসে বললেন, 'দুনোটা একসাথে চলছে!'

এর নাম হলো আগ্রহ! কিন্তু ওদের অপরাধ ছিলো এই যে, ওরা মেয়ে হয়ে জন্মেছিলো। তাই এত আগ্রহের পরও ওদেরকে আর পড়ার সুযোগ দেয়া হয়নি। অথচ একটি ছেলেকে জানি, এখনো তিনি 'অধ্যয়ন করিতেছেন' শুধু ছেলে হয়ে জন্মানোর পূণ্যগুণে! কুদরতের কারিশমা কতটুকুই বা আমরা বুঝতে পারি!

এখন আমার ছোট মেয়েকে পড়াই। ওর নাকি আরবী শেখার 'প্রচুর' আগ্রহ! কিন্তু আমার মনে হয়, আগ্রহ শব্দটা যদি জীবন্ত হতো, প্রতিবাদ করতো!

*(আলহামদু লিল্লাহ, এখন আমার সেই ছোট্ট মেয়েটি একটি ছোট্ট শিশুর মা। এখন লেখা ও পড়ার প্রতি তার অন্তরে সত্যি অনেক আগ্রহ এবং আগ্রহের সুফলও পাচ্ছে। তার লেখা এখন আমার ভালো লাগে। তবে ওর ছোট্টকাল সম্পর্কে তখন যে কথাটা লিখেছিলাম সেটা এখন আর পরিবর্তন করলাম না, তেমনই রেখে দিলাম আমার দু'আ হিসাবে।)*

তৃতীয়ত 'লিখতে বসি, কিন্তু লেখা আসে না!' কথাটা আমি বিশ্বাস করি না। কারণ দু'জন বন্ধু গল্পের আড্ডায় বসেছো, আর গল্প আসছে না, এরকম অভিযোগ আমি কখনো শুনিনি। তাহলে লিখতে বসে লেখা আসবে না কেন? লেখা মানে তো কলমের জিহ্বা দিয়ে কাগজের সঙ্গে কথা বলা, বা গল্প করা। তো মুখের জিহ্বায় যদি কথার অভাব না হয়, কলমের জিহ্বায় কেন কথার অভাব হবে? হাঁ, এমন হতে পারে যে, বিশেষ কোন বিষয়ের উপর লিখতে গিয়ে লেখা আসছে না। কারণ ঐ বিষয়ে তোমার পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই। সে তো কলমের দোষ নয়, জ্ঞানের স্বল্পতার দোষ! লেখা মানে লেখকের সঞ্চিত জ্ঞান বিন্যস্ত করে পাঠকের সামনে পরিবেশন করা। এখন ঐ বিষয়ে তোমার যদি জ্ঞানের সঞ্চয় না থাকে তাহলে

লেখার বয়স কি পঁয়ত্রিশ মাস হয়েছে?! বরং তুমি যদি যথার্থ চেষ্টা করো তাহলে তো ইনশাআল্লাহ তোমাদের গন্তব্য হবে অনেক দূরে, সেই আকাশের উচ্চতায়! কেননা তোমাদের সুযোগ-সুবিধা এবং উপায়-উপকরণ আমাদের সে যুগের তুলনায় অনেক বেশী। যেটা কম সেটা হলো ঐকান্তিক আগ্রহ এবং নিয়মিত চেষ্টা। আসলে মোবাইল এবং এজাতীয় অন্য উপসর্গগুলো তোমাদেরকে তলানিতে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। আল্লাহর শোকর, আমাদের যুগে 'এগুলো' ছিলো না। তখন গতি ছিলো না, কিন্তু জীবনটা ছিলো গতিময় এবং নদীর স্রোতের মত বেগবান। তোমরা গতি পেয়েছো, কিন্তু জীবনটা হয়ে পড়েছে স্রোতবঞ্চিত মরা গাঙ্গের মত। জীবনের বাইরের গতি ও চঞ্চলতা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করো এবং চেষ্টা করো জীবনকে গতীশীল করতে, তাহলে সত্যিকারের স্বাদ পাবে সবকিছুতে, জ্ঞানসাধনায়, সাহিত্যসাধনায় এবং আমলের সাধনায়।

এবার মূল আলোচনায় আসা যাক, তোমাদের প্রশ্ন ছিলো, সহজে লেখার উপায় কী? আমিও আমার শৈশবে এ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলাম, তবে সমাধান লাভের জন্য কোন উস্তাযকে প্রশ্ন করার সুযোগ হয়নি। কেননা তখন মাদরাসায় 'বাংলা যবান' ছিলো আদমের গন্দম। তবে সমাধানটা আল্লাহ মেহেরবান আমার মাথায় ঢেলে দিয়েছিলেন। সে বড় মজার গল্প! তখন হেফযখানায় পড়ি, আর মাটির ব্যাংকে পয়সা জমা করি। একদিন স্বপ্নে দেখি, চোর এসে লুকিয়ে রাখা ব্যাংকটা নিয়ে যাচ্ছে। আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললাম, 'ভাই, কষ্ট কইরা জমাইছি, একটা ... কিনুম, ব্যাংকডা আপনে নিয়েন না।

চোরের মনে দয়া হলো, ঘরের অনেক কিছু নিলো, কিন্তু ব্যাংকটা নিলো না। সকালে স্বপ্নটা আম্মাকে বললাম। আম্মা হেসে বললেন, যা চিন্তা করো সেইটা স্বপ্নে দেখো।

তখন হঠাৎ .. একেবারেই হঠাৎ মাথায় এলো, স্বপ্নটা খাতায় লিখে রাখি। মনে পড়ে, সেদিন 'নিজেই শুধু চেনা যায়' এমন হস্তাক্ষরে লিখেছিলাম–

***'চোর আসিল, ব্যাংক নিলো, আমি বললাম, নিয়েন না। চোর ব্যাংটা রাইখা চইলা গেল। আসলে সব চোর খারাপ না।'***

এটা ছিলো আমার স্মরণকালের মধ্যে প্রথম লেখা। এখন ভাবি, শিশুমনের চিন্তাও কত সুন্দর কাজ করে এবং ঘটনা থেকে সিদ্ধান্ত আহরণ করে! স্বপ্নে দেখা চোরের আচরণ থেকে আমি সিদ্ধান্ত আহরণ করেছিলাম যে, চোরমাত্রই খারাপ নয়। এবং ঘটনা লেখার সঙ্গে চিন্তাপ্রসূত এই মন্তব্যটাও লিখেছিলাম। তারপর থেকে যখনই কোন স্বপ্ন দেখতাম, কাউকে না কাউকে বলতাম এবং খাতায় লিখে রাখতাম।

এরপর একদিন মাথায় চিন্তা এলো, প্রতিদিন কত কিছু করি, কত কিছু দেখি, কত কিছু শুনি এবং কত কথা ভাবি; তো শুধু স্বপ্ন লেখার পরিবর্তে সেগুলো কিছু কিছু

কেন? এভাবেই শুরু হয়েছিলো আমার স্বপ্নের ডায়রী এবং বাস্তব জীবনের রোযনামচা। এবং এটাই ছিলো আমার সমস্যার সমাধান।

ছোটকালের খাতা ও রোযনামচা মাঝে মধ্যে দেখতাম, আর অবাক হতাম! কত কথা, কত চিন্তা এবং কত ঘটনা! আমি ভুলে গেছি, কিন্তু খাতার পাতায় রয়ে গেছে। আর আনন্দের বিষয়,২ আমার অজান্তেই দিন দিন আমার লেখা সুন্দর হচ্ছে এবং বানান ভুলও কমে আসছে।

এখনো মনে পড়ে, কলম ও দোয়াতের প্রতি তখন আমার অন্তরে কেমন একটি ভালোবাসার জন্ম হয়েছিলো। মাঝে মধ্যে কলমকে চুমো খেতাম এবং দোয়াতের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর জানাতাম।

একটু আগে বলেছি, লেখা মানে সঞ্চিত জ্ঞান পাঠকের সামনে পরিবেশন করা। সুতরাং লিখতে হলে অবশ্যই তোমাকে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানের একটি সূত্র হলো পড়া। তোমার পূর্ববর্তী যারা তোমার জন্য তাদের সঞ্চিত জ্ঞান কাগজের পাতায় লিখে রেখে গেছেন তাদের লেখা পড়ো, পড়ো এবং পড়ো। (আমার ইচ্ছে করছে, পড়ো শব্দটি আরো কয়েকবার লিখি!) তারপর পঠিত বইটি সম্পর্কে তোমার মতামত ও মন্তব্য দু'চারটা বাক্যে হলেও লিখে রাখো। সে লেখা হয়ত কখনো ছাপা হবে না এবং কেউ দেখবে না, কিন্তু তোমার লেখা শেখার কাজটা তো হবে!

জ্ঞান অর্জনের আরেকটি মাধ্যম এবং খুব কার্যকর মাধ্যম হলো জীবন ও জগৎ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। দেখার মত চোখ, শোনার মত কান এবং চিন্তা করার মত মন যদি থাকে তাহলে তুমি আকাশের তারা থেকে, চাঁদের জোসনা থেকে, সূর্যের উদয়-অস্ত থেকে এবং ঘাসের সবুজ গালিচা থেকে, মাঠের সোনালী ফসল থেকে, গাছের ফল ও ফুল থেকে এবং পাখীদের গান থেকে, শিশুর হাসি-কান্না থেকে, নদীর কুলকুল ধ্বনি থেকে এমনকি নর্দমার ময়লা থেকেও তুমি জ্ঞান লাভ করতে পারো এবং সেটাকেই লেখার রূপ দিতে পারো। সেই লেখা ছাপার যোগ্য না হতে পারে, কিন্তু তোমার লেখা শেখা হবে

'নর্দমার ময়লা থেকে'– এটা কিন্তু কথার কথা নয়। কিছু দিন আগে সত্যি সত্যি নর্দমার ময়লা থেকে খুব মূল্যবান একটি জ্ঞান এবং একটি লেখা আমি পেয়েছি। 'নর্দমা থেকে পাওয়া লেখা' শিরোনামে লেখাটি পরিশিষ্টে তুলে দিলাম, পড়ে দেখো।

*(আজ দোসরা রবিউস্‌সানী, ৩১হি. গত শাবান মাসের সাতের তারিখে মাগরিবের পরপর আমার স্ত্রীকে তার মায়ের বাড়ীতে ফোন করেছিলাম. হঠাৎ শুনি কান্না! সদ্যভূমিষ্ঠ একটি শিশুর কান্না। আমার মনে তখন কী যে তরঙ্গদোলা অনুভূত হলো! সঙ্গে সঙ্গে ফোন রেখে দিয়ে কম্পিউটারে বসে গেলাম এবং একটি লেখা তৈরী করলাম. শিশুর কান্না থেকে পাওয়া আমার জীবনের একমাত্র লেখা, যা এখনো কোথাও প্রকাশিত হয়নি লেখাটি পরিশিষ্টে দেয়া*

কয়েক দিন আগে চতুর্থ বর্ষে সবক পড়াতে যাচ্ছি, হঠাৎ আকাশে দিকে তাকিয়ে একটি জ্ঞান এবং একটি লেখা পেয়ে গেলাম। খুশিতে এবং আল্লাহর প্রতি

কৃতজ্ঞতায় মনটা আমার সিক্ত হয়ে গেলো।
শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করে ছেলেদের বললাম–
ঐ দেখো, নীল আকাশের গায়ে শুভ্র মেঘের কী সুন্দর চিত্র! এবং স্থির চিত্র নয়, চলমান চিত্র! ধীরে ধীরে চিত্রগুলোর রূপ পরিবর্তন হচ্ছে এবং নতুন নতুন চিত্র ফুটে উঠছে।
আমি বললাম, 'আকাশের পটে রচিত এ অনিন্দসুন্দর শিল্পকর্মের আড়ালে আমি, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন সেই মহান শিল্পীর সৌন্দর্যের ঝিলিক দেখতে পাই। ইনশাআল্লাহ স্বয়ং শিল্পীর দিদারও একদিন আমরা পাবো।'
আমি আরো বললাম, 'পর্দার আড়াল থেকে ওড়নার ঝিলিক দেখে এবং হাসির রিনিঝিনি শুনে প্রেমিক তার পেয়সীর অস্তিত্ব অনুভব করতে এবং স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করতে পারে, কিন্তু এতটুকুতে তৃপ্ত না হয়ে নির্বোধ প্রেমিক যদি বলে, 'এখনই তোমার দেখা পেতে চাই, এখনই আমি তোমার সঙ্গে মিলনের আনন্দ পেতে চাই', অসন্তুষ্ট প্রেয়সী অবশ্যই বলবে, 'পর্দার আড়াল থেকে আমার আভাস পেয়েছো, তাতেই সন্তুষ্ট থাকো। আমার দেখা পেতে হলে, আমার সঙ্গে মিলনের আনন্দ লাভ করতে হলে অপেক্ষা করো এবং যোগ্যতা অর্জন করো। আমার মোহরানা আদায় করো। এটাই প্রকৃতির নিয়ম।
তো দুনিয়ার যিন্দেগি হলো মাহবূবের দীদার লাভের যোগ্যতা অর্জনের এবং মোহরানা আদায়ের সময়। এখানে সৃষ্টির সৌন্দর্যের আড়ালেই তাঁর অস্তিত্ব ও সৌন্দর্য অনুভব করতে হবে এবং তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে ...।'
ছেলেদের আমি বলেছিলাম, এ লেখাটি এইমাত্র আমি পেলাম দূর আকাশে শুভ্র মেঘের আল্পনা থেকে। একথাগুলো তোমরা তোমাদের রোযনামচায় লিখে রাখো। কয়েক দিন পর জিজ্ঞাসা করলাম, .....? কিন্তু ছেলেদের অত সময় কোথায়! ওদের কত কাজ! সেই ছেলেদের আমি ভুলে যাইনি। তাদের কয়েকজন এখন শিক্ষক, দুয়েকজন ইতিমধ্যে লেখক পরিচয়ও অর্জন করেছে। কিন্তু সাহিত্যের

সাধক! **তার জন্য আমার ব্যাকুল প্রতীক্ষার এখনো অবসান হয়নি, অথচ দিন দিন দৃষ্টি আমার ক্ষীণ হয়ে আসছে। জানি না, আর কত দিন 'তার' জন্য পথ চেয়ে থাকতে পারবো। সে যখন আসবে তাকে দেখার জন্য আমার চোখের তারার জ্যোতি তখনো যেন অম্লান থাকে** হে আল্লাহ!

কয়েক বছর আগের কথা, থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর মাপা দেখে আমার পুত্র মুহম্মদের খেয়াল হলো, গরম পানিটার 'জ্বর' মেপে দেখবে! আহ, চিরকাল যদি আমরা এমন সহজ-সরল শিশুটি থেকে যেতে পারতাম!

তো লুকিয়ে লুকিয়ে সে গরম পানির জ্বর মাপলো, আর থার্মোমিটারটা ফেটে পারদ বের হয়ে গেলো। এ ঘটনা থেকে আমি এ মহামূল্যবান শিক্ষা অর্জন করলাম যে, আমাদের আকল শুধু সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে আল্লাহর পরিচয় লাভ করার জন্য, আল্লাহর যাত ও সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য নয়। যদি তা করি, আকলের পরিণতি হবে থার্মোমিটার দিয়ে গরম পানির 'জ্বর' মাপার মত। (এই অর্জিত জ্ঞান আমি একটি কিতাবের ভূমিকা লিখতে গিয়ে ব্যবহার করেছি। পরিশিষ্টে লেখাটি তুলে দিলাম শুধু এজন্য যে, লেখাটি যেন হারিয়ে না যায়।)

মোটকথা, তোমার দেখা, শোনা ও চিন্তা যদি সদাসক্রিয় থাকে তাহলে জীবন ও জগত থেকে তুমি বহু জ্ঞান লাভ করতে পারো এবং তা থেকে লেখার উপকরণ সংগ্রহ করতে পারো। যদি শুধু বই থেকে লব্ধ জ্ঞানের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখো তাহলে তোমার জ্ঞানের পরিমাণ ও পরিধি কখনো বাড়বে না।

হুমায়ূন আজাদ একজন নাস্তিক লেখক, তবে বড় মাপের লেখক। ছোটদের তিনি একটি উপদেশ দিয়েছেন–

'তোমরা এখন ছোট। এখন থেকেই তোমার চারপাশের পরিচিত-অপরিচিত সবকিছু দেখো; যত পারো দেখো এবং দেখো। সবকিছু নিয়ে চিন্তা করো; যত পারো চিন্তা করো এবং চিন্তা করো। বুকের মধ্যে জমা করো দেখা, শোনা ও জানার পরিমাণ যত পারো বৃদ্ধি করো। এগুলোই হবে তোমার লেখার মাল-মশলা। যারা দেখে না, শোনে না, চিন্তা করে না এবং বুকের মধ্যে জমা করে না তারা লেখক হতে পারে না।'

(হুমায়ুন আযাদ কত মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন ছোটদের! আমার জানতে ইচ্ছে করে, তিনি নিজে কি দেখেছিলেন চোখ মেলে সৃষ্টিকে এবং সৃষ্টির দর্পণে স্রষ্টার উপস্থিতিকে? তিনি কি শুনেছিলেন কান পেতে সৃষ্টির সঙ্গীত এবং সেই সঙ্গীতের সুরে স্রষ্টার তাসবীহ! তিনি কি চিন্তা করেছিলেন সৃষ্টির রহস্য এবং স্রষ্টার অস্তিত্ব! না শেষ পর্যন্ত রয়ে গিয়েছিলেন তাদেরই দলে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, 'তাদের রয়েছে হৃদয়, কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না এবং তাদের রয়েছে কর্ণ, কিন্তু তা দ্বারা তারা শ্রবণ করে না এবং তাদের রয়েছে চক্ষু, কিন্তু তা দ্বারা তারা অবলোকন করে না। ওরা হলো পশুর মত, বরং আরো ভ্রষ্ট।'

হুমায়ুন, কামনা করি, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।)

আরেকটি জরুরি কথা, আমরা যে বই পড়ি, আমাদের বই পড়ার উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য দু'টো; জ্ঞান ও তথ্য আহরণ এবং ভাষা ও সাহিত্য গ্রহণ। বিষয়বস্তু এবং তথ্যগত জ্ঞান লাভের জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের নির্ভরযোগ্য যে কোন বই পড়া যেতে পারে, ভাষা ও সাহিত্যমান যেমনই হোক। তবে তা থেকে শব্দ, বাক্য, উপমা, উৎপ্রেক্ষা এককথায় ভাষা ও সাহিত্যের কোন উপাদান গ্রহণ করা যাবে না। কেননা তাতে তোমার ভাষাজ্ঞান কাঁচাই থেকে যাবে, ভাষা ও সাহিত্য শেখার জন্য

বাংলাভাষার বরণীয় লেখক-সাহিত্যিকদের বই পড়তে হবে, সাধারণ মানের কোন লেখা পড়া চলবে না। আর যা পড়বে, ধীরে ধীরে উপলব্ধির সঙ্গে পড়বে, কোন কিছু তাড়াহুড়া করে গোগ্রাসে গিলবে না। শব্দচয়ন, উপমার ব্যবহার, চিত্রকল্প নির্মাণ, শৈলী ও বাক্যবিন্যাস ইত্যাদি চিন্তা করবে। গল্পের, প্রবন্ধের এবং বক্তব্যের অবয়ব ও শরীরকাঠামো সম্পর্কেও চিন্তা করবে এবং সেগুলো মনে গেঁথে রাখার চেষ্টা করবে, যাতে পরে সুযোগমত নিজের লেখায় সেগুলো ব্যবহার করা যায়।

পরিশেষে ছোট্ট একটি কথা; ছোট্ট কথা, তবে সত্য কথা। তোমাকে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। তাঁর সাহায্য হলেই তুমি সফল হতে পারো। শুধু চেষ্টায় কিছু হবে না। শুরুতে বলেছি, আজকের এ লেখায় কলমকে আমি শাসন করবো না। কলমের ডগায় যা আসে নিঃসঙ্কোচে তাই লিখে যাবো। কাটাচেরা, পরিমার্জন কিছুই করবো না, এবং করিনি। জানি না, তোমাদের কাজে আসার মত কিছু 'এসেছে' কি না, তবে আমি কল্যাণের ইচ্ছা করেছি।

---

১। এখানে একটি বিষয় আলোচনা করা উপকারী হবে বলে মনে হয়, পুষ্পের পাতায় এ অংশটি এমন ছিলো– 'শেখ সা'দীর গল্প মনে পড়লো, পথে এক রূপসীকে দেখে এক যুবকের তার প্রতি 'আগ্রহ' হলো। যুবক রূপসীকে তার আগ্রহ নিবেদন করলো। রূপসী মৃদু হেসে বললো, আমাকে দেখেই মজে গেলে! আমার পিছনে বোরকা পরে আসছে আমার বোন। আমি যদি আসমানের তারা হই তাহলে আমার বোন আসমানের চাঁদ। যুবক ছুটলো পিছনে। বোরকার ঘোমটা তুলে দেখে, দাঁত পড়া এক বুড়ী! আবার এসে ধরলো রূপসীকে, কেন মিথ্যা বললে? রূপসী হেসে জবাব দিলো, আমার প্রতি তোমার আগ্রহের পরিমাণটা পরীক্ষা করলাম।'

এ বইটি সংকলনের সময় যখন আবার সামলোচকের দৃষ্টিতে তাকালাম, মনে হলো, 'মজে গেলে' কথাটা এখানে অপ্রয়োজনীয়, সেটা বরং প্রচ্ছন্ন থাকাই ভালো। আরো মনে হলো, আমার পিছনে বোরকা পরে আসছে আমার বোন' থেকে প্রথম 'আমার'-কে বাদ দিলে ভালো হয়। তারপর মনে হলো, বোরকাওয়ালী শব্দটি ভালো হবে, তাই লিখলাম, 'পিছনে আসছে বোরকাওয়ালী আমার বোন।'

পরবর্তী বাক্যটি নিয়ে আমার এক প্রিয় ছাত্রের সঙ্গে আলোচনা করছিলাম। সে বললো, 'চাঁদ'-এর পরিবর্তে সিতারা হলে কেমন হয়? তারা মানে সাধারণ তারা, আর সেতারাকে আমরা ধরে নেবো অধিক উজ্জ্বল তারা অর্থে! তার পর্যালোচনা আমার পছন্দ হলো, আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তার শব্দটি গ্রহণ করলাম। তুমিও দু'টি বাক্যকে পাশাপাশি বারবার কানে বাজিয়ে দেখো, কেমন সুন্দর একটি সুরছন্দ সৃষ্টি হয়েছে এবং অর্থে ও উপমায় কেমন নতুনত্ব এসেছে!

০ আমি যদি আসমানের তারা হই তহালে সে আসমানের চাঁদ।

০০ আমি যদি হই আসমানের তারা, সে হবে আসমানের সেতারা।

'রূপসীর সহাস্য জবাব' এই পরিমার্জনটুকু চিন্তা করলে তুমি বোঝবে যে, এই সংক্ষিপ্ততা

এবার শেষ পরিমার্জনটুকু লক্ষ্য করো, 'আমার প্রতি' এই অংশটি বাদ দিয়ে সংলাপটিকে আরো সংক্ষিপ্ত করার কারণে উপহাস ও কটাক্ষের ভাবটি আরো ধারালো হয়েছে।

দেখো, এত দীর্ঘ দিন পর যখন নিজের লেখা নিজে দেখলাম সমালোচকের দৃষ্টিতে, তাতে কত খুঁত বের হলো এবং আগের তুলনায় তা কত সুন্দর হলো! এমনকি এখনো বলা যায় না যে, লেখাটি সৌন্দর্যের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়েছে। বরং এখনো তাতে আরো চিন্তা-ভাবনার এবং সংস্কার ও পরিমার্জনের অবকাশ রয়েছে।

(দ্বিতীয় সংস্করণের সময় সেটাই সত্য হলো। কয়েকটি পরিমার্জন দেখো–

০ আমি যদি হই আসমানের তারা, সে হবে আসমানের সেতারা

০০ আমি যদি আসমানের তারা, বোন আমার আসমানের সেতারা।

(আরো পরে, একেবারে শেষ সম্পাদনার সময় মনে হলো, একটি 'আসমান' কমিয়ে দিলে সংলাপটি আরো সুন্দর হবে, তাই লিখলাম, 'আমি যদি হই তারা আসমানের, বোন আমার সেতারা'।)

০ পথে এক রূপসীকে দেখে এক যুবকের তার প্রতি আগ্রহ হলো

০০ পথে এক রূপসীর প্রতি এক যুবকের আগ্রহ হলো এবং যুবক রূপসীকে তার আগ্রহ নিবেদন করলো।

(শেষ সম্পাদনার সময়, 'পথে এক রূপসীর প্রতি এক যুবকের আগ্রহ হলো এবং সেই আগ্রহ সে তাকে নিবেদন করলো।')

০০ 'সে যুগেও ছিলো এ যুগের যুবক।' এই একটিমাত্র বাক্য সংযোজন দ্বারা লেখাটি কত সারগর্ভ হয়ে গেলো!

০ বোরকার ঘোমটা তুলে দেখে, দাঁতপড়া এক বুড়ী (দৃশ্যটা শ্লীলতা বর্জিত তাই না! পরিমার্জন দেখো–)

০০ বোরকার ভেতরে ছিলো এক নানী! (মূল ফার্সীতে আছে 'মাদারে মাদার'– মায়ের মা! তাহলে এখন আরো মূলানুগ হলো এবং বাক্যটি আরো সুশীল হলো )

০ যুবক ফিরে এসে ধরলো রূপসীকে, কেন মিথ্যা বললে?

০০ রূপসীর প্রতি, ফিরে আসা যুবকের অনুযোগ, এ কেমন পরিহাস তোমার!

০ তোমার আগ্রহের পরিমাণ পরীক্ষা করলাম

০০ এই বুঝি তোমার আগ্রহ!

০০ রূপসীর সহাস্য জবাব, এ কেমন আগ্রহ তোমার!

এখন বলো, আমি যদি আমার লেখার পিছনে এই মেহনতটুকু না করি তাহলে চলবে কেন?)

২। আগে ছিলো, 'মজার বিষয়', এখন মনে হলো, জীবনের এমন একটি সফলতার বিষয়কে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তরল শব্দ ব্যবহার না করা উচিত। আশ্চর্য, কথাটা আগে মনে হয়নি!

# সহজে লেখার উপায়

একটা কথা আমি ছাত্রদের প্রায় বলি[১]। কলমের সফরে যারা নতুন মুসাফির তাদের জন্য খুবই জরুরী কথা। আমরা শুরুতেই বিষয়ভিত্তিক গুরুগম্ভীর লেখা লিখতে চাই এবং বেশ লম্বা-চওড়া না হলে সেটাকে লেখা মনে করি না। আর যেহেতু সেটা আমাদের দ্বারা হয়ে ওঠে না সেহেতু আমরা ধরে নেই, লেখা আমার কাজ নয়। এভাবে আমরা উদ্যম ও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলি। অথচ আল্লাহর মদদের উপর ভরসা করার পর উদ্যম ও আত্মবিশ্বাসই হলো একজন লেখকের পথচলার সবচে' মূল্যবান পাথেয়। সুতরাং লেখার অঙ্গনে যারা 'শিশু' তাদের জন্য লেখা শেখার এটা সঠিক পদ্ধতি নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, লেখার যোগ্যতা এবং বিষয়-যোগ্যতা দু'টো ভিন্ন জিনিস।[২] তদ্রূপ লেখা এবং লেখার সৌন্দর্য দু'টো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়।[৩] 'লিখনযোগ্যতা'র অংকুরোদ্গম ও বিস্তার এবং উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে ছোট ও হালকা বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্নভাবে লেখার মশক ও অনুশীলন থেকে।[৪] আর বিষয়বস্তুর যোগ্যতা অর্জিত হয় অব্যাহত জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে। তো তুমি যদি নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের উপর লিখতে বসো, আর লিখতে না পারো তাহলে এর কারণ হবে বিষয়বস্তুর জ্ঞানের অভাব, লেখার যোগ্যতার অভাব নয়।

দ্বিতীয়ত কোন লেখা লেখা হওয়ার জন্য তার কলেবর বিচার্য নয়। লেখা দশ পৃষ্ঠার হোক বা দশ লাইন, পাঁচ লাইনের, গ্রহণযোগ্য লেখা সেটাই যা পাঠকের জন্য কোন না কোন বার্তা ধারণ করে এবং পাঠকের অন্তরের গভীরে সে বার্তা পৌঁছে দিতে পারে। পুষ্পের প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায় ছোট ছোট কিছু লেখা আছে। সেগুলো মনোযোগের সঙ্গে দেখো, আশা করি তুমি বুঝতে পারবে যে, প্রতিটি লেখা পাঠকের জন্য কোন না কোন বার্তা বহন করছে এবং পাঠকের হৃদয়কে তা স্পর্শ করছে। প্রথম কথা এবং শেষ কথা নামের লেখাগুলো এই শ্রেণীর লেখা। এখানে উদাহরণস্বরূপ পুষ্পের গত ছফর সংখ্যার কিশোরপাতা-১৪ এর

মা'লূমাতের প্রয়োজন নেই। চারপাশের পরিবেশ-প্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণই যথেষ্ট, তবে যেটা দরকার সেটা হলো ভিতরের অনুভব-অনুভূতি, অন্তরের কোমলতা ও বিগলিতি এবং হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা ও পরিশুদ্ধি। তখন আকাশ থেকে নেমে আসা ভাবকে হৃদয় ধারণ করতে পারে, আর হৃদয় যখন কোন ভাব ধারণ করে তখন কলম থেকে তা ঝরঝর করে ঝরে পড়ে। শুরুর দিকে লেখা হয়ত সুন্দর হবে না, তবে কলমের গতি স্বতঃস্ফূর্ত হবে। আর শুরুতে তোমার কাছে আমাদের কাম্য স্বতঃস্ফূর্ত লেখা; শুধু লেখা, সুন্দর লেখা নয়। লেখা সুন্দর হবে অব্যাহত অনুশীলন এবং সাহিত্য-অধ্যয়নের মাধ্যমে ধীরে ধীরে।

উপমাটা সঙ্গত হবে কি না জানি না, ক্রিকেটদলের কোচ তার খেলোয়াড়দের সবসময় খুব গুরুত্বের সাথে একটা উপদেশ দিয়ে থাকেন–

*'হচ্ছে কি হচ্ছে না, এ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে তুমি তোমার স্বাভাবিক খেলাটা খেলে যাও। স্বাভাবিক খেলা, সুন্দর খেলা নয়।'*

লেখা ও খেলা, মিল আছে শব্দে ও স্বভাবে; সুতরাং লেখার ক্ষেত্রেও এ উপদেশ একশভাগ সত্য। সৌন্দর্যচিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে তুমি তোমার স্বাভাবিক লেখাটা লিখে যাও। দেখবে; তোমার লেখা ধীরে ধীরে সুন্দর-সুশ্রী হচ্ছে এবং বেশ উৎকর্ষ লাভ করছে।

স্বাভাবিক গতিতে লেখাটা তৈরী হওয়ার পর শুরু হবে আসল কাজ। অর্থাৎ প্রচুর সময় নিয়ে লেখার পরিচর্যা। লিখতে যদি লাগে একদিন লেখার পরিচর্যায় লাগতে পারে তিনদিন, সপ্তাহ, মাস বা আরো বেশী। যতবার পরিচর্যা করবে, আগের চেয়ে সুন্দর হবে এবং একসময় পরিচর্যায়ও সময় কম লাগবে। কোন এক মজলিসে বলেছিলাম, আমাদের মূল সমস্যা হলো, আমরা লিখতে বসে চিন্তা করি, তাই লিখতে পারি না, আবার লেখার পরে চিন্তা করি না, তাই লেখা সুন্দর হয় না।

এটা ঠিক নয়। লেখার সময় তুমি শুধু লিখবে, চিন্তা ও পরিচর্যা যা করার তা করবে লেখাটা তৈরী হয়ে যাওয়ার পর এবং তা চলতে পারে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। শুরু থেকে এভাবেই আমি কলমের অনুশীলন করে আসছি এবং আল্লাহর রহমতে কিছুটা ফলও পেয়েছি।

কথার প্রবাহে মূল বক্তব্য থেকে কিছুটা দূরে চলে এসেছি। আমি বলছিলাম, কিশোরপাতার সেই ছোট্ট লেখাটি পড়ে দেখার কথা, লেখাটির মূল উদ্দেশ্য হলো পাঠকের কাছে, 'জ্ঞান ও গুণ অমর', এ বার্তাটুকু পৌঁছে দেয়া। এ উদ্দেশ্যের জন্য লেখক বিরাট কোন লেখা তৈরী করেননি এবং বড় বড় গ্রন্থ অধ্যয়ন করে অসংখ্য তথ্যেরও সমাবেশ ঘটাননি। শুধু একটি ফুল ও একটি মোমকে উপমা হিসাবে গ্রহণ করে তিনি তার ছোট্ট লেখাটির শরীরকাঠামো তৈরী করেছেন। একটি

মুশাব্বাহ এবং দু'টি মুশাব্বাহ বিহী- এই হলো লেখাটির সমগ্র শরীরকাঠামো। দেখো-

*'যারা অনেক জ্ঞান এবং অনেক গুণ অর্জন করে, তারপর নিজেদের জ্ঞান ও গুণ দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধন করে মৃত্যুর পরো তারা অমর হয়। তারা বেঁচে থাকে মানুষের হৃদয়ে, মানুষের ভালোবাসায়। যেমন ফুল মানুষকে সুবাস দেয় এবং মোম মানুষকে আলো দেয়। একারণেই ফুল ঝরে গেলেও এবং মোম গলে গেলেও মানুষের ভালোবাসা পেয়ে অমর হয়ে আছে।'*

তুমি যদি স্বতঃস্ফূতভার্বে একথাগুলো লিখতে পারো তাহলেই তুমি হয়ে গেলে লেখক। শুরুতে এতটুকুই তোমার কাছে আমাদের কাম্য।

তবে এ লেখাটিই যখন একজন সাহিত্যিকের কলম থেকে বের হয় তখন তার সৌন্দর্য হয় অন্য রকম। নীচে দেখো, এ লেখাটি পুষ্পে ছাপা হয়েছে-

*'ফুল ঝরে যায় সুবাস বিলিয়ে, মোম গলে যায় আলো ছড়িয়ে। ঝরে যাওয়া ফুলের জীবন কি ব্যর্থ? গলে যাওয়া মোমের আত্মদান কি অর্থহীন? তাহলে ফুলকে মানুষ কেন এত ভালোবাসলো? ফুলকে নিয়ে কেন এত কবিতা লেখা হলো? মোমের শিখায় পতঙ্গেরা কেন জীবন দিলো? মোমের আলো নিয়ে কেন এত গান রচিত হলো?*

*না, ফুলের মৃত্যু নেই; কারণ সুবাসই ফুলের জীবন। মোমেরও মৃত্যু নেই; কারণ আলোই মোমের প্রাণ। হে মানুষ, তোমারও মৃত্যু নেই; কারণ জ্ঞান তোমার জীবন, গুণ তোমার প্রাণ।'*

লেখার যত্ন ও পরিচর্যার যে কোন শেষ নেই তার চাক্ষুষ প্রমাণ দেখো, কয়েক মাস আগে পুষ্পের ছাপায় ছিলো- *'মোমের আলোতে পতঙ্গেরা কেন জীবন দিলো? মোমের আলো নিয়ে কেন এত গান রচিত হলো?'*

এখন লেখাটি নিয়ে আবার নাড়াচাড়া করতে গিয়ে হঠাৎ মনে হলো, আলো তো প্রাণ কেড়ে নেয়ার জন্য নয়! আর পতঙ্গেরাও তো ঝাঁপ দিয়েছে আলোতে নয়, আগুনের শিখায়। সুতরাং আলো না হয়ে হওয়া দরকার 'শিখা'। সুতরাং বাক্যটি এমন হওয়া দরকার, 'মোমের শিখায় পতঙ্গেরা কেন জীবন দিলো?'

তো বলছিলাম, এধরনের ছোট ছোট লেখা তুমি লিখতে পারো তোমার সাধারণ জ্ঞান থেকে, তোমার চারপাশের পরিবেশ ও প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান থেকে সাহায্য গ্রহণ করে।

দেখো, উপরের লেখাটিকে তুমি যদি বড় কলেবর দিতে চাও এবং বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব দ্বারা সমৃদ্ধ করতে চাও তাহলে এটা হবে বিষয়ভিত্তিক লেখা এবং তা লিখতে

জ্ঞানের। স্থানাভাব না হলে এরও নমুনা পেশ করা যেতো। তবে মনে হয় প্রয়োজন নেই।

তো এখানে বিষয় হলো তিনটি – (ক) সাধারণ লেখা (খ) সুন্দর লেখা (গ). তথ্যসমৃদ্ধ বিষয়ভিত্তিক লেখা। তোমার করণীয় হলো প্রথমে সাধারণ লেখার চেষ্টা করা. তারপর সুন্দর লেখার চেষ্টা করা, আর সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান আহরণের ধারা অব্যাহত রাখা এবং কোন বিষয় অধ্যয়নের মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক লেখারও চেষ্টা করা।

*(তোমার যদি মনে হয়, এ তো বিশাল কষ্টের ব্যাপার! তাহলে একটা কথা বলি, এ রাজপথ তোমার চলার জন্য নয়।)*

লেখার সহজ অনুশীলনের আরেকটি উপায় হলো কোন বিষয়ে একটি দু'টি লেখা সামনে রেখে নতুন বিন্যাসে, নতুন আঙ্গিকে এবং নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে লেখাটি তৈরী করা। এতে তথ্যসংকটের কারণে লেখা বিঘ্নিত হয় না, তদুপরি নমুনা সামনে থাকার কারণে নিজস্ব পছন্দ মত লেখাটিকে সাজানো সহজ হয়। *(পুষ্পের আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠার লেখাগুলো সাধারণত কয়েকটি দৈনিক পত্রিকার কাটিং সামনে রেখে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরী করা হয়।)*

এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা আছে।

আরেকটি সহজ উপায় হলো ছোট ছোট ভ্রমণকাহিনী লেখা। এ উদ্দেশ্যে তুমি তোমার সাধ্যের ভিতরে ধারে কাছে কোথাও বেড়াতে যেতে পারো।

*(আমার ছেলে মুহম্মদ এর নাম দিয়েছে মিনি শিক্ষাসফর, এ উদ্দেশ্যে আজই সে রওয়ানা দেবে নানুর বাসায়, তবে আমার আশঙ্কা, ভ্রমণ হলেও কাহিনী..., গাছের আমগুলো শুধু কষ্ট পাবে। তবু হোক, আমের রস থেকে একসময় লেখার রস সৃষ্টি হলে হতেও পারে।)*

লেখার সুবিধার জন্য ভ্রমণকালেই প্রয়োজনীয় তথ্য নোট করে নিতে পারো। তারপর, কোথায় গেলে? কেন গেলে? কীভাবে গেলে? কী দেখলে? চিন্তার কী খোরাক পেলে? এগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে পারো। হোক না সাধারণ ও ছোট আকারের খুব নিরীহ একটি ভ্রমণকাহিনী। এ বিষয়েও পরবর্তী সময়ে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা আছে।

সবশেষে নিয়মিত কাজ হলো রোজনামচা লেখা। এ সম্পর্কে এতো বলা হয়েছে যে, নতুন করে আর কিছু বলার নেই। এখন শুধু প্রয়োজন নিয়মিতভাবে এবং পরিমিতভাবে লেখার অনুশীলন চালিয়ে যাওয়া। উপরে লেখার অনুশীলন ও মশকের যে ক'টি পন্থা বলা হলো সেগুলোর উপর যদি ঠিকমত আমল করা হয়; (ক) যদি নিয়মিত রোযনামচা লেখা হয় (খ) ছোট ও হালকা বিষয়ের উপর মাসে

অন্তত তিনচারটি ছোট ছোট লেখার অনুশীলন করা হয় (গ) মাসে অন্তত একটি ভ্রমণকাহিনী লেখা হয় (ঘ) মাসে অন্তত একবার কোন বিষয়ের উপর একটি দু'টি লেখা সামনে রেখে নিজের পক্ষ হতে ঐ বিষয়ে একটি লেখা তৈরীর অনুশীলন করা হয় (ঙ) প্রতিদিন নিয়মিত কিছু সময় মানসম্মত সাহিত্য অধ্যয়ন করা হয় (চ) এবং জ্ঞান ও তথ্য আহরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ের উপর নিয়মিত সাধারণ অধ্যয়ন চালিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে একজন সফল লেখক তৈরী হওয়ার পথে ইনশাআল্লাহ আর কোন বাধা থাকতে পারে না।

হায়, আমি যদি বোঝাতে পারতাম, হৃদয়ে আমার কত ব্যাকুলতা, তোমার জন্য! সাহিত্যের রাজপথে তোমার শুভযাত্রার জন্য! তোমার সফল অভিযাত্রার জন্য! আল্লাহর উপর ভরসা করে পথ চলা তো শুরু করো! উদ্দেশ্যের পথে নিরন্তর ত্যাগ ও সাধনা ছাড়া কবে কার জীবনে সফলতার ফুল ফুটেছে বলো!

আলোর জন্য মোমকে তো ফোঁটা ফোঁটা করে গলতেই হবে!

---

১। আগে ছিলো, 'প্রায় বলে থাকি', এটা ঠিক নয়, হয় লিখবো, ছাত্রদের বলে থাকি, না হয় লিখবো, প্রায় বলি।

২। আগে ছিলো, 'বিষয়বস্তুর যোগ্যতা', এবং-এর আগে ও পরে তারকীবের অভিন্নতা রক্ষার ধারণা থেকে সেটা করা হয়েছিলো, এখন মনে হচ্ছে, এখানে তার চেয়ে জরুরি হলো শব্দের কোমলায়ন।

৩। আগে ছিলো, 'সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়', কিন্তু এ অংশটির সম্পর্ক আগের সাথে, অর্থাৎ 'লেখার যোগ্যতা এবং বিষয়যোগ্যতা দু'টো ভিন্ন জিনিস, তো দু'টি শব্দের মধ্যে সমশ্রেণিতা রক্ষা করার জন্য এই পরিবর্তন।

৪। 'অঙ্কুরোদ্গম' কঠিন একটি শব্দ। স্বাভাবিক নিয়মে 'বিস্তার' এবং অঙ্কুরোদ্গম পরে হওয়ার কথা, কিন্তু এখানে এটাই ঠিক, আবৃত্তিগত দিক থেকে এবং বাস্তবতার দিক থেকে। তবে সম্ভবত এভাবে লেখা যেতে পারে, 'লিখনযোগ্যতার অঙ্কুর ও বিস্তার এবং উন্মেষ ও বিকাশ... এখানে অঙ্কুরকে অঙ্কুরোদ্গম অর্থে ধরে নিতে হবে।)

# একই কথা বারবার

একই কথা বারবার শুনতে শুনতে এবং বলতে বলতে সত্যি আমি এখন ক্লান্ত। গতকাল একটি ছেলের চিঠি পেলাম, সেই পুরোনো কান্না! লিখতে পারি না; লেখা আসে না!'

'ইসলাম ও নারী-অধিকার'বিষয়ে মাদরাসায় রচনা প্রতিযোগিতা ছিলো। তার ইচ্ছা ছিলো, প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার। ক'দিন চেষ্টাও করেছে, লেখা আসেনি। শেষে হতাশ হয়ে প্রতিযোগিতার চিন্তা বাদ দিয়েছে। এ পর্যন্ত ঘটনা স্বাভাবিক ছিলো। অস্বাভাবিকতার শুরু এর পরে। ছেলেটি শেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, আর যাই হোক কিছু লেখা এবং লেখক হওয়া তার দ্বারা সম্ভব নয়। এখানেও যদি শেষ হতো, আমার বলার কিছু ছিলো না। সমস্যা হলো, ছেলেটি আমার নামে এক লম্বা চিঠি লিখে তার হতাশা ও সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। যদিও বানান ভুল প্রচুর, তবু মনের হতাশা ও বেদনার কথাগুলো লিখেছে মোটামুটি সুন্দরভাবে সাজিয়েগুছিয়ে, এমনকি তিন তিনটি উপমা ব্যবহার করে!

কথা হলো, তুমি লিখবে না, তাতে কার কি আপত্তি! 'কলমটাকে ভেঙ্গে ফেলে দেবে', তাতেই বা কে বাধা দেয়! কিন্তু আমি বেচারা গরীব মানুষ, আমার কাছে এত লম্বা চিঠি লেখা কেন? কলমের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার ঘোষণা দিতে গিয়ে কলমেরই সাহায্য নেয়া কেন? কলমের উপর এটা কত বড় যুলুম!

লিখতে না পারার হতাশার উপর এত সুন্দর লেখা! শোনো কথা, এই ছেলে নাকি লিখতে পারে না! তুমি লিখেছো, 'ডানা ভাঙ্গা পাখী কি উড়তে পারে! যে সাপের বিষদাঁত ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে সে কি ছোবল দিতে পারে! যে সৈনিকের হাতে অস্ত্র নেই সে কি লড়াই করতে পারে! পারে না। সুতরাং আমিও কখনো পারবো না লেখক হতে। লেখার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া আমার জন্য হবে হাস্যকর। ...

এখন আমার বক্তব্য শোনো–

দীর্ঘ চিঠিতে তুমি তোমার হতাশার কথা লিখেছো। লিখতে পেরেছো কিভাবে? কারণ সত্যি সত্যি তোমার ভিতরে হতাশা ছিলো। ভিতরে যা আছে তা মানুষ মুখে বলতে পারে এবং কলমে লিখতে পারে।

ইসলাম ও নারী-অধিকার সম্পর্কে তুমি লিখতে পারোনি কেন? কারণ এ সম্পর্কে তোমার ভিতরে কোন ভাব ও ভাবনা এবং জ্ঞান ও তথ্য সঞ্চিত ছিলো না। ভিতরে যা নেই সে সম্পর্কে মানুষ কিছু বলতে পারে না এবং লিখতে পারে না।

সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো, যা জানি সে সম্পর্কে কিছু বলার এবং লেখার চেষ্টা করা, আর যা জানি না সে সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা। পর্যাপ্ত জ্ঞান ও তথ্য সঞ্চিত হওয়ার আগে সে বিষয়ে কিছু না বলা এবং না লেখাই সঙ্গত। যে বিষয়ে জ্ঞান নেই সে বিষয়ে লিখতে না পারার অর্থ কিছুতেই এটা নয় যে, তুমি লিখতে পারো না। তোমার চিঠিতে যে তিনটি উপমা ব্যবহার করেছো তা সম্ভব হলো কীভাবে? কারণ তুমি কখনো না কখনো দেখেছো, ডানাভাঙ্গা পাখী উড়তে চেষ্টা করছে, কিন্তু উড়তে পারছে না। কবে কোথায় তুমি এ দৃশ্য দেখেছো, তোমার মনে নেই, কিন্তু দৃশ্য থেকে অর্জিত জ্ঞানটুকু তোমার ভিতরে সঞ্চিত ছিলো, সেটাই তুমি আজ ব্যবহার করেছো তোমার লেখার অক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য। নিজেকে তুমি কল্পনা করেছো একটি পাখীরূপে, যে পাখী উড়তে চায়, কিন্তু পারে না। কারণ তার ডানা আছে, কিন্তু ভাঙ্গা। তুমিও লিখতে চাও, কিন্তু লিখতে পারো না। কারণ তোমার কলম আছে, কিন্তু সে কলম ভাঙ্গা, ( যে কলম থেকে লেখা আসে না, তা যত দামী ও সুদৃশ্যই হোক, আসলেই তো তা ভাঙ্গা কলম।)

কবে কখন তুমি একটি ডানাভাঙ্গা পাখীর ওড়ার অক্ষম প্রচেষ্টার দৃশ্য দেখেছিলে, তখন কি তুমি কল্পনাও করেছিলে যে, তোমার লেখার অক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য সেটা উপমারূপে ব্যবহৃত হবে?

সাপের বিষদাঁত এবং তা ভেঙ্গে ফেলার দৃশ্য সম্ভবত তুমি কখনো দেখোনি। কারো কাছ থেকে শুনে, বা কোন বই পড়ে এ তথ্য অর্জন করেছো যে, সাপের বিষদাঁত আছে এবং তা ভেঙ্গে দিলে আর ছোবল দিতে পারে না। তো শোনা বা পড়ার সূত্রে প্রাপ্ত এ তথ্য তোমার মাঝে সঞ্চিত ছিলো এবং সেটা আজ তুমি ব্যবহার করেছো তোমার লেখার অক্ষমতা প্রকাশ করার কাজে। এভাবেই অর্জিত জ্ঞান ও তথ্য মানুষকে লেখার যোগ্যতা দান করে।

এটা অবশ্য ভিন্ন প্রসঙ্গ যে, তোমার দ্বিতীয় উপমাটা ঠিক নয়! তুমি সাপ হবে কেন এবং কাউকে ছোবল দিতে চাইবে কেন, আর তোমার কলমটাই বা সাপের বিষদাঁতের মত হতে যাবে কেন?

তৃতীয় উপমাটি অবশ্য ঠিক আছে, নিজের লেখার অক্ষমতাকে তুমি নিরস্ত্র সৈনিকের অক্ষমতার সাথে তুলনা করেছো। এখানেও তুমি তোমার সঞ্চিত জ্ঞান ব্যবহার করেছো। মাঝখানে সাপের ব্যাপারটা বাদ দিলে তোমার লেখার অক্ষমতা প্রকাশের লেখাটি চমৎকারই ছিলো।

তো শেষ পর্যন্ত আমরা কি সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম? মানুষ যা জানে সে বিষয়ে কিছু না কিছু লিখতে পারে; যা জানে না সে বিষয়ে লিখতে পারে না এবং সে বিষয়ে লিখতে যাওয়া উচিতও নয়। তাতে খামোখা হতাশার শিকার হতে হয়, আর দোষ

তো এখন থেকে তুমি তোমার জানা বিষয়গুলো নিয়ে লিখতে চেষ্টা করো। গাছ, ফুল, পাখী ইত্যাদি সম্পর্কে, এমনকি বিষদাঁতওয়ালা সাপ সম্পর্কেও লিখতে পারো, তবে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে, যাতে ছোবল না দেয়। কিন্তু সাবধান! খুব সাবধান! ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-অধিকার, বিশ্বশান্তি কীভাবে আসবে, কোরআন ও বিজ্ঞান, এই সকল মহা মহা বিষয়ে দাঁত বসাতে যেয়ো না, তাতে লেখা তো কিছু হবে না, উল্টো অল্প বয়সেই 'লেখার দাঁত' ভেঙ্গে যাবে।

হাঁ, মুরুব্বির তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন বিষয়ে পড়া-শোনার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে যথাসময়ে সেসব বিষয়ে কলম ধরতে পারো, তখন দেখবে, কলম থেকে লেখা আসছে এবং সে লেখা মানুষের উপকারেও আসছে।

আরেকটা কথা, যদি কখনো তোমার মনে হয় যে, তুমি লিখতে পারছো না এবং তোমার পক্ষে লেখক হওয়া সম্ভব নয়, তখন আস্তে করে কলমটা ফেলে দিও, (আসলে বলতে চাচ্ছি কলমটা রেখে দিও)। সেই কলমটা দিয়েই আবার লম্বা চিঠি লিখে আমাকে পেরেশান করো না। আমি বেচারা গরীব মানুষ, আমার টুটাফাটা কিছু কাজ আছে। তাছাড়া লেখক হওয়ার জন্য হয়ত ঘটা করে 'ঘোষণা' দিতে হয়, কিন্তু লেখক না হওয়ার জন্য এত ঘটা করে পত্র লেখার কী প্রয়োজন! যত্তো সব!

নাহ, আমার মনে হয় বিরক্ত হওয়া ঠিক হলো না। তোমার লেখক না হওয়ার 'ঘোষণাপত্র' থেকেই তো আমার এ সংখ্যার 'এসো কলম মেরামত করি' লেখাটা তৈরী হয়ে গেলো! আচ্ছা ঠিক আছে, যারা মনে করো যে, লেখক হওয়া তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তারা আমাকে লম্বা লম্বা পত্র লেখো, তাতে অন্তত আমার কিছু লেখা তো তৈরী হবে! এবং .. এবং তোমরাও হয়ত চিঠি লিখতে লিখতে অন্তত 'ছোটখাটো' লেখক হয়ে যাবে। সব লেখককেই 'নোবেল প্রাইজ' পেতে হবে, তা কিন্তু নয়। বানানটা নির্ভুল হলেই হলো, আর যা বলতে চাও তা সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করতে পারলেই হলো। এটাকেই বলে লেখক হওয়া, এর বেশী কিছু নয়। বাকি রইলো সাহিত্য সাধনা! তো এর জন্য প্রয়োজন মাত্র দশজন সাহসী ও উদ্যমী তরুণের। এজন্য সবার পেরেশান হওয়ার দরকার নেই। (আচ্ছা ভাই, এবার যাই, অন্য কাজ আছে।)

---

১। আগে এই শেষ অংশটি ছিলো না, এখন যুক্ত করেছি। নন্দঘোষ জিনিসটা কী, জানা আছে বলেই আমি 'কলমনন্দঘোষ'-এর মত চমৎকার শব্দযুগল তৈরী করতে পেরেছি। তোমার যদি নন্দঘোষবিষয়ক তথ্য জানা না থাকে, তুমি এর স্বাদ পাবে না। তো সব কারিশমা হলো তথ্য জানা থাকা এবং জানা না থাকার।

# লেখার মুহূর্তের প্রতীক্ষায়

কী দিয়ে আজকের লেখাটা শুরু করবো। লজ্জা দিয়েই শুরু করি, আমার ব্যর্থতার লজ্জা। ছাত্রের ব্যর্থতা তো শিক্ষকেরই ব্যর্থতা!

মাদরাসাতুল মাদীনাহর গত শিক্ষাবর্ষের বিদায় অনুষ্ঠানে চতুর্থ বর্ষের ছাত্ররা কিছু পোস্টার টানিয়েছিলো অনুষ্ঠানস্থলে। তাতে ছিলো সুন্দর সুন্দর কিছু কথা ও বাণী। কিন্তু তাতেও দেখতে পেলাম আমাদের সেই বানানভুলের জন্মদোষ, শুধু ভুল নয়, রীতিমত ভুলের ছড়াছড়ি। 'শূণ্যতা দেখে ক্ষুণ্ন কেন তুমি!' আজব সুওয়াল! 'শূণ্যতা' দেখে কেন ক্ষুণ্ন হবো না আমি! ছাত্রদের ডেকে বললাম, মাদরাসাতুল মাদীনায় দীর্ঘ চার বছর বাস করেও যদি তোমরা 'শূণ্যতা' লেখো, আর আমি 'শূণ্যতা' দেখি তাহলে তো আমার এবং তোমাদের সকলেরই জমার খাতায় বিরাট একটা 'শূন্য' ছাড়া আর কিছু থাকে না। জানি না, কবে দূর হবে আমাদের এই 'শূণ্যতা'!

যাক, এবার আসি মূল আলোচনায়। আমি আজকের আলোচনার নাম দেবো, 'লেখার মুহূর্ত'। মানুষের জীবনে এমন কিছু মুহূর্ত আসে যখন হৃদয় খুব কোমল ও আর্দ্র হয় এবং ভিতরে ভাবের ও আবেগের তরঙ্গদোলা অনুভূত হয়। নিজের অজান্তেই তখন একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা জাগ্রত হয়। সবসময় এটি হয় না, মাঝে মাঝে হয়। হৃদয় ও আত্মা যাদের যত পবিত্র হয়, চিন্তা ও ভাবনা যাদের যত স্বচ্ছ হয়, নীচতা ও হীনতা থেকে যারা যত মুক্ত হয় স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার মুহূর্ত তারা তত বেশী অর্জন করতে সক্ষম হয়। সাহিত্যের সাধক যারা ভিতরের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার সেই মুহূর্তটির জন্য তারা প্রতীক্ষায় থাকেন; কখনো তা হাতছাড়া করেন না। তখনই তারা কলম হাতে নেন এবং লেখায় নিমগ্ন হন। ঐ মুহূর্তটি হলো লেখার সুবর্ণ মুহূর্ত। তখন চিন্তা করে করে এবং শব্দ ও বাক্য খুঁজে খুঁজে লিখতে হয় না। লেখা তখন আসতে থাকে। কলম থেকে শব্দ তখন ঝরতে থাকে। মনে হয়, ভিতর থেকে প্রবল বেগে একটি ঝরণা যেন প্রবাহিত হয়ে চলেছে। কলম যেন সেই স্রোতধারার সঙ্গে সঙ্গ দিয়ে পেরে উঠছে না।

এমনও হয়, গভীর রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে সাহিত্যের সাধক হঠাৎ ভিতরে সেই স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা অনুভব করেন। তখনই তিনি কলমের মুখ খুলে ধরেন, যাতে ভিতরের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণাটি বের হয়ে আসার পথ পেয়ে যায়। তখন যদি তিনি ভাবেন, এখন থাক, সকালে; তাহলেই গেলো। সকালে তিনি দেখতে পাবেন, হঠাৎ জেগে ওঠা ভিতরের সেই ঝরণা শুকিয়ে গেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্যের সাধনায় যারা অমর হয়েছেন তারা সকলেই ভিতরের এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার কথা বলেছেন এবং বিস্ময়কর সব অভিজ্ঞতার কথা লিখে গেছেন। এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা আমার, তোমার সবার মাঝেই আসে; কারো কম, কারো বেশী। এটাকে কখনো অবহেলা করা উচিত নয়, বরং আমাদের কর্তব্য হলো, হৃদয়ের পবিত্রতা এবং চিন্তার বিশুদ্ধতা অর্জনের সাধনায় আত্মনিয়োগ করা, যাতে এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা আমাদের মাঝে পুনঃপুন জাগ্রত হয়।

আমার নিজের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার কথা বলি, গভীর রাতে একটি বইয়ে একটি কবিতা পড়ছিলাম, ফরহাদ মাজহারের–

*আমি ডেকে বলতে পারতুম, 'তুই একটু সাবধানে যা–'/ একটু সাবধানে, যেমন সাবধানে যায় কবি কিম্বা পাখি,/ ব'তে পারতুম, 'আয় আমার সঙ্গে বোস'/ আমার সঙ্গে, আমি যেমন কিচ্ছু না ছুঁয়ে বসে থাকি। ......*

*বলতে পারতুম, 'অত দ্রুত নয় হুমায়ুন, আস্তে আস্তে যা'* ......

কবি জানতেন, প্রতিপক্ষের হাতে নিহত তার বন্ধু হুমায়ুন ভুল পথে যাচ্ছে, এ পথের পরিণতি এমনই হয় যেমন হয়েছে, কবি এখন আফসোস করছেন, সময় থাকতে বন্ধুকে তিনি সতর্ক করেননি বলে। কবিতাটি পড়ছি, আর আমার ভিতরে একটি তরঙ্গদোলা অনুভব করছি। কবির নিহত বন্ধুর কথা স্মরণ করে আমারও হৃদয় করুণারসে আপ্লুত হলো এবং ভিতরে সেই স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণাটি জাগ্রত হলো। আমার মনে হলো, পৃথিবীতে আল্লাহ এই যে বিভিন্ন শিক্ষার জিনিস ছড়িয়ে রেখেছেন সবাই তো তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। আমি যদি তা থেকে কোন শিক্ষা পেয়ে থাকি তবে আমার কি কর্তব্য নয় সকলকে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানানো, না হলে তো আমাকেও পরে কবির মত অনুতাপ করতে হবে! ভোরের আলো থেকে তো আমি কিছু শিক্ষা পাই এবং শিক্ষা পাই সূর্যাস্ত থেকে। আমার কি উচিত নয় সকলকে সেই শিক্ষাটুকু গ্রহণের আহ্বান জানানো! সঙ্গে সঙ্গে কবিতার বই বন্ধ করে লেখার কলম নিয়ে বসে গেলাম, এবং এ সংখ্যার প্রথম কথা ও শেষ কথা দুটো লিখে ফেললাম, বরং বলা ভালো লেখা হয়ে গেলো। আমাকে চিন্তা করতে হলো না, ভিতর থেকে একটি স্রোতের মত শব্দগুলো যেন কলম থেকে বের হয়ে এলো। (লেখা দু'টি 'শুধু তোমার জন্য' এবং 'ডাক দাও' নামে পরিশিষ্টে দেখো, এবং তা পড়ে তোমার কী অনুভূতি হলো সংক্ষেপে খাতায় লেখো। না,

না ভয় পেয়ো না, তোমাকে লেখক বানানোর মতলব করছি না।)

প্রথমে ভেবেছিলাম, লিখবো, 'আমি ভোরের আলো থেকে এই শিক্ষা পেয়েছি, তুমিও এ শিক্ষাটুকু গ্রহণ করো। তারপর মনে হলো, একজনকে সম্বোধন করে বলি, তুমি কি ভোরের আলো থেকে কোন শিক্ষা পেয়েছো? যদি পেয়ে থাকো তাহলে সকলকে আহ্বান জানাও, যেন তারাও ঐ শিক্ষাটুকু গ্রহণ করে।

লেখাদু'টি তৈরী হওয়ার পর অবশ্য প্রচুর সময় ব্যয় করে সম্পাদনা করেছি, তবে লেখাটি বেরিয়ে এসেছে মুহূর্তের মধ্যে। স্বতঃস্ফূর্ত এই মুহূর্ত সব সময় আসে না, যখন আসে তখন সেটাকে অবহেলা করা উচিত না। কলমের মুখ খুলে ধরা উচিত, যাতে ভিতরের সেই প্রেরণাটুকু লেখা হয়ে বের হয়ে আসার সুযোগ লাভ করে।

সাধারণভাবে আমরা যে সমস্ত লেখা লিখি তা হচ্ছে মস্তিষ্কের লেখা, ভিতরের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার লেখা নয়। মস্তিষ্কের যে লেখা তার পিছনে থাকে আমাদের অনেক পড়াশোনা ও চিন্তাভাবনা, অনেক পরিশ্রম ও সাধনা। সেখানে শব্দ ও বাক্য আমাদেরকে চিন্তা করে করে সাজাতে হয়। এক কথায় সে লেখা আমরা কষ্ট করে তৈরী করি, সৃষ্টি করি। এভাবেও লেখা হয় এবং সাহিত্য সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রেও যে যত আন্তরিকভাবে পরিশ্রম ও সাধনা করবে তার লেখা তত সুন্দর হবে। তবে উপরে যে লেখার কথা বললাম সেটা হলো অন্যকিছু, সাহিত্যের সাধক যারা তারা লিখতে থাকেন, তবে সবসময় প্রতীক্ষায় থাকেন সেই অন্যকিছুর, যা আসে অন্তর স্নিগ্ধ হলে, হৃদয় বিগলিত হলে এবং ঊর্ধ্বজগতের সঙ্গে আত্মার মিলন হলে।

যা বলতে চেয়েছি, জানি না তা বলতে পেরেছি কি না। তবে আমি বলতে চেষ্টা করেছি। বাংলাভাষায় অনেকেই সাহিত্য সাধনা করেছেন এবং করছেন। কার কী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তা তারাই ভালো বলতে পারেন। আমরা শুধু জানি, আমাদের লক্ষ্য একটি, শুধু একটি, আল্লাহর দ্বীনের খেদমত করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। আল্লাহ যেন আমাদের কবুল করেন, আমীন।

---

১। সাধারণভাবে আমরা বলি, 'কলম নিয়ে বসে গেলাম'। এখানে আগে যেহেতু আছে 'কবিতার বই, সেহেতু পরে লিখেছি 'লেখার কলম' যদি বলি, 'বই বন্ধ করে' তাহলে বলবো, 'কলম নিয়ে'। এখন মনে হচ্ছে এখানে পর্ববিভক্তিতে সমস্যা আছে। যেমন, 'কবিতার বই বন্ধ করে/ লেখার কলম নিয়ে/ বসে গেলাম।' যদি বলি, 'কবিতার বই রেখে/ লেখার কলম নিয়ে/ লিখতে বসে গেলাম', তাহলে মনে হয় পর্ববিভক্তিটা সুষম হয়।)

# লেখার মুহূর্ত

গত সংখ্যায় আমাদের আলোচ্যবিষয় ছিলো 'লেখার মুহূর্ত'। মূল বক্তব্য ছিলো এরকম- হৃদয়ের গভীরে একটি স্বতঃস্ফূর্ত ভাব ও প্রেরণা যখন জাগ্রত হয় তখনই কলম নিয়ে বসে যাওয়া উচিত এবং ভিতরের ভাবটুকু লিখে রাখা উচিত। এসম্পর্কে আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটি উদাহরণ দিয়েছিলাম। আশা করি, বিষয়টি তোমরা উপলব্ধি করতে পেরেছো।

এ বিষয়ে তোমাদেরও কিছু অভিজ্ঞতা আছে নিশ্চয়! তোমাদেরও হৃদয়ে কখনো কখনো সেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাব ও প্রেরণা এবং আনন্দ-বেদনার তরঙ্গদোলা জেগেছিলো নিশ্চয়! তোমরা যদি সেগুলো লিখে পাঠাতে, ভালো হতো। পুষ্পের বন্ধুরা তা থেকে উপকৃত হতে পারতো।

যাক, এ সম্পর্কে আজ আরো দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি। প্রথমে শোনো আরব-বিশ্বের সনামধন্য সাহিত্যিক আলী তানতাবীর অভিজ্ঞতা। এক শীতের রাতে তিনি এক ধনী বন্ধুর বাড়ীতে দাওয়াত খেলেন। সেখানে ছিলো খাদ্যের প্রাচুর্য। খাওয়া-দাওয়া শেষে এশার জামাতে শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি গেলেন দামেস্কের ঐতিহাসিক জামে উমাবী মসজিদে। সেখানে মসজিদের সিঁড়িতে তিনি দেখেন, কঙ্কালসার এক গরীব পড়ে আছে। না আছে শীত নিবারণের বস্ত্র, না আছে ক্ষুধা নিবারণের অন্ন। ওখানে খাদ্যের প্রাচুর্য, আর এখানে পড়ে থাকা ক্ষুধার্ত এক বনী আদম- এ দু'টি বিপরীত দৃশ্য তাঁর ভিতরে এমন আলোড়ন সৃষ্টি করলো যে, নিজেকেও তিনি অপরাধী ভাবলেন। ভিতরে তার প্রশ্ন জাগলো, কেন এমন হয়? সমাজে কিছু মানুষের কোন অভাব নেই, আর বেশীর ভাগ মানুষের অভাব ছাড়া কিছু নেই। কিছু মানুষের ঘরে খাদ্যের এমন প্রাচুর্য যে, অতিভোজনে তাদের শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, আর বহু মানুষ খাবারের অভাবে ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছটফট করে। কেন এমন হয়? আল্লাহ তো সম্পদ অঢেল দিয়েছেন কিছু মানুষ কেন এভাবে

সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখে? কেন তারা তাদের সম্পদে অভাবীদের ভাগ দিতে চায় না? সঞ্চিত সম্পদ তো তারা কবরে নিয়ে যেতে পারে না। ...

ভিতরের এই ভাব ও ভাবনা তাঁকে এমনই উতলা করে তুললো যে, আত্মযন্ত্রণায় যেন তাঁর প্রাণ বের হয়ে যায়! যন্ত্রণায় ছটফট করা অবস্থায় তিনি এশার জামাত পড়লেন; তারপর বাড়ীতে ফিরে আসার অপেক্ষা না করে সেখানেই একটুকরো কাগজ এবং কলম নিয়ে বসে গেলেন, আর তখনই তৈরী হয়ে গেলো তাঁর জীবনের একটি সেরা লেখা । তিনি বলেন–

'যে লেখা আমি চিন্তা করে লিখি তা শেষ হতে অনেক সময় কয়েক দিনও লেগে যায়, অথচ এ লেখাটি লিখতে আমার লেগেছে মাত্র দশ মিনিট। সবচে' বড় কথা, এ লেখা দ্বারা আমি আমার আত্মযন্ত্রণা এবং অপরাধবোধ থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি লাভ করেছিলাম।'

একই লেখকের বিপরীত অভিজ্ঞতা ছিলো এ রকম– মধ্যরাতে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেলো। অবিন্যস্ত কিছু ভাবনা তখন তাঁর মাথায় ঘোরপাক খেতে লাগলো। হঠাৎ তাঁর হৃদয়ে সুন্দর একটি ভাবের উদয় হলো। তিনি আলো জ্বেলে তখনই তা লিখে ফেলবেন বলে স্থির করলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য, কলম খুঁজে পেলেন না। ভাবলেন, সকালে লিখবেন। সকালে কলম তো খুঁজে পেলেন, কিন্তু মনের ভিতরে সেই ভাবটি আর খুঁজে পেলেন না। তখন তাঁর আফসোসের সীমা ছিলো না।

এমন আফসোস অনেক বিখ্যাত লেখককে অনেক বার করতে হয়েছে।

আমি লেখক নই, লেখার অনুশীলন করি মাত্র; আমারও অনেক লেখা এভাবে মনের ভিতর থেকে হারিয়ে যাওয়ার আফসোস আছে। এখন অবশ্য এ ভুলটা একটু কম হয়। চেষ্টা করি ভিতরে কোন ভাবের উদয় হলে তখনই সেটা লিখে রাখতে,

অন্তত কলমের আঁচড়ে মূল চিন্তাটা ধরে রাখতে, যাতে পরে সেটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়া সম্ভব হয়।

এসংখ্যার 'প্রথম কথা'টিও হৃদয়ের গভীরে উদিত ভাব থেকে লেখা। দুপুরের কায়লুলার সময় ভাবছিলাম, জীবনের দীর্ঘ সময় তো চলে গেলো! কী জন্য দুনিয়াতে এসেছিলাম! কী কাজে জীবনটা পার হলো! আর কী নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবো! নিজের অজান্তেই গুনগুনিয়ে আবৃত্তি করতে লাগলাম সেই বিখ্যাত কবিতাটি–

'যেদিন তুমি এসেছিলে ভবে/ কেঁদেছিলে তুমি, হেসেছিল সবে/ এমন জীবন

এ কবিতা আগে অনেকবার আবৃত্তি করেছি, কিন্তু আজ যেন ধীরে ধীরে হৃদয়ের গভীরে ভাবের একটি তরঙ্গ সৃষ্টি হলো। ভিতরে কেমন উথাল-পাতাল শুরু হলো। আল্লাহ তাওফীক দিলেন; কলমটা হাতে নিলাম। ভাবের সেই তরঙ্গগুলো যেন পথ পেয়ে কলমের মুখ দিয়ে বের হয়ে এলো এবং তা মুহূর্তের মধ্যে। (পরে অবশ্য অনেক সময় নিয়ে লেখাটির পরিচর্যা করেছি।)

উদাহরণ আরো আছে; চার-পাঁচদিন আগের কথা; একটি কবিতার বই পড়ছিলাম; কবি তার প্রিয়তমাকে সম্বোধন করে লিখেছেন–

'তোমার প্রতি/ তোমাকে লক্ষ্য করে এই পঙক্তিমালা/ তোমার জন্য আমার এই কবিতা, মেহেরজান! ...

হঠাৎ মনে হলো, কবির কাব্যপ্রতিভা আছে, তাই তিনি তার প্রিয়তমাকে উদ্দেশ্য করে কবিতা লিখেছেন। লিখতে পেরে নিজেকে ধন্য ভাবছেন। আমি তো কবিতা লিখতে জানি না; যদি জানতাম তাহলে আমি আমার আল্লাহর শানে না'ত ও কবিতা লিখতাম। তাঁর অনন্ত দয়া ও করুণার স্তুতি গাইতাম। ...

আবার ভাবলাম, আচ্ছা, এই যে আমি মনে মনে তাঁর কথা ভাবি, এই যে আমার হৃদয় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়, এই যে তাঁর প্রতি ভালোবাসায় আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়, এই যে ভিতরের ভাবতরঙ্গ, এটাও তো একরকম কবিতা! ...

সঙ্গে সঙ্গে বই বন্ধ করে কলম নিলাম এবং এ সংখ্যায় প্রকাশিত 'তোমার জন্য কবিতা' লেখাটি লিখে ফেললাম। আমি লিখলাম নয়, লেখাটি যেন ভিতর থেকে নিজে নিজে বের হয়ে এলো।

ঘটনা আরো আছে; 'তোমার জন্য কবিতা' লেখাটি বের হয়ে আসার পর শোকর ও আনন্দ প্রকাশের জন্য আমার স্ত্রীকে শুনালাম এবং কীভাবে লেখাটি হৃদয়ের ভিতরে উদিত হয়েছে, বললাম, তিনিও আনন্দিত হলেন এবং আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। কবির কবিতা ছিলো তার প্রিয়তমা মেহেরজানকে লক্ষ্য করে। হঠাৎ আমার স্ত্রী বলে উঠলেন, বলা ভালো, আল্লাহ তাকে দিয়ে বলালেন, কবির কবিতা মেহেরজানের জন্য, আর তোমার 'কবিতা' 'মেহেরবানের' জন্য।

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম! 'মেহেরজান থেকে মেহেরবান'! একটি মাত্র শব্দ আমার ভিতরে ইশক ও মুহাব্বাতের নতুন মউজ সৃষ্টি করলো এবং আমি পেয়ে গেলাম একটি নতুন লেখার উপাদান। 'দু'টি কবিতা সমান হলো?' লেখাটি এ সংখ্যায় তুমিও পড়ো। (দু'টো লেখাই পরিশিষ্টে দেখতে পারো)

মোট কথা, তোমার হৃদয় যদি উন্মুক্ত থাকে তাহলে হঠাৎ হঠাৎ তোমার হৃদয়

কখনো চাঁদের জোসনা থেকে, কখনো সাগরের ঢেউ থেকে, কখনো বাগানের ফুল থেকে, কখনো পথের ধুলিকণা থেকে, কখনো অন্যের লেখা থেকে।

হয়ত লেখাটি খুব সাধারণ, হয়ত পাঁচ দশ লাইনের। কিন্তুর মনের দরজায় দস্তক দেয়া এই মেহমানকে অবহেলা করো না। দরজা খুলে দাও এবং তাকে সাদরে বরণ করে নাও। যখন আসমানে জানাজানি হবে যে, তুমি বড় 'মেহমান নেওয়ায' এবং বড় শোকরগোযার তখন সেখান থেকে তোমার উদ্দেশ্যে পাঠানো হবে আরো অসংখ্য মেহমান এবং বড় বড় মেহমান!

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় যত বড় বড় লেখক সাহিত্যিক বিগত হয়েছেন তারা চিন্তার লেখার চেয়ে হৃদয়ের লেখা দিয়েই বেশী সমৃদ্ধ হয়েছেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন, আমীন।

---

১। এখানে ছিলো, 'সিংহভাগ', আমার মনে হয়, সিংহভাগ শব্দটি সববিষয় এবং সবস্থানের উপযোগী শব্দ নয়।

# নবম অধ্যায়ঃ লেখার বীজ

*লেখকের চিন্তায় কোন লেখার প্রথম যে ধারণাটি উদিত হয় সেটাকেই বলা যায় লেখার বীজ। এই প্রথম ধারণাটি থেকেই পরবর্তীতে লেখা তৈরী হয়। তো বর্তমান অধ্যায়ে লেখার বীজ সম্পর্কে আলোচনা হবে যে, এটা কী এবং লেখার বীজ থেকে কীভাবে লেখা সৃষ্টি হয় বা সৃষ্টি করতে হয়?*

# বীজ থেকে লেখার বৃক্ষ

'লেখার বীজ এবং বীজ থেকে লেখার বৃক্ষ'—এই হলো আজ আমাদের আলোচ্যবিষয়। লেখা সম্পর্কে লেখকের চিন্তায় প্রথম যে ভাবনাটি উদিত হয় সেটাই হলো লেখার বীজ। বীজ থেকে অঙ্কুরিত গাছ যেমন বড় হয় ছোট হয়, লেখাও বড় বা ছোট হতে পারে; পাঁচ দশ লাইনেরও হতে পারে। প্রতিটি লেখা কলেবরে বিরাট হতে হবে এমন কোন কথা নেই।

কৃষকের জন্য ধান-গমের বীজ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, লেখকের জন্য লেখার বীজ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। হঠাৎ যে কোন সময় যে কোনভাবে তুমি তোমার চিন্তায় লেখার একটি বীজ পেয়ে যেতে পারো। তখনি ঐ বীজটি থেকে লেখাটা তৈরী করে ফেলতে হয়। নইলে হঠাৎ করেই তা চিন্তা থেকে হারিয়ে যেতে পারে এবং হারিয়ে যায়। আমার সে অভিজ্ঞতা হয়েছে অনেকবার। সুন্দর একটি বীজ পেলাম, ভাবলাম সুন্দর একটি লেখা হবে। অবহেলা করে সঙ্গে সঙ্গে লিখিনি। পরে দেখি, বীজটি হারিয়ে গেছে চিন্তা থেকে। খুব আফসোস হয়েছে। কিন্তু অসময়ের আফসোসে কী লাভ!

যদি এমন হয় যে, লেখার বীজ তো পেয়েছো, কিন্তু তখন লেখার পরিবেশ নেই বা মানসিক প্রস্তুতি নেই। এমন হতে পারে। লেখার মুহূর্ত সবসময় আসে না। তখন লিখতে চাইলেও লেখা হয় না। আবার মনের ভিতরে যখন লেখার মুহূর্ত এসে যায় তখন যে কোন মূল্যে ঐ সময়টুকুকে কাজে লাগাতে হয়। লেখার মুহূর্ত সম্পর্কে পিছনের কোন সংখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে। তো বিষয় হলো দুটি। লেখার বীজ এবং লেখার মুহূর্ত। যদি এমন হয় যে, মাথায় লেখার বীজটা তো এসেছে, কিন্তু হৃদয়ে লেখার মুহূর্তটি আসেনি। তখন লেখার দরকার নেই। তবে অবহেলায় বীজটি যেন হারিয়ে না যায়। খাতার পাতায় টুকে রেখে দাও। এভাবে অসংখ্য বীজের ভাণ্ডার হতে পারে তোমার খাতাটি। মাঝে মাঝে খুলে দেখতে পারো, কত বীজ জমা হলো। অন্তরে যখন লেখার মুহূর্ত এসে যায় তখন কোন একটি বীজ নিয়ে মনের মাটিতে বপন করো, অর্থাৎ কলম নিয়ে বসো এবং লেখাটি তৈরী করে ফেলো। আমার খাতায় অসংখ্য বীজ সংরক্ষিত আছে। মাঝে মাঝে সেগুলো নেড়ে -চেড়ে দেখি। যখন পরিবেশ অনুকূল হয় এবং হৃদয় প্রস্তুত হয়, অর্থাৎ লেখার

মুহূর্ত আসে তখন যে কোন একটি বীজ থেকে লেখা তৈরীর চেষ্টা করি। কখনো দ্রুত হয়, কখনো বিলম্ব হয়। কারণ 'কলম ও কলব' সবসময় এক অবস্থায় থাকে না।

আমার খাতায় বহু বছর ধরে সংরক্ষিত বীজও আছে, যা থেকে লেখা তৈরী করার সুযোগ এখনো হয়নি। আবার এমনও হয়েছে যে, লেখার বীজটা চিন্তায় এসেছে, মনের জমিনও তৈরী আছে, সঙ্গে সঙ্গে বীজটি বপন করে দিয়েছি, আর একটি 'লেখা-বৃক্ষ' তৈরী হয়ে গেছে।

মোট কথা, লেখার বীজ যদি পাও তখনই লেখাটি তৈরী করে ফেলো, কিংবা যথাসময়ের জন্য সংরক্ষণ করে রাখো। আমার কাছে যারা আছে অনেক সময় তাদের বলি, দেখো, এই যে একটি বীজ, তা থেকে এভাবে এভাবে একটি সুন্দর লেখা তৈরী হতে পারে। তুমি চেষ্টা করো। এভাবে বীজ সরবরাহের কাজও আমি করি। কোন ভালো কৃষকের হাতে যদি বীজগুলো পড়তো তাহলে ভালো ফসল হতে পারতো।

অনেকে লেখা আসে না বলে অনুযোগ করে। আসলে ওদের কাছে বীজ সংরক্ষিত নেই, আর বীজ না হলে গাছ হবে কীভাবে? বীজের পরে অবশ্য মনের জমিটাও হতে হবে উর্বর। অনুর্বর সেচহীন জমিতে সুন্দর ফসল আশা করা যায় না! মনের জমি কীভাবে উর্বর হয় তা জানতে পারো, 'সাহিত্যের উৎস হৃদয়, অন্যকিছু নয়', নামের লেখাটিতে। মন যত সুন্দর, চিন্তা যত পরিচ্ছন্ন এবং চরিত্র যত সুবাসিত হবে, লেখার জন্য মনের জমি তত উর্বর ও উপযোগী হবে। ভাষার সঙ্গে হৃদয়ের এবং কলমের সঙ্গে কলবের সংযোগ না হলে কখনো সুন্দর লেখা হয় না।

যাক, লেখার বীজের কথায় ফিরে আসি। একবার এক প্রিয় ছাত্রের সঙ্গে সফরে ছিলাম, দুপুরের রোদে ক্লান্ত হয়ে আমরা একটি গাছের ছায়ায় বসলাম। খুব ভালো লাগলো, ক্লান্তি দূর হলো এবং দেহ-মন আবার সতেজ হলো।

আমি ভাবলাম, গাছের ছায়ার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। ভাবলাম, আর লেখার বীজ পেয়ে গেলাম, 'ছায়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা'।

সঙ্গীকে বললাম, এই দেখো, 'লেখার বীজ', গাছ থেকে, মেঘ থেকে ছায়া পাই, কত আরাম হয়, কিন্তু আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না।

এ পর্যন্ত বলে হঠাৎ মনে হলো, দুনিয়ার মত আখেরাতের কঠিন দিনেও তো ছায়ার প্রয়োজন হবে সে জন্য কী চেষ্টা করছি আমরা?

দেখো, বীজ থেকে মাটি ফুঁড়ে যে অঙ্কুর বের হয় তার যেমন দুটি পাতা থাকে তেমনি লেখার বীজ থেকে হৃদয়ের মাটি ফুঁড়ে যে অঙ্কুরটি বের হয়েছে তারও কী সুন্দর দুটি পাতা– দুনিয়ার ছায়া এবং আখেরাতের ছায়া। দুনিয়ার ছায়া পাই গাছ থেকে, মেঘ থেকে, আখেরাতের ছায়া পাওয়া যাবে আরশ থেকে। ব্যস, দুদিক থেকে আলোচনাকে প্রসারিত করো, তারপর একটি উপসংহার টানো, সুন্দর একটি লেখা তৈরী হয়ে যাবে।

আমি এ বীজটির নাম দিলাম 'ছায়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা'। ছেলেটিকে বললাম, বীজটি থেকে একটি লেখা তৈরী করো পুষ্পের জন্য

এ পর্যন্ত সব ঠিক ছিলো, কষ্ট শুরু হলো এর পর থেকে। ছেলেটি লেখেনি, লেখার বীজটিও সংরক্ষণ করেনি।

আমার ভিতরে তিনটি শব্দের একটি রিমঝিম সুর ছিলো, 'গাছের ছায়া, মেঘের ছায়া, আরশের ছায়া!'

তখন আমার অবস্থা হলো এই– লেখার বীজ আছে, মনের জমিও প্রস্তুত। এমন শুভমুহূর্তে লিখতে না বসা অন্যায় হবে, নিজের উপর, নিজের কলমের উপর এবং সম্ভবত সাহিত্যের পাথেয় সন্ধানকারী বহু তরুণের উপর। তাই কাজ-অকাজ সব ছেড়ে কলম নিয়ে বসে গেলাম। ছায়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা নামে নীচের লেখাটি তৈরী হলো–

*'পথে চলার সময় ছায়ার প্রয়োজন কি আমরা অস্বীকার করতে পারি! প্রখর রোদে চলতে গিয়ে আমরা ক্লান্ত হয়ে গাছের নীচে বসি এবং গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করি। আবার কখনো আকাশে ভেসে বেড়ায় যে মেঘ, তাও আমাদের ছায়া দান করে। কিন্তু আমরা বড় অকৃতজ্ঞ। গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করি, মেঘের ছায়ায় পথ চলি এবং ভুলে যাই। কখনো সামান্যতম কৃতজ্ঞতা বোধ করি না ছায়ার প্রতি। আমাদের দুনিয়ার জীবনে রোদ আছে, তাই ছায়ারও প্রয়োজন আছে। আখেরাতের জীবনেও রোদ আছে, আর সে রোদ দুনিয়ার চেয়ে হাজার লক্ষগুণ বেশী। কারণ সূর্য তখন থাকবে মাথার একহাত উপরে। তাই তখন ছায়ার প্রয়োজন হবে অনেক বেশী। আখেরাতে কোন ছায়া থাকবে না, আরশের ছায়া ছাড়া। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো আখেরাতে আরশের ছায়া-লাভের জন্য দুনিয়াতেই চেষ্টা করে যাওয়া।'*

লেখার দেহকাঠামোটি বোঝার সুবিধার জন্য লেখাটিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে নেয়া যায়। যথা–

(১) *'পথে চলার সময় ছায়ার প্রয়োজন কি আমরা অস্বীকার করতে পারি'?* এটুকু হচ্ছে লেখার প্রারম্ভ বা উদ্বোধনী অংশ। পরের অংশটি, অর্থাৎ– *'প্রখর রোদে চলতে গিয়ে আমরা ক্লান্ত হয়ে গাছের নীচে বসি এবং গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করি'*– এটি হচ্ছে উদ্বোধনী অংশের প্রসার ও বিস্তার।

(২) এরপর হচ্ছে ছায়া-লাভের দ্বিতীয় উৎস মেঘের আলোচনার মাধ্যমে লেখার সম্প্রসারণ, যথা– *'আবার কখনো আকাশে ভেসে বেড়ায় যে মেঘ, তাও আমাদের ছায়া দান করে।'*

এ অংশটি ছাড়াও কিন্তু লেখাটি শরীর লাভ করতে পারে। অর্থাৎ শুধু গাছের ছায়া এবং আরশের ছায়া দ্বারাই লেখাটি তৈরী হতে পারে, তবে লেখাটি ছোট হবে, আর সৌন্দর্য কিছুটা ক্ষুণ্ন হবে।

(৩) *'কিন্তু আমরা বড় অকৃতজ্ঞ'*– এটি হচ্ছে উদ্বোধনী অংশ থেকে মধ্যবর্তী অংশে গমনের জন্য সেতুবন্ধন। লেখায় প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে গমনের জন্য এধরনের যোগসূত্র বা সেতুবন্ধনের প্রয়োজন। যাই হোক, মধ্যবর্তী অংশটি হলো–

(৪) *'গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করি, মেঘের ছায়ায় পথ চলি এবং ভুলে যাই। কখনো*

এই মধ্যবর্তী অংশটি আলোচ্য লেখার খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা পাঠকের জন্য শিক্ষা এবং চিন্তার উপাদান বহন করছে।

(৫) *'দুনিয়ার জীবনে রোদ আছে এবং ছায়ার প্রয়োজন আছে, তেমনি আখেরাতের জীবনেও রোদ আছে এবং ছায়ার প্রয়োজন আছে।'*

এটি হচ্ছে মধ্যবর্তী বক্তব্য থেকে সমাপ্তি বক্তব্যে বা উপসংহারে উপনীত হওয়ার সেতুবন্ধন। আগেও বলেছি, বক্তব্য থেকে বক্তব্যে গমনের জন্য সেতুবন্ধন জরুরী এবং তা যত সুন্দর হয়, লেখা তত মানোত্তীর্ণ হয়।

(৬) *'সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো আখেরাতে ছায়া হাছিল করার জন্য দুনিয়াতেই চেষ্টা করে যাওয়া।'*

এটি হলো লেখার সমাপ্তি অংশ বা উপসংহার। যে কোন লেখায় প্রধানত তিনটি অংশ থাকে। যথা– উদ্বোধনী অংশ, মধ্যবর্তী অংশ এবং সমাপ্তি অংশ। প্রতিটি অংশকে পরিমাণমত বিস্তারিত ও প্রসারিত করার মাধ্যমেই লেখার দেহকাঠামো নির্মাণ করা হয়।

বলাবাহুল্য যে, প্রথম প্রচেষ্টায় উপরে যা তৈরী হয়েছে তা পূর্ণাঙ্গ লেখা নয়। আসলে এটি হচ্ছে বীজ থেকে তৈরী চারাগাছের মত। যত্ন ও পরিচর্যা দ্বারা এটি পূর্ণাঙ্গ লেখারূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, যেমন চারা থেকে পূর্ণ বৃক্ষ হয়। এ লেখাটিকেও যথেষ্ট সময় ও চিন্তা ব্যয় করে এবং অব্যাহত পরিচর্যা ও সম্পাদনার মাধ্যমে বর্তমান স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা করা হয়েছে। নীচে সম্পাদনার মোটামুটি একটি রূপরেখা তুলে ধরা হলো।

(১) উদ্বোধনী অংশটি আবার দেখো– *'পথে চলার সময় ছায়ার প্রয়োজন কি আমরা অস্বীকার করতে পারি! প্রখর রোদে চলতে গিয়ে আমরা ক্লান্ত হয়ে গাছের নীচে বসি এবং গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করি। আবার কখনো আকাশে ভেসে বেড়ায় যে মেঘ, তাও আমাদের ছায়া দান করে।'*

কয়েকটি বাক্য মিলে একটি বক্তব্য হয়। উপরে উদ্বোধনী বক্তব্যটি তিনটি বাক্য মিলে গঠিত হয়েছে। প্রথমটি হলো প্রশ্নবাক্য। দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি হলো খবর-বাক্য।

লেখাটি নিয়ে চিন্তাভাবনার শুরুতেই যে ত্রুটিটা নযরে পড়েছে তা এই যে, পদ্যের মত গদ্যেরও নিজস্ব একটি ছন্দ থাকে এবং বক্তব্যের বাক্যগুলোর মাঝে একটি জ্যামিতিক মাপ থাকে। এখানে তা অনুপস্থিত। সামনের সম্পাদিত অংশটি পড়ে দেখো–

*চলার পথে/ প্রখর রোদে/ ক্লান্ত শ্রান্তপথিক কী আশা করে?/ একটু ছায়া।/ সেই ছায়া কখনো সে লাভ করে/ সুদূর আকাশের ভাসমান মেঘ থেকে/ কখনো পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বৃক্ষ থেকে।*

এখানে প্রশ্নবাক্যটি তিন পর্বে বিভক্ত, প্রথম দু'টি পর্বে দু'টি করে শব্দ। তৃতীয় পর্বটি প্রথম দু'টি পর্বের সমান। আবার পর্ব তিনটিতে রয়েছে এ-কারের ছন্দ। অথচ সম্পাদনাপূর্ব প্রশ্নবাক্যটি ছিলো সাদামাটা, তাতে ছন্দগত ও জ্যামিতিক সৌন্দর্য ছিলো না।

দ্বিতীয় ত্রুটি হলো, প্রশ্নের কোন উত্তর না থাকা। সম্পাদনায় দু'টি শব্দের ছোট্ট একটি উত্তর এসেছে, যা খুব আবেদনপূর্ণ।
এরপর দেখো, যদি বলা হতো–
'সেই ছায়া কখনো দান করে/ সুদূর আকাশে ভাসমান মেঘ/ কখনো পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বৃক্ষ।'
তাহলে পর্বগুলোর মাপ ঠিক থাকে, তবে ছন্দ কিছুটা ক্ষুণ্ন হয়। কিন্তু 'গাছ' বললে কোন ছন্দই থাকে না। তবে এখানে সবচে' বড় ত্রুটি হলো, পথিকের অনুপস্থিতি। অথচ বক্তব্য শুরুই হয়েছিলো পথিককে নিয়ে। বাক্যটি এমনও হতে পারে–
'সেই ছায়া সে লাভ করে/ আকাশে ভাসমান মেঘ থেকে/ কিংবা পথের পাশে সবুজ বৃক্ষ থেকে। (আরো ভালো হয়, যদি বলি– আকাশের কালো মেঘ থেকে/ কিংবা পথের পাশে সবুজ বৃক্ষ থেকে।)
মোটকথা, দ্বিতীয় পর্বে 'সুদূর' এবং তৃতীয় পর্বে 'দাঁড়িয়ে থাকা' শব্দগুলো বাদ দেয়া যায়।
(২) উদ্বোধনী অংশ থেকে পরবর্তী অংশে গমনের সেতুবন্ধনটি আবার পড়ো–
*'কিন্তু আমরা বড় অকৃতজ্ঞ।'*
এটি গ্রহণযোগ্য ছিলো। তবে সম্পাদনার মাধ্যমে তা আরো গভীর ও মর্মসমৃদ্ধ হয়েছে। দেখো–
*'জীবনের জন্য শীতল ছায়ার কত প্রয়োজন/ তা জানে মরুভূমির পথহারা মুসাফির।/ তুমি, আমি– আমরা/ আজীবন এ ছায়া ভোগ করি/ বিনা মূল্যে,/ বিনা চিন্তায়।'*
(৩) লেখার মধ্যবর্তী অংশটি, যা পাঠকের জন্য শিক্ষা বহন করছে, তা আবার দেখো–
*'গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করি,/ মেঘের ছায়ায় পথ চলি/ এবং ভুলে যাই।/ কখনো সামান্যতম কৃতজ্ঞতা বোধ করি না ছায়ার প্রতি।'*
(এখানে 'কখনো' শব্দটি বাদ দিলে তাতে বাক্যটির আয়তন কমে আসে। একই কারণে 'সামান্যতম' এর পরিবর্তে 'কোন' বললে ভালো হয়। অর্থাৎ– কোন কৃতজ্ঞতা বোধ করি না ছায়ার প্রতি।)
পরবর্তী অংশটি সম্পাদনার সময় নতুনভাবে তৈরী করা হয়েছে। ফলে লেখাটি সুন্দরভাবে বিস্তার লাভ করেছে এবং অনেক ভাবসমৃদ্ধ হয়েছে। যেমন–
*'মেঘের ছায়ায় যখন পথ চলি/ তখন একবারও ভাবি না/ মাথার উপর আমার সঙ্গে ভেসে চলা মেঘখণ্ডের কথা।'*
(এটি হলো মধ্যবর্তী অংশের প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগটি এই)–
*'কোন গাছের ছায়ায় বসে যখন তুমি হে পাথিক দূর করো তোমার পথ চলার ক্লান্তি তখন একবারো তুমি ভাবো না এমন শীতল ছায়াদানকারী গাছটির কথা।'*
(৪) এখানে লেখাটিকে আরো সম্প্রসারিত করার জন্য দুটি বক্তব্য সংযোজন করা হয়েছে, যা মূল লেখাটিতে ছিলো না। প্রথমত ছায়ার মূল্য অনুভব করার প্রেরণা, দ্বিতীয়ত ছায়াদানকারী গাছের প্রতি নিষ্ঠুরতার নিন্দা। যথা–

*(ক) ছায়ার যখন অভাব হয় তখন মানুষ বুঝতে পারে ছায়ার মূল্য। একটুকরো ছায়ার জন্য প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। মাথার উপর একটু ছায়া পেলে যেন প্রাণ ফিরে আসে।*

(কিংবা বলা যায়– *'যখন কোন ছায়া থাকে না তখন মানুষ বুঝতে ...*)

(খ) *'আচ্ছা, সেই ছায়া-দেয়া গাছকে আমরা কেটে ফেলি কীভাবে? এমন উপকারী বন্ধুর প্রতি এমন নির্মম হতে পারি কীভাবে? ...*

(৫) সমাপ্তি অংশ বা উপসংহারে গমনের সেতুবন্ধনটি আবার দেখো–

*'আমাদের দুনিয়ার জীবনে রোদ আছে, তাই ছায়ারও প্রয়োজন আছে। আখেরাতের জীবনেও কিন্তু রোদ আছে, আর সে রোদ দুনিয়ার চেয়ে হাজার লক্ষগুণ বেশী। কারণ সূর্য তখন থাকবে মাথার একহাত উপরে। তাই তখন ছায়ার প্রয়োজন হবে অনেক বেশী। আখেরাতে কোন ছায়া থাকবে না। আরশের ছায়া ছাড়া।'*

এটি হলো সরাসরি ধর্ম-উপদেশ এবং তা গ্রহণযোগ্য, তবে উপদেশকে প্রচ্ছন্ন রাখা অনেক সময় বেশী উপকারী হয়, সেজন্য সম্পাদনায় নীচের সেতুবন্ধনটি আনা হয়েছে–

*'আমার মূল কথা অবশ্য এখানে নয়; গাছের ছায়ায় বসে এবং মেঘের ছায়ার দিকে তাকিয়ে আসলে আমি তোমার কাছে একটি প্রশ্ন রাখতে চাই ...।*

(যদি বলি, গাছের ছায়ায় বসে এবং মেঘের ছায়ায় দাঁড়িয়ে... তাহলে ছন্দগত দিক থেকে আরো ভালো হয়।)

(৬) সমাপ্তি অংশটি আবার দেখো– *'সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো আখেরাতে আরশের ছায়া হাছিল করার জন্য দুনিয়াতেই চেষ্টা করে যাওয়া।'*

এটিও উপদেশ-ভারাক্রান্ত, তাই সম্পাদনায় তা এভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে–

*'আমি তোমার কাছে জানতে চাই, আর কোন জীবনে আর কোন ছায়ার কি আমাদের প্রয়োজন আছে? সেই ছায়াটুকু লাভ করার কী আয়োজন আমরা করছি?*

তুমি যদি এই বীজটি থেকে লেখা তৈরী করো, আর লেখাটিকে উপদেশধর্মী করতে চাও তখন তুমি ঐ উপদেশমূলক কথাগুলো অবশ্যই আনতে পারো।

***

এভাবে সম্পাদনা শেষ হওয়ার পর লেখাটি নিয়ে আরেকদিন বসলাম। পড়ছি আর ভাবছি, কোথাও কোন খুঁত আছে কি না? ভাষাগত দিক থেকে বা দেহকাঠামোর দিক থেকে? অপ্রয়োজনীয় কোন কথা এসে গেছে কি না, কিংবা প্রয়োজনীয় কোন কথা রয়ে গেছে কি না? দেখো–

*'মেঘের ছায়ায় যখন পথ চলি,/ একবারও ভাবি না,/ মাথার উপর আমার সঙ্গে ভেসে চলা মেঘখণ্ডের কথা।'*

'হঠাৎ মনে হলো, ছায়ার প্রতি কৃতজ্ঞতার কথা বলছি, অথচ ছায়া যার দান তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা কথা নেই! দেখো, কত বড় ত্রুটি এবং কত দীর্ঘ চিন্তার পর তা নযরে এলো! তখন পুনঃসম্পাদনা করে কথাটা এভাবে লিখলাম–

*......কৃতজ্ঞতা বোধ করি না গাছের প্রতি, গাছের ছায়া যার দান তাঁর প্রতি!'*
পরবর্তী পর্যায়ে আরো সম্পাদনার মাধ্যমে বক্তব্যটিকে আরো সুবিন্যস্ত ও পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করা হয়েছে। যেমন–
*'মেঘের ছায়ায় যখন পথ চলি তখন আমাদের ভাবা উচিত, যিনি মেঘের ছায়া দান করেছেন তিনি কত মেহেরবান!'*
*'গাছের ছায়ায় যখন বসি তখন আমাদের ভাবা উচিত, গাছের ছায়া যিনি দান করেছেন তিনি কত মেহেরবান!*
(যদি বলি, 'মেঘের ছায়া/গাছের ছায়া যার দান তিনি কত মেহেরবান!' তাহলে আরো ভালো হয়।)
পরে ভাবলাম, ছায়ার প্রতি কৃতজ্ঞতাকে যদি প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ করি এবং তার আড়ালে প্রচ্ছন্নভাবে ছায়ার স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতার কথা বলি তাহলে বক্তব্যটি আরো আবেদনপূর্ণ ও সাহিত্যমণ্ডিত হয়। এ ভাবনা থেকে লিখলাম–
*'মেঘের ছায়ায় যখন পথ চলি তখন একবার ভাবি না মাথার উপর আমার সঙ্গে ভেসে চলা মেঘখণ্ডের কথা; মেঘের আড়ালে যিনি আছেন তার কথা ভাবার আর সুযোগ কোথায়! অন্তত মেঘখণ্ডকেই যদি একটু কৃতজ্ঞতা জানাতাম! তিনি হয়ত ভাবতেন, 'আমাকেই তুমি জানিয়েছো এ কৃতজ্ঞতা।'*
গাছের ছায়া প্রসঙ্গেও একই ভাবে সম্পাদনা করা হয়েছে। তবে এখানে একজন কল্পিত পথিককে সম্বোধন করা হয়েছে। লেখাটি প্রথমে এরূপ ছিলো–
*'কোন গাছের ছায়ায় বসে যখন তুমি হে পথিক দূর করো তোমার পথ চলার ক্লান্তি , তখন একবারও ভাবো না, পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাছটির কথা, গাছের সবুজ পাতার আড়ালে যিনি, তাঁর কথা ভাবার আর সুযোগ কোথায়। অন্তত ছায়াদার গাছটির প্রতি যদি আমার মন একটু কৃতজ্ঞ হতো, হয়ত তিনি বলতেন, 'এ কৃতজ্ঞতা তুমি আমাকেই জানিয়েছো।'*
এখানে একটি বিষয় দেখো, মেঘের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, 'তখন একবারও ভাবি না (মাথার উপর আমার সঙ্গে ভেসে চলা) মেঘখণ্ডের কথা', আর গাছের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, 'তখন একবারও তুমি ভাবো না (পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা) গাছটির কথা'।
এখানে বন্ধনীটি বাদ দেয়া যায়। তবে রাখা বা বাদ দেয়া উভয় স্থানে হতে হবে, একটি বাদ দিয়ে অন্যটি রাখলে উভয় পাশ্বের ভারসাম্য ও সমতা ক্ষুণ্ন হয়, যেমন–
(ক) একবারও ভাবি না মেঘখণ্ডেরও কথা
(খ) একবারও তুমি ভাবো না পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাছটির কথা।
তবে কিছুটা খুঁত এখনো রয়ে গেছে। কারণ, একটি অংশ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। যদি বলা হতো
(ক) 'একবারও ভাবি না মাথার উপর ভেসে চলা মেঘখণ্ডের কথা'
(খ) একবারও ভাবি না পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাছের কথা'
তাহলে উভয় অংশের শব্দসংখ্যা কাছাকাছি হতো।

তাছাড়া 'মেঘখণ্ডের কথা' এর পরিবর্তে 'মেঘের কথা' হলে 'গাছের কথা'-এর সাথে অধিকতর সাদৃশ্য রক্ষা হতো।

এখানে আরেকটি ত্রুটি এই যে, মেঘের ক্ষেত্রে যেহেতু 'আমি' ব্যবহার করা হয়েছে সেহেতু গাছের ক্ষেত্রেও 'তুমি'-এর পরিবর্তে আমি ব্যবহার করা উচিত ছিলো, যেমন–

(ক) *'গাছের ছায়ায় বসে যখন আমরা পথের ক্লান্তি দূর করি, তখন একবারও ভাবি না... ।*

এখানে চিন্তাভাবনার একপর্যায়ে মনে হলো, গাছের ছায়াকে মায়ের আঁচলের ছায়ার সঙ্গে উপমা দিলে বক্তব্যটি আবেদনপূর্ণ হয়। এ চিন্তা থেকে নীচের উপমাটি যোগ করা হয়েছে–

'... *তখন একবারও ভাবি না, মমতাময়ী মায়ের আঁচলের মত শাখাবিস্তার করে দাঁড়িয়ে থাকা গাছটির কথা ... ।*

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, যেহেতু ছায়ার দুটি উৎস এখানে আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ মেঘ ও বৃক্ষ। আর মেঘের ক্ষেত্রে কোন উপমা নেই, সেহেতু গাছের ক্ষেত্রেও উপমা না থাকাই ভালো, যত আবেদনপূর্ণই হোক না সে উপমা। কারণ বক্তব্যের উভয় অংশ অভিন্ন আঙ্গিকে হওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং হয় গাছের উপমা বাদ দাও, না হয় মেঘেরও একটি উপমা খুঁজে বের করো, যেমন–

'একবারও ভাবি না মাথার উপর খোলো শামিয়ানার মত ঝুলে থাকা/ঝুলন্ত মেঘের কথা'।

এবার কিছু ত্রুটির কথা আলোচনা করি, যা লেখা ছাপা হওয়ার পর এখন নযরে এসেছে।

(ক) *চলার পথে/ প্রখর রোদে ক্লান্ত-শ্রান্ত পথিক কী আশা করে?*

এখানে শ্রান্ত শব্দটির তেমন প্রয়োজনীয়তা নেই, তদুপরি শব্দটি মুছে ফেললে পর্ববিভক্তিটা সুন্দর হয়। তুমি দু'ভাবে পড়ে দেখো না!

(খ) তুমি, আমি– আমরা আজীবন এই ছায়া ভোগ করি বিনামূল্যে ও বিনা-চিন্তায়।

'তুমি, আমি–আমরা' এ ব্যবহার বাংলায় আছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে তা ভালো লাগে। তবে মনে হয় এখানে 'তুমি, আমি' বাদ দিয়ে শুধু 'আমরা' বলাই ভালো হবে।

'বিনামূল্যে, বিনা চিন্তায়' অনেক চিন্তা করেই লেখা হয়েছিলো। এখন মনে হচ্ছে, কথাটায় তেমন আবেদন নেই। বরং বিনামূল্যে মানে অর্থমূল্য আদায় না করে, যা স্থূল বিষয়, পক্ষান্তরে চিন্তা হচ্ছে তত্ত্বগত বিষয়। বরং বলি–

*'আমরা আজীবন এ ছায়া ভোগ করি, অথচ কখনো চিন্তা করি না* এবং *ছায়ার মূল্য বুঝি না'* তাহলে লেখাটি অনেক বেশী ভালো হতো না?

(গ) 'মেঘের আড়ালে যিনি তাঁর কথা ভাবার সুযোগ হয় কখন'

'গাছের সবুজ পাতার আড়ালে যিনি তাঁর কথা ভাবার সময় হয় কখন!'

এখানে সবুজ শব্দটি অতিরিক্ত মনে হচ্ছে

যদি লিখি, 'তাঁর কথা ভাবা তো দূরের কথা!'
অথবা, 'যদি আমরা ভাবতাম মেঘের কথা এবং মেঘের আড়ালে যিনি, তাঁর কথা তাহলে কত ভালো হতো! অন্তত ...'
'যদি আমরা ভাবতাম গাছের কথা এবং সবুজ পাতার আড়ালে যিনি, তাঁর কথা তাহলে কত ভালো হতো! অন্তত...'
(ঘ) যখন তুমি হে পথিক, দূর করো তোমার পথ চলার ক্লান্তি
'তোমার' শব্দটি বাদ দিয়ে পড়ো, 'তুমি হে পথিক, দূর করো পথ চলার ক্লান্তি।
(ঙ) ছায়ার যখন অভাব হয় তখন মানুষ বুঝতে পারে ছায়ার মূল্য। একটুকরো ছায়ার জন্য/ প্রাণ তার ওষ্ঠাগত হয়ে যায়।/ মাথার উপর একটু ছায়া পেলে/ যেন প্রাণ ফিরে আসে।
এখানে পর্ববিভক্তি সুন্দর হয়নি। তাছাড়া পুরো বক্তব্যে 'ওষ্ঠাগত' হচ্ছে একমাত্র কঠিন শব্দ, যা এখানে বেমানান্। তাছাড়া গদ্যছন্দেরও পতন ঘটেছে। যদি বলি– *'একটুকরো ছায়ার জন্য/ প্রাণ তার যায় যায়।/ মাথার উপর একটু ছায়া পেলে/ যেন প্রাণ ফিরে পায়।'* তাহলে মনে হয় আগের চেয়ে ভালো হয়।
এই যে পরিবর্তন পরিমার্জন, এর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা য়ায় যে, একটি লেখা ছাপা হওয়ার পরো তাতে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা ও সম্পাদনার অবকাশ থাকে এবং লেখাটি তাতে আরো উৎকর্ষ লাভ করতে পারে। কিন্তু আমরা আমাদের লেখার পিছনে সময় দিতে এবং লেখার যত্ন নিতে মোটেই আগ্রহী নই, না প্রকাশের আগে, না পরে। তাহলে কীভাবে আমাদের লেখার উন্নতি হবে এবং আমরা বাতিল কলমের সাথে 'টক্কর' দেবো? (এবং আমরা আহলে বাতিলে সঙ্গে কলমের পাঞ্জা লড়বো?)

আশা করি উপরের লেখা থেকে তোমরা বুঝতে পেরেছো, কীভাবে লেখার বীজ থেকে ধীরে ধীরে একটি পূর্ণ লেখা-বৃক্ষ তৈরী হয় এবং একটি লেখা তৈরী হয়ে যাওয়ার পর কীভাবে তার ভাষাগত ও কাঠামোগত পরিমার্জন ও পরিচর্যা করা হয়। এভাবে তুমি যদি কলমের সাধনা অব্যাহত রাখো তাহলে ধীরে ধীরে তোমার লেখা অবশ্যই উন্নতি লাভ করবে ইনশাআলাহ।

---

১। আল্লাহর শোকর পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা এই চিন্তা দান করলেন যে, সৃষ্টিজগতে আল্লাহ তা'আলার যে অসংখ্য নেয়ামত আছে প্রতিটি নেয়ামত সম্পর্কে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে একটি লেখা হতে পারে। এই চিন্তা থেকেই পুষ্পের প্রতিসংখ্যায় কিশোর পাতায় একটি করে লেখা প্রকাশিত হচ্ছে, যথা, ছায়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা, ফুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা, মাটির প্রতি কৃতজ্ঞতা, নদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি।

# দশম অধ্যায়ঃ রোযনামচা লেখা

লেখা শেখার ক্ষেত্রে রোযনামচা লেখার ভূমিকা অপরিসীম। রোযনামচা
লেখা মনে নিজের অজ্ঞাতেই লেখক হয়ে ওঠা।
তো রোযনামচা আসলে কী? রোযনামচা কেন লিখবো?
কীভাবে লিখবো?
বর্তমান অধ্যায়ে এ সম্পর্কে
আলোচনা করো হয়েছে।

# রোযনামচা কী, কেন ও কীভাবে?

একটি কথা আমি অনেকবার অনেকভাবে বলেছি, কিন্তু খুব কম 'ছেলে-মেয়ে' তা গ্রহণ করেছে এবং আরো কম 'ছেলে-মেয়ে' তা পালন করেছে। কথাটি আজ এখানে আবার বলছি। বলছি, কারণ এর মাধ্যমে আমি আমার জীবনে অপরিসীম সুফল লাভ করেছি। আমি চাই না, এর সুফল থেকে পুষ্পের কোন বন্ধু বঞ্চিত থাকুক।

যদি তুমি লেখা শিখতে চাও এবং ভবিষ্যতে একজন বড় লেখক হতে চাও, যদি তুমি সাহিত্য অর্জন করতে চাও এবং আগামী দিনের 'সাহিত্যরত্ন' হতে চাও তাহলে নিয়মিত রোযনামচা লেখাই হলো এর সহজতম উপায়।

রোযনামচা মানে ডায়রী। তো রোযনামচা বা ডায়রী লেখার অর্থ কী? এক কথায় এর অর্থ হলো, তোমার জীবনে এবং তোমার চারপাশের পরিবেশে প্রতিদিন যা কিছু ঘটে, তুমি প্রতিদিন যা কিছু করো, যা কিছু দেখো, যা কিছু শোনো এবং যা কিছু চিন্তা করো সেগুলোর কিছু কিছু সেই দিনের সন-তারিখসহ খাতার পাতায় (কিংবা বাজার থেকে সংগ্রহ করা ডায়রীর পাতায়) লিখে রাখা। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ঘটনা, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনা, এমনকি আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীও নিজের চিন্তা-ভাবনা ও অনুভব-অনুভূতির আলোকে লেখা যেতে পারে। এভাবে একজন মানুষের ডায়রীর পাতাগুলো হয়ে ওঠে তার হারিয়ে যাওয়া অতীত জীবনের সাক্ষী। অনেক বছর পর মানুষ যখন অতীতের ডায়রী খুলে দেখে তখন নিজেই সে অবাক হয়ে যায়।

সুখ-দুঃখের, হাসি-আনন্দের কত বিচিত্র ঘটনা! বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা ও অনুভব-অনুভূতির কী আশ্চর্য প্রকাশ, যার অধিকাংশই হয়ত হারিয়ে গেছে স্মৃতির পাতা থেকে, কিন্তু রোযনামচার পাতা বিশ্বস্ত বন্ধুর মত ধরে রেখেছে তার হারিয়ে যাওয়া অতীত জীবনকে।

আমার শৈশবের রোযনামচার খাতাগুলো ছিলো আমার কাছে। আমার স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েছিলাম ভবিষ্যতের আমানত হিসাবে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা, আটাশির

বন্যায় সব নষ্ট হয়ে গেছে। যদি সেগুলো রক্ষা করা যেতো, অন্যকারো জন্য না হোক, আমার জন্য হতো অনেক মূল্যবান সম্পদ। সেগুলোর পাতায় আমি খুঁজে পেতাম আমার হারিয়ে যাওয়া শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের বহু দিনের বহু স্মৃতি। কিন্তু তাই হয়েছে যা আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন, তবে আল্লাহর শোকর, সেই বন্যার থাবা থেকে খুবই আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে গেছে আমার উনিশশ' আশি সনের ডায়রীটি।

আশি সন মানে কিন্তু আজ থেকে ত্রিশবছর আগের ডায়রী। তো সেই ডায়রীর পাতাগুলো যখন খুলে দেখি তখন একবার অবাক হয়ে ভাবি, আচ্ছা! এমন সুন্দর ঘটনাও আমার জীবনে ঘটেছিলো একসময়! এত সুন্দর চিন্তাও আমি করেছিলাম একসময়! তখন আল্লাহর শোকর আদায় করি। আবার কখনো লজ্জা ও অনুতাপের সাথে ভাবি, ছি! এমন কাজও করেছিলাম একদিন! এমন অসুন্দর, অসুস্থ চিন্তাও এসেছিলো আমার মনে! তখন তাওবা-ইস্তিগফার করি এবং সামনের জন্য সতর্ক হই।

তবে আমার দৃষ্টিতে ডায়রী লেখার যেটা সবচে' বড় পাওনা সেটা এই যে, নিজের অজান্তেই একদিন দেখবে, তোমার লেখার হাত বেশ শক্তিশালী এবং তোমার কলম যথেষ্ট পরিপক্ক হয়ে উঠেছে। যে কোন ঘটনা এবং যে কোন চিন্তা তুমি স্বচ্ছন্দে ও সাবলীলভাবে প্রকাশ করতে পারছো।

মোটকথা, শৈশব থেকে নিয়মিত রোযনামচা লেখার অভ্যাস একদিকে যেমন সুস্থ চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটায়, জীবন গড়ার উদ্যম, উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা যোগায়, তেমনি অন্যদিকে তা ভবিষ্যত জীবনে সফল লেখক হওয়ার মযবূত ভিত্তি তৈরী করে দেয়।

এজন্যই দেখা যায়, মুসলিম-অমুসলিম বহু মনীষী ও কবি-সাহিত্যিক শৈশব থেকে রোযনামচা লেখার অভ্যাস করেছেন, এমনকি তাদের অনেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রোযনামচা লিখে গেছেন নব্বই বছর বয়সে মৃত্যুর মাত্র একঘণ্টা আগে কাঁপা কাঁপা হাতে (তথ্যটা যেখান থেকে সংগ্রহ করেছি সেখানে অবশ্য কাঁপা কাঁপা হাতে লেখার কথা নেই কিন্তু কাঁপা কাঁপা হাত থেকে যে দৃশ্যটি কল্পনায় আসে তা তো হৃদয়কে খুব নাড়া দেয়, তাই না! তাই আমি নিজের থেকে এটি যোগ করেছি। এবং আশা করি, তা অবাস্তবও নয় এ কৌশলও একজন লেখককে জানতে হয় এবং সতর্কতার সঙ্গে তা প্রয়োগ করতে হয়) রোযনামচা লেখার ইতিহাসও আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এ ধরনের বহু বিখ্যাত রোযনামচা বই আকারেও প্রকাশিত হয়েছে মানুষ নিজের জীবনে শিক্ষা ও চিন্তার খোরাক লাভের জন্য যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে সেগুলো পাঠ করে থাকে

এটা অবশ্য ঠিক যে, বিখ্যাত ব্যক্তিদের শৈশব ও কৈশোরের লেখা রোযনামচা

ছাপার অক্ষরে তেমন একটা প্রকাশিত হয়নি। কারণ ঐ শিশু বা কিশোর নিজেও জানতেন না যে, তিনি হতে যাচ্ছেন আগামী দিনের বিখ্যাত কোন ব্যক্তি। এই তুচ্ছ ও সামান্য লেখাগুলোই একদিন হতে পারে অনেক মূল্যবান সম্পদ। তিনি নিজেও তা জানতেন না, আর তার চারপাশের কেউ তো জানতোই না। তাই তা সংরক্ষণ করার কোন চেষ্টা হয়নি। তবে তোমাদের প্রতি আমার পরামর্শ, তোমরা তোমাদের ছোটকালের ডায়রীগুলো যত্নের সঙ্গে রেখে দিও। কে জানে, হয়ত এগুলো আগামী দিনের কোন বড় আলিমের, বরণীয় কোন লেখক-সাহিত্যিকের এবং আল্লাহর রাস্তায় জান কোরবানকারী কোন মুজাহিদের শৈশব। হয়ত রোযনামচার পাতায় ধরে রাখা এ শৈশব ও কৈশোরই হবে আগামীদিনের শিশু-কিশোরদের জন্য সুন্দর জীবন গড়ার উপাদান।

আবার অনেক দূর চলে গিয়েছি, না! এটা আমার বড় দুর্বলতা, তবে আগেও বলেছি, হয়ত কল্যাণজনক দুর্বলতা। যাক আগের কথায় ফিরে আসি। বলছিলাম বড়দের ছোট বেলার রোযনামচা তেমন একটা সংরক্ষিত হয়নি। তবে তোমাদেরই বয়সের একটি মেয়ে, এই ধরো মৃত্যুর সময় যার বয়স হয়েছিলো মাত্র তের বছর, তার নাকি নিয়মিত রোযনামচা লেখার অভ্যাস ছিলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারবাহিনীর হাত থেকে জীবনরক্ষার জন্য কয়েকটি পরিবারের সাথে আত্মগোপন করা এই মেয়েটি যে রোযনামচা লিখেছিলো তা সারা দুনিয়ায় রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।১

আশ্চর্য! মাত্র তের বছরের একটি মেয়ে, প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর আশঙ্কার মধ্যে বাস করেও রোযনামচা লেখার কথা ভুলেনি! প্রতিদিনের বিভিন্ন মর্মস্পর্শী ঘটনা এবং মনের বিচিত্র চিন্তা-ভাবনা ও অনুভব-অনুভূতি সবার অগোচরে রোযনামচার পাতায় সে লিখে রাখতো। একান্ত নিরালায় বসে মানুষ যেমন প্রাণের বন্ধুর সাথে মনের সব গোপন কথা অকপটে খুলে বলে ঠিক তেমনি সে প্রতিদিনের সব ঘটনা, সব চিন্তা-ভাবনা লিখে যেতো, যেন প্রাণের বান্ধবীকে মনের কথা বলছে।

একবছর পর যখন সে শত্রুদের হাতে নিহত হয়, তখন তার রোযনামচাটি, আশ্চর্য! শত্রুর নযর এড়িয়ে যায়। পরবর্তীকালে তার বাবা প্রাণপ্রিয় কন্যার স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে রোযনামচাটি প্রকাশ করেন। আর এই একটি মাত্র রোযনামচা তের বছরের এক কিশোরীকে জগৎ-জোড়া খ্যাতি এনে দেয়।২ পৃথিবীর কত ভাষায় যে তার অনুবাদ হয়েছে, হিসাব নেই। বাংলা অনুবাদও পাওয়া যায়, তবে আমি আমার ছেলে ও ছাত্রদের তা পড়তে বলি না। আমি শুধু বলি, এখান থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাটুকু গ্রহণ করতে। রোযনামচাটি পড়ে সমালোচকরা মন্তব্য করেছেন, মেয়েটি যদি বেঁচে থাকতো, পৃথিবীর একজন সেরা লেখিকা হতে পারতো।

তুমি যদি তোমার আজকের জীবনকে অতীতের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে চাও এবং নিজের চিন্তা-চেতনার উৎকর্ষ সাধন করতে চাও, সর্বোপরি যদি ভবিষ্যতে একজন শক্তিশালী লেখক হতে চাও, কিংবা তোমাদের ভাষায় হতে চাও 'কলমসৈনিক' তাহলে এখন থেকে নিয়মিত রোযনামচা লেখা শুরু করো।

পিছনে বারবার বলা সেই কথাটাই এখানে আবার বলবো, তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে যেভাবে কথা বলো, গল্প করো ঠিক সেভাবে তোমার রোযনামচা বন্ধুর সঙ্গে মুখের জিহ্বার পরিবর্তে কলমের জিহ্বার সাহায্যে কথা বলে যাও। তুমি কিছু লিখতে বসেছো এবং লেখাটা কেমন হচ্ছে, এসব মোটেই ভাবতে যেয়ো না। সুন্দর সুন্দর শব্দ, বা বাক্য খুঁজতে যেয়ো না; অনর্গল শুধু লিখে যাও, হোক না তা কাকের ছা', বকের ছা'! আসল কথা হলো, অবিচল প্রতিজ্ঞা নিয়ে আজই শুরু করে দাও।

দেখো কাণ্ড! লেখাটা শেষও করতে পারিনি, একছাত্র এসে হাযির! ছেলেটি বেশ দুষ্ট ও চঞ্চল, তবু তাকে আমি ভালোবাসি এজন্য যে, সে নিয়মিত রোযনামচা লেখে এবং মাঝে মধ্যে আমাকে দেখায়; আমি দেখে দেই এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে সাহায্য করি। এখন এসেছে আজকের রোযনামচাটা দেখাতে। আমার ভালো লেগেছে, তাই নীচে ছাপার অক্ষরে তুলে ধরলাম, পড়ে দেখো এবং তুমিও এভাবে লিখতে চেষ্টা করো।

### *সেই মেয়েটির মৃত্যু হলো*

১৭ই অগাস্ট ১৯৯৯ খৃ.

প্রথম বছর আমাদের মাদরাসার ছাত্রসংখ্যা যখন মাত্র তিনজন, তখন থেকে যে স্ত্রীলোকটি পরম যত্নের সঙ্গে তালিবুল ইলমদের খাবার রান্না করে দিতো, তার বোবা মেয়েটি অনেক দিন রোগযন্ত্রণা ভোগ করে আজ মারা গেলো। আছরের সময় আমরা জানাযা পড়লাম। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন)

মাদরাসা থেকে কিছুটা দূরে এক বস্তিতে মা ও মেয়ে থাকতো। তার বাবাও পঙ্গু অসহায়। বস্তির দুস্থ একটা মেয়ে মরা যাবে, তাতে পৃথিবীর কী এমন ক্ষতি! ওরা বরং যত মরে তত ভালো। বেঁচে থাকলে তো বস্তি-উচ্ছেদ করে শহরের সৌন্দর্য রক্ষা করতে হয়। কামাল সাহেবের মত 'গরীবদরদীর' তাতে [illegible] মামলার ঝামেলা বাঁধায়। তার চেয়ে অসুখে, অনাহারে, মহামারীতে এমনিতেই যদি মরে সাফ হয়ে যায় তাতে আপদ দূর হয়। [illegible] সব আপদ দূর হয়।)

পৃথিবীর যত ক্ষতি [illegible] বরং রাজনীতির মহামারী [illegible]

অবস্থা যখন খুবই খারাপ তখন মেয়েটিকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছিলো। বস্তি-বাসিনীর হাসপাতালে আসার 'শখ' দেখে ডাক্তার 'ছাহেবান' একেবারে তাজ্জব বনে গিয়েছিলেন। তাই হাসপাতালের দোরগোড়া থেকেই বিদায় করে দিয়েছেন। মাদরাসার পক্ষ থেকে মেয়েটির চিকিৎসার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করা হয়েছিলো, কিন্তু মেয়েটি বাঁচেনি।

মানুষের কাছে দাম না থাকলেও আল্লাহর কাছে হয়ত তার অনেক দাম ছিলো। তাই দেড়শ' তালিবে ইলম তার জানাযায় শরীক হয়েছে এবং কোরআন খতম করে দু'আ করেছে। দুনিয়াতে 'বড়লোকদের' ক'জনের ভাগ্যে তা ঘটে ('ঘটে'-এর পরিবর্তে 'জোটে' হলে ভালো হতো।)

শুনেছি মেয়েটি তার মায়ের সাথে মাদরাসার মাতবাখে বাসন মেজে দিতো। মৃত্যুর আগে বোবা মেয়েটি হাতের ইশারায় নাকি বলেছে, আমি আল্লাহর কাছে চলে যাবো, আমার জন্য দু'আ করো।

দ্বীনের ঘর মাদরাসার সাথে সামান্য একটু সম্পর্কের কত সৌভাগ্য! তাহলে যারা তালিবে ইলম তাদের কত সৌভাগ্য হবে! কিন্তু আমরা কি নিজেদের মর্যাদা বুঝতে পারি? মেয়েটিকে আল্লাহ জান্নাত নছীব করুন, আমীন।

**মুহম্মদ ফয়যুল্লাহ**
৪র্থ বর্ষ, মাদরাসাতুল মাদীনাহ

### *পর্যালোচনা*

মাশাআল্লাহ, কত সুন্দর ও মর্মস্পর্শী রোযনামচা! কবেকার কোন তেরবছরের এক ইহুদি মেয়ের রোযনামচার এত প্রশংসা করছি! এ তো তার চেয়ে সুন্দর, তার চেয়ে মর্মস্পর্শী!

মাদরাসার মাতবাখের সাথে সম্পর্কিত একটি মহিলার কিশোরী মেয়ে অসুখে ভুগে মারা গেছে। ঘটনা তো এখানেই শেষ। কারণ সে তো ছিন্নমূল গরীবের সাধারণ মেয়ে, তার মৃত্যুতে কার কী এসে যায়! কিন্তু মেয়েটির মা যে মাদরাসার তালিবে ইলমদের খাবার রান্না করতো পরম যত্নের সাথে! সেটা এই তালিবে ইলমের মনে দাগ কেটেছে। আবার মেয়েটিও মাতবাখের বাসন মেজে দিতো! তাই তার মৃত্যুর ঘটনা মাদরাসাতুল মদীনাহর তালিবে ইলমদের জন্য সাধারণ ঘটনা নয়। একারণেই তার রোযনামচায় এ ঘটনা এত গুরুত্ব লাভ করেছে।

মেয়েটির মৃত্যুর কথা লেখার ফাঁকে ফাঁকে দেখো, ধনী-গরীবের জীবনের বৈষম্য, এমনকি মৃত্যুরও বৈষম্যের চিত্র কত সুন্দরভাবে উঠে এসেছে! বস্তির লোকদের প্রতি শহরের ধনী ও অভিজাত লোকদের ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের মনোভাবের দিকেও কেমন তির্যক ইঙ্গিত রয়েছে। আমার এখন পরিষ্কার মনে পড়ছে না, আবছা করে মনে পড়ছে, ড. কামাল হোসেন সে সময় বস্তি নিয়ে কী একটা কাণ্ড যেন

আমাদের দেশের চিকিৎসাব্যবস্থায় গরীব যে কতটা অবহেলার শিকার, তাও দেখো, কত সুন্দরভাবে রোযনামচার লেখায় ফুটে উঠেছে! সবশেষে দেখো, ছেলেটি কত সুন্দর চিন্তা করেছে! নিজেদের আত্মপরিচয় সম্পর্কে তার ভিতরে আত্মজিজ্ঞাসা জাগ্রত হয়েছে। এভাবে ঘটনা ও অনুভূতির মিশ্রণে যে লেখা তৈরী হয় তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হয়।

এত কিছু না হোক, তুমি না হয় সাদামাটা করেই যদ্দুর পারো লেখো। যেমন–

'আমাদের মাদরাসাতুল মাদীনাহর মাতবাখে শুরুর দিকে যে মহিলাটি কাজ করতো, আজ তার কিশোরী মেয়েটি মারা গেছে। অনেক দিন থেকেই সে অসুস্থ ছিলো। মাদরাসার পক্ষ হতে চিকিৎসার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। শেষ দিকে হাসপাতালেও নেয়া হয়েছিলো, কিন্তু ডাক্তাররা চিকিৎসা না দিয়েই তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত মেয়েটি মারা গেছে।

আজ আছরের পর মেয়েটির জানাযা হয়েছে। মাদরাসার ছাত্র-উস্তায সকলে জানাযায় শরীক হয়েছে এবং পরে মাদরাসায় কোরআন খতমের পর বিশেষ দু'আ হয়েছে। মেয়েটিকে আল্লাহ জান্নাত নছীব করুন, আমীন।'

এটা হলো নিছক বিবরণমূলক রোযনামচা লেখার নমুনা। এভাবেও রোযনামচা লেখা যেতে পারে।

এটা আরো সংক্ষিপ্তও হতে পারে। যেমন–

'আজ একটি মেয়ের জানাযা পড়লাম। শুরুতে আমাদের মাদরাসার মাতবাখে যে বুয়া কাজ করতো তার মেয়ে। কঠিন অসুখে ভুগে মেয়েটি মারা গেছে। মেয়েটির জন্য আমার খুব মায়া হলো। মেয়েটির জন্য আজ এশার পরে কোরআন খতম ও বিশেষ মুনাজাত হয়েছে।'

এক কাজ করো না! তুমিও তোমার রোযনামচার খাতা থেকে নির্বাচিত কয়েকটি পাতা পুষ্পের জন্য পাঠাও না! প্রয়োজনীয় পরিমার্জনের পর পুষ্পে প্রকাশিত হলে তুমিও উৎসাহ পাবে, পুষ্পের বন্ধুরাও উপকৃত হবে! আমি কিন্তু এখন থেকেই তোমাদের সুন্দর সুন্দর রোযনামচার অপেক্ষায় থাকলাম! তোমরা সবাই ভালো থেকো।

---

১। হিটলার আজ ইতিহাসের সবচে' ঘৃণিত চরিত্রদের একজন। অথচ উভয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী ও পরাজিত নায়করা সকলেই ছিলেন প্রায় অভিন্ন চরিত্রের। কিন্তু সব অপরাধের বড় অপরাধ হলো পরাজয় বরণ করা। আর হিটলার সেই অপরাধ করেছিলেন। একই অপরাধ ছিলো উছমানি খেলাফতের!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা জয়ী হয়েছিলো, আর জাপান হয়েছিলো পরাজিত। তাই ইতিহাস এখন বলে, আমেরিকা নাগাসাকি ও হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা ফেলেছিলো যুদ্ধকে সংক্ষিপ্ত করে বহু মানুষের প্রাণ রক্ষা করার 'মহান' উদ্দেশ্যে, আর জাপান

পারমাণবিক বোমানিক্ষেপকে অনিবার্য করে তুলেছিলো। জার্মানি দু'টুকরো এবং উছমানী খেলাফত টুকরো টুকরো হয়েছিলো একই অপরাধে। জার্মানীর অপরাধ অবশ্য মাফ হয়ে গেছে এবং টুকরো দু'টো জোড়া লেগে গেছে। কিন্তু উছমানি খেলাফত!)

২। এখানেও কাজ করেছে জয়-পরাজয়ের সেই একই তত্ত্ব। কিশোরীটির ভাগ্য ভালো যে, সে ছিলো ইহুদী এবং হিটলার বাহিনীর নির্যাতনের শিকার। তার মত বহু কিশোর-কিশোরী নিহত হয়েছে মিত্রবাহিনীর 'দয়ালু' সৈনিকদের হাতেও এবং তাদের দু'একজন কাঁচা হাতে সে নির্যাতনের লোমহর্ষক কাহিনী লিখেও গিয়েছিলো। কিন্তু পরাজিতের আর্তনাদ কে শোনে! আফগানিস্তানের একটি মেয়ের মর্মস্পর্শী একটি রোযনামচার কয়েকটি পাতা নাকি সম্প্রতি প্রচারিত হয়েছে ইন্টারনেটে। কিন্তু বিশ্বমিডিয়ার বিশ্বব্যাপী আঁধার সেটিকে ঢেকে রেখেছে। যদি সম্ভব হয়, আফগানিস্তানের সেই হতভাগ্য মেয়েটির রোযনামচার পাতাগুলো পুষ্পের বন্ধুদের আমি উপহার দিতে চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ।

# হাতে-কলমে রোযনামচা

ইচ্ছে ছিলো এবারও শব্দের সঠিক প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করবো, কিন্তু এর মধ্যে দেখা দিয়েছে রোযনামচার সমস্যা। বেশ কিছু চিঠিতে তোমরা জানতে চেয়েছো রোযনামচা লেখার নিয়ম-কানুন। তোমরা নাকি রোযনামচা লিখতে চাও, কিন্তু বুঝতে পারো না, কী লিখবে এবং কীভাবে লিখবে। আচ্ছা মুশকিল তো! রোযনামচা লেখার আলাদা নিয়ম-কানুন আমি আবার কোত্থেকে জোগাড় করবো! একটা কথা এতবার বলেছি যে, আর বলতে ইচ্ছে করে না। তুমি তোমার বন্ধুর সঙ্গে বসে এই যে গল্প করো, বিভিন্ন বিষয়ে, বিভিন্ন প্রসঙ্গে। কখনো শোনাও তোমার নিজের ঘটনা, কখনো পথে দেখা ঘটনা; কখনো তাকে বলো তোমার আগামী দিনের স্বপ্নের কথা; কখনো বলো কারো কাছ থেকে পাওয়া কষ্টের কথা, কখনো জানাও কোন বিষয়ে নিজের অনুভব অনুভূতির কথা; ইত্যাদি। তো এগুলো কে তোমাকে শিখিয়ে দেয়? কেউ না। বন্ধুর সঙ্গে কথা বলা, গল্প করা শেখাতে হয় না। নিজে নিজেই সবাই শিখে যায়, বলা ভালো, নিজে নিজেই এসে যায়। তো রোযনামচাকে মনে করো না, তোমার প্রিয় বন্ধু! তুলে ধরো না, তোমার মনের যত কথা সেই বন্ধুর কাছে!

যাক, বারবার বলা সেই কথা আবার বলে কী আর হবে! তোমরা শোনবে এবং ভুলে যাবে। তার চেয়ে চলো এককাজ করি, এবার না হয় চেষ্টা করি, হাতে কলমে রোযনামচা লেখার কায়দা শিখিয়ে দিতে। তারপর দেখি, নতুন কী বাহানা খুঁজে বের করো!

আচ্ছা ধরো, আজ হলো ১৭ই যিলকাদ, রোয রোববার। তোমার কপালে এই তারিখটা লিখে দিলাম, কারণ তুমি হলে আমার রোযনামচার খাতা! রাতে ঘুমোবার আগে তোমাকে নিয়ে বসলাম। তোমাকে আমার আজকের দিনের কিছু কথা শোনাবো। তা কী কথা শোনানো যায়! সকালে নাস্তা করেছি পোড়া মরিচ দিয়ে পান্তা ভাত! বাজারে গিয়েছিলাম মাছ-তরকারী কিনতে! দুপুরে গোসল

করেছি পুকুরে সাঁতার কেটে! বিকালে চাচাত ভাই রাসেলের সঙ্গে সময় কাটিয়েছি গল্পগুজব করে! হতে পারে, এসব কথা হতে পারে তোমার সঙ্গে। এমনকি আছর পর্যন্ত যে লম্বা একটা ঘুম দিয়েছি তাও বলতে পারি তোমাকে, কিংবা মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত সবক ইয়াদ করেছি এবং আগামী দিনের পড়া দেখেছি। এশার পরে পুষ্প পড়েছি, অমুক লেখাটা ভালো লেগেছে, তমুক লেখাটা ভালো লাগেনি, এ ধরনের আরো অনেক কথা বলতে পারি। এই ছোট ছোট কথাগুলো একত্র হলেই মোটামুটি একটি রোযনামচা হয়ে যেতে পারে। আবার আজকের পত্রিকায় সবচে' গুরুত্বপূর্ণ যে খবরটা ছিলো তাও শোনাতে পারি। এভাবে একটানা গড় গড় করে এত কথা বলতে পারি যে, তোমার বিরক্তি ধরে যাবে, কিংবা ক্লান্ত হয়ে তুমি ঘুমিয়েই পড়বে, আর আমি কলম দিয়ে তোমার পেটে খোঁচা দিয়ে বলতে পারি, কিরে রোযনামচা দোস্ত! এত জলদি ঘুমিয়ে পড়লি! তুমি হয়ত ঢুলু ঢুলু চোখে বলবে, না দোস্ত! শুনছি, বলে যা!

আমি বলবো, নারে, আজ আর জমছে না, থাক আমিও ঘুমিয়ে পড়ি এবং কলমটা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

হুবহু এটাই হতে পারে তোমার রোযনামচা, যদিও খুব সাদামাটা। তবু এভাবে লিখতে লিখতে লেখার অভ্যাস তৈরী হয়ে যাবে এবং ধীরে ধীরে লেখার উৎকর্ষও সাধিত হবে।

***

একদিনের রোযনামচায় সংক্ষেপে সংক্ষেপে অনেকগুলো বিষয়ের উল্লেখ যেমন থাকতে পারে। তেমনি থাকতে পারে শুধু কোন একটি ঘটনার বিশদ উল্লেখ। বুঝতে পারলে না, এসো এটাও তাহলে হাতে কলমে দেখাই।

ধরো, শুধু সকালের নাস্তার প্রসঙ্গটাই হতে পারে আজকের রোযনামচার একমাত্র বিষয়। তুমি তো আমার 'রোযনামচা-দোস্ত'! তো তোমাকে আমি আজকের নাস্তার গল্পটা এভাবে শোনাতে পারি–

'দোস্ত, আজকের নাস্তাটা খুব মজাদার হয়েছিলো রে! আলুপরাটা তো আমার খুব প্রিয়। অন্যদিন দুটো রুটি খাই, আজ খেলাম তিনটা। ইচ্ছে করছিলো আরেকটা খাই, বললে আম্মু হয়ত আরেকটা ভেজে দিতেন। কিন্তু লোভটা সামলে নিলাম।'

এপর্যন্ত এসে শেষ হতে পারে আমার কথা। আবার ইচ্ছে করলে এখানে এরকম একটি মন্তব্য যোগ করতে পারি– 'আসলে জিহ্বার চাহিদা পুরা করাটা সহজ, কিন্তু লোভ সম্বরণ করাটা কঠিন। যারা লোভ সম্বরণ করতে পারে তারা ভালো মানুষ। আমি হয়ত আজ একটু ভালো মানুষ হতে চেয়েছিলাম। (কিরে, হাসলি যে!)

দেখো, এই মন্তব্যটুকুর কারণে আলুপরাটার নাস্তা প্রসঙ্গে লেখা তুচ্ছ রোযনামচা

কত সুন্দর একটি শিক্ষার বিষয় হয়ে গেলো!

আচ্ছা, সত্যি যদি আমার সকালের নাস্তা হয়ে থাকে পোড়া মরিচ দিয়ে পান্তা ভাত তাহলে আমি লিখতে পারি–

'আজ নাস্তার অন্য কোন ব্যবস্থা ছিলো না, ছিলো শুধু পান্তাভাত। তাই একটা পোড়া মরিচ ডলা দিয়ে দু'লোকমা পান্তা মুখে দিয়ে মাদরাসায় গেলাম।'

এতটুকু হলো ঘটনা। এখন আমার ভিতরে যদি শোকরের জাযবা থাকে তাহলে লিখতে পারি, 'তবু তো আমার কিসমতে পান্তাভাত জুটেছে, আল্লাহর শোকর! কত মানুষের হয়ত এতটুকুও জুটেনি।'

দেখো তো, পান্তার নাস্তা এখন কত মূল্যবান হয়ে গেলো! পঞ্চাশ বছর পরে যদি রোযনামচার এই পাতাটা আমার চোখে পড়ে, তখন আমার অনুভূতি কীরকম হবে! হতে পারে!

**পক্ষান্তরে কারো মনে যদি পান্তা খেয়ে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে সে লিখতে পারে– 'কেন এমন হয়! কারো ভাগ্যে জুটে পান্তাভাত, আর কেউ তিন বেলা খায় ঘী-ভাত! আমরা কেন গরীব হলাম! এটা কি আমাদের ভাগ্য, না ধনীদের শোষণের ফল?'**

**আর যদি আমার অন্তরে মা-বাবার প্রতি দরদব্যথা জেগে থাকে তাহলে লিখতে পারি, 'দু'লোকমা পান্তা আমার মুখে তুলে দিতে মা-বাবাকে কত কষ্ট করতে হয় তা আমি কিছুটা হলেও বুঝতে পারি। হয়ত অনেক সময় তারা নিজেরা অনাহারে থেকে আমাকে ক্ষুধার কষ্ট থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন।'**

**প্রসঙ্গটা আরো সম্প্রসারিত হতে পারে, যেমন আমি এমন একটি প্রতিজ্ঞা করলাম– 'আমাকে লেখা-পড়া শিখতে হবে। লেখা-পড়া শিখে অনেক বড় হতে হবে। আমার মা-বাবার স্বপ্ন আমাকে পূর্ণ করতে হবে, করতেই হবে। বড় হয়ে আমি তাদের কষ্ট দূর করবো। তাদের মুখে হাসি ফোটাবো'**

আরেকটা বিষয় আমার চিন্তায় আসতে পারে, অনেক ছেলে লেখা-পড়া শিখে বড় হয়ে মা-বাবার কষ্টের কথা ভুলে যায়, নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মা-বাবা আগে যেমন কষ্ট করেছেন, বুড়ো বয়সে আরো বেশী কষ্ট ভোগ করেন। এটা চিন্তা করে আমি তোমার পেটের উপর লিখতে পারি, (হাসছো কেন! তুমি তো আমার রোযনামচা দোস্ত! তোমার পেটের উপর লিখবো না তো কোথায় লিখবো!) হাঁ, আমি লিখতে পারি–

'আমি ঐসব অকৃতজ্ঞ সন্তানের মত হবো না যারা বড় হয়ে মা-বাবার কষ্টের কথা ভুলে যায়। আমি ....।'

দেখো, মরিচ-ডলা পান্তাভাতের নাস্তা থেকে কত সুন্দর চিন্তাসমৃদ্ধ রোযনামচা হয়ে

সব বাদ দাও, অভাব-টভাব কিচ্ছু না, আসলে পান্তাভাত তোমার প্রিয়, তাই পান্তা খেয়েছো! তাহলে তুমি মজা করে এভাবে লিখতে পারো, 'বলিসনে দোস্ত! যত রকম নাস্তাই তৈরী হোক, একটা মরিচ পোড়া, আর একবাসন পান্তা হলে আমার আর কিচ্ছু চাই না। আসলে মরিচ ডলে পান্তা খাওয়ার স্বাদই আলাদা! সবাই কি আর তা বোঝে! পান্তার স্বাদ বুঝতে হলে চাই আমার মত জিহ্বা!

বাদ দাও নাস্তা প্রসঙ্গ। বাজারে গিয়েছিলে না! সেটাই না হয় লেখো (ঐ দেখো, রোযনামচা তো ছিলো আমার, কোন ফাঁকে যেন হয়ে গেলো তোমার, আচ্ছা চলো, তুমি তোমার বাজারে যাওয়ার কথা এভাবে লিখতে পারো)–

'মাদরাসার বিরতিতে (ছুটিতে নয়) বাড়িতে এসেছি দু'দিন হলো। আম্মা পাঠালেন বাজারে। মাছ কিনতে হবে, আর তরিতরকারী। আমি খেতে পারি খুব ভালো, পারি না শুধু বাজার করতে। আম্মু বললেন, শিখতে হবে তো! তাই বলা যায় বাজার করা শিখতে গেলাম।'

এখানেই শেষ হতে পারে তোমার রোযনামচা। আবার ইচ্ছে করলে প্রসঙ্গটা সম্প্রসারিত করতে পারো এভাবে, 'বাজার করা আচ্ছা রকম শিখে এলাম। মাছ দেখে আম্মা বললেন, এমন পঁচা মাছ আনলি কী করে!

পচা! মাছওয়ালা যে 'কানখা' দেখিয়ে বললো, একদম টাটকা!

লাউশাকটা অবশ্য ছিলো কচি এবং তাজা, তবে আম্মা বললেন, দাম নাকি নিয়েছে দ্বিগুণ!'

এখানে বাজার করার বিষয়ে তোমার আনাড়িপনার দিকটি প্রাধান্যে এসেছে। যদি তুমি বাজারপরিস্থিতি প্রসঙ্গে লিখতে চাও তাহলে লিখতে পারো– 'কিন্তু বাজারে গিয়ে তো আমি দিশেহারা! সবকিছু যেন আগুন। মাছের দোকানে একে তো মাছ নেই, তার উপর দাম আকাশ-ছোঁয়া। আকাশ-ছোঁয়া মানে বুঝলি না! মানে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার অনেক উপরে! সীমিত আয়ের লোক যারা তাদের এখন মাছ কেনার সাধ্য নেই। মাছে-ভাতে বাঙ্গালীকে এখন মাছের কথা ভুলেই যেতে হবে দেখা যাচ্ছে।

তরিতরকারি অবশ্য আছে, কিন্তু ছোট্ট একটা লাউ, দাম পঞ্চাশ টাকা!'

এখানেই শেষ হতে পারে, আবার ইচ্ছে করলে লিখতে পারো, 'এক সময় এমন অবস্থা ছিলো না, বাজারে প্রচুর মাছ উঠতো, তরিতরকারি বোঝাই থাকতো। দামও ছিলো কম। সীমিত আয়ের লোকেরাও মোটামুটি বাজার করে খেতে পারতো। যাদের হাতে অঢেল টাকা আছে তাদের অবশ্য কোন সমস্যা নেই। কিন্তু চৌদ্দ কোটি মানুষের দেশে এমন মানুষের সংখ্যা কত?'

তুমি যদি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিচার করতে চাও তাহলে লিখতে পারো, 'কেন জিনিসপত্রের এত অভাব? কেন এই অগ্নিমূল্য? বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন কারণ

বলে, কিন্তু আসল কারণ হলো, সবই আমাদের কর্মফল। মানুষের নাফরমানি ও পাপাচারের কারণে বরকত উঠে গেছে। যতদিন আমাদের আমল ঠিক না হবে অভাব দূর হবে না, যত চেষ্টাই করা হোক অভাব শুধু বাড়তেই থাকবে।'

অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে তুমি এভাবে লিখতে পারো– আম্মা আমাকে পাঠিয়েছিলেন বাজার করা শিখতে, কিন্তু আমি আজ এমন এক শিক্ষা পেলাম যা বহু কিতাব পড়ে এবং অনেক উপদেশ নছীহত শুনেও শেখা হতো না। একদিনের বাজার করা থেকেই আমি বুঝে নিয়েছি, জীবন কত কঠিন! আব্বাকে তো বাজার করতে হয় এবং বাজারের পয়সাটা উপার্জনও করতে হয়!

কখনো কি ভেবেছি, কীভাবে আসে আমার দস্তরখানে প্রতিদিনের খাবার! আজ রান্না ঘরে আম্মাকে দেখে এবং অফিস থেকে ফিরে আসা আব্বার দিকে তাকিয়ে আমার খুব মায়া হলো। কোরআনের শেখানো দু'আটি পড়লাম, রাব্বির হাম হুমা কামা...।

দেখো, সামান্য একটা বাজার করার প্রসঙ্গ থেকে কতকিছু ভাবা যায় এবং কতভাবে তা লেখা যায়!

আবার ধরো বাজারের ভিতরে, কিংবা বাজারে যাওয়া আসার পথে বিশেষ কোন ঘটনা যদি তোমার নযরে পড়ে থাকে তাহলে শুধু সেটাই লিখতে পারো। চোর ধরা পড়েছে এবং এখনকার ভাষায় খুব করে 'গণধোলাই' হয়েছে। তো তুমি এ ঘটনাটাই লেখো। শুধু ঘটনা লেখো, একটু বিছিয়ে ছড়িয়ে। কি চুরি করেছিলো, কীভাবে ধরা পড়লো, চোরটা দেখতে কেমন। বয়স্ক না অল্প বয়স্ক, মার খেয়ে চোরটা কী হালাত হলো। তারপর কি তাকে ছেড়ে দেয়া হলো না পুলিশে দেয়া হলো, ইত্যাদি।

আবার মূল ঘটনাটা অতি সংক্ষিপ্ত করে তুমি তোমার প্রতিক্রিয়া উল্লেখ করতে পারো। চোরের প্রতি তোমার সহানুভূতির উদ্রেক হলে তুমি লিখতে পারো– এভাবে নিজের হাতে আইন তুলে নেয়া ঠিক নয়। এটা এক ধরনের হিংস্রতা! যে কোন অজুহাতে মানুষ যে কত হিংস্র হতে পারে তা তুমি তুলে ধরতে পারো।

আবার মূল ঘটনাটার প্রতি তোমার সন্দেহের কথা বলতে পারো, কারণ অনেক সময় এমনও হয় যে, প্রমাণ ছাড়া নিছক সন্দেহবশে নিরপরাধের উপর সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এভাবেও লিখতে পারো যে, হয়ত লোকটি অভাবের তাড়নায় চুরি করতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু সামাজের উঁচু তলায় যাদের বাস, যারা লাখ লাখ নয়, দেশের কোটি কোটি টাকা চুরি করে তাদের তো কোন সাজা হয় না, বরং এই লোকেরাই তাদের গলায় ফুলের মালা দেয়, তারাই হয় সমাজের নেতা, দেশের হর্তাকর্তা, ইত্যাদি।

মাত্র তো বাজার করা হলো, এর পর আছে দুপুরে পুকুরে সাঁতার কেটে গোসল করা। তো শুধু এটাই হতে পারে তোমার আজকের রোযনামচা। যেমন–

মাদরাসায় কলের পানিতে গোসল করা, গোসলের সময় পানি চলে যাওয়া, পানির অভাবে গোসল করতে না পারা, এগুলো উল্লেখ করে লিখতে পারো, বাড়ি এলে পুকুরে সাঁতার কেটে গোসল করার কী আনন্দ! স্বাস্থ্যের জন্য সাঁতারের উপকারিতা সম্পর্কেও কিছু লিখতে পারো। শহরের মানুষ যে সাঁতার জানে না, পুকুরে নামতে ভয় পায়, সে প্রসঙ্গও আসতে পারে। অনেক কিছুই আসতে পারে, তুমি যদি আনতে চাও।

আজকের সবঘটনা বাদ দিয়ে শুধু চাচাত ভাই রাসেলের সঙ্গে সময় কাটানো সম্পর্কেই লিখবে! লেখো –

'রাসেলের সঙ্গে অনেক দিন পর দেখা হলো। ও আমার চাচাত ভাই। এক সময় দু'জনে অনেক ভাব ছিলো। ও শহরের মাদরাসায় চলে যাওয়ার পর অবশ্য সম্পর্কটা অনেক শিথিল হয়ে গেছে। তবু আজ ওর সঙ্গে খুব সুন্দর কিছু সময় কাটলো।'

এখানেই শেষ হতে পারে। আবার আরো কিছু দূর অগ্রসর হতে পারে। যেমন, কী কী বিষয়ে গল্প হলো, লিখতে পারো, সংক্ষেপে, অথবা কিছুটা বিশদ। তোমারও কি ইচ্ছা করে শহরের মাদারাসায় লেখাপড়া করতে? কেন ইচ্ছে করে, কিংবা কেন ইচ্ছে করে না, লিখতে পারো।

রাসেল যদি শহরে গিয়ে অনেক বদলে গিয়ে থাকে, সেটাও বলতে পারো। কী ধরনের পরিবর্তন, ভালো না মন্দ, তা লিখতে পারো, সংক্ষেপে, অথবা কিছুটা বিশদ। যদি সে তোমার সাথে আগের মত আন্তরিক আচরণ না করে থাকে, আর তুমি কষ্ট পেয়ে থাকো তাহলে তা লিখতে পারো এবং মানুষ কীভাবে এত বদলে যায় সে সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করতে পারো।

আচ্ছা, কোন ঘটনা বা কাজের কথাই লিখবে না, শুধু লিখবে ঘুমের কথা! তাও হতে পারে, শুধু ঘুমের কথা দিয়েও মোটাতাজা একটা রোযনামচা হতে পারে। কারণ ঘুমটা তো আর ছোটখাটো কাজ না! তুমি তো জানোই, তালিবে ইলমের ঘুম হলো ইবাদত! লেখো–

'আজ সারাটা বিকাল ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই কাটালাম। সারা শরীর জুড়ে অনেক অবসাদ ছিলো। ঘুম থেকে উঠে অবশ্য নিজেকে বেশ তরতাজা মনে হলো।'

শুধু এইটুকু হতে পারে, আবার শেষে এই মন্তব্যটা জুড়ে দেয়া যেতে পারে ঘুমের কৈফিয়ত হিসাবে– 'আসলে দেহের অবসাদা দূর করার জন্য কখনো একটু বাড়তি ঘুমেরও দরকার হয়। একটু ঘুমিয়ে নিলে পরে সতেজ শরীরে অনেক কাজ করা [illegible]।'

আর যদি মনে করো, সময়ের অপচয় হয়েছে তাহলে এভাবে আফসোস প্রকাশ করো, 'আজ সারাটা বিকাল বরবাদ হয়ে গেলো ঘুমের মধ্য দিয়ে। আসলে ঘুমের ঘোরে যে সময়টা চলে যায় সেটা জীবন থেকেই হারিয়ে যায়। এখন খুব আফসোস হচ্ছে জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া আজকের বিকেলটার জন্য।'

এ পর্যন্ত থাক, কিংবা মন্তব্য লিখতে পারো– 'স্বাভাবিক নিয়মে আমরা প্রতিদিন যে পরিমাণ ঘুমাই তাতেই আমাদের জীবনের প্রায় তিনভাগের একভাগ চলে যায় ঘুমের মধ্যে। তার সঙ্গে যদি যোগ হয় এরকম সময়-অসময়ের ঘুম!'

গেলো ঘুম, এবার পড়া। শুধু মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত পড়া সম্পর্কে লিখবে আজকের রোযনামচা! ভালো কথা; শুধু ঘটনা লিখবে? লেখো–

'মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত এখন বেশ দীর্ঘ সময়। আজ যেসব সবক হয়েছে সেগুলো ইয়াদ করলাম। প্রথমে আদবের মুখতারাত, তারপর কুদূরী। আজ কুদূরীর দরস অবশ্য সহজ ছিলো। অল্পসময়েই ইয়াদ হয়ে গেলো। কিন্তু কাফিয়া ছিলো বেশ কঠিন। সবকের সময় মনে হলো বুঝেছি, কিন্তু ইয়াদ করতে বসে দেখি, সব যেন আবছা হয়ে গেছে।'

আরো লেখা যায়, 'নহব বা আরবী ব্যাকরণ সবসময় আমার কাছে কঠিন মনে হয়, তার উপর কাফিয়া তো আগাগোড়াই কঠিন। প্রতিটি ইবারত জটিল ও দুর্বোধ্য। র্মম উদ্ধার করাই দায়। বিষয়বস্তু বোঝাই যখন উদ্দেশ্য তখন সহজ ইবারাতে লেখাই তো উত্তম হতো! আমার মনে হয়, কাফিয়া থেকে আর যাই হোক নহবের মাসায়েল আত্মস্থ করা সহজ নয়। আচ্ছা, নাহব ও ব্যাকরণ ছাড়া কি ভাষা শেখা সম্ভব নয়!'

এশার পর তোমার পুষ্প পড়া নিয়েও হতে পারে আজকের রোযনামচা। যেমন–

'এ মাসের পুষ্প এখনো আসেনি। এশার পর পিছনের একটা সংখ্যা পড়লাম। প্রথম কথা এবং শেষ কথা এ দুটি শিরোনামের লেখাগুলো আমার খুব ভালো লাগে। ছোট পরিসরে ছোট্ট লেখা, কিন্তু প্রতিটি লেখায় পাঠকের জন্য থাকে মূল্যবান কোন বার্তা। আসলে যে লেখায় কোন বার্তা থাকে তা আয়তনে ছোট হলেও অনেক বড় লেখার চেয়েও মূল্যবান।'

এটা হলো প্রথম কথা ও শেষ কথা শিরোনামের লেখাগুলো সম্পর্কে একটি সাধারণ পর্যালোচনা। এরপর ইচ্ছে করলে তুমি নির্দিষ্ট কোন একটি লেখা সম্পর্কে মন্তব্য করতে পারো। যেমন–

'দ্বিতীয় প্রকাশনা–৪ এর প্রথম কথা আজ পড়লাম, আগেও পড়েছি, একবার দু'বার করে অনেক বার। এমন লেখা বারবারই পড়তে হয়। তাহলেই লেখার মূল বার্তাটি অনুধাবন করা যায়। লেখাটির মূল বক্তব্য হলো, ভবিষ্যতে বড় হওয়ার শুধু স্বপ্ন দেখা যথেষ্ট নয়, স্বপ্ন দেখার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নবাস্তবায়নের কঠিন সাধনায়

আত্মনিয়োগ করাও কর্তব্য।
লেখক আমাদেরকে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখতে বলেছেন, সেই সঙ্গে স্বপ্নবাস্তবায়নের সাধনায় আত্মনিয়োগ করারও আহ্বান জানিয়েছেন।'
কোন লেখা যদি তোমার পছন্দ না হয় তাহলে সে সম্পর্কে সাহসের সঙ্গে যুক্তির ভাষায় তোমার মতামত বলো। যেমন, 'দ্বিতীয় প্রকাশনা-৭ এর সম্পাদকীয়টি আমার কাছে মনে হয়েছে পুষ্পের উপযোগী নয়। খেলার খবরের উল্লেখ ছাড়াই বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা যেতো। অলিম্পিক আয়োজনে বিপুল অপচয়ের সমালোচনা করতে গিয়ে প্রকারান্তরে অলিম্পিকের বিজ্ঞাপন প্রচার করা হলো বলে মনে হতে পারে। এটা আমার ব্যক্তিগত মত, ভিন্নমত অবশ্যই থাকতে পারে।'
এমনও হতে পারে যে, আজকের রোযনামচায় কোন ঘটনা বা ঘটনাকেন্দ্রিক কোন প্রতিক্রিয়া লেখা হলো না। শুধু মনে উদিত হওয়া কোন একটি চিন্তার কথা লেখা হলো। যেমন-
'কত পার্থক্য সে যুগে এবং এ যুগে। তখন ইলম অর্জনের জন্য না এমন অনুকূল পরিবেশ ছিলো, না এত উপযোগী সামান ছিলো, না এত কিতাব ছিলো, না তথ্যলাভের এত সূত্র ছিলো, অথচ কেমন জ্ঞানসমুদ্র ছিলেন এককেজন! যেমন ছিলো ইলম তেমনি ছিলো বিনয়। কিন্তু আজ!
'আজ' এর পর ! চিহ্ন দিয়ে কথা শেষ করতে পারো, আবার আজকের বিপরীত অবস্থার বিশদ বর্ণনাও দিতে পারো।
আলোচনা আরো দীর্ঘ করা যায়, কিন্তু তার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আমি শুধু জানতে চাই, তুমি কি এখন নিয়মিত রোযনামচা লেখা শুরু করবে, না নতুন কোন অজুহাত তালাশ করবে! দেখো, তোমাদের রোযনামচা না লেখার ওছিলায় আমার কিন্তু রোযনামচার উপর ভালো হোক মন্দ হোক একটা লেখা তৈরী হয়ে গেলো!

# প রি শি ষ্ট

মূল গ্রন্থে যে সমস্ত লেখার প্রতি
কোন না কোন ভাবে ইঙ্গিত এসেছে সেগুলো
গ্রন্থবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে পরিশিষ্টে যোগ করা হলো। পাঠক যদি দেখতে
ইচ্ছে করেন তাহলে হাতের কাছেই পেয়ে যাবেন।

# শিশুর প্রতি কৃতজ্ঞতা

পৃথিবীর উদ্যানে একটি মানবশিশু সদ্য ফোটা একটি ফুলের মতই কোমল ও পবিত্র। তোমার হৃদয়ে ফুলের প্রতি যে নিষ্পাপ ভালোবাসা, তেমনি ভালোবাসা থাকতে হবে সেই নিষ্পাপ শিশুটির প্রতি যে মাত্র আজ এই পৃথিবীর বাগানে ফুল হয়ে ফুটেছে। ফুলের প্রতি কোন মানুষের হৃদয়ে বিদ্বেষ থাকে না, এমনকি সে ফুল যদি ফোটে শত্রুর বাগানে। তেমনি কোন মানবশিশুর প্রতি তোমার হৃদয়ে থাকতে পারে না কোন বিদ্বেষ, যদি ও সে পৃথিবীতে এসে থাকে তোমার শত্রুর ঘর আলো করে।

এখানে সেখানে, সবখানে পৃথিবীর মানব-উদ্যানে আজ যত ফুল ফুটেছে, যত শিশু জন্মলাভ করেছে। আমি জানতে চাই না, তার মা-বাবা মুসলিম, না অমুসলিম, আরব না অনারব, সাদা না কালো, আমি জানতে চাই না সেই নিষ্পাপ শিশুটির জন্ম আমার বন্ধুর ঘরে, না শত্রুর ঘরে। সব শিশুকে আমি উপহার দিলাম আমার হৃদয়-উদ্যান থেকে একটি করে শুভ কামনার সুরভিত পুষ্প।

হে শিশু! তোমার কান্নাকে আমি সাদরে বরণ করি, তোমার অবাক চাহনিকে আমি শ্রদ্ধা করি, তোমার ঠোঁটের মিষ্টি হাসিকে, তোমার মুখের আধো আধো বোলকে আমি অভিনন্দন জানাই। আমিও একদিন তোমার মত নিষ্পাপ ছিলাম। এমন কান্না আমারও কণ্ঠে ছিলো, এমন অবাক চাহনি আমারও চোখে ছিলো, এমন মধুর হাসি, এমন আধো আধো বোল ছিলো আমারও ঠোঁটে, মুখে! সে সব হারিয়ে আমি এখন নিঃস্ব। বহু কলঙ্কে আমি এখন মলিন। তবু আমার হৃদয়ে আছে শিশুর হাসি ও কান্নার প্রতি, তার চোখের অবাক চাহনির প্রতি এবং তার মুখের আধো আধো বোলের প্রতি মধুর প্রীতি ও ভালোবাসা।

হে মানবশিশু! হে জান্নাতের ফুল! তুমি সুন্দর থাকো, তুমি পবিত্র থাকো! পৃথিবীর সব আবিলতা ও মলিনতা থেকে তুমি মুক্ত থাকো। উর্ধ্বজগতের সাথে বিরহের, বিচ্ছেদের এই যে কান্না আজ তোমার কণ্ঠে, তার সুরঝঙ্কার চিরকাল যেন বাজতে থাকে তোমার হৃদয়বীণার তারে। তোমার স্রষ্টাকে তুমি যেন ভালোবাসতে পারো হৃদয় ও আত্মা সঁপে দিয়ে।

তোমার চোখের এই যে অবাক চাহনি, তা যেন জীবনের প্রতি, জগতের প্রতি এবং

প্রকৃতির সবকিছুর প্রতি অপার মুগ্ধতা নিয়ে বেঁচে থাকে চিরকাল। জীবন, জগৎ ও প্রকৃতি তোমাকে যেন পরম যত্নে চিরকাল প্রতিপালন করে এবং তোমাকে যেন তোমার স্রষ্টার শক্তি ও কুদরত এবং দয়া ও রহমতের পরিচয় দান করে।

তোমার মুখের আধো আধো বোল যেন পৃথিবীর সব মানুষের জন্য সত্যের বাণী ও বার্তা হয়ে উচ্চারিত হতে থাকে চিরকাল।

হে মানবশিশু! মায়ের কোলে আকাশ থেকে নেমে আসা হে চাঁদ! চিরকাল তুমি জোসনার আলো বিতরণ করো তোমার মায়ের জন্য এবং সব মানুষের জন্য।

যে মায়ের কোল আলো করে তুমি আজ পৃথিবীতে এসেছো তাকেও আমার অভিনন্দন। যে প্রসববেদনার ফল তুমি, তা যেন রক্ষা করে তাকে জীবনের এবং মহাজীবনের সকল কষ্ট-যন্ত্রণা থেকে। তোমাকে দেখে সব ব্যথা-বেদনা তিনি ভুলেছিলেন; তোমাকে দেখে তিনি পরম তৃপ্তির হাসি হেসেছিলেন; সেই হাসিটুকু চিরকাল যেন অম্লান থাকে তার জীবনে। তোমার জান্নাত তুমি যেন খুঁজে নিতে পারো তার পায়ের নীচে।

'আয়েশা', তুমি যেন হতে পারো তোমার মায়ের 'আলো-আশা'!

হে শিশু! হে ফুল! হে চাঁদ! চিরকাল তুমি যেন শিশুই থাকো। শিশুর মত কোমল ও নিষ্পাপ। চিরকাল তুমি যেন ফুল থাকতে পারো। ফুলের মত পবিত্র ও সুরভিত। চিরকাল তুমি যেন চাঁদ হয়ে থাকো। চাঁদের জোসনার মত স্নিগ্ধ। চিরকাল তুমি যেন থাকাতে পারো মাতৃদুগ্ধের মত শুভ্র-পবিত্র।

(গতকাল যে শিশুটি জন্ম লাভ করেছে। দূর থেকে যার কান্না শুনে এ লেখাটি আমি লিখেছি তার কাছে চিরাকলের জন্য আমি ঋণী হয়ে থাকলাম। পৃথিবীতে মাত্রই সে এসেছে। আমি তাকে দেখিনি, আমার কাছ থেকে সে কিছুই গ্রহণ করেনি, অথচ আমার কলবকে দান করলো কিছু পবিত্রতা, কিছু কোমল অনুভূতি এবং আমার কলমকে দান করলো আলোকিত শব্দের কিছু ফুল!

জান্নাত থেকে নেমে আসা শিশু এভাবেই দান করে তার মাকে, বাবাকে, আমাকে, তোমাকে, সবাইকে। তবে শিশুর দান সবাই বুঝতে পারে না; তা বোঝার মত হৃদয় সবার থাকে না। তুমি যদি শিশুর কান্নাকে বরণ করে নিতে পারো! যদি তোমার শত্রুর শিশুকেও আদর দিতে পারো তাহলে একটি শিশুর কাছ থেকে তুমি এমনকি জান্নাতও পেয়ে যেতে পারো। হে বন্ধু! হাত জোড় করে বলি, শিশুকে ভালোবাসতে শেখো; তোমার শিশুকে এবং সকল মানবশিশুকে।)

# শুধু তোমার জন্য নয় সকলের জন্য

পূর্বদিগন্তে তুমি কি হে বন্ধু দেখেছো ভোরের আলো! লাল প্রভাত-সূর্য!
তুমি কি বাগানে দেখেছো সদ্য ফোটা ফুল! সবুজ ঘাসের ডগায় শিশিরবিন্দু!
তুমি কি শুনেছো প্রভাত-পাখীদের কলরব! বুলবুলির মিষ্টি গান!
প্রাতঃসমীরণে, গাছের সবুজ পাতার হিল্লোলে তুমি কি শুনেছো প্রকৃতির সুমধুর কোন বাণী! জীবনের নবযাত্রার প্রদীপ্ত কোন আহ্বান!
যদি বলো, হাঁ, তাহলে আমি বলবো, ভোরের আলো এবং প্রভাত-সূর্য শুধু তোমার জন্য নয়, সকলের জন্য।
বাগানের সদ্য ফোটা ফুল এবং তার কোমল সুবাস, সবুজ ঘাসের শিশির বিন্দু ও তার পবিত্র শুভ্রতা শুধু তোমার জন্য নয়, সকলের জন্য; তোমার জন্য এবং যারা ঘুমিয়ে আছে তাদেরও জন্য।
পাখীদের কলরব এবং বুলবুলির গান শুধু তোমার জন্য নয়, সকলের জন্য।
প্রাতঃসমীরণ এবং সবুজ পাতার হিল্লোল শুধু তোমার জন্য নয়, সকলের জন্য; তোমার জন্য এবং যারা ঘুমিয়ে আছে তাদেরও জন্য।
তুমি ডাকো, যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের জাগিয়ে তোলো; তারাও যেন দেখতে পায় লালসূর্যের শোভা এবং শিশিরবিন্দুর শুভ্রতা। পাখীদের কলরবে, বুলবুলির গানে তারাও যেন শুনতে পায় প্রকৃতির বাণী।
সবুজ পাতার হিল্লোল থেকে তারাও যেন পেয়ে যায় নবজীবনের আহ্বান। তখন, শুধু তখন তোমার জীবনে আসবে পরিপূর্ণতা ও সম্পূর্ণতা।

# তুমি ডাক দাও

তুমি কি দেখেছো পশ্চিম দিগন্তের লাল আভা! ধীরে ধীরে সূর্যের অস্ত যাওয়া!
তুমি কি দেখেছো দিনের শেষে রাত্রির অন্ধকার! ক্লান্ত পাখীদের নিড়ে ফিরে আসা!
সন্ধ্যা-কাকের কা-কা রবে তুমি কি শুনেছো কান্নার বিষণ্ন সুর, দিনের অবসানের শোক-বাণী!
মিনারে মিনারে মুআযযিনের আযানে তুমি কি শুনেছো বিদায়ের বার্তা! সায়াহ্নের সঙ্গীত!
যদি বলো, হাঁ, তাহলে আমি বলবো, অস্ত যাওয়া সূর্যের লাল আভা এবং পাখীদের নীড়ে ফিরে আসা শুধু তোমার জন্য নয়, সকলের জন্য। দিনের অবসান ও রাত্রির অন্ধকার, আলো-আঁধারের এই মিলনমেলা শুধু তোমার জন্য নয়, সকলের জন্য। সন্ধ্যা-কাকের কান্নার বিষণ্ন সুর এবং মাগরিবের আযানে ধ্বনিত বিদায়ের শোকসঙ্গীত শুধু তোমার জন্য নয়, সকলের জন্য।
তুমি ডাক দাও, গাফলাতের ঘোরে বেহুঁশ যারা তাদের সতর্ক করো। সূর্যাস্তের লাল আভা থেকে তারাও যেন গ্রহণ করে জীবনের অস্ত যাওয়ার শিক্ষা। তারাও যেন বুঝতে পারে, দিনের শেষে পাখীদের মত আমাদেরও ফিরে যেতে হবে আমাদের নীড়ে। সন্ধ্যা-কাকের কান্নার বিষণ্ন সুরে এবং মাগরিবের আযানধ্বনিতে তারাও যেন শুনতে পায় জীবনের অবসানের শোকসঙ্গীত। তোমার অনুভব,তোমার আকুতি যদি ছড়িয়ে দিতে পারো সকলের মাঝে তাহলেই তোমার জীবনের সার্থকতা।

# নর্দমা ও আবর্জনা থেকে শিক্ষা

*(হুমায়ূন আহমেদ নামে একজন লেখক আছেন। তার লেখা আমার তেমন একটা পড়া হয়নি। পড়ার সুযোগও নেই আমার কর্মব্যস্তজীবনে। তবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতেই হবে যে, তার বই থেকে দু'তিনবার আমি খুব ভালো পরিমাণে উপকৃত হয়েছি। তার মধ্যে একটি এই যে, তার বইয়ের একটি বাক্য বা শব্দ থেকে আমি নীচের লেখাটি উপহার পেয়েছি। এখন মনে নেই, তিনি তার কোন এক বইয়ে এরকম একটি বাক্য লিখেছিলেন, 'মনে হলো, আমি পথের পাশের নর্দমায় পড়ে গেছি। সারা গা আমার ঘিন ঘিন করছে।' এ বাক্যটি পড়ে আমি যেন পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলাম সারা গায়ে ময়লা ভরিয়ে নর্দমা থেকে উঠে আসা সেই মানুষটির ছবি, আমারও যেন সারা শরীর ঘিনঘিন করে উঠেছিলো। সেই ঘিনঘিন অনুভূতি থেকেই নীচের লেখাটি জন্মলাভ করেছিলো। আরেকবার তার উপন্যাসে লেখা একটি ঘটনা থেকে আমি খুব বড় একটি শিক্ষা পেয়েছিলাম। সে শিক্ষা আমার জীবনে অনেক কাজে আসছে। অনেককেই আমি সেটা বলি, কখনো সুযোগ হলে তোমাদেরও বলবো। তবে একটা কথা, তার এবং তার মত লেখকদের লেখায় আখলাক ও চরিত্র এবং আফকার ও চিন্তা নষ্ট করার উপাদান এত বিপুল পরিমাণে রয়েছে যে আল্লাহ পানাহ! তাই আমি কিছুতেই পরামর্শ দিতে পারি না যে, সাহিত্য শেখার নামে কেউ সেগুলো পড়ুক। আচ্ছা যাক, এখন লেখাটি দেখো-)*

নর্দমায় পড়ে গিয়ে শরীর যদি ময়লা-গান্দায় ভরে যায়, মানুষ তখন কী করে? ময়লা শরীরেই সবার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়? (আগে ছিলো ঘোরাফেরা করে?) হাসিমুখে দশজনের মজলিসে বসে থাকে?

না, মানুষ তা করে না, বরং অস্থির হয়ে ময়লা দূর করার উপায় খোঁজে। পানি ঢেলে, সাবান মেখে পরিষ্কার হওয়ার চেষ্টা করে। মানুষ ময়লা বহন করে বেড়ায়, কিন্তু ময়লা ও দুর্গন্ধ সহ্য করতে পারে না। দু'একদিন শহরের আবর্জনা পরিষ্কার না করলে দুর্গন্ধে সেখানে বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। রোগ-ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়।

নর্দমায় পড়ে শরীরে যেমন ময়লা লাগে, প্রতিদিন শহরে যেমন আবর্জনা জমে তেমনি 'জীবনের নর্দমায়' পড়ে আমাদের কলবও ময়লা-গলিযে মাখামাখি হয়ে না-পাক হয়ে যায়; আমাদের মনের জগতেও আর্বজনা জমে রোগ-ব্যাধি ছড়ায়। ক্রোধ, হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, লোভ-লালসা, 'লোকলিপ্সা' ইত্যাদি হলো কলবের ময়লা-নাপাকি এবং যাবতীয় পাপাচার-অনাচার হলো মনের জগতের আবর্জনা। এগুলো দূর হয় তাওবা-ইস্তিগফার দ্বারা এবং পবিত্র মানবের সান্নিধ্য দ্বারা।

শরীরের ও শহরের ময়লা-আবর্জনা দূর করার জন্য আমরা যতটা তৎপর, কলবের ও হৃদয়ের ময়লা-আবর্জনা দূর করার ক্ষেত্রে আমরা ঠিক ততটা উদাসীন। তাই আমাদের শরীর ও শহর যত শুভ্র ও পরিচ্ছন্ন, আমাদের কলব ও হৃদয় তত নোংরা ও কদর্য।

আমাদের শরীর পরিচ্ছন্ন এবং বিভিন্ন সুগন্ধিতে সুবাসিত; আমাদের ঘর-বাড়ী, শহর-জনপদ পরিষ্কার, ঝকঝকে, তকতকে এবং সবুজগাছের ছায়ায় স্নিগ্ধ, কিন্তু আমাদের কলব ও রূহ ডুবে আছে গালাযাত ও গান্দেগিতে, আমাদের হৃদয় ও আত্মা নোংরা হয়ে আছে নানা রকম ময়লা-আবর্জনায় মাখামাখি হয়ে। কলব ও রূহের জাহানে এবং হৃদয় ও আত্মার জগতে তাই আমরা ব্যধিগ্রস্তই শুধু নই, বরং আমাদের দ্বারা অন্যদের মধ্যেও রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে। হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ-লালসায় সমাজ বিষিয়ে ওঠে। আমরা যেখানে যাই, যাদের কাছে যাই, আমাদের উপস্থিতি ও সংস্পর্শ দ্বারা অনাচার-পাপাচারই শুধু সংক্রমিত হয়; আমাদের দুর্গন্ধে পারিবেশ শুধু বিষাক্ত হয়।

যাদের কাছে 'সাবান আছে, পানি আছে' আসুন আমরা তাদের কাছে যাই এবং কলবের গান্দেগি ও হৃদয়ের আর্বজনা ধুয়ে পরিষ্কার করে আত্মার জগতে পবিত্র হই।

# তো/মা/র/জ/ন্য/ক/বি/তা

যারা কবি তারা কবিতা লেখে তাদের ভালোবাসার জন্য, তাদের প্রেমকে অমর করে রাখার জন্য। যারা কবি তারা কবিতা লেখে তাদের প্রিয়তমকে নিবেদন করার জন্য, ছন্দের যাদু দ্বারা প্রিয়তমের হৃদয়কে বিগলিত করার জন্য।
আমি কবি নই; আমি কবিতা লিখতে জানি না। আমি তো শিখিনি শব্দের কারসাজি এবং ছন্দের কারিশমা!
হে প্রিয়তম! আমার হৃদয়ে আছে সামান্য ভালোবাসা এবং আত্মনিবেদনের অতিসামান্য আকুতি। তবে যা আছে তা শুধু তোমার জন্য। তুমি যে আমার একমাত্র হে প্রিয়তম! আমি যে তোমার সৃষ্টি! তুমি যে আমার স্রষ্টা!
কবিদের কাব্যপ্রতিভা, সে তো তোমারই দান। আমাকে তুমি কেন দিলে না কবিতা হে প্রিয়তম! আমি যদি কবি হতাম, আমি যদি কবিতা লিখতে জানতাম, তোমার জন্য কবিতা লিখতাম; শব্দ দিয়ে, মুক্তো দিয়ে এবং অশ্রুবিন্দু দিয়ে। আমি কবিতা লিখতাম ছন্দের তরঙ্গ দিয়ে তোমার অপার সৌন্দর্যের বন্দনা গেয়ে। আমি কবিতা লিখতাম তোমার অনন্ত করুণার স্তুতি বর্ণনা করে। আমার সমস্ত কবিতা আমি নিবেদন করতাম তোমাকে, শুধু তোমাকে। আমাকে তুমি কেন দিলে না কবিতা হে প্রিয়তম!
শব্দের ও ছন্দের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এবং নৈঃশব্দের বাণী অবলম্বন করে কি কবিতা হয়?! তাহলে তো আমি আদর্শ কবি! কারণ কখনো কখনো আমি নৈঃশব্দের মাঝে বিচরণ করি এবং তোমার সান্নিধ্য অনুভব করি। হৃদয় তখন পুলকিত, শিহরিত ও উদ্বেলিত হয়। আমার সমগ্র সত্তায় অপূর্ব এক তরঙ্গদোলা সৃষ্টি হয়। এটাই যদি হয় নৈঃশব্দের কবিতা তাহলে তো হে প্রিয়তম, আমি তোমার জন্য কবিতা রচনা করি! আমার নৈঃশব্দের কাব্যবন্দনা তোমার জন্য, শুধু তোমার জন্য। তুমি যে আমার একমাত্র হে প্রিয়তম! আমি যে তোমার সৃষ্টি! তুমি যে আমার স্রষ্টা!

শব্দ ও নৈঃশব্দ তোমার কাছে তো সমান! তুমি তো শুনতে পাও মুখের কথা এবং মনের কথা! আমার সব কথা তোমার জন্য। আমার শব্দের গদ্য এবং নৈঃশব্দের কবিতা তোমার জন্য। আমার সরব বন্দনা ও নীরব প্রার্থনা, সব তোমার জন্য। আর আমি! আমার অস্তিত্ব! আমার হৃদয় ও আত্মা! আমার সর্বসত্তা তোমার জন্য, শুধু

# দু'টি কবিতা সমান হলো!

হে কবি! তুমি বড় ক্ষুদ্র; তোমার কবিতা অতি তুচ্ছ! তোমার কবিতা যার জন্য নিবেদিত সে 'মেহেরজান'!
আমার কবিতার বন্দনা যার জন্য তিনি 'মেহেরবান'!
আমার কবিতা এবং তোমার কবিতা কি সমান হলো! বলো, বলো, কবিতার কসম করে বলো!
তুমি ভালোবাসো যে সৌন্দর্য তা দু'দিনের, তোমার কবিতার আয়ু তাহলে ক'দিনের!
আমার উপাস্য যিনি, আমি যাকে ভালোবাসি, আমি যার বন্দনা গাই তিনি আধার সকল সৌন্দর্যের। তিনি স্রষ্টা সময়ের, জীবনের, চাঁদের, জোসনার, ফুলের, সুবাসের এবং নারীর সুন্দর মুখের। আমার কবিতা নয় তো চাঁদের জোসনা এবং ফুলের সুবাসের জন্য, নয় কোন সুন্দর মুখের জন্য। আমার কবিতা যে নিবেদিত অনন্ত সৌন্দর্যের জন্য! সুতরাং যত সামান্য হোক, আমার কবিতা অনন্তকালের জন্য।
হয়ত তুমি অনেক বড় কবি, কিন্তু হে কবি! তুমি ও তোমার কবিতা বড় ক্ষণস্থায়ী।
হয়ত আমি ক্ষুদ্র কবি, কিংবা নই কোন কবি, তবু আমার কবিতা অনন্তকালের।
হয়ত তুমি পাবে সোনার পদক এবং নগদ পুরস্কার। আমার কবিতার পুরস্কার শুনতে চাও হে কবি, হুরের মুখের
নির্ঝর হাসি, তার চোখের তির্যক চাহনি!



দারুল কলম
মাদরাসাতুল মাদীনাহ
কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা-১২১১